মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

অনূদিত

আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভীর

ইসলামের যাকাত বিধান

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)
অনূদিত

আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী'র

ইসলামের যাকাত বিধান

প্রথম খণ্ড

[কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকের যাকাত বিধান ও
তার দার্শনিক পটভূমির তুলনামূলক অধ্যয়ন]

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা),
দোকান নং – ২০৯, ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০,
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২; ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৭১২-১৮৫০০০।

ইসলামের যাকাত বিধান (প্রথম খণ্ড)
মূল ঃ আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম।

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮২ ইংরেজি
৮ম প্রকাশ ঃ জুলাই ঃ ২০১৩ ইংরেজি
রমজান ঃ ১৪৩৪ হিজরী
শ্রাবণ ঃ ১৪২০ বাংলা

প্রকাশক ঃ
মোস্তাফা নাসিরুল হক
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ ঃ
আবদুল্লাহ্ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তফা কম্পিউটার্স
১০-ই/এ-১, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস
২/১ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা।

মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

ISBN : 984-8455-57-17

প্রসঙ্গ-কথা

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, বিশেষত গরীব, নিঃস্ব ও অসহায় লোকদের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান নিঃসন্দেহে একটি কঠিন সমস্যা। এই সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থায় কিছু 'কল্যাণধর্মী' পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু সে সব পদক্ষেপ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে কোন নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে নি। ফলে কল্যাণধর্মী বলে খ্যাত রাষ্ট্রগুলোতেও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচী এখনো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। দৃশ্যত কিছু কল্যাণধর্মী ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষ সে সব দেশে চরম দুরাবস্থার মধ্যে বসবাস করছে।

ইসলাম আল্লাহ্‌র দেয়া এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় এক সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি ছাড়াও সামাজিক ন্যায়বিচারকে নিশ্চিত করার জন্যে যাকাত-এর একটি চমৎকার কর্মসূচীর বিধান রাখা হয়েছে। সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল লোকদের বাড়তি সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত আদায় করে দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের মধ্যে যথাযথ বন্টন করাই এ কর্মসূচীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলাবাহুল্য, এটি যেমন একটি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম, তেমনি ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদতও। তাই পবিত্র কুরআনের বহুতর স্থানে নামায প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যাকাত প্রদানেরও আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যাকাত সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণার অভাবে এই কল্যাণময় ব্যবস্থাটি থেকে আমাদের সমাজ যথোচিতভাবে উপকৃত হতে পারছে না।

আরব জাহানের স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও সুপণ্ডিত আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী প্রণীত 'ফিক্‌হুয যাকাত' নামক বিশাল গ্রন্থটি এদিক থেকে আমাদের জন্যে এক পরম সম্পদ। যাকাত আদায়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো অত্যন্ত পুংখানুপুংখভাবে বিবৃত করা হয়েছে দুই খণ্ডে বিভক্ত এই মূল্যবান গ্রন্থে। এ কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) 'ইসলামের যাকাত বিধান' শিরোনামে এই অনন্য গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে সময়ের এক বিরাট দাবি পূরণ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থটির প্রকাশনায় ধারাবাহিকতা না থাকায় এর অপরিমেয় কল্যাণ থেকে যথোচিতভাবে উপকৃত হতে পারেননি আমাদের বিদগ্ধ পাঠক সমাজ, বরং গত কয়েক বছর ধরে গ্রন্থটি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না বলে আগ্রহী পাঠকরা সরাসরি অভিযোগ করেছেন আমাদের কাছে।

এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)-এর গ্রন্থাবলী প্রকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত 'খায়রুন প্রকাশনী' এখন থেকে 'ইসলামের যাকাত বিধান' শীর্ষক গ্রন্থটির যথাযথ প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তদনুসারে বর্তমানে এর প্রথম খণ্ডটি সহৃদয় পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। এর দ্বিতীয় খণ্ডটিও যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটির এ সংস্করণে আমরা পূর্বেকার মুদ্রণ-প্রমাদগুলোর সংশোধনের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এর অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ পারিপাট্যকেও উন্নত করার ব্যাপারে যত্ন নেয়া হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থটির এ সংস্করণ পাঠকদের কাছে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ গ্রন্থকার ও অনুবাদককে এই অনন্য খেদমতের উত্তম প্রতিফল দান করুন, এটাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

ঢাকা ঃ ১৩, এপ্রিল, ১৯৯৭

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন

অনুবাদকের কথা

'যাকাত' দ্বীন-ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। কিন্তু এ বিষয়ে আধুনিক সমাজ ও অর্থনীতির দৃষ্টিতে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত কোন গ্রন্থ উপমহাদেশের কোন ভাষায় ছিল না। তাই এ বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করছিলাম বহুদিন থেকে।

তবে এ যুগের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও সুপণ্ডিত এবং কাতারের অধিবাসী আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী লিখিত 'ফিক্‌হুয যাকাত' (فقه الزكوة) নামক আরবী গ্রন্থটির নাম শুনে আসছিলাম ১৯৬৯ সন থেকেই। কিন্তু দুই খণ্ডে বিভক্ত এই বিরাট গ্রন্থখানি পড়ার কোন সুযোগ তখন আমি পাই নি।

এর দশ বছর পর ১৯৭৯ সনের রমযান মাসে এই গ্রন্থখানি আমি সর্বপ্রথম দেখতে পাই এবং তখনই আমি এর অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভীর এ এক অমর ও অতুলনীয় সৃষ্টি। আমার জানামতে আরবী ভাষায়ও এর সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নেই।

বস্তুত ইসলামী জ্ঞান ও আদর্শের ক্ষেত্রে যাকাত যেমন মহান আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ অবদান, দুনিয়ার বঞ্চিত মানবতার দারিদ্র্য মুক্তির জন্য যাকাতও এক অনন্য ও অনবদ্য ব্যবস্থা। এ বিষয়ে ব্যাপক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এই গ্রন্থখানি এক মহামূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থখানি রচনা করে আল্লামা কারযাভী দ্বীন-ইসলামের এক অতুলনীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে গোটা মুসলিম জাহানেরও মহাকল্যাণ সাধন করেছেন।

আমি আশা করি, এই গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করে পাঠকবৃন্দ যাকাতের গুরুত্ব ও মানবতার কল্যাণে এর বিরাট ভূমিকার কথা সবিস্তারে জানতে পারবেন। এই বিরাট গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সম্পূর্ণ করে বাংলা ভাষাভাষী জনগণের সম্মুখে পেশ করতে পারা আমার জন্যে একটি পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং এজন্য আমি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন করছি অশেষ শুকরিয়া।

(মওলানা) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

মুস্তাফা মনযিল
২০৮, নাখালপাড়া
ঢাকা ২৮-৮-১৪০২ হিজরী

সূচীপত্র

ইসলামের যাকাত বিধান

প্রথম খণ্ড

আল্লাহ্‌র বিধান

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ- اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ- وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

লোকদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর, তার দ্বারা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ কর এবং তাদের জন্যে কল্যাণের দোয়া কর। নিঃসন্দেহে তোমার এই দোয়া তাদের জন্যে পরম সান্ত্বনার কারণ। আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

بسم الله الر حمن الرحيم

গ্রন্থকারের কথা

সমস্ত তারীফ ও প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র জন্য। দরূদ ও সালাম রাসূলে করীম (স)-এর জন্য; তাঁর বংশ-পরিবার, সঙ্গী-সাথী ও তাঁর নিকট থেকে প্রাপ্ত হিদায়াতের অনুসরণকারীদের প্রতি—

দ্বীন-ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। তওহীদী ঈমান ও নামায কায়েমের সঙ্গে সঙ্গে এই যাকাত রীতিমত আদায় করেই এক ব্যক্তি মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। অধিকারী হতে পারে মুসলিম জনগণের ভাই হওয়ার, পারে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর ও ঘনিষ্ঠ করে নিতে। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ -(التوبه-١١)

যদি এই লোকেরা তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই হবে।

যাকাত সাধারণত ইবাদতের পর্যায়ে গণ্য। কুরআন মজীদে নামাযের সঙ্গেই আছে যাকাতের উল্লেখ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাকাত ইসলামের সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিধানের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কারণে তা খুব গুরুত্ব সহকারেই উপস্থাপিত হয় রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে এবং এই পর্যায়ে লিখিত গ্রন্থাবলীতে।

ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ এই কারণে যাকাতের আইন ও বিধি-ব্যবস্থা এবং তত্ত্ব ও তথ্যের উপর পরিপূর্ণ বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য সহকারে গুরুত্ব আরোপ করেছেন—এই প্রসঙ্গে গবেষণা চালিয়েছেন।

কুরআনের তাফসীর লেখকগণের ভূমিকা

কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে, তাফসীর লেখকগণ সেই সব আয়াতকে ভিত্তি করে যথেষ্ট চিন্তা-গবেষণা ও বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা চালিয়েছেন। এই পর্যায়ে সূরা আল-বাকারার ২৬৭ ও তৎপরবর্তী আয়াত, সূরা আল-আনআমের ১৪১ আয়াত, সূরা আত-তওবা'র ৩৪,৬০ ও ১০৩ আয়াত এবং আরও কয়েকটি সূরার কতিপয় আয়াত উল্লেখ্য।

তাফসীরকারগণ উপরিউক্ত আয়াতসমূহের পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে যে মহামূল্য ও বৃহদাকার গ্রন্থাবলী রচিত হয়েছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ

—আবূ বকর আর-রাযী আল-জাস্‌সাস ঃ আল-আহ্‌কামুল কুরআন

—আবূ বকর ইবনুল আরাবী ঃ আল-আহ্‌কামুল কুরআন

—আবূ আবদুল্লাহ্ আল-কুরতুবী ঃ আল-জামে'লি-আহকামিল কুরআন

মুহাদ্দিস ও হাদীসের ব্যাখ্যাকারদের ভূমিকা

এ পর্যায়ে হাদীসসমূহের আলোচনা ও ব্যাখ্যাদানে মুহাদ্দিস ও হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ফিকাহ্ গ্রন্থের পদ্ধতিতে হাদীসের যে সব গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে যাকাত সম্বন্ধে একটা বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম মালিক প্রণীত মুয়াত্তা, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ, জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজা প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখ্য। সেই বিশেষ অধ্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত তাঁর কথা ও কাজের বিবরণ সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। একমাত্র বুখারী শরীফেই যে 'কিতাবুয যাকাত' উদ্ধৃত আছে তাতেই ১৭২টি সহীহ্ মরফূ[১] হাদীস সংকলিত রয়েছে। মুসলিম শরীফেও তাঁর থেকে সতেরটি হাদীস ছাড়া অবশিষ্ট সকল হাদীসই উদ্ধৃত হয়েছে। উপরন্তু সাহাবা ও তাবেয়ীনের বিশটি উক্তিও তাতে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

ফিকাহ্‌বিদদের কাজ

ফিকাহ্‌র কিতাবসমূহে যাকাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ইসলামের দ্বিতীয় ইবাদত হিসেবে। এই কারণে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণে নামাযের পরপরই তার উল্লেখ রয়েছে ইবাদতসমূহের আলোচনা ব্যপদেশে।

ইসলামের অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ফিকাহ্‌র আলিমগণের কাজ

তাঁরা ইসলামের অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক ব্যবস্থার অংশ হিসাবেই যাকাতকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ কারণে সে বিষয়ের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই ইমাম আবূ ইউসুফের 'কিতাবুল খারাজ'-এ, ইয়াহ্ ইয়া ইবনে আদাম লিখিত 'কিতাবুল খারাজ'-এ, আবূ উবাইদ লিখিত 'কিতাবুল আমওয়াল'-এ, মাওদী শাফেয়ী ও আবূ-ইয়ালী আল-হাম্বলী রচিত 'আল-আহ্‌কামুস্ সুলতানীয়া' নামক গ্রন্থদ্বয়ে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা লিখিত 'আস-সিয়াসাতুশ-শরীয়াহ' গ্রন্থে।

এক্ষণে যাকাত পর্যায়ে আলোচনাকারী যে মৌল বস্তুর মুখাপেক্ষী হয়, তা অত্যন্ত ভারী ও দুরূহ। তার উৎস বিপুল এবং প্রচুর। তাহলে নতুন করে যাকাত সম্পর্কে এই আলোচনার অবতারণার প্রয়োজন কি? অন্য কথায়, ইসলামী গ্রন্থকার কি এই ধরনের এক নবতর বিরাট আলোচনার মুখাপেক্ষী, যাতে যাকাতের নিয়ম-বিধান, তার লক্ষ্য

---

১. মরফূ বলা হয় সেই হাদীসকে, যা রাসূলের কথা সম্বলিত এবং কোন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত।

২. ফত্হুল বারী-বুখারী শরীফের শরাহ্। তাতে কিতাবুয্ যাকাত উপসংহারে দ্রষ্টব্য।

এবং ব্যক্তি-সমষ্টির জীবনে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হবে? বর্ণনা করা হবে সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সামষ্টিক ব্যবস্থাপনায় তার স্থান সম্পর্কে?

এ প্রশ্নের জবাব আমরা নিশ্চিন্তেই ইতিবাচকভাবে দিতে সক্ষম। বরং বলতে পারি, এ ধরনের আলোচনার প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র। তার কয়েকটি কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

১. এ কথায় কোনই সন্দেহ নেই যে, ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই স্তম্ভ সম্পর্কে আলোচনাকারী ও লেখকগণের একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে এই বিষয়টির পৌনপুনিক আলোচনা, প্রয়োজন হচ্ছে বিভিন্ন উৎসে বিস্তীর্ণ হয়ে থাকা তার হুকুম-আহকাম, তার তত্ত্ব ও তথ্য একত্র করার এবং তাকে সমসাময়িক যুগের পদ্ধতি ও যুক্তিসঙ্গত কলেবরে নতুন করে উপস্থাপনের। অতীত-কালে বিশেষজ্ঞগণ এ পর্যায়ে যে চিন্তা ও গ্রন্থাবলী উপস্থাপন করেছেন, এ যুগের জন্য তাকে যথেষ্ট মনে করা যায় না কোনক্রমেই। কেননা তাঁরা যে গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করেছেন, তা তাঁদের যুগোপযোগী সেকালের ভঙ্গী ও স্টাইল অনুযায়ী করেছেন। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক যুগেরই একটা নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গী রয়েছে, প্রত্যেক যুগের স্টাইল স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَاارْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلِ الاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ- (ابراهيم-٤)

আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে তার সময়কার লোকদের ভাষা ও ভঙ্গী (এবং কথা বলার যোগ্যতা) সহকারে প্রেরণ করেছি, যেন সে লোকদের সামনে স্পষ্ট বক্তব্য রাখতে সক্ষম হয়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় দুটি প্রধান বিষয় অধ্যয়ন , পর্যালোচনা ও সর্বদিক দিয়ে স্পষ্ট করে তোলা একান্তই আবশ্যক। বিষয় দুটি পরস্পর বিরোধী। একটি ইতিবাচক আর অপরটি নেতিবাচক। একটি ইসলামের ফরযসমূহের মধ্যে গণ্য এবং সত্য কথা হচ্ছে, তা ইসলামের পাঁচটি মৌল স্তম্ভের অন্যতম। আর দ্বিতীয়টি ইসলামে শুধু নিষিদ্ধই নয়, ধ্বংসকারী সাতটি কাজের অন্যতম। প্রথমটি যাকাত আর দ্বিতীয়টি সূদ। প্রথমটির ফরয হওয়ার কথা কিংবা দ্বিতীয়টির হারাম হওয়ার কথা অস্বীকার ও অমান্যকারী ব্যক্তি সর্বসম্মতভাবে কাফির—ইসলাম ত্যাগকারীরূপে অভিহিত।

আর বাস্তবিকপক্ষে দ্বিতীয় বিষয়টি—অর্থাৎ সূদ—মুসলিম মনীষীদের কাছে প্রথমটির তুলনায় বেশী গুরুত্ব লাভ করেছে।

মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ দরাজ, ঈসা আবদুহু, মুহাম্মাদ আবূ জুহরা, মুহম্মাদ আবদুল্লাহ্ আল-আরাবী, মাহমুদ আবুস-সউদ, মুহাম্মাদ বাকের আস্-সদর ও মুহাম্মাদ আজীজ প্রমুখ মনীষী এ পর্যায়ে বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য।[১] তাঁরা খালেস ইসলামী দৃষ্টিকোণে কিংবা সম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ প্রভাবিত দৃষ্টিকোণে অনেক কিছুই লিখেছেন।

কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তনের দৃষ্টিতে বিষয়টি অধিক গভীর ও ব্যাপক পর্যালোচনার প্রয়োজন এখনও অব্যাহত। যারাই বেশী গবেষণা ও চেষ্টা-সাধানা করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যে এ ক্ষেত্রটি চিরকাল বিস্তীর্ণ হয়ে থাকবে। তবে সেই অধ্যয়ন অবশ্যই তুলনামূলক হতে হবে। সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে ইসলামের মৌল উৎসসমূহের। সর্বাবস্থায়ই বিষয়টি অধিক যত্ন ও গুরুত্বের দাবি রাখে।

কিন্তু 'যাকাত' আলোচ্য বিষয় হিসেবে আলোচনাকারী ও বিশেষজ্ঞদের নিকট যথাযথ গুরুত্ব লাভ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। এই ধরনের একটি বিষয় যে পরিচর্যা পাওয়ার অধিকারী, তা আদৌ করা হয়নি। অথচ ইসলামের ফরযসমূহের মধ্যে তার একটা বিশেষ স্থান রয়েছে, বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে অর্থনৈতিক, রাজস্ব ও সামষ্টিক ব্যবস্থায়।

২. এখানে এমন কতগুলো সমস্যা আছে, যে বিষয়ে প্রাচীনকালীন ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ রয়েছে। প্রত্যেক মতের সমর্থকবৃন্দ তাঁদের মত উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলিল-প্রমাণেরও উল্লেখ করেছেন। ফতোয়া দানকারিগণ পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। প্রত্যেকেই নিজের মত ও তার ইমামের (অগ্রবর্তী মত প্রদানকারীর) সমর্থন জানিয়েছেন। আর সাধারণ ফতোয়া প্রার্থীগণ ফতোয়া প্রদানকারী বিশেষজ্ঞদের এই পারস্পরিক বৈপরীত্যের সম্মুখে দিশেহারা হয়ে অবস্থান করছে। এ কারণে এসব পরস্পর বিরোধী উক্তি, তাদের প্রত্যেকের উপস্থাপিত প্রমাণ ও যুক্তির পুনর্বিবেচনা হওয়া এবং আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাব ও মানদণ্ডের উপর ইনসাফের দৃষ্টিতে তার যাঁচাই-পরখ হওয়া একান্তই আবশ্যকীয় ছিল। একান্তই জরুরী ছিল পরস্পর বিপরীত এসব মতের মধ্যে একটি মতকে এমনভাবে অগ্রাধিকার দান করা, যেন পরবর্তীকালে আলোচনাকারীরা একটা নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হন।

এই কারণে শিক্ষাগুরু মরহুম শায়খ মাহমুদ শালতুত তাঁর রচিত 'আল-ইসলাম আকীদাতুন ওয়া-শরীয়াতুন'—'ইসলাম ঃ একটি বিশ্বাস ও বিধান' শীর্ষক মূল্যবান গ্রন্থে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন ঃ যাকাত একটি সাধারণ দ্বীনী স্তম্ভ।

তিনি লিখেছেন ঃ

যদিও আমি বিশ্বাস করি, নীতিগত মতপার্থক্য জীবন্ত চিন্তাশক্তির নিদর্শন এবং এ মত-পার্থক্যের যে ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠে তার উদারতা থাকা সত্ত্বেও যখনি এই কর্তব্যের বাস্তবায়নে ইমামগণের মতবিরোধের ক্ষেত্র লক্ষ্য করি, আমার দিল কুণ্ঠিত

১. এই মনীষীদের লিখিত বইয়ের নাম এখানে যথাক্রমে এই ঃ 'সুদ', 'আল্লাহ্ সুদ হারাম করেছেন কেন?' 'সুদ হারামকরণ একটা অর্থনৈতিক সংগঠন', বিশেষ মালিকানা ও ইসলামে তাঁর সীমা, ইসলামী অর্থনীতির প্রধান রূপরেখা, আমাদের অর্থ 'ব্যবস্থা', 'সুদমুক্ত ব্যাংক সাফল্যের চাবিকাঠি' প্রভৃতি।

হয়ে উঠে, যদিও ফিকাহ্র কিতাব ও নিয়ম-বিধানে যথেষ্ট প্রশস্ততা দেখতে পাওয়া যায়।

এই ফরয কাজটির উল্লেখ প্রায়শই নামায সংক্রান্ত নির্দেশের পাশাপাশি হয়েছে। কাজেই তাতে মুসলমানদের ভূমিকা কিংবা তাদের সকলের ক্ষেত্রে এই ফরয কাজটির ভূমিকা ঠিক নামাযের মতই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্য কথায়, নামায মুসলিম জনগণের কাজে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, এ কাজটিও ঠিক ততটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। তার মর্যাদা এমন সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে কোন অস্পষ্টতা থাকবে না, থাকবে না কোন বিরোধ-পার্থক্যের একবিন্দু অবকাশ। ঠিক যেমন দিন-রাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয।

এ ফরয কাজটির মৌল ও পরিমাণ বিশেষজ্ঞদের মতবিরোধের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পরিমাণের ক্ষেত্রে তাঁদের মতবিরোধ এমন একটা প্রকাশ ঘটিয়েছে, যা মুসলমানদের দ্বীনী কর্তব্য পালনে বিশেষ পার্থক্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর অন্ধ অনুসরণে মতবিরোধ এবং তার পথের বিভিন্নতা ও বিপুলতাই তার মূলে নিহিত কারণ।

কারো কারো মতে শিশু-বালক ও পাগলের মাল-সম্পদে যাকাত ধার্য হয়, কারো কারো মতে তা হয় না। এমনিভাবে কেউ কেউ মনে করেন, জমি থেকে মানুষ যা-ই উৎপাদন করে তাতেই যাকাত ধার্য হয়। অপরদের মতে এক বিশেষ ধরনের ফসল বা ফল ছাড়া অন্য কিছুতে যাকাত ধার্য হয় না। কারো মতো ঋণ থাকলেও যাকাত দিতে হবে, অপর লোকেরা এর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। ব্যবসায়ী পণ্যে যাকাত ধার্য হওয়ার কথা অনেকে বলেছেন, অনেকে আবার ভিন্নমত পোষণ করেন। মহিলাদের ব্যবহার্য অলংকারেও যাকাত ধার্য হয় কিন্তু অনেকে তা মেনে নিতে পারেন নি। অনেক বিশেষজ্ঞ যাকাত ফরয হওয়ার জন্য একটা নিম্নতম পরিমাণ মাল নিসাব নির্দিষ্ট করেন এবং তা কারো মালিকানায় এলেই যাকাত দিতে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নিম্নতম পরিমাণের শর্ত অনেকেই মানছেন না। এক কথায় যাকাত ফরয হওয়া না-হওয়ার দ্রব্যসামগ্রী পর্যায়ে বিভিন্ন মত উপস্থাপিত হয়েছে। অনুরূপভাবে যাকাত ব্যয়ক্ষেত্র সম্পর্কেও যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকার কথা অস্বীকার করা যায় না।

শায়খ শালতুত এ কথার উল্লেখ করার পর খুবই দ্রুততা সহকারে এ ব্যাপারে পুনর্বিবেচনার জন্য আকুল আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা তিনি মনে করেন, ইমামগণের নিকট বিরোধীয় বিষয়সমূহ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই মতবিরোধ মূল ফরযটির উপরই কঠিন আঘাত হানতে পারে এবং তার বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এ ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা হতে হবে সেই মূল লক্ষ্যের ভিত্তিতে, যে কারণে কুরআন মজীদ এই কাজটিকে ফরয করেছে, একে একটি দ্বীনী কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে, যেন তার ও তার সমগ্র দিকের সাথে সমস্ত মুসলমানের সম্পর্ক সমমানের হতে পারে।

(الاسلام المفيد وشعر يعته-ص ١٠٩)

৩. এ ক্ষেত্রে আরও কতগুলো ব্যাপার সম্পূর্ণ নতুনভাবে এই যুগে দেখা দিয়েছে। প্রাচীনকালীন ফিকাহ্‌বিদগণ এ সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত ছিলেন না। শেষের দিকের ফিকাহ্‌বিদগণও সে সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিতই রয়ে গেছেন। এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্তই আবশ্যক, যেন মানুষ মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে এবং সাধারণ মুসলমানদের মুখে উচ্চারিত উদ্বেগ সৃষ্টিকারী প্রশ্নাবলীর স্পষ্ট জবাব দানে সক্ষম হয়। একালে জন্তু-জানোয়ার, নগদ অর্থ, কৃষি ফসল ও ফল-ফলাদি ছাড়াও বহু সম্পদ নতুনভাবে দেখা দিয়েছে, বহু আকাশচুম্বী দালান-কোঠা নির্মিত হয়েছে ভাড়ায় লাগানো ও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে। বড় বড় শিল্প-কারখানা নির্মিত হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামও পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের মূলধন—স্থাবর ও অস্থাবর রয়েছে যা মালিকদের হাতে আবর্তিত হয় ও উৎপাদন হতে থাকে, ভাড়া দেয়া হয়, যেমন নৌকা, গাড়ি, উড়োজাহাজ, হোটেল-রেস্তোরাঁ ও প্রেস ইত্যাদি। বিপুল সংখ্যক শিল্প-ব্যবয়াসী কোম্পানী কায়েম ও চালু হয়ে আছে। স্বাধীন পেশাধারী লোকও বিপুল পরিমাণ অর্থোপার্জন করে থাকে, যেমন চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, উকীল প্রভৃতি। এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক উচ্চ মর্যাদা, মজুরী ও বিনিময় সম্পন্ন মাসিক বেতনধারী লোকও রয়েছে। এ পর্যায়ে প্রশ্ন হচ্ছে, এসব প্রতিষ্ঠান-সংখ্যা ও ক্রমবর্ধমান মূলধন কি যাকাত ফরযের আওতায় পড়ে অথবা প্রাথমিক যুগে যেসব জিনিসের উপর যাকাত চালু ছিল, এখনও তা তারই মধ্যে সীমিত হয়ে থাকবে? এ সবের উপরও যাকাত যদি ফরয ধরা হয়, তাহলে তার পরিমাণ কি হবে, কখন তা ফরয হবে এবং সেজন্য ফিকাহ্‌সম্মত ভিত্তি কি হতে পারে?

কতগুলোর ক্ষেত্রে নিসাব (যাকাত ফরয হওয়ার নিম্নতর পরিমাণ) এবং শরীয়াতসম্মত পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে। যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে নিসাব নির্ধারণকারী অকাট্য দলিল রয়েছে। কৃষি ফসল ও ফল-ফলাদির যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে পাঁচ 'অসাক্ক', রোযা-ভঙ্গের যাকাত একশ' এবং নগদ টাকায় যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে দুইশ' দিরহাম অথবা বিশ 'দীনার' নির্ধারিত আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বর্তমান সময়ে আমরা এই প্রাচীনকালীন নিসাবের পরিমাণ এ কালের মুদ্রায় কিভাবে নির্ধারিত করতে পারি? এ কালের প্রচলিত পরিমাণে তার রূপান্তর কিভাবে সম্ভব? তা'ছাড়া এ প্রশ্নও প্রবল যে, এগুলো কি অপরিবর্তনশীল, না তাতে কোনরূপ পরিবর্তন—হ্রাস-বৃদ্ধি করার অবকাশ আছে? কেননা অর্থনৈতিক ও সামাজিক আধার (Receptacles) পরিবর্তিত এবং নগদ অর্থের ক্রয়মূল্য উঠানামা করছে।

বিশেষ করে প্রাথমিক ইসলামী যুগের—যখন এগুলো নির্ধারিত হয়েছিল—তুলনায় অনেকটা ভিন্ন ধরনের রূপ পরিগ্রহ করেছে আমাদের একালে এবং এখনকার সমাজে।

উপরন্তু আধুনিক কালের কর ধার্যকরণের (Taxation) ব্যাপারটিও বিশেষভাবে বিবেচ্য। তা কখনও প্রকারভিত্তিতে হয়, কখনও অ-প্রকারভিত্তিতে; আবার কখনও আপেক্ষিকভাবে ও ঊর্ধ্বমুখী ভাবধারায়। এগুলো সাম্প্রতিককালের রাষ্ট্র-সরকার কর্তৃক

ধার্য হয়ে থাকে। আর রাষ্ট্রের সাধারণ প্রয়োজন পূরণে তৎলব্ধ অর্থ ব্যয় করা হয়। অনেক সামষ্টিক লক্ষ্য বাস্তবায়নেও তা বিনিয়োগ করা হয়। প্রশ্ন হল, যাকাতের সাথে এই সব ধার্যকৃত করের (Taxation) সম্পর্ক কি? উৎস, ব্যয়ের ক্ষেত্র ও লক্ষ্য ইত্যাদিতে এ দুয়ের মাঝে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের প্রকৃত কারণ কি? ধার্যকৃত কর কি কখনও যাকাতের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে? আর তা না হলে যাকাতের পাশাপাশি কর ধার্যকরণ কি শরীয়াত অনুযায়ী জায়েয?

এগুলো বড় বড় ও জটিলতর প্রশ্ন। এ যুগ এই সব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব পাওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব। আমাদের পক্ষে এ পর্যায়ে কোন-না-কোন অভিমত ব্যক্ত করা একান্তই অপরিহার্য, যদিও প্রাচীন কালের ফিকাহ্‌বিদগণ যেসব বিষয়ে কোন মত দিয়ে যান নি, সেসব বিষয়ে এ কালের আলিমগণের পক্ষে কোন মত স্থির করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। আর তার কারণ হল, ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরে যে 'ইজতিহাদ' কার্যকর ছিল এ কালে তার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে বলে লোকদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে। অথচ এই কথাটি যে সুস্পষ্ট-রূপে ভুল ও বিভ্রান্তিকর, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। বস্তুত স্বয়ং রাসূলে করীম (স) যে দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তা রুদ্ধ করার অধিকার কারোরই থাকতে পারে না।

তবে বিশেষজ্ঞগণ যেমন বলেছেন, ইজতিহাদ কয়েক প্রকার ও কয়েকটি ক্ষেত্রে সমন্বিত। কোন কোন আলিম বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে ও ক্ষেত্রে ইজতিহাদে পারদর্শী হতে পারেন, অন্যান্য বিষয়ে হয়ত তা করতে তাঁরা সক্ষম নন। বস্তুত এ ব্যাপারটি যেমন অসম্ভব নয়, তেমনি নয় কঠিন ও দুরূহ। তবে তা সম্ভব সেই সব আলিমদের জন্যে, যাঁরা তা করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করবেন এবং ইসলামী শরীয়াত আরবী ভাষা অধ্যয়নে দ্বীনের মূল উৎস্য আহরণ ও আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানে (Explore) এবং পারস্পরিক মূল্যায়ন ও উদ্ভাবনে অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণে (Inference) ব্রতী ও যোগ্যতা-প্রতিভাসম্পন্ন হবেন।

আমি বিশ্বাস করি, উপরিউক্ত বিষয়াবলীতে কোন সুস্পষ্ট ও অকাট্য অভিমত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে সামষ্টিক ইজতিহাদ একান্তই অপরিহার্য। তা করতে হবে মুসলিম আলিম সমষ্টিকে সমবেতভাবে। তবে সেই সঙ্গে এই বিশ্বাসও আমার রয়েছে যে, বিভিন্ন বিষয়ে ব্যক্তি পর্যায়ের আলোচনা-পর্যালোচনা ও ইজতিহাদী চিন্তা-ভাবনা নির্ভুল সামষ্টিক ইজতিহাদের পথ শুধু উন্মুক্তই করে না, আলোকোজ্জ্বলও করে তোলে। তাতে পূর্বপ্রস্তুতি শূন্যতা বা অপরিপক্কতার কোন প্রশ্রয় থাকবে না।

সামষ্টিক ইজতিহাদে সারা দেশের মুসলিম আলিমদের মধ্যকার শক্তিশালী বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের অভিমত অভিব্যক্তিও প্রতিফলিত হতে পারে। তার সম্মুখে সব সময়েই বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধক প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়াবে। তার বড় বড়গুলো রাজনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও প্রশাসকদের স্বেচ্ছাচারিতায় মারাত্মক পরিণতি লাভ করবে।

৪. এ পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক মুসলিমের বড় বেশী ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে—এটা দুঃখের সাথেই বলতে হচ্ছে। তাদের মধ্যে যাঁরা সংস্কৃতিসম্পন্ন বলে গণ্য, তাঁরাও সেই

ভুল ধারণা থেকে মুক্ত নন। তাঁরা মনে করেন যাকাত কতিপয় পয়সার সামগ্রী মাত্র কিংবা শস্য দানার একটি ওজন বিশেষ। তা দিয়ে দানশীল ধনী ব্যক্তিরা দরিদ্র-নিঃস্বদের উপর মর্যাদাবান হয়ে উঠেন। তার দ্বারা কয়েক দিনের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় মাত্র—পরিমাণে তা কম হোক, কি বেশী। তারপরই সেই দরিদ্র, নিঃস্ব ব্যক্তি আবার সেই দানশীল ধনী ব্যক্তির দ্বারস্থ হয়—ভিক্ষার হাত প্রসারিত করে তার দান গ্রহণের উদ্দেশ্যে। সে তার পবিত্র হাত দিয়ে সেই দান গ্রহণ করে এবং তার ধন-জনে শ্রীবৃদ্ধির জন্যে কল্যাণের দোয়া করে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে।

কিন্তু ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ বিধানের সাথে এই অবস্থার কোন সম্পর্ক নেই। তবু স্বীকার করতে হবে যে, পরবর্তীকালসমূহে মুসলিম সমাজে এটা একটা রেওয়াযে পরিণত হয়েছে।

সম্প্রতি প্রচারমান দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়ার সুযোগ আমাদের হয়েছে। তার একটিতে জনৈক লেখক[১] এই ধারণা উপস্থাপিত করেছেন যে, যাকাত আমাদের এ কালের সমাজের পক্ষে শোভন নয়। কেননা এ কালের সমাজের অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক সংগঠন-সংস্থা দানের উপর ভিত্তিশীল নয়। এ কালের সমাজ কাজ ও উৎপাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা মনে করেন, ইসলামী ব্যবস্থায় যাকাত হচ্ছে ভিক্ষুকদের জন্যে বিশেষ দান অথবা অলস-নিষ্কর্মা লোকদের জন্যে জীবিকা।

অপর একজন লেখক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে ইসলামী সুবিচার ব্যবস্থাকে 'দানের সাম্যবাদ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২] এ সব কিছু থেকে স্পষ্টরূপ প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ লোকগুলো হয় গভীর মূর্খতায় নিমজ্জিত নতুবা তারা অসদুদ্দেশ্যপরায়ণ।

এই প্রেক্ষিতেই আমাদের বক্তব্য হল, প্রস্তাবিত আলোচনা যে একান্তই অপরিহার্য, তা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে। যার পক্ষেই এ বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব, তার এ দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকা কিছুতেই উচিত নয়। আমি বিশ্বাস করি, জ্ঞানবান লোকদের উপর তা 'ফরযে কিফায়া'[৩] কেননা কেউই এ কর্তব্য পালন না করলে সকলেই গুনাহ্‌গার হবে।

ইসলামে সম্পদ ও অর্থব্যবস্থা পর্যায়ে জনৈক আলোচনাকারী বিস্ময়[৪] প্রকাশ করেছেন এই অবস্থা দেখে যে, আধুনিক কালের ইসলামী গ্রন্থ প্রণয়ন সংস্থাসমূহ যাকাত পর্যায়ে একখানি উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ না করে পারলো কি করে? অথচ তা অত্যন্ত

---

১. লেখক কমিউনিস্ট বলে পরিচিত। নাম ঃ আহমাদ বাহাউদ্দিন, আর পত্রিকার নামঃ اخبار اليوم। ১৯৬১ সন।

২. কিতাবখানির নাম ঃ من هنا نبدأ (আমরা এখান থেকেই শুরু করছি)। খালেদ মুহাম্মাদ খালেদ এই বইখানির রচয়িতা।

৩. যা সাধারণভাবে সকলেরই উপর ফরয কিন্তু তাদের কতিপয় আদায় করলেই সকলের আদায় হয়ে যায়।

৪. তিনি মাহ্‌মুদ আবুস-সউদ المسلمون। নামক পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ।

গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্বীন-ইসলামে তার স্থান অনস্বীকার্য। মিসরের ওয়াক্ফ্ মন্ত্রণালয়ের ইসলামী বিষয়ক উচ্চতর সংস্থা এই প্রয়োজনের কথা বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছে। বিগত নয় বছর কাল ধরে কতগুলো ইসলামী বিষয়ে প্রতিযোগিতার আহবান করা হয়ে এসেছে। সারা মুসলিম জাহানের লেখক-চিন্তাবিদদের তাতে রচনা পেশ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে সেই রচনার আকার যেন বড় আকারের ৩৫০ পৃষ্ঠার কম না হয়। 'ইসলামে যাকাত' ছিল এই পর্যায়ের একটি বড় উল্লেখযোগ্য বিষয়।

১৯৬৩ সনের মার্চ মাসে কায়রো শহরে যে ইসলামী আলোচনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার ঘোষণায় উপরিউক্ত কাজের প্রয়োজনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রায় চল্লিশটি দেশের ইসলাম বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি তাতে অংশ করেছিলেন। এই সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিলঃ

যাকাত, ইসলামের অর্থোৎপাদনের উপায়, ফল গ্রহণের পন্থা এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির সাথে এগুলোর সম্পর্ক—এই হল আজকের আলোচ্য বিষয়। কেননা এগুলো ইসলামী শরীয়াতের দুটি বিভাগের মিলনক্ষেত্র। আর সেই বিভাগ দুটি হচ্ছে ঃ ইবাদত, সামাজিক-সামষ্টিক আচরণবিধি। এই কারণে সম্মেলন তার পরবর্তী অধিবেশনসমূহে আলোচনা ও চিন্তা-গবেষণার জন্য এই বিষয়গুলো নির্দিষ্ট করেছে।

এ আলোচনার[১] গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলী পরিপূরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

ক. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপাদানসমূহ—যা মৌল উৎসে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে রয়েছে—একত্র করা। হাদীস, তাফসীর, বিভিন্ন মাযহাবের ফিকাহ্র গ্রন্থাদি, শরীয়াত ও অর্থ সংক্রান্ত কিতাবাদি প্রভৃতিই হল এ পর্যায়ের মৌল উৎস। ইসলামী সংস্কৃতির এগুলোই হল প্রধান উৎস। এগুলো সংগ্রহ করার পর সেগুলোকে নতুন করে উপস্থাপন করা এমনভাবে যেন তা থেকে ইসলামের বিধান স্পষ্টভাবে পাওয়া যেতে পারে।

খ. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে বহু বিভিন্ন মত রয়েছে তা মন্থন করা, যেন তন্মধ্যে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য মত সহজেই জানতে পারা যায়। যা হবে শরীয়াতের অকাট্য দলিলভিত্তিক এবং বর্তমান সময়ের ও প্রয়োজনের দৃষ্টিতে মুসলিম জনগণের পক্ষে কল্যাণকর, তা ব্যক্তির সীমিত শক্তিসামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

গ. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেসব নতুন প্রশ্ন, সমস্যা ও ঘটনা দেখা দিয়েছে, যার সাথে প্রাচীনকালীন আলিমগণ আদৌ পরিচিত ছিলেন না—সেই সব বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করা। কেননা এ সব এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, সমকালীন ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখকগণ সে সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ও নিঃসম্পর্ক হয়ে থাকতে পারেন না।

ঘ. 'ইসলামী কর' হিসেবে যাকাতের মর্মকথা স্পষ্ট করে তোলা। সেই সঙ্গে তার ও আধুনিককালে আরোপিত করের মধ্যে তুলনা করা। এ দুয়ের মাঝে যে সাদৃশ্য বা বৈপরীত্য রয়েছে, তা ব্যক্ত করা।

---

১. المؤتمر لمجمع البحوث الاسلامية-ص٣١٤

ঙ. মুসলিম সমাজ জীবনে যাকাতের লক্ষ্য ও ফলশ্রুতি বর্ণনা করা। মুসলিম সমাজের দারিদ্র্য, নিঃস্বতা, ভিক্ষাবৃত্তি, আকস্মিক বিপদ-আপদ ও ঘটনা-দুর্ঘটনা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করা, সেই সঙ্গে একালে প্রকাশিত বিভিন্ন সামষ্টিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ কার্যকর করা।

চ. 'যাকাত'কে কেন্দ্র করে যে সব ভুল চিন্তা-ধারণা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে তার পরিশুদ্ধিকরণ। ভুল বুঝ্-সমঝ্ ও তাকে ভুল ভাবে প্রয়োগই হল এর কারণ অথবা ইসলামের দুশমনদের উত্থাপিত সন্দেহগুলোর দরুনই তা হয়েছে।

বস্তুত এ সব কাজ সম্মুখে রেখেই উপরিউক্ত আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ও কাজ করেছে। আম মনে করি, তাতে যথেষ্ট সাফল্যও অর্জিত হয়েছে।[১]

আলোচনার পদ্ধতি ও ধরণ

সম্মুখবর্তী আলোচনায় যে পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়েছে ও যে দৃষ্টিকোণ অবলম্বিত হয়েছে তা এখানে স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে ঃ

১. মৌল-উৎস নির্ধারণ তত্ত্ব সংগ্রহ

এ পর্যায়ে আমার প্রথম কাজ ছিল কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করা। অন্য কথায় প্রস্তাবিত আলোচনার জন্যে যে সব দলিল-প্রমাণ এবং উক্তি জরুরী তা প্রাচীন ও আধুনিক উৎসসমূহ থেকে সংগ্রহ করে সম্মুখে রাখা। এই দলিল-প্রমাণ ও উক্তি যেমন শরীয়াত থেকে সংগৃহীত, তেমনি মনীষীদের লিখিত গ্রন্থাদি থেকেও। এ পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য দলিলসমূহ (Wordings)। কেননা যাকাতের মর্মকথা, তার নিয়ম ও আইন-বিধান এবং তার লক্ষ্য, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে তা-ই হচ্ছে প্রথম ভিত্তি।

বস্তুত এই আলোচনায় তত্ত্ব ও তথ্যের উৎস বিপুল ও অফুরন্ত। বিভিন্ন সময়ে লিখিত তাফসীর গ্রন্থসমূহ এ পর্যায়ের বড় অবলম্বন। এই তাফসীর দুই ধরনের। এক ধরনের তাফসীর আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। অপর এক প্রকারের তাফসীর লেখকের নিজস্ব চিন্তাভাবনা-গবেষণার ফসল উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে কুরআন মজীদের আইন-বিধান পর্যায়ের আয়াতসমূহের তাফসীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীসের গ্রন্থসমূহঃ হাদীসের মূল বর্ণনা, তার ব্যাখ্যাসমূহ, বিভিন্ন বর্ণনা, তাতে প্রযুক্ত বুদ্ধিমত্তা, হাদীসের সমালোচনা-পর্যালোচনা—সহীহ বা অ-সহীহ নির্ধারণ। যেসব

---

১. المؤتمر الاول لمجمع البحوث الاسلامية – ص ٣١٤

হাদীস গ্রন্থে ফিকাহ্র দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা منتقى ও بلوغ المرام
الاخبار। এই দুখানি হাদীস সংগ্রহ এবং ব্যাখ্যা পুস্তক।

বিভিন্ন মাযহাবের ফিকাহ্র কিতাব এবং তুলনামূলক মাযহাবী ফিকাহ্র কিতাব। বিশেষ করে ফিকাহ্র যেসব গ্রন্থে বিশেষ মাযহাবের দলিলাদী উদ্ধৃত হয়েছে, বিরোধী মতের দলিলাদি রদ করা হয়েছে, আইন-প্রণয়নের মৌলনীতি ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের কায়দা-কানুন সংক্রান্ত কিতাবাদিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ইসলামী অর্থশাস্ত্র ও প্রতিষ্ঠানাদি সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী : এ পর্যায়ে ইমাম আবূ উবাইদ আল-কাসেম ইবনে সালাম লিখিত প্রখ্যাত অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত কিতাব 'কিতাবুল আমওয়াল' বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ধন-সম্পদ ও অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা ও সমাজতাত্ত্বিক গ্রন্থাদি : এসব গ্রন্থে একই সঙ্গে যেমন ইসলামী সামাজিক বিধান আলোচিত হয়েছে, তেমনি ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও পর্যালোচিত হয়েছে।

এ ছাড়া সাহায্যকারী গ্রন্থাদিতো রয়েছে বিপুল সংখ্যক অভিধান, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিশ্বকোষ ও গ্রন্থাদির তালিকা প্রভৃতি বিশেষ কাজ দিয়েছে।

এসব প্রাচীন ও এ কালের লিখিত গ্রন্থাদি থেকে আমি যা-ই উদ্ধৃত করেছি, মূল আলোচনা ব্যপদেশে তার উল্লেখ করেছি। অথবা সেই পৃষ্ঠার টীকায় তার নাম, পৃষ্ঠা ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এমন সব গ্রন্থাদিরও সাহায্য গ্রহণ করেছি, যা লেখক সমাজের কাছে সাধারণভাবে পরিচিত নয়। এক স্থানে যে গ্রন্থের নামের উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তী স্থানে সেই কিতাবের আসল নাম অথবা তা বোঝা যায় এমন ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অনেক সময় ছোট অথচ প্রখ্যাত উক্তিও উদ্ধৃত করা হয়েছে কিন্তু তার উৎসের উল্লেখের প্রয়োজন মনে হয় নি। আর তা অত্যন্ত বিরল এবং মূল সিদ্ধান্ত তার উপর নির্ভরশীলও নয়। আমাদের পূর্বকালীন লেখকদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে, যার উক্তিরই উল্লেখ করা হোক তার সঙ্গে আসল উক্তিকারীর নামের উল্লেখ করাই বাঞ্ছনীয়। তাঁরা বলেছেন :

إِنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْقَوْلِ اَنْ يُّسْنَدَ اِلٰى قَائِلِهٖ-

যার কথাই উদ্ধৃত করা হোক তা তার নামে উল্লেখ করাতেই বরকত রয়েছে।

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, এই আলোচনার একটা মহামূল্য অবদান হল ধন-সম্পদ ও অর্থনীতি সংক্রান্ত অধ্যয়নের বন্ধ দুয়ার আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। আমি এই বিষয়ে 'বিশেষজ্ঞ' হওয়ার ইচ্ছায় নিভৃত একাকীত্বে মগ্ন হয়েছিলাম। ফলে এ পথে আমি ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-অন্তর্দৃষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়েছি। তার নিদর্শনাদি আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। তার প্রাথমিক তথ্যাবলী এবং সমর্থক তত্ত্বাদিও আমার চোখের সম্মুখে

উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এগুলো আমি স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। সেই গ্রন্থের নাম مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام (দারিদ্র সমস্যা ও তার ইসলামী সমাধান)।

২. আলোচনার বণ্টন ও তার বিভিন্ন বিন্যাস

বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমস্যাদির পূর্ণাঙ্গতা বিধানের দৃষ্টিতে এগুলোকে বিস্তীর্ণ প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা এর এক অংশ অপর অংশের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আমি আমার সীমিত সাধ্যানুযায়ী এই মহান ইসলামী বিষয়টিকে একটি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি সংগ্রহ করে দিতে চেষ্টানুবর্তী হয়েছি। এই কারণে প্রতিটি আলোচনাই অপেক্ষাকৃতভাবে দীর্ঘায়িত হয়েছে। এই গোটা আলোচনা নয়টি অধ্যায় ও একটি উপসংহারে বিভক্ত। অধ্যায়সমূহের বিন্যাস যুক্তিসঙ্গতভাবেই করা হয়েছে। প্রথমে যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কিত আলোচনা, পরে যাকাত কার উপর ফরয হয়, সেই আলোচনা—অতঃপর কিসে কিসে ও কতটা পরিমাণ ফরয তার বর্ণনা; এই যাকাত কার জন্যে ব্যয় করা হবে, কার জন্যে তা গ্রহণ করা হারাম, তার বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যাকাত আদায় করার পন্থা এবং তার লক্ষ্য ও ফলাফল। ফিতরের যাকাত পর্যায়ের আলোচনা এরপর এসেছে। যাকাত দেয়ার পর ব্যক্তির ধনমালের উপর অপরাপর যেসব অধিকার ধার্য হয় এবং যাকাত ও আধুনিক কালে ধার্য করা। কর বা খাজনা ইত্যাদির মধ্যকার সম্পর্ক, সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য পর্যায়ের আলোচনাও পেশ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ এ পর্যায়ে যাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি, সব ধর্ম ব্যবস্থায়ই গরীব ও দুর্বল-অক্ষমদের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম মক্কী স্তর থেকেই এ ব্যাপারে খুব বেশী গুরুত্ব সহকারে কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছে। আর মদীনা শরীফে সুনির্দিষ্টভাবে যাকাতের বিধান কার্যকর হয় এবং তার সাহায্যে সমাজের দরিদ্রদের অভাব পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইসলামের এই ব্যবস্থা যেমন অভিনব, তেমনি বিরল। এর পূর্বে কোন ধর্ম বা রাষ্ট্র বিধান এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ যাকাত কার উপর ওয়াজিব, তা এই পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বালক ও পাগলের ধন-সম্পদে যাকাত ধার্য হওয়ার ব্যাপারটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। অমুসলিমের কাছ থেকে যাকাত আদায় করা যায় কিনা, এ প্রশ্ন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ যাকাতের পাত্র ও পরিমাণ অর্থাৎ পশু সম্পদ, নগদ অর্থ, ব্যবসায় পণ্য, কৃষি ফসল, খনিজ সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ, মধু ইত্যাদি প্রাণিজ সম্পদ প্রভৃতি থেকে যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। শস্যোৎপাদনের প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা, ব্যবসায়ী মূলধন গড়ে তোলা, অনুরূপভাবে শ্রেণীভিত্তিক

মজুরী ও স্বাধীন জীবিকা গ্রহণের উপযোগী লোক সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা সেই সঙ্গে রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ কুরআন মজীদে যাকাত ব্যয়ের যে আটটি ক্ষেত্রের উল্লেখ রয়েছে, তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ এ পর্যায়ে দেয়া হয়েছে। কোন্ ক্ষেত্রে কত ব্যয় করা হবে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমান পরিমাণ ব্যয় করা হবে কিনা? কাদের জন্য যাকাত ব্যয় করা যাবে না, এ সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ যাকাত আদায় করার পন্থা, যাকাতের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, যাকাত আদায়ে ত্বরিত পন্থা গ্রহণ কিংবা বিলম্বিতকরণ, তা এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিতকরণ, যাকাতের মূল্য দান ও এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ যাকাতের লক্ষ্য ও ফলাফল, দাতা, গ্রহণকারী ও গোটা সমাজের প্রেক্ষিতে যাকাতের লক্ষ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমাজের বড় বড় সমস্যার—যেমন বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, আকস্মিক ঘটনা-দুর্ঘটনা, ঝগড়া-বিবাদ, নিঃস্বর্তা—সর্বোপরি দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে যাকাতের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ ফিতরের যাকাত (ফিত্‌রার সাদকা) ও তার আইন-বিধান আলোচিত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ঃ যাকাত আদায় করার পরও ব্যক্তির ধন-মালে অন্যান্য যেসব অধিকার ধার্য হয়—এর পক্ষের মত ও বিপক্ষের মত এবং উভয় পক্ষের দলীল-প্রমাণ পর্যায়ে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। উক্ত দুই পক্ষের মতবিরোধের মূল স্থান বা কারণ নির্ধারণ এবং একটি মতের অগ্রাধিকার দান সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ঃ যাকাত ও কর সম্পর্কে আলোচনা। যাকাত তার প্রকৃতি ও ভিত্তির দিক দিয়ে এক বিশেষত্ব সম্পন্ন ও বিশিষ্ট কর হওয়ার আলোচনা। তার মৌলনীতি (Principle) নিরাপত্তামূলক অবদান ও লক্ষ্য, তার মৌলনীতি ও বিধি-বিধান, আধুনিক 'কর' সংক্রান্ত চিন্তার পরিণতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। নিয়ম-বিধান, লক্ষ্য ও নিরাপত্তা বিধানে আধুনিক কর ব্যবস্থা যা করতে অক্ষম রয়ে গেছে, যাকাত তা করতে সক্ষম হয়েছে। এ পর্যায়ে যাকাত গ্রহণের ব্যবস্থা কার্যকর করার পরও বিভিন্ন খাতে 'কর' গ্রহণকে শরীয়াত জয়েয মনে করে কিনা, আর যাকাত দিয়ে দিলে বিভিন্ন প্রকারের কর দেয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কিনা—এ আলোচনার নবম অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলা হয়েছে।

উপসংহারঃ এ পর্যায়ে যাকাত ব্যবস্থার মর্মকথা সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। এতে যাকাত সম্পর্কে বিভিন্ন মুসলিম ও অমুসলিম লেখকদের সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই সাথে সুবিচার, সাম্য ও সমাজবদ্ধ লোকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যাকাতের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই সব আলোচনা মিলিয়ে 'যাকাত' বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত বিষয়কে একত্র ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। যাকাতের মৌল নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান এবং লক্ষ্য ও ফলাফল বিস্তরিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

আলোচনার এ হচ্ছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলঃ

৩. তুলনামূলক আলোচনা

তার দুটি রূপ রয়েছে ঃ

প্রথম. ইসলামের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন মতের পারস্পরিক তুলনা করা। তন্মধ্যে সর্বোত্তম ও দলিল-প্রমাণের দিক দিয়ে সর্বাধিক শক্তিশালী মত সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন করে তোলা।

দ্বিতীয়. ইসলামী শরীয়াত ও অন্যান্য শরীয়াতের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা। এই অন্যান্য শরীয়াতের মধ্যে যেমন কতিপয় আসমানী ধর্ম রয়েছে, তেমনি রয়েছে মানুষের গড়া কতিপয় বিধান ও ব্যবস্থা। তার কতিপয় প্রাচীন এবং কয়েকটি নতুন—এ কালের রচিত। এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ শরীয়াতের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব অপরাপর বাতিলকৃত আসমানী শরীয়াতের অপেক্ষা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানব-রচিত মতবাদের অক্ষমতা ও সম্পূর্ণতাও প্রকট হয়ে উঠেছে।

ইসলামের ভিতরকার মাযহাবসমূহের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে আমি কেবল চারটি প্রখ্যাত মাযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিনি। কেননা তা হলে ইসলামী ফিকাহ্র অন্য সমস্ত বড় বড় মাযহাব ও মতের প্রতি অবিচার করা হত। এই আলোচনায় সাহাবী, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তী ফিকাহ্বিদ্দের মাযহাবের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা সেই মাযহাব ও মতকে উপেক্ষা করা ও তা থেকে ফায়দা গ্রহণ না করা, না শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয হতে পারে, না বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিতে। সাহাবিগণের মর্যাদা ও ইলমী বিশেষত্ব সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধতার অবকাশ নেই। তাঁদের বাদ দিলে সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উমর ইবনে আবদুল আজীজ, জুহরী, নখয়ী, হাসান, আতা, শাবী, মাইমুন ইবনে মিহ্রান প্রমুখ প্রধান তাবেয়ীনের মাযহাব আমাদের সামনে আসে। আর তাদের পরবর্তীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই—ইমাম সওরী, আওযায়ী, আবূ উবাইদ, তাবারী ও দাউদ জাহেরী প্রমুখ ফিকাহ্বিদকে । এ মনীষীদের মত ও উক্তি ইসলামী জ্ঞানসমুদ্রে মহামূল্য সম্পদ। তা বাদ দিলে যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে মহা ভুল করা হবে, তেমনি দ্বীন-ইসলামেরও বড় ক্ষতি সাধিত হবে।

আমি 'শিয়া' মাযহাবকেও বাদ দিইনি। সেখানে 'যায়দীয়' ও 'ইমামীয়া' ফিকাহ্ বর্তমান রয়েছে। আমার জানা মতে আমাদের ও এঁদের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু খুঁটিনাটি ব্যাপারে এবং তা সামান্য। শেষের দিকের দুজন মনীষীর নীতি আমি অধ্যয়ন করেছি। তাঁরা হলেন, 'সুবুলুস সালাম'-এর (سبل السلام) লেখক ইমাম সানয়ানী এবং 'নায়লুল আওতার'-এর (نيل الاوطار) গ্রন্থকার ইমাম

শাওকানী। দুজনই অতি বড় মুহাদ্দিস। তাঁরা নিজ নিজ গ্রন্থে 'যায়দীয়া' ও 'ইমামীয়া মাযহাবের উল্লেখ করেছেন। আল-হাদী, আল-কাসেম, আল-বাক্কের, আন-নাসের প্রমুখ এই শেষোক্ত মাযহাবদ্বয়ের ইমাম। আহলে সুন্নাতের আলিম এঁদের মতকে খুব বেশী উল্লেখ ও ব্যবহার করেছেন এবং তাতে তাঁরা কোন দোষ দেখতে পান নি।

ইসলামী ফিকাহ্-বহির্ভূত মতসমূহের তুলনামূলক আলোচনায় আমরা যাকাত ও প্রাচীন ধর্মসমূহ প্রবর্তিত দানসমূহের মধ্যে তুলনা করেছি। আধুনিককালে যে সম্পদে কর ধার্য হয়, তার ও যাকাতের মধ্যকার পার্থক্যও স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। এ কালের বড় অবদান যে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তার সাথে যাকাতের তুলনামূলক আলোচনাও আমরা উপস্থাপিত করেছি।

৪. ব্যাখ্যা ও কারণ প্রদর্শন

প্রতিটি ব্যাপারে শুধু শরীয়াতের বিধান বা হুকুম উল্লেখ করেই আমি ক্ষান্ত হইনি—তাকেই যথেষ্ট মনে করিনি। তার পশ্চাতে যে যৌক্তিকতা ও বুদ্ধিমত্তা নিহিত, তারও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করেছি। শরীয়াতে যা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব ঘোষিত হয়েছে কিংবা যা নিষিদ্ধ হয়েছে বা অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছে, তার মূলে নিশ্চয়ই একটা তত্ত্বগত দিক রয়েছে। সেই দিকের উন্মোচন না হলে তার সৌন্দর্য অনুধাবন সম্ভব হয় না। শরীয়াতের বিধানদাতার নিজের অনুসৃত এই পন্থাকে আমরাও অনুসরণ করেছি। বিধি-বিধানের মূলগত কারণ, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, ব্যক্তি বা সমষ্টিগতভাবে মানুষের জন্যে তার কল্যাণ প্রকাশ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। কেবল শরীয়াত পালনের দায়িত্ব ও নির্মম কর্তব্যের কথা বলে দিয়েই ক্ষান্ত হতে চেষ্টা করিনি। ঈমানের তাকীদে শরীয়াতের সর্বপ্রকার আদেশ-নিষেধ অবশ্যই পালন করতে হবে—তার যৌক্তিকতা কেউ বুঝুক আর না-ই বুঝুক, এই নীতিকে সর্বপ্রযত্নে পরিহার করা হয়েছে।

শরীয়াতের অন্তর্নিহিত যুক্তি ও সৌন্দর্য বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা সর্বাবস্থায়ই যখন অতীব বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গলময় কাজ, তখন এ কালে তার অপরিহার্যতা তো শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছ। পাশ্চাত্য বিপর্যয়কারী চিন্তাধারা, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী চিন্তা-প্রবাহ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে আগত সাংস্কৃতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে তা আরও বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। কাজেই একদিক থেকে শুধু বিধান ঘোষণা ও অপর দিক থেকে 'শুনলাম ও মানলাম' বলে মাথা নত করে দেয়া বর্তমান যুগে কোনক্রমেই যথেষ্ট হতে পারে না।

৫. যাচাই ও অগ্রাধিকার দান

আলোচনাকারীকে অবশ্যই সমগ্র উৎসকে মন্থন করতে হবে। বিষয় সম্পর্কিত সমস্ত উক্তি, দলীল-প্রমাণ উল্লেখ এবং সে সবের মধ্যে তুলনা ও যাচাই করা আবশ্যক। কেননা সে যদি বিশেষ একটি কথায় বন্দী হয়ে পড়ে বা বিশেষ একটি মাযহাবের অন্ধ অনুসারী হয়ে থাকে, তাহলে তার সমস্ত চেষ্টা-সাধনা-গবেষণা এই মাযহাবের সমর্থন ও

শক্তি বর্ধন এবং তার বিপরীত মাযহাবের প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে যাবে। প্রকৃত কল্যাণে উপনীত হওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

এই কারণে আমি আমার গর্দান বিশেষ একটি মাযহাব ও তার অন্ধ অনুসরণের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নিয়েছি। তবে এই ব্যাপারটি অতীব নতুন বলা চলে। প্রাচীনকালের লোকেরা এর সাথে পরিচিত ছিলেন না। যদিও ইমামগণ নিজেরাই তাঁদের অন্ধভাবে অনুসরণ করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। আর বস্তুতই যদি কেউ কোন বিশেষ ফিকাহ্‌বিদকে প্রতিটি বিষয়ে ও ক্ষেত্রে তার দলীল দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অনুসরণ করে, তাহলে সে তো তাঁকে 'শরীয়াত-দাতা' রূপে মেনে নিল। অথচ শরীয়াতদাতা আল্লাহ্‌ এবং রাসূল ছাড়া আর কেউই নন। পরন্তু অন্ধ অনুসরণে বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল ও নিষ্ক্রিয় করে দিতে হয়। কিন্তু তা কোনক্রমেই উচিত হতে পারে না। ইমাম ইবনুল জাওজী বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে চিন্তা-বিবেচনা ও ভাল-মন্দ বিচারের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন (উদ্দেশ্য হচ্ছে, এগুলোকে সে পুরোপুরি কাজে লাগাবে)। কাজেই যে লোককে আলোকবর্তিকা দেয়া হয়েছে সে যদি তা নির্বাপিত করে অন্ধকারে পথ চলতে শুরু করে, তাহলে তার মত হতভাগ্য আর কেউ হতে পারে না। অন্য মনীষীদের উক্তি হচ্ছে, অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলে সে, যে চরম বিদ্বেষী অথবা নিতান্তই বুদ্ধিহীন।

এই প্রেক্ষিতে বলতে চাই, আমি বিভিন্ন মনীষীর উক্তি ও দলীল-প্রমাণসমূহ একজন অন্ধ অনুসরণকারীর মনোভাব নিয়ে পাঠ করিনি পাঠ করেছি অনুসন্ধানকারী, সত্যানুসন্ধিৎসু ও যাচাই-পরখকারীর দৃষ্টিতে । বস্তুত, সত্যের আবিষ্কারকামী পরোয়া করে না কোথায় সে সত্য পাওয়া গেল, কার সঙ্গে চলে তা পাওয়া গেল। সে তা পেতে পারে আগের কালের লোকদের কাছে, পেতে পারে পরে আসা লোকদের কাছে। অনেক সময় প্রকৃত সত্য পাওয়া যায় স্বাধীন মত প্রকাশকারীদের কাছে, আধুনিক কালের অথবা হাদীসবিদদের কাছে। কখনও জাহেরী ফিকাহ্‌বিদদের কাছে, চারটি প্রখ্যাত মাযহাবেও তা পাওয়া যেতে পারে। অপরাপর ইমামগণের কাছেও সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না, এমন কথাও নয়।

বিদ্বেষপরায়ণ, সংশয়বাদী ও প্রতিটি প্রাচীন মতে অবিচল হয়ে থাকা লোকদের পথে আমি চলিনি। যারা মনে করে, চারজন প্রখ্যাত ইমামের পরে আর কোন 'ইমাম' আসেনি, আমি তাদের সাথেও একমত নই। প্রথম যুগের পর ইজতিহাদের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কথাও আমি সমর্থন করি না; পরবর্তীকালের তাক্বলীদকারী ফিকাহ্‌বিদ ছাড়া আর কারোর কাছে ইল্‌ম নেই, যারা তাদের বিপরীত মত গ্রহণ করে তারা তাদের সাথে শত্রুতা করে—এরূপ গোঁড়ামী মনোভাবকে আমি কল্যাণকর মনে করতে পারিনি।

এতদ্‌সত্ত্বেও আমি সেসব আত্মাভিমানী লোকদের দলভুক্ত নাই, যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা ছাড়াই এক-একজন বড় মুজতাহিদ হওয়ার দাবিতে মুখর। সেসব

নতুনতত্ত্ববাদীদেরও আমি সমর্থন করি না, যারা নতুন দ্বীন, নতুন ভাষা-পরিভাষা এবং নতুন চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টির অহমিকায় দিশেহারা।

জ্ঞান-চর্চা ও সত্যানুসন্ধানে আমি সম্পূর্ণ মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করে চলেছি। যে কোন কল্যাণময় নতুনকে আমি স্বাগত জানাই। যে কোন নির্ভুল পুরাতনকে গ্রহণ করতে আমি সতত উদগ্রীব। প্রাচীন গ্রন্থাদির হরিৎ বর্ণ মুদ্রণ বিভ্রাট আমাকে তা পাঠ করতে বাধাগ্রস্ত করেনি। বরং আমি তার গভীরে তলিয়ে সত্য উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছি। এক কথায়, পুরাতন ও নতুন উভয় ধরনের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকেই আমি তত্ত্ব ও তথ্য-সুধা আহরণ করেছি। তাতে কোন কুণ্ঠা বা সংশয় আমার গতিকে শ্লথ করতে পারেনি। উভয় ক্ষেত্রেই আমার ভূমিকা হচ্ছে মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান তথ্য বাছাই-ছাঁটাইকারীর মত। ভাল ও গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে, অকাতরে ও অকপটে তা তুলে নিয়েছি। যা অপ্রয়োজনীয় আবর্জনাবৎ, তা পরিহার করে সম্মুখে চলে গেছি। সংগৃহীত সম্পদ যাচাই ও তুলনা করে দেখেছি। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছি। যার কথার যৌক্তিকতা আমার কাছে প্রকট ও অকাট্য প্রমাণিত হয়েছে, তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হইনি। কোনরূপ বিদ্বেষার্ত মনোভাব আমার ছিল না—কোন মুনির কথার প্রতি, কোন ইমামের মাযহাবের প্রতি। একটি বিষয়ে আমি যদি ইমাম আবূ হানীফার মত গ্রহণ করে থাকি, তাহলে অপর ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছি ইমাম মালিকের মত। তৃতীয় ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী, সুফিয়ান, আহমদ, আওযায়ী, আবূ উবাইদ বা তাঁদের পূর্ব কিংবা পরবর্তী কোন ইমামের মত। কেননা তাঁরা প্রত্যেকেই কোন সাহাবী কিংবা কোন তাবেয়ী'র সহীহ্ মতকেই গ্রহণ করেছেন বলে আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস।

আমার এ নীতিকে মিথ্যা দ্বারা সজ্জিতকরণ (Embishment) বা জাল দলীল উদ্ভাবন (Fabricate) অথবা 'সহজিয়া' নীতি বলে অভিহিত করা (ও তাই করে এর নিন্দা করা) চলে না। কেনানা আসলে এ নীতির সারবত্তা হচ্ছে, 'দলীল-প্রমাণের অনুসরণ, যেখানেই তা পাওয়া যাক। কোন লেখক-চিন্তাবিদেরই কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ ব্যতিরেকে অপর কোন মতের সাথে নিজেকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলা উচিত নয়। হযরত ইবনে আব্বাস, আতা ও মালিক প্রমুখ থেকে বর্ণিতঃ

كُلُّ اَحَدٍ يُّوْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ الاَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

যে কারোরই কথা যেমন গ্রহণ করা চলে তেমনি তা প্রত্যাখ্যানও করা চলে। তবে রাসূলে করীম (স)-এর কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে আমাকে কোন কোন বিষয়ে কোন পরিত্যক্ত ও অপ্রখ্যাত উক্তি বা মত গ্রহণ করতে হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বহুসংখ্যকের মতকেও অগ্রাহ্য করতে হয়েছে। কেননা বেশী লোক বললেই যে একটা কথা অকাট্য সত্য হয়ে যাবে—এ কোন কথা নয়। তেমনি কম লোকে বললে কথাটি মিথ্যা বলে মনে করতে হবে, তার পেছনেও কোন যুক্তি নেই। দুনিয়ায় এমন ফিকাহবিদ রয়েছেন, যাঁদের কথার সমর্থনে অকাট্য

যুক্তি থাকলেও তাতে তিনি এককই রয়ে গেছেন। অল্পসংখ্যক লোকের মতের ক্ষেত্রে সর্বত্র এরূপই অবস্থা দেখা গিয়েছে। কিন্তু আমি তার পরোয়া করিনি।

পরোয়া করব কেন? আমি অনেক বড় বড় ইমামকে দেখেছি, তাঁরা নিজ নিজ মতের উপর একক ও অনন্য হয়েই অবিচল হয়ে রয়েছেন; যদিও অধিকাংশ লোক তাঁর বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কথাই ধরুন, তিনি বলেন ঃ একটি ব্যাপার যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই, রাসূলে করীম (স)-এর ফয়সালাতেও পাওয়া যায় না। অথচ তোমরা দেখবে, সব লোকই তা গ্রহণ করেছে। তাহল মৃতের শুধু কন্যা থাকলে তার বোনও মীরাস পায়।[১] সমস্ত মানুষ এ মতকে নিজের বিরুদ্ধে দলীলরূপে মনে করেনি।

ইমাম মালিক (র) ফতোয়া দিয়েছেন যে, ফল-পাকুড় বিক্রির ক্ষেত্রেও শুফ্আ (Pre-emption) কার্যকর হবে। পরে তিনি বলেছেনঃ 'এ এমন একটা ব্যাপার যা আমি কখনও শুনিনি কিংবা অপর কেউ এ মত দিয়েছেন—এমন খবরও আমার কাছে পৌছায়নি।'[২] প্রত্যেক ইমামেরই এমন বহু ব্যাপার ছিল, যে সম্পর্কে তাঁরা একান্ত নিজস্ব মত পোষণ করে গেছেন। অপর কেউই তাঁদের মতের সমর্থন করেনি। তাতে তাঁরা কোন দোষই মনে করেন নি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের এরূপ একক ও অন্যদের অসমর্থিত বহু মতকে একত্রিত করে একখানি বিশেষ গ্রন্থও রচিত হয়েছে।

গ্রহণ, অগ্রাধিকার ও সত্য নির্ধারণে অবলম্বিত নিয়ম নীতি

বক্ষ্যমাণ আলোচনা বহু মৌলনীতি সমষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। দৃষ্টিতে যা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে তা অবলম্বন বা গ্রহণ, বিভিন্ন মতদ্বৈধতা সম্পন্ন নিয়ম-বিধানে একটিকে অগ্রাধিকার দান এবং ইজতিহাদী কার্যক্রমের সাহায্যে সম্পূর্ণ নতুন বা প্রায় নতুন কোন মত উদ্ভাবনের একটা শরীয়াতী নিয়ম রয়েছে। এসব নিয়ম-নীতিকে আমরা মোটামুটিভাবে উল্লেখ করছি ঃ

১. দলীলকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ—যতক্ষণ বিশেষ অর্থে গ্রহণের কোন দলীল পাওয়া না যায়।

বস্তুত দ্বীন-ইসলামের বহু দলীলই সাধারণ অর্থবোধক শব্দ সহকারে এসেছে, যেন তার তাৎপর্যের ব্যাপকতায় বহু একক ও খুঁটিনাটি ব্যাপারও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। দ্বীন-ইসলাম যে শাশ্বত ও চিরন্তন এবং তা সর্বকালে সকল স্থানেই সমানভাবেই প্রযোজ্য, এটা তার একটা অকাট্য প্রমাণ।

---

১. الاحكام فى اصول الاحكام لابن حزم ص ٥٤١ -
২. ঐ পৃঃ ৫৪২

এ কারণে আমি মনে করি, কুরআন মজীদের আয়াতে এবং রাসূলে করীম (স) -এর হাদীসে সাধারণ অর্থবোধক যে শব্দ, এত সাধারণভাবে প্রযোজ্য যেসব বিধান এসেছে, সেসব সেভাবেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। সাধারণ তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই তার প্রয়োগ হওয়া উচিত। তবে কোন বিশেষ নির্ভুল অকাট্য দলীল যদি তা থেকে বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য গ্রহণে বাধ্য করে, তা হলে তখন আমরা সে সাধারণ অর্থ ও তাৎপর্য পরিহার করে বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্যই গ্রহণ করব।

সহীহ্ সুন্নাতের সুন্দর জাহেরী তাৎপর্য এবং সাধারণ তাৎপর্য উপস্থাপক আয়াতসমূহ যারা প্রত্যাখ্যান করেন, আমি তাদের সাথে একমত নাই। যাঁরা হাদীসের সাহায্যে কুরআনের সাধারণ তাৎপর্যকে বিশেষ তাৎপর্যে পরিণত করেন, তাঁদের নীতিকেও আমি সমর্থন করতে পারি না। যদিও তাঁর সনদে নমনীয়তা আছে অথবা কোন সহীহ্ হাদীস দ্বারাও বিশেষ অর্থ গ্রহণের দিকে নিয়ে যেতে চাই না—যদিও তাঁর ইঙ্গিতে দুর্বলতা বা অস্পষ্টতা বিদ্যমান।

ইমাম আবূ হানীফা (র) একটি হাদীস গ্রহণ করতে রাযী হন নি। হাদীসটি হল এইঃ

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةَ اَوْسَقٍ مِّنَ لِتَّمَرِ صَدَقَةٌ–

পাঁচ ওয়াসেক্ (একটা বিশেষ পরিমাণ) খেজুরের কম পরিমাণে যাকাত নেই।

তিনি মনে করেন কুরআনের আয়াত ঃ

مِمَّااَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ–

যমীন থেকে যা-ই আমরা উৎপাদন করে দিয়েছি (তারই 'ওশর' দিতে হবে)

এবং فيما سقت السماء العشر আকাশের বর্ষণে যে ভূমিই সিক্ত হয়, তার ফসলেই 'ওশর' (দশ ভাগের এক ভাগ) ধার্য হবে।

সাধারণ বিধান উপস্থাপক ও হাদীসের ভিত্তিতে প্রথমোক্ত হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সকল পরিমাণের ফসলের উপরই যাকাত ফরয বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু আমি এখানে ইমান আবূ হানীফা (র)-র মত গ্রহণ করতে পারিনি। কেননা উক্ত হাদীসটি সহীহ্ এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত। আর এ কথা বলে তার ব্যাখ্যা দেন যে, ব্যবসায়ের জন্যে খেজুর নির্দিষ্ট হলে তখন হাদীসটি প্রযোজ্য হবে, তা যেমন দুর্বল ব্যাখ্যা, তেমনি অ-অগ্রাধিকারদানযোগ্য, বরং ভুল। এ কারণে আমি ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মত গ্রহণ না করে এ পর্যায়ে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ এবং অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মত গ্রহণ করেছি। ফলে জমি যে ফসলই দেয় তাতে যাকাত ধার্যকরণে আমি নিসাব (নিম্ন পরিমাণ) নির্ধারণ করার প্রয়োজন মনে করেছি—যেমন অন্যান্য সব ধন-মালের ক্ষেত্রে নিসাব ধার্য হয়ে থাকে। আর ধনশালী ব্যক্তিদের উপর যাকাত ফরয করার মূলে যে যৌক্তিকতা আমার এ মত তার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ।

তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসের যে সাধারণ তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন, তাতে আমি তাঁর মত সম্পূর্ণ সমর্থন করছি এবং তাৎপর্যের এ সাধারণতাকে لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ 'শাক-সব্জিতে যাকাত হয় না' এ হাদীসের তাৎপর্য দ্বারা বিশেষ অর্থে গ্রহণ করি না কেননা হাদীসটি খুবই দুর্বল। তবে তার একটা ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে এই অর্থে যে, তাতে যাকাত হয় না যা সংগ্রহকারীরা গ্রহণ করতে পারে। কেননা তা তো খুব শীঘ্র বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার জিনিস (Perishable goods)। বায়তুলমালে তা টিকে থাকতে পারে না। অতএব জন্তু ও ফসল ইত্যাদির ন্যায় তা গ্রহণ করার বিধান শরীয়াতে দেয়া হয়নি। এগুলোর ওয়াজিব হওয়াটা পূর্বোক্ত সাধারণ অর্থবোধক শব্দ দ্বারা প্রত্যাহৃত হয়ে যায়নি।

কুরআন ও সুন্নাহ্তে যে সাধারণ তাৎপর্যসম্পন্ন বিধান ও ব্যবস্থা রয়েছে, তা ঠিক অনুরূপ মর্যাদা সহকারেই মেনে নেয়া উচিত, যতক্ষণ না বিশেষ অর্থ গ্রহণে বাধ্যকারী কোন সহীহ্ দলীল পাওয়া যাবে। এ প্রেক্ষিতে যে সব আয়াত ও হাদীস সাধারণভাবে সর্বপ্রকারের ধন-মালে যাকাত ফরয ঘোষণা করেছে, আমরা সেগুলোকে সেই সাধারণ অর্থেই গ্রহণ করেছি। যেমন আল্লাহ্র নির্দেশঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

ধনী লোকদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর।

وَالَّذِيْنَ فِى اَمْوَلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ-

তাদের ধন-মালে সুনির্দিষ্ট হক রয়েছে।

নবী করীম (স)-এর কথা ঃ

اَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ-

তোমরা তোমাদের ধন-মালের যাকাত আদায় করে দাও।

এসব সাধারণ তাৎপর্যমূলক আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধন-মালের মধ্যে পার্থক্য বা তারতম্য করা যায় না। এ সাধারণ তাৎপর্য থেকে বাইরে রাখব শুধু তা-ই, যে সম্পর্কে অকাট্য ও সহীহ্ দলীল পাওয়া যাবে।

২. সুদৃঢ় ইজমার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন

যেহেতু শরীয়াতের কোন বিশেষ হুকুমের ব্যাপারে গোটা মুসলিম উম্মতের আলিমগণের, বিশেষ করে, প্রাথমিক যুগে—ঐকমত্য হওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি যে বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন সে বিষয়ে শরীয়াতের সহীহ্ দলীল বা সার্বিক কল্যাণবোধ অথবা অনুভবযোগ্য কোন ব্যাপারের ভিত্তি করেছেন। তাই তাঁদের এ ঐকমত্যের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন একান্তই বাঞ্ছনীয়। তার ফলে ঐকমত্যের ক্ষেত্রসমূহ

শরীয়াতে সুরক্ষিত থাকতে পারে, তা ভারসাম্য রক্ষার মৌল নীতি হতে পারে এবং চৈন্তিক অস্থিরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ হতে পারে।

যেমন রৌপ্যের যাকাতের অনুপাতে স্বর্ণের যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের সম্পূর্ণ ঐকমত্য সাধিত হয়েছে দশ ভাগের এক-চতুর্থাংশ। আরও যেমন তাদের ইজমা হয়েছে যে, এক 'মিস্‌কাল' হচ্ছে এক দিরহাম ও এক দিরহামের সাত ভাগের তিন ভাগ পরিমাণ। এভাবে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে।

শিরোনামে আমি 'সুদৃঢ় ইজমা' ব্যবহার করেছি। তার কারণ এই যে, কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ এমন সব বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে দাবি করেছেন, যে বিষয়ে অন্যদের কাছে মতদ্বৈধতা রয়েছে। এ মতদ্বৈধতারও কারণ রয়েছে। প্রাথমিক যুগসমূহের মুজতাহিদ আলিমগণ বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের সংখ্যাও ছিল অনেক। প্রতিটি ইজতিহাদী বিষয়ে তাঁদের অভিমত জানতে পারা ও একত্র করা খুবই দুরূহ ব্যাপার ছিল। ইমাম আহমদ এ পর্যায়ে বলেছেনঃ

مَنِ ادَّعٰى الْاَجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ..... لَعَلَّ النَّاسُ اخْتَلَفُوْا مَا يَدْرِيْهِ وَلَمْ يَنْتَهِ اِلَيْهِ فَلْيَقُلْ: لَا تَعْلَمُ النَّاسُ خْتَلَفُوْا- اَوْلَمْ يَبْلُغْنِىْ ذٰلِكَ-

যে দাবি করে যে, কোন বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছে, সে মিথ্যাবাদী, কেননা হয়ত সে জানে না যে, লোকেরা ভিন্ন মত প্রকাশ করেছে অথবা সে খবর তার পর্যন্ত পৌঁছায়নি। অতএব বলা দরকার যে, লোকেরা হয়ত ভিন্নমত প্রকাশ করেছে, তার সংবাদ আমার পর্যন্ত আসেনি।

এ পর্যায়ে এমন এক দৃষ্টান্তই দেয়া যেতে পারে, যাতে ইজমা সংঘটিত হওয়ার দাবি করা হয়েছে বটে অথবা সেই বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করার সংবাদ সে জানে না বলে জানিয়েছে। তা সত্ত্বেও তাতে ভিন্নমত প্রমাণিত হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী গরুর যাকাত পর্যায়ে বলেছেন ঃ প্রতি ত্রিশটি গরুর যাকাত বাবদ একটা এক বছরের বাছুর (تبيع) দিতে হবে। আর চল্লিশটিতে দিতে হবে একটি (مسنة) আর এতে ভিন্নমত আছে বলে আমি জানি না।

... অথচ এ কথা প্রমাণিত যে, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্‌, সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব, কাতাদাহ্‌ এবং ইবনে যুবাইরের মদীনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।[১]

ইবনুল মুনযির ধন-মালের যাকাত অমুসলিমকে দেয়া যাবে না—এই মতে ইজমা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। অথচ জুহরী, ইবনে সিরীন ও ইকরামা এ থেকে ভিন্নমত

---

১. الاحكام لا بن حزم

প্রকাশ করে বলেছেন যে, হ্যাঁ, অমুসলিমদের জন্যে তা থেকে ব্যয় করা জায়েয। আর যেমন বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমরের বাহ্যিক মত এটাই।[১]

ইবনে কুদামাহ্ তাঁর 'আল-মুগ্নী (المغنى) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ বনু হাশিম বংশের লোকদের ফরয যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নেই—এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধতা আছে বলে আমরা জানি না। আর টীকায়, হাফেয ইবনে হাজার লিখিত 'ফত্হুল বারী' গ্রন্থ থেকেও তার এরূপ মতের কথা উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম তাবারী উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) তা জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, তারা যদি রাসূল (স)-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার দরুন প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তাদের জন্যে ফরয যাকাত গ্রহণ করা জায়েয। ইমাম তাহাভীও এরূপ উদ্ধৃত করেছেন। মালিকী মাযহাবের কেউ কেউ আবহরী থেকেও এ মতের উল্লেখ করেছেন। আর তা-ই কোন কোন শাফেয়ীর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ বনু হাশিমের লোকেরা পরস্পরের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করতে পারে। মালিকী মাযহাবের এ ব্যাপারে চারটি মতের উল্লেখ করা হয়েছে। এক—জায়েয, দুই—জায়েয নয়, তিন—নফল দান গ্রহণ জায়েয, ফরয দান নয়; এবং চার—এর বিপরীত (অর্থাৎ নফল দান গ্রহণ জায়েয নয়, ফরয যাকাত গ্রহণ জায়েয)।[২]

বস্তুত এই যে ইজমা—কোন বিষয়ে ঐকমত্যের দাবি, দলীলের ভিত্তিতে আমরা তার বিরোধিতা করতে পারি, করলে কোন দোষ হবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটা ইজমা নয়।

তবে যে ইজমা সুদৃঢ়—যাতে কোন বিপরীত মত আদৌ জানা যায় নি—তার সম্ভাবনা, বাস্তবতা ও অকাট্যতা নিয়ে যত বিতর্কেরই সৃষ্টি হোক না-কোন, সেই পর্যায়ের কোন শরীয়াতী হুকুমের বিরোধিতা আমি করছি না, যেমন এর পূর্বে আমি বলেছি।

কিন্তু আমি বিরোধিতা করছি এ মতে ইজমা হওয়ার, যাতে উসূলে ফিকাহ্র আলিমগণের এই মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, কোন সময়ের আলিমগণ কোন বিষয়ে দুটি মতে মতদ্বৈধতা করলে তাঁদের পরবর্তী লোকদের তৃতীয় কোন মত নতুন করে বলা জায়েয নয়। কেননা মুসলিম উম্মত যদি দুটি মতের মধ্যে মতদ্বৈধতা সীমাবদ্ধ করে রাখে, তাহলে বুঝতে হবে, তাৎপর্যের দিক দিয়ে উম্মত তৃতীয় মত নতুন করে সৃষ্টি করতে নিষেধ করে দিয়েছে। আ-মদী (প্রখ্যাত উসূলে ফিকাহ্বিদ) মনে করেন, তৃতীয় মতটি যদি পূর্ববর্তী দুই মতের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয়, তাহলে সেরূপ মত দেয়া জায়েয নয়। অন্যথায় যদি এক হিসেবে দুটি মতের একটির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয়, আর অপর দিক দিয়ে তার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে তা জায়েয হবে, কেননা তাতে ইজমা ভঙ্গ করা হয় না।[৩]

---

১. যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র—এই অধ্যায়ে অমুসলিমদের যাকাত দানের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২. فتح البارى ৩য় খণ্ড. ২২৭ পৃষ্ঠা; যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র—এ পর্যায়ের নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩. আল-অ-মদী লিখিত الاحكام ১ম খণ্ড, ১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এর দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন ঃ العشر على مالك الارض । 'ফসলের ওশর দেয়ার দায়িত্ব জমির মালিকের আর অধিক সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদ (جمهور) বলেছেন ঃ যে লোক জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করবে, তাকে দিতে হবে ওশর। এখানে এ দুটি মতের মধ্যে ঐকমত্য ভিত্তিক মত হল ঃ ওশর ওয়াজিব—অবশ্যই দেয়। অতঃপর আমরা যখন বলব, ওশর জমির ফসল থেকে ভাড়ায় চাষকারীর দেয়া ওয়াজিব—জমির মালিককে মূল্য বা ভাড়া বাবদ দেয়া মূল্য বাদ দেয়ার পর; এবং বলব, মালিক ভাড়াকারীর কাছ থেকে যে মূল্য আদায় করেছে তা থেকে যাকাত দিতে হবে, তখন আমরা—আ-মদী যেমন বলেছেন—ইজমা ভঙ্গকারী হব না।

তবে আলিমগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, কোন বিষয়ে দুটি মতের দ্বৈধতা এ কথার অকাট্য প্রমাণ যে, তাতে ইজতিহাদ করার বিপুল অবকাশ বিদ্যমান। তৃতীয় মতটি তো ইজতিহাদেরই ফলশ্রুতি এবং তা জায়েয। অনেক বিষয়েই কোন কোন তাবেয়ী তৃতীয় মত নতুন করে প্রকাশ করেছেন, যা সাহাবীদের কেউ বলেন নি। যেমন ইবনে সিরীন ও মসরূক্ব প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে।[১] বস্তুত বিষয়টি যতক্ষণ ইজতিহাদ পর্যায়ভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ তা-ই ঘটতে থাকবে। কেননা তাতে দৃষ্টির প্রসারতা ও ইজতিহাদ করার সুযোগ থেকেই যায়।

৩. সহীহ্ কিয়াস (Analogy) কার্যকরকরণ

'কিয়াস' বলা হয় একটি ক্ষেত্রে তারই মত অপর একটি ক্ষেত্রে দেয়া শরীয়াতী মত (علة) প্রয়োগ করাকে। তা এমন একটি কারণের (حكم) দরুন হয়, যা উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবে বর্তমান। এ ব্যাপারটিকে মহান আল্লাহ্ ত'আলা বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতির মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন। ইবনুল কাইয়্যেম যেমন বলেছেন, এটা হচ্ছে সেই 'মীযান' (মানদণ্ড) যা আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদের সঙ্গে করে নাযিল করেছেন, তার সহকারী ও সহযাত্রী বানিয়েছেন। এখানে এ পর্যায়ের দুটো আয়াতের উল্লেখ করা যায়ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ- (الشورى-١٧)

আল্লাহ্ তিনিই, যিনি পরম সত্যতা সহকারে কিতাব ও আল-মীযান—নির্ভুল মানদণ্ড নাযিল করেছেন।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ- (الحديد-٢٥)

এবং আমরা নিঃসন্দেহে আমাদের রাসূলগণকে পাঠিয়েছি অকাট্য-স্পষ্ট দলীল সহকারে এবং আমরা তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি আল-কিতাব ও আল-মীযান, যেন মানুষ সুবিচার সহকারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

---

১. আল-আ-মদী লিখিত الاحكام ১ম খণ্ড, ১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই আল-মীযান (المـيـزان) অর্থ সুবিচার, ন্যায়পরতা এবং সুবিচার-ন্যায়পরতা কি এবং কি নয়, তার প্রমাণকারী যন্ত্র। নির্ভুল কিয়াসই হচ্ছে কুরআন প্রবর্তিত এই 'আল-মীযান'। প্রথমত আল্লাহ্ এর যে নামকরণ করেছেন তা প্রশংসাসূচক নাম। তা সর্বাবস্থায় সকলের জন্যে কর্তব্য—প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী। 'কিয়াস'-এর নামকরণ এভাবে হয়নি। তা দুভাগে বিভক্ত; 'হক' হতে পারে, হতে পারে 'বাতিল'ও। তা যেমন প্রশংসাযোগ্য হয়, তেমনি তিরস্কারযোগ্য। হয় সহীহ্—নির্ভুল ও খারাপ—বিপর্যয়কারীও। তবে সহীহ্ 'কিয়াস' হচ্ছে সেই আল-মীযান, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবের সঙ্গী করে নাযিল করেছেন।[১]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন ঃ 'কিয়াস' একটা মোটামুটি অর্থজ্ঞাপক শব্দ। সহীহ্ কিয়াস ও অ-সহীহ্ কিয়াস উভয়ই তার অন্তর্ভুক্ত। তবে সহীহ্ কিয়াসই শরীয়াত সমর্থিত। আর তা হচ্ছে দুই সমান বিষয়ের একত্রীকরণ, দুটো পরস্পর পার্থক্যপূর্ণ জিনিসের মধ্যে পার্থক্যকরণ। প্রথমটি প্রত্যাহারের কিয়াস। আর দ্বিতীয়টি বিপরীতের কিয়াস। আর তা-ই সে সুবিচার, যা করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে করীম (স)-কে পাঠিয়েছেন।

সহীহ্ কিয়াস হচ্ছে, যেমন মূল বিষয়ে যে, কারণ (علة) বর্তমান থাকার দরুন শরীয়াতের একটা হুকুম হয়েছে, সে কারণটি অপর যে বিষয়ে পাওয়া যাবে তাতেও শরীয়াতের সে হুকুমই গ্রহণীয় হবে। কেননা অনুরূপ হুকুম দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গ্রহণ করার প্রতিবন্ধক কিছুই নেই। শরীয়াত এরূপ কিয়াসের বিরুদ্ধে কখনই কিছু নিয়ে আসেনি। পার্থক্যকারী বাতিলকরণের কিয়াসও এমনিই হয়ে থাকে তা হচ্ছে এই যে, দুটো অবস্থার মধ্যে যেমন পার্থক্য হবে না, যা দ্বিতীয় অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। শরীয়াত এরূপ কিয়াসের বিরুদ্ধে নয়।[২]

আসল বক্তব্য হল, 'কিয়াস' যখন মূল ও তার সদৃশ দ্বিতীয় জিনিসের মধ্যে সমন্বয়কারী 'কারণ'-কে স্পষ্ট করে তোলে এবং এ দুটোর মাঝে প্রকাশমান বা প্রচ্ছন্ন কোন পার্থক্যকারী না থাকে, গণনার যোগ্য কোন প্রতিবাদীও পাওয়া না যায় তখন তাকে একটি শরীয়াতসম্মত দলীল হিসেবে গ্রহণ করা ও মেনে নেয়া ওয়াজিব। তাতে কোন দোষ হওয়ার কারণ নেই।

কেউ আপত্তি তুলতে পারেন এই বলে যে, যাকাত একটি বিশেষ ইবাদতের কাজ। আর ইবাদতের কাজে কোন 'কিয়াস' চলে না। তা হলে আমরা বলব ঃ হ্যাঁ, একথা সত্য যে, খালেস ইবাদতের কাজে কিয়াসের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। কেননা ইবাদত ফরয হওয়ার 'ইল্লাত' (কারণ) বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব নয়। ইবাদতের কাজে তো কোন কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে শুধু আল্লাহ্র হুকুম পালন করাই লক্ষ্য হতে হবে। অতএব নামায, রোযা, হজ্জ প্রভৃতি নিছক ইবাদত পর্যায়ের কাজসমূহে কোনরূপ

---

১. اعلام المـؤقـعـيـن - ج١ - ص١٢

২. رسـالـة لـنـقـيـاس لابـن تـيـمـيـه-

কিয়াস করা ঠিক হবে না। তাহলেই লোকদের জন্যে দ্বীনের নামে এমন কাজের বিধান করা বন্ধ হবে, যার অনুমতি আল্লাহ্ তা'আলা দেননি। না তেমন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে, না কোন কাজ করার দায়িত্ব থেকে কাউকে মুক্ত করা যাবে।

কিন্তু যাকাতের অবস্থা ভিন্নতর। তার আরও একটা দিক রয়েছে। তা নিছক ইবাদত নয়। তা সুপরিজ্ঞাত হক্ও। একটা সুনির্দিষ্ট ও দার্যকৃত করও। তা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামজিক, সামষ্টিক ও ধন-সম্পদ সংক্রান্ত ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশও। তা একদিকে ইবাদতের তাৎপর্য ও ভাবধারা সমন্বিত। শরীয়াতে তাঁর বিধিবদ্ধ হওয়া ও তৎসংক্রান্ত হুকুম-আহ্কাম নাযিল হওয়ার মূল কারণ (علة) প্রখ্যাত ও সর্বজনবিদিত। তাহলে সেই 'ইল্লাত' বা 'কারণ' অনুযায়ী আর যা যা তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রয়েছে, শরীয়াতের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে সেই বিষয়েও অনুরূপ বিধান হওয়ার কথা আমরা 'কিয়াস' করব না কেন?

নবী করীম (স) স্বয়ং কোন কোন দানা বীজ ও ফল-ফসল যেমন যব, খেজুর, কিসমিস, মনাক্কা ইত্যাদি থেকে ফিতরার যাকাত গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী, আহ্মদ ও তাঁদের সঙ্গীগণ সাধারণত বা বেশীর ভাগ খাদ্য হিসেবে গৃহীত জিনিসের উপর 'কিয়াস' করেছেন। তাঁরা এসব গৃহীত জিনিসকে মূলত ইবাদতের লক্ষ্যস্বরূপ ধরে নেন নি। কেননা তাহলে এর উপর কিয়াস করা চলতো না। কৃষি-ফসল ও ফল-পাকড়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে বেশীর ভাগ ফিকাহ্‌বিদ অন্যান্য এমন সব দানা বা বীজ সম্পর্কে কিয়াস করেছেন, যে সম্পর্কে দলীল পাওয়া গেছে এবং তাঁরা কেবল হাদীসে উল্লিখিত গম, যব, খেজুর ও কিসমিসের মধ্যে যাকাতকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। হযরত উমর (রা)-ও যাকাত পর্যায়ে কিয়াস প্রয়োগ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি যখন জানতে পারলেন যে, এক-একটি ঘোড়ার মূল্য একশতটি উষ্ট্রের সমান হয়, তখন ঘোড়ার যাকাত গ্রহণের জন্যে তিনি নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, আমরা চল্লিশটি ছাগল থেকে যাকাত আদায় করি; কিন্তু ঘোড়া থেকে কিছুই নিচ্ছি না, (এটা হওয়া উচিত নয়)। ইমাম আবূ হানীফা (র) সুপরিজ্ঞাত শর্তের ভিত্তিতে এই মতকেই মেনে নিয়েছেন।[১]

এই আলোকে আমরা কৃষিজমির উপর 'কিয়াস' করেছি বসবাসের জন্যে ভাড়া দেয়া দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ি, ইত্যাদি। যেসব দানের জিনিস থেকে হযরত ইবনে মাসউদ, মুয়াবিয়া ও উমর ইবনে আবদুল আযীয প্রমুখ যাকাত গ্রহণ করতেন তা ব্যয় করা কালে—যদিও তা সাধারণভাবে যাকাত ফরয হওয়া জিনিসের অন্তর্ভুক্ত তার উপর আমরা কিয়াস করছি মাসিক বেতন (رواتب) ও মজুরীকে।

মধুর উপর ওশর ধার্য হওয়ার কথা হাদীসে (اثار)-ই উদ্ধৃত হয়েছে। আমরা তার উপর কিয়াস করছি মিল্ক ও দুগ্ধ ইত্যাদি পশুজ-উৎপন্ন দ্রব্যাদি।

---

১. এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থে যথাস্থানে করা হবে।

কিয়াসের গুরুত্ব প্রমাণ করার প্রসংগে ইমাম শাফেয়ী তাঁর الرسالة গ্রন্থে স্বর্ণের যাকাত পর্যায়ে যা লিখেছেন , এখানে তার উল্লেখ যথেষ্ট হবে বলে মনে করছি। তিনি বলেছেন ঃ

নবী করীম (স) 'আল-অরাক্ব, (নগদ রৌপ্য)-এ যাকাত ফরয করেছেন। তাঁর পরে মুসলিম সমাজ স্বর্ণে যাকাত গ্রহণ করেছে। হয় এমন হাদীসের (خبر) ভিত্তিতে, যা আমাদের কাছে পৌছেনি অথবা এই কিয়াস করে যে, স্বর্ণ ও মুদ্রা লোকদের এমন নগদ সম্পদ, যা তারা পুঁজি করে এবং ইসলামের পূর্বে ও পরে তারা যে ক্রয়-বিক্রয় করত তাতে মূল্য হিসেবে তা তারা চালুও করেছে।[১]

অতএব নগদ স্বর্ণ মুদ্রার যাকাত গ্রহণ—এই মুদ্রাই হল বিশ্বের বড় বড় জাতির নগদ মুদ্রার বিশ্বমান—খুব সহজ ব্যাপার নয়। তা সত্ত্বেও রাসূলে করীম (স)-এর পর মুসলমানগণ এই যাকাত গ্রহণ করেছেন এবং তা করেছেন কিয়াস-এর সাহায্যে। এটাই অধিকতর সম্ভব। এ পর্যায়ে কোন হাদীস থেকে থাকলেও তা ইমাম শাফেয়ীর কাছে পৌছায়নি—যদিও তিনি খুব তালাশ করেছেন এবং অনুরূপ কিছু ভিত্তি পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম মালিক, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের কাছেও এই পর্যায়ে কিছুই পৌছায়নি। কাজেই বলতে হয় যে, এ পর্যায়ে কোন হাদীসের অস্তিত্ব একটা বহু দূরবর্তী সম্ভাবনা। এই কারণে ইমাম মালিক কোন হাদীসের অপেক্ষা না করে 'আমল' বা কাজের উপর ভিত্তি করেছেন এবং বলেছেন ঃ

اَلسُّنَّةُ الَّتِىْ لَا اخْتِلَافَ فِيْهَا عِنْدَنَا- اَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ مِنْ عِشْرِيْنَ دِيْنَارً اَعَيْنَا ذَهَبًا كَمَا تَجِبُ فِىْ مِأَتَىْ دَرْهَمٍ فِضَّةٍ-

আমাদের মতে যে সুন্নাতে কোন মতদ্বৈধতা নেই, তা হচ্ছে সরাসরিভাবে বিশটি দীনারে (স্বর্ণমুদ্রা) যাকাত ফরয যেমন দুইশ' দিরহামে (রৌপ্য মুদ্রায়) যাকাত ফরয হয়ে থাকে।

৪. লক্ষ্য ও কল্যাণের গুরুত্ব স্বীকার

ইসলামের সুবিজ্ঞ ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মনীষিগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, শরীয়াতের হুকুম-আহকাম ও আইন-বিধান কার্যকর করা হয়েছে আল্লাহ্র বান্দাদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের দৃষ্টিতে। সে সব কল্যাণ জরুরীমূলক হোক, প্রতিবন্ধকতামূলক অথবা সৌন্দর্যসূচক, তাতে কোন পার্থক্য নেই।

এ কথার দলীল—যেমন ইমাম শাতেবী লিখেছেন—তা হচ্ছে শরীয়াতের বিধান অনুসন্ধান ও তার সামষ্টিক ও অংশ সম্পর্কিত দলীলাদির উপর দৃষ্টিপাত। তা কোন বিশেষ একটি দলীলের মধ্যে সীমিত নয়, কোন একটা বিশেষ ঘটনা কেন্দ্রিকও নয়। বরং গোটা শরীয়াত সম্পূর্ণরূপে তার উপর আবর্তিত।[২]

১. الرسالة ص ١٩٣-١٩٤

২. الموافقات ج ٢ ص ٥١

ইমাম শাতেবী একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়মের উল্লেখ করেছেনঃ 'শরীয়াত পালনে বাধ্যবাধকতার প্রেক্ষিতে ইবাদতের আসল কথা হল দাসত্ব স্বীকার—তার তাৎপর্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে। আর আদত-অভ্যাস-মুয়ামিলাত-এর মূল কথা হল তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য আরোপ।[১] এ কথা প্রমাণের জন্যে তিনি এতসব স্পষ্ট অকাট্য দলীলের উল্লেখ করেছেন, যা এখানে উদ্ধৃত করার অবকাশ নেই।

এখানে আমি আবার বলছি, পূর্বোক্ত কথার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করছি ঃ যাকাত যদিও ইবাদতের পর্যায়ে নামাযের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তা প্রকৃতপক্ষে একটা ইবাদত মাত্র নয়। আসলে তা 'আদত' বা মুয়ামিলাতের অতীব নিকটবর্তী কাজ। কেননা তা মুসলিম জনগণের ধন-মাল সংক্রান্ত ব্যাপার; বড়জোর তা রাষ্ট্র ও ধন-মালিকের মধ্যকার ব্যাপার অথবা তা রাষ্ট্রের অবর্তমানে বা নিষ্ক্রিয়তার সময়ে ধন-মালের মালিক ও দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্কের দিক। আর তার প্রমাণ এই যে, ইসলামের অর্থ-বিজ্ঞান ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে যাকাত এ পর্যায়ে উল্লিখিত ও আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গের গ্রন্থাদির মধ্যে কিতাবুল খারাজ, কিতাবুল আমওয়াল, আহকামুস্ সুলতানিয়া ও আস্সিয়া সাতুশ-শরঈয়া উল্লেখ্য। আসলে যাকাত ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটা বিশেষ অংশ।

আমরা যদি ইসলামী ফিকাহ্কে আধুনিক পদ্ধতিতে পুনর্বিন্যাস করতে ইচ্ছা করি, তাহলে যাকাতকে আমরা অবশ্যই অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত করব। তাকে নিছক ইবাদতের মধ্যে গণ্য করেই ক্ষান্ত হয়ে যাব না। আইন প্রণয়নকালেও তাই করতে হবে। কেননা তা যে অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক বিধি প্রণয়নের অন্তর্ভুক্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এরূপ করা হলে যাকাত ইবাদতের পরিমণ্ডল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে না। ইমাম শাতেবী ঘোষণা করেছেন ঃ আদতের মধ্যে যদি বন্দেগীর ভাবধারা পাওয়া যায়, তাহলে তা অবশ্যই মানতে হবে এবং দলীলের সাথে স্থিতি গ্রহণ করতে হবে। যেমন বিবাহে মোহরানা দাবি করা, খাদ্য হিসেবে গৃহীত জন্তুর দেহের বিশেষ স্থানে যবেহ করা, মীরাস বন্টনে নির্দিষ্ট অংশসমূহ এবং তালাকের সংখ্যায় মাসের সংখ্যা গণনা প্রভৃতি।

যাকাতের পরিমাণ ও নিসাবকে আমি এ পর্যায়েই গণ্য করছি। কেননা তা শরীয়াতদাতা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। তিনিই তার সীমা নির্ধারণ করেছেন এবং চূড়ান্ত করে দিয়েছেন। বিগত কাল ও যুগসমূহে বিশ্বের মুসলিমগণ সেই ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঐকমত্য রক্ষা করে এসেছেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে ঠিক দলীলের উপর স্থিতি ও ঐকমত্য হওয়া কর্তব্য। এ কারণে যেসব লোক যাকাতের পরিমাণ ও নিসাবকে কাল ও অবস্থার অনুপাতে পরিবর্তন ও হ্রাস-বৃদ্ধির যাঁতাকলে ফেলতে চাইছেন, আমি তাঁদের বিরোধিতা করছি। কেননা তা করা হলে শরীয়াতভিত্তিক যাকাতের মর্যাদাই বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তাকেও একটা রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স পর্যায়ে নামিয়ে দেবে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্র সরকার

---

১. الموافقات ج ٢ ص ٥١

যেমন বিভিন্ন ধরনের ও পরিমাণের ট্যাক্স ধার্য করে থাকে, যাকাতও ঠিক সেই রকমেরই একটা অতীব নগণ্য জিনিসে পরিণত হবে।

সারকথাঃ ইসলামী শরীয়াতের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধান এবং ক্ষতি ও বিপর্যয়ের পথ বা কারণসমূহ প্রতিরোধ। ইমাম মালিক ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের অনুসৃত নীতিতে এই মৌল নীতির সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা তাঁরা 'জনকল্যাণ' (Public good or welfare (مصالح موسله)-কে শরীয়াতেরই একটি দলীলরূপে গণ্য করেছেন। তাই 'যরায়ে' (ক্ষতির কারণ) বন্ধ করার নীতি অনুযায়ী যেমন আমল করা দরকার,[১] তেমনি এই 'জনকল্যাণ' অনুযায়ীও আমল হওয়া আবশ্যক। তবে হাম্বলী মাযহাবের বহু সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদ এ বিতর্ক দূরীভূত করে দিয়েছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা ও তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যেম নিজ নিজ গ্রন্থে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন যুগিয়েছেন। এ পর্যায়ে তাঁরা দু'জনেই বহু দলীল ও সহীহ্ শরীয়াতী হিসাব-নিকাশ উপস্থাপিত করেছেন।

এই ভিত্তিতে ইবনুল কাইয়্যেম একটা অধ্যায় দাঁড় করিয়েছেন। কাল-স্থান, অবস্থা, মনোভাব ও ব্যবহারের পার্থক্যের দৃষ্টিতে ফতোয়া পরিবর্তন ও পার্থক্য দেয়া স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে বলে তিনি দাবি করেছেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেনঃ 'এ-এক বিরাট কল্যাণদায়ী পরিচ্ছেদ।'

> এ সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন শরীয়াতের ব্যাপারে বড় ভুল সংঘটিত হয়েছে। এর কারণে বহু দুঃখ-কষ্ট ও অসুবিধার উদ্ভব হয়েছে। অথচ শরীয়াত উচ্চমানের কল্যাণ দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার দরুন এই ধরনের অবস্থার সুযোগ দেয় না। কেননা শরীয়াতের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়েছে জনগণের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ চিন্তার উপর। এটাই সম্যক সুবিচার, আল্লাহ্‌র অপরিসীম রহমত, সামষ্টিক কল্যাণ, অতীব যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তাসঞ্জাত। অতএব যে বিষয়ই সুবিচারের সীমা পেরিয়ে জুলুমের পর্যায়ে পড়বে, রহমতের পরিবর্তে অশান্তির কারণ হবে, অকল্যাণের পরিবর্তে বিপর্যয় ডেকে আনবে, যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিবর্তে অর্থহীনতা ও আবর্জনার প্রশ্রয় দেবে, তা শরীয়াত হতে পারে না—তার যে ব্যাখ্যাই দেয়া হোক-না-কেন। শরীয়াত হচ্ছে বান্দাগণের মধ্যে আল্লাহর সুবিচার। তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুকম্পা, পৃথিবীর উপর মহাশান্তির ছায়া বিস্তার। তাঁর যৌক্তিকতা ও কর্মকৌশলের নিদর্শন, মহানবী (স)-এর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। তা নূর বিশেষ, দৃষ্টিমানরা তার আলোকেই দেখতে পারে, হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকেরা তাঁরই হেদায়েত পেয়ে ধন্য হয়।[২]

বস্তুত এ অতীব লোভনীয় ও আগ্রহসম্পন্ন কালাম। জনগণের মধ্যে তার ব্যাপক প্রচার সাধন আমাদের কর্তব্য। আমাদের এই যুগেও এর বিপরীত কিছু বলার থাকতে পারে না। বস্তুত ইবনুল কাইয়্যেম যখন বলেন যে, কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে ফতোয়াও বদলে যায়, তখন তিনি খুব ঠিক কথাই বলেন, অতীব সত্য কথা বলেন।

---

১. বরং আল-কারাফী বলেছেন ঃ অন্যের 'মাসালিহে মুরসালার' ব্যাখ্যা তাদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে করেছেন। কিন্তু তার শাখা-প্রশাখা বর্ণনাকালে শুধু 'মুসলিহা' বলেন।

২. اعلام الموقعين- ج ٣ ص ١٤

কেননা তখন মূলত শরীয়াতের বিধান কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় না, পরিবর্তিত হয় শুধু তার প্রয়োগ। আইন বদলে যায় না, আইনের বুঝ-সমঝ্ বদলে যায়। শরীয়াত তো আল্লাহ্‌র ওহী, তা শাশ্বত। কিন্তু ফতোয়া, বুঝ-সমঝ্ ও বিচার মানুষের কর্ম।

রাসূলে করীমের যুগে কুরআনের আয়াত অনুযায়ী। 'আল-মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' [Whose hearts have learn (recently) reconciled to (truth)]-কে যাকাত দেয়া হত। উত্তরকালে খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা) তাদের যাকাত দিতে অস্বীকার করলেন। বললেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ-

নিশ্চয়ই আল্লাহর তা'আলা দ্বীন ইসলামকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন এবং ওদের প্রতি মুখাপেক্ষিতা শেষ করেছেন।

এ কথা বলে ও এ কাজ করে তিনি মূলত শরীয়াতের কোন হুকুমকে পরিবর্তিত করে দেন নি, কুরআনী অকাট্য দলীলকে বাতিল ঘোষণা করেন নি—যদিও এরূপ ভিত্তিহীন কথা অনেকেই মনে করে নিয়েছে। তিনি রাসূলে করীমের সময়কাল ও অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার দরুন ফতোয়া—(শরীয়াতী হুকুমের প্রয়োগ) পরিবর্তন করে দিয়েছেন মাত্র। ফলে উয়াইনা ইবনে হাসান ও আক্‌রা ইবনে হাবেসের ন্যায় লোকদের উপর তাদের মন ফিরিয়ে রাখার জন্যে ইসলামের যে নির্ভরশীলতা ছিল ও তারাও কিছু পাওয়ার জন্যে আকাঙ্ক্ষিত ছিল, তার আর কোন অবকাশই থাকল না। কেননা রাসূলে করীম (স) তাদের দিল আকৃষ্ট করার জন্যে কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে যান নি,—সাদা চেকে স্বাক্ষর দিয়ে যান নি। এ ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা রয়েছে, তিনি যখন যার মন আকৃষ্ট করে রাখার প্রয়োজন মনে করবেন, তাই করতে পারবেন, আর যখন দেখবেন যে, কোন ব্যক্তি বা লোক সমষ্টির মত খুশী করার আদৌ প্রয়োজন নেই অথবা অবস্থার পরিবর্তনের কারণে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে অথবা ধন ব্যয়ের অন্য ক্ষেত্রসমূহ তুলনামূলকভাবে অধিকতর প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের তার অধিকার রয়েছে। তাতে চিরদিনের জন্যে এ খাতটি বাতিল করেও দেয়া হবে না। সেকালের ও এ কালের কোন কোন হানাফী আলিম তাই মনে করেছেন। কেননা আল্লাহ্‌র কিতাবের কোন হুকুম বাতিল ও নিষ্ক্রিয়করণের কোন অধিকার হযরত উমর তো দূরের কথা, গোটা মুসলিম উম্মতেরও থাকতে পারে না। তবে তিনি সেকালের মুসলিম জনগণের কল্যাণ এতেই নিহিত বলে মনে করেছিলেন যে, মন রক্ষার জন্যে যাকাতের অর্থের প্রতি লোভীদের নিরাশ করে দেবেন। পরবর্তীকালে কারোর মন রক্ষার জন্যে অথবা সাধারণ কল্যাণের দৃষ্টিতে কিছু দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তা করার পথ এর দরুন বন্ধ হয়ে যায় নি।[১]

---

১. مصارف الزكاة- فصل المؤلفة قلوبهم দ্রষ্টব্য।

সাধারণ জনকল্যাণের দৃষ্টিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বিপর্যয়কারী পথ বন্ধ করা যে শরীয়াত বিরোধী নয়, হযরত উমরের এই কাজ তার অকাট্য দৃষ্টান্ত। অনুরূপভাবে কাল ও স্থানের পরিবর্তনের দরুন ফতোয়া পরিবর্তিত হওয়ারও তা অতীব উত্তম ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অবস্থার পরিবর্তনে ফতোয়া পরিবর্তিত হওয়া পর্যায়ে হযরত উমরের দ্বিতীয় অবদান হচ্ছে ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্যকরণ। সিরিয়ার কতিপয় লোক এসে তাঁর কাছে ঘোড়ার যাকাত জমা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু তা গ্রহণে তাঁর মনে দ্বিধার সঞ্চার হল। কেননা নবী করীম (স)-ও এ কাজ করেন নি, তাঁর পূর্ববর্তী খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও এ কাজের কোন দৃষ্টান্ত রেখে যান নি। পরবর্তীকালে ইয়ালা ইবনে উমাইয়া ও তাঁর ভাই যখন দেখলেন একটি ঘোড়ার মূল্য একশটি উষ্ট্রের সমান হয়েছে, তখন কিয়াসকে দলীলরূপে গ্রহণ করে তিনি ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্য করে দিলেন। এ কাজটি আসলে পরম লক্ষ্য কল্যাণ ও শরীয়াতের ভিত্তি যে সুবিচার, তার দাবি পূরণ পর্যায়ের।

স্থান ও কালের পরিবর্তনের দরুন ফতোয়ার পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার এখানে উল্লেখ্য আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাসূলে করীম (স) যখন হযরত মুয়ায (রা)-কে ইয়েমেনে পাঠিয়ে দিলেন, তখন নির্দেশ দিয়ে দিলেন যে, তিনি যেন সেখানকার ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে সেখানকার দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করেন। এ পর্যায়ের নির্দেশে বলা হয়েছিল ঃ শস্য থেকে শস্য গ্রহণ কর, ছাগল থেকে ছাগী, উষ্ট্র থেকে উষ্ট্র। এই নির্দেশ জনগণের প্রতি একটা সুবিধা দানের ব্যাপারই মনে করা হয়েছিল। লোকদের কাছে এভাবে দাবি করা হবে; কিন্তু তাঁদের জন্যে যদি সেই জিনিসের মূল্য দিয়ে দেয়া সহজ হয় তবে তাকে অবশ্যই স্বাগতম জানানো হবে। কেননা জনগণের পক্ষে সহজতর পন্থা তা-ই। তাদের পিছনে অবস্থানকারী রাজধানী মদীনাবাসীদের জন্যেও তাতেই ফায়দা নিহিত। কেননা কোন জিনিস উদ্বৃত্ত হয়ে গেলে তা তো সেখানেই পাঠিয়ে দেয়া হবে। হযরত মুয়ায ইয়েমেনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

ائْتُوْنِى بِخَمِيْسٍ اَوْلَبِيْسٍ (مَلاَبِسَ مِنْ صُنْعِهِمْ) اٰخِذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الذُّرَّةِ وَالشَّعِيْرَ فَاِنَّهُ اَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَاَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ-

তোমরা আমাকে খামীস কিংবা তোমাদের তৈরী পোশাক দাও। আমি তা তোমাদের কাছ থেকে শস্য বা যবের পরিবর্তে গ্রহণ করব। কেননা তা-ই তোমাদের জন্যে সহজ আর মদীনায় অবস্থানকারী মুজাহিদদের পক্ষেও সুবিধাজনক।[১]

হযরত মুয়ায (রা) হালাল-হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত ছিলেন। হাদীসে এরূপই বলা হয়েছে এবং তিনিই দেখলেন যে, যাকাতের বিধানদাতা তার দ্বারা জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনই করতে চেয়েছেন। এ উদ্দেশ্যেই যাকাতের ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। তিনি ফসলের যাকাত বাবদ ফসলের পরিবর্তে ইয়েমেনী বস্ত্র গ্রহণ করতে

---

১. এ গ্রন্থে 'যাকাত আদায়ের পন্থা' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রস্তুত ছিলেন। যদিও তা বাহ্যত হাদীসের বিরুদ্ধ মত। কিন্তু হযরত মুয়ায তো আর হাদীসের বিরোধিতা করতে পারেন না। তিনিই কুরআন ও সুন্নাতের পর ইজতিহাদকে আইনের তৃতীয় উৎস রূপে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি এখানে হাদীসের মূল লক্ষ্য অনুধাবন করে তাকে কার্যকর করেছেন, তার মৌল বক্তব্যকে লংঘন করেন নি। এ কারণে ফিকাহ্‌র মৌল নীতিবিদগণ মুজাহিদ হওয়ার অন্যতম শর্ত করেছেন, তাকে আইন-বিধানের মর্মকথা ও শরীয়াতের আসল লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে আলিম হতে হবে। সেই সাথে তাকে যুগের জনগণের প্রকৃত কল্যাণ সম্পর্কেও অবহিত হতে হবে। আর একথা খুবই সত্য। কেননা যে লোক বহু ও বিপুল বিদ্যা অর্জন করল, ইজতিহাদের উপায়-উপকরণসমূহও আয়ত্তাধীন করে নিল কিন্তু সে কোন নিভৃত কোণে কিংবা গির্জা-খানকার মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে বলে সমাজ-সমষ্টির কল্যাণ বা অকল্যাণ সম্পর্কে কোন ধারণাই অর্জন করতে পারেনি, জনমনে ঝগড়া-বিবাদের কি সব কারণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তাও বুঝতে পারেনি—বাস্তব ও বৈষয়িক জীবন যাপন করেনি, সে মুজতাহিদ হতে পারে না, ইসলামী শরীয়াতের কোন ব্যাপারে সে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম থেকে যাবে।

আমরা এখানে শরীয়াতের যে সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সার্বিক কল্যাণ্যের কথা বলছি, এর পক্ষে বেশ কয়েকজন সাহাবী মত প্রকাশ করেছেন। যেমন অনেকে বলেছেন, স্ত্রীলোকদের ব্যবহার্য অলংকারে যাকাত নেই। কেননা যাকাত প্রবর্তনে শরীয়াতের লক্ষ্য তাঁরা বুঝেছেন, ক্রমবৃদ্ধিশীল ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ অথবা বর্ধন প্রবণতাসম্পন্ন ধন-মালের যাকাত গ্রহণ—রাসূলে করীম (স) তাই করেছেন। যেন অতিরিক্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সম্পদ থেকেই সাধারণভাবে যাকাত গ্রহণ করা হয় এবং মূল সম্পদ যেন মালিকের কর্তৃত্বে অবশিষ্ট থেকে যায়। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ্ নারীদের জন্যে যে অলংকার ব্যবহার জায়েয করে দিয়েছেন, তা তো বৃদ্ধিশীল নয়—বৃদ্ধি প্রবণতা সম্পন্নও নয় বরং তা ক্ষয়িষ্ণু, তা সৌন্দর্য ও শোভা বৃদ্ধিকারী পোশাক বা ঘরের সরঞ্জাম পর্যায়ের জিনিস।

শরীয়াতের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে নিরপেক্ষ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার উপর। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা তাবেয়ী ইমাম আতা ইবনে বিরাহ্‌র মতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। তাঁর মত হল ফসল উৎপাদনে যে ব্যয় হয়েছে তা বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট ফসল থেকে যাকাত গ্রহণ। জমি ভাড়ায় নিয়ে যারা ফসল উৎপাদন করে, তাদেরও উৎপাদন ব্যয় বাদ দেয়ার পরই যাকাতের হিসাব লাগাতে হবে। জমির ভাড়াটাও বাদ পড়বে। ভাড়ার জমির মালিক শুধু দখলের কারণে যে ভাড়া পায় তার উপরও যাকাত ধার্য হবে। তা থেকে 'ওশর' কিংবা 'অর্ধেক ওশর' আদায় করা হবে। কেননা সে নিজে চাষাবাদ করলে যা উৎপাদন হত, এ ভাড়াটা তারই বিকল্প।

আলোচনার পদ্ধতি

বক্ষ্যমাণ আলোচনায় আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, তাকে সহজ ও কঠিন—উভয় পরিব্যাপ্ত বলা যায়। বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির আলোচনায় সাধারণত যে কঠিন ও দুর্বোধ্যতা আরোপ করা হয়, আমি তা পরিহার করে চলেছি। প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে খুব স্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক বক্তব্যের উদ্ধৃতিও দিয়েছি। মূল তাৎপর্য সংরক্ষণ সহকারে অল্প অল্প কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

সফল ও সঠিক পদ্ধতি তা-ই হতে পারে যাতে কঠিন কঠিন সূক্ষ্ম বিষয়াদি স্পষ্ট করে বলা হয়। আমি তাঁই করতে চেষ্টা পেয়েছি। সম্ভবত আমি তাতে সাফল্য লাভ করেছি কিংবা সাফল্যের নিকটবর্তী হয়েছি।

পরবর্তী কথা হচ্ছে, আমি দীর্ঘ ছয় বছরাধিক কাল ধরে এই আলোচনাকে একটা বৈজ্ঞানিক মর্যদা দানের জন্যে চেষ্টা করেছি। এর পর এর পথে নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। আল্লাহ্ যা করেন, তাতেই মংগল নিহিত। আমি এই পাণ্ডুলিপি সম্মুখে রেখে নাড়াচাড়া করতে থাকি। কোথাও কথা বাড়াতে থাকি, পুনর্বিন্যাস করতে থাকি, পরিচ্ছন্ন ও পরিমার্জিত করতে থাকি। সর্বশেষে মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় বর্তমান আকার ও অবস্থায় তা প্রকাশিত হচ্ছে। সুস্থ দৃষ্টিবান চিন্তাবিদ ও লেখকগণ আশা করি এর প্রতি গুরুত্ব দেবেন এবং নিরপেক্ষ নিষ্ঠাবান সমালোচকগণের পর্যবেক্ষণ থেকে আশা করি আমি বঞ্চিত হব না।

সে যা-ই হোক, আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা এ কাজে নিয়োজিত করেছি। এই সুদৃঢ় ফরয কাজের (যাকাতের) মর্মকথা ব্যাখ্যা করার যে সাধ্যযোগ্যতা আমার ছিল, তা এ কাজে লাগাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইনি। ইসলামী বিধানের অবদান এই যাকাত ব্যবস্থা। তার সাথে সংশ্লিষ্ট আইন-বিধানের নিরপেক্ষতা, তাতে নিহিত তত্ত্বের গভীরতা এবং তার বিরাট লক্ষ্য ও প্রভাব সমুদ্ঘাটিত ও সমুদ্ভাসিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই দীর্ঘ আলোচনা। মুসলিমগণ এর আলোকে ইসলাম সম্পর্কিত ধারণা সঠিকভাবে গড়ে নেবেন, দীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতি ও অপরিচিতির পর এই ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন করবেন এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামজিক-সামষ্টিক ব্যবস্থার এক অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে যাকাত আবার গ্রহণ ও কার্যকর করবেন, আমি এটারই আশা পোষণ করছি। কেননা তার ফলেই আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ সম্ভব। শুধু তাই নয়, মুসলিম জনগণের বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর বহুলাংশের সমাধান এর মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব বলে মনে করি। এ কালের যুবক সমাজে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, তা থেকে তাদের রক্ষা করার এটাই অন্যতম পন্থা বলে আমার বিশ্বাস।

এখন এই অর্ধয়ন যদি তার লক্ষ্যে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহলে আমি সেজন্যে আল্লাহ্র হামদ করব। আল্লাহ্র শোকর আদায় করাই আমার এই চেষ্টা-প্রচেষ্টার চরম লক্ষ্য। তিনিই এই চেষ্টার শুভ ফল দানে সক্ষম, তিনিই পারেন আমার এই কাজে বরকত দিতে—যদিও তা আমার লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছতে অসমর্থ রয়েছে।

আমার জন্যে সান্ত্বনার বিষয় হল, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি, তাতে কোন ত্রুটি বা অবসাদের প্রশ্রয় দিইনি। আর যে লোক প্রাণপণ চেষ্টা করে তার 'মজুরি' এবং যে নিয়ত করে, তার সওয়াব বন্ধ হয়ে যায় না। প্রত্যেক চেষ্টাকারীরই একটা প্রাপ্য রয়েছে। আর প্রত্যেকেই তা-ই পায়, যা পাওয়ার জন্যে সে ইচ্ছা করেছে—এটাই ইসলামের নিয়ম।

وماتوفيقى الابالله عليه توكلت واليه انيب–

দোহা, কাতার ইউসুফ আল-কারযাভী.
জুমাদিউল আউয়াল ১৩৮৯ হিজরী
জানুয়ারী ১৯৬৯ সাল

প্রাথমিক কথা

যাকাত ও সাদকার অর্থ

'যাকাত' শব্দের বিশ্লেষণ

আভিধানিক অর্থ ঃ বলা হয় ঃ زكا 'যে জিনিস ক্রমশ বৃদ্ধি পায় ও পরিমাণে বেশী হয়'। زكافلان অমুক ব্যক্তি যাকাত দিয়েছে অর্থ—সুস্থ ও সুসংবদ্ধ হয়েছে। অতএব 'যাকাত' হচ্ছে 'বরকত'—পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা-শুদ্ধতা-সুসংবদ্ধতা।[১]

'লিসানুল আরব' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ 'যাকাত' শব্দের মূল আভিধানিক অর্থঃ الطهارة والنماء والبركة والمدح : পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা।' এ সব কয়টি অর্থই কুরআন ও হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে।

ওয়াহেদী প্রমুখ বলেছেন ঃ বাহ্যত زكا এ মূলের আসল অর্থ হচ্ছে আধিক্য ও প্রবৃদ্ধি। আরবীতে বলা হয় ঃ

زَكَا الزَّرْعُ يَزْكُوْ زَكَاءً

কৃষিফসল বৃদ্ধি পেয়েছে—পেয়েছে যেমন করে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আর যে জিনিসই বৃদ্ধি পায়, তাই 'যাকাত' হয়।

আর কৃষিফসল ক্রমবৃদ্ধি পাওয়া কেবল তখনই সম্ভব, যখন তা আবর্জনামুক্ত হয়। তাই 'যাকাত' শব্দটিতে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার ভাবধারা বিদ্যমান।

ব্যক্তির গুণ বর্ণনায় 'যাকাত' শব্দ ব্যবহৃত হলে তা হবে সুস্থতা-সুসংবদ্ধতা অর্থে। তখন ব্যক্তির মধ্যে কল্যাণের আধিক্য হওয়া বোঝাবে। যেমন বলা হয় ঃ رجل زكى অর্থাৎ পবিত্র জাতির মধ্যে চরম মাত্রার কল্যাণসম্পন্ন ব্যক্তি। আর زكى القاضى الشهود বলা হবে যখন বিচারক সাক্ষ্য প্রমাণের অধিকতর কল্যাণ বর্ণনা করবে।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে 'যাকাত ব্যবহৃত হয় ধন-মালে আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ও ফরযকৃত অংশ বোঝাবার জন্যে। যেমন পাওয়ার যোগ্য-অধিকারী লোকদের নির্দিষ্ট অংশের ধন-মাল দেয়াকেও 'যাকাত' বলা হয়।

ধন-মাল থেকে এই নির্দিষ্ট অংশ বের করাকে 'যাকাত' বলা হয় এজন্যে যে, যে মাল থেকে তা বের করা হলো তদ্দরুন তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষেই তার মাত্রা ও পরিমাণ

---

১. المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٩٨-

বেড়ে যায়। তা বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পায়। ইমাম নববী ওয়াহেদী থেকেই এ কথা বর্ণনা করেছেন।[১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা বলেছেন ঃ সাদকায় দানকারীর মন ও আত্মা পবিত্র হয়, তার ধন-মাল বৃদ্ধি পায়, পরিচ্ছন্ন হয় এবং প্রকৃতপক্ষে পরিমাণে বেশী হয়।[২]

ক্রমবৃদ্ধি ও পবিত্রতা কেবল ধন-মালের মধ্যেই সাধিত হয় না। যাকাত দানকারীর মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত তা সংক্রমিত হয়। সম্ভবত এ দিকে লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

خُذْمِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا (التوبه- ١٠٣)

তুমি তাদের ধন-মাল থেকে সাদকা (যাকাত) গ্রহণ কর, তুমি তার দ্বারা তাদের পবিত্র করবে ও পরিচ্ছন্ন (প্রবৃদ্ধিমান) করবে।

আজহারী লিখেছেন—তা দরিদ্রকেও প্রবৃদ্ধি দান করে। দরিদ্রের জন্যে বস্তুগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবৃদ্ধি ব্যক্ত করে—এ শব্দটি এই অর্থের দিকে সুন্দর এক দৃষ্টিপাত বা ইংগিত করে। সেই সাথে ধনশালী ব্যক্তির মন ও সম্পদে প্রবৃদ্ধি সাধন করে—এ কথাও বোঝায়।

ইমাম নব্বী 'আল-হাভী' গ্রন্থ্ প্রণেতার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ তোমরা জানবে, 'যাকাত' আরবী শব্দ, ইসলামী শরীয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেও এই শব্দটি সর্বজন পরিচিত ছিল। জাহিলিয়াতের যুগের কাব্য ও কবিতায় তা ব্যবহৃত হয়েছে, এই ব্যবহারকে অনেক সময় দৃষ্টান্ত হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়।

দাউদ যাহিরী লিখেছেন ঃ অভিধানে এই নামের কোন ভিত্তি নেই। শরীয়াতের বিধান দ্বারাই তা প্রচলিত।

'আল-হাভী' প্রণেতা বলেছেন, এ কথাটি যদিও বিপর্যয়কারী, তবে যাকাতের বিধানে তার মধ্যকার মতদ্বৈধতা কিছুমাত্র প্রভাবশালী নয়।[৩]

এসব কথা জেনে নেয়ার পর প্রখ্যাত ইয়াহুদী প্রাচ্যবিদ—শাখ্ত-এর কথার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুবাদকৃত ইসলামী বিশ্বকোষে 'যাকাত' শব্দ সম্পর্কে লিখিত হয়েছে ঃ

---

১. আল্লামা যামাখশারী তাঁর 'আল-ফায়েক' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ 'যাকাত' সাদকা'র মতই একটা কাজ বিশেষ। এ একটা সমন্বিত অর্থজ্ঞাপক শব্দ। তার একটা অর্থ ঃ যাকাত বাবদ দেয়া ধনমালের একটা অংশ। আর দ্বিতীয় হল পরিচ্ছন্নতাকরণের কাজ। কুরআনের আয়াত والذين هم للزكوة فاعلون —এর অর্থ মূর্খতাবশত প্রথমটি মনে করার দরুন ভুল তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়েছে। আসলে এর অর্থ—যারা তাযকীয়া—পরিচ্ছন্ন পবিত্রতার কাজ করেছে।

২. مجموع فتوى- شيخ الامام ابن تيميه ج ٢٠ ص ٨-

৩. المجموع - ج ٥- ص ٣٢٥

নবী করীম (স) 'যাকাত' শব্দটি তার আভিধানিক অর্থের তুলনায় অনেক বেশী প্রশস্ত তাৎপর্যে ব্যবহার করেছেন। তিনি আসলে শব্দটির ইয়াহুদী ব্যবহার গ্রহণ করেছেন। (ইয়াহুদী ব্যবহারে এরমীয় শব্দ—যাকাত زاكوت মক্কা শরীফে زكواة বা زكاة রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। زكى মূল থেকে বিভিন্ন রূপ শব্দ গঠিত হয়, زكى অর্থ طهر পবিত্র হয়েছে। যাকাতের সাথে সম্পৃক্ত—আরবদের আভিধানিক অনুভূতির দিক দিয়ে, এসব বিভিন্নভাবে গড়া শব্দ কুরআনে ব্যবহৃত হয়ে সেই অর্থ দেয় না যা মূলত আরবী নয়। যা ইয়াহুদী ভাষা থেকে গৃহীত। তার অর্থ ঃ 'তাকওয়া।'[১]

শাখ্ত ও অন্য প্রাচ্যবিদগণ (Orientalists) ইসলামের চিন্তাধারা, তার পারিভাষিক শব্দ, বিধি-বিধান, তাৎপর্য ইত্যাদিকে ইয়াহুদী বা খৃস্টানদের উৎসের সাথে সম্পর্কিত দেখবার জন্য একটা চরম পাগলামিমূলক অহমিকায় নিমজ্জিত। তারা যেগুলোকে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোন-না কোন উৎস থেকে আসা বলে প্রমাণ করতে সব সময় সচেষ্ট থাকেন। আসলে এ ক্ষেত্রে তারা একটা অমূলক ধারণা দ্বারা চালিত। নিজেদের ইচ্ছেমতই তারা যা তা বলতেও কুণ্ঠিত নন। এ কথার জবাবে আমরা দুটি বিষয়ের অবতারণা যথেষ্ট বলে মনে করছি ঃ

প্রথমত, কুরআন মজীদ 'যাকাত' শব্দটি মুসলিম সমাজে পরিচিত অর্থেই ব্যবহার করেছে সেই মক্কী জীবনের প্রাথমিক সময় থেকেই। এ পর্যায়ে সূরা আল-আরাফ-এর ১৫৬ আয়াত, সূরা মরিয়মের ৩১ ও ৫৫ আয়াত, সূরা আল-আম্বিয়ার ৭২ আয়াত, সূরা আল-মুমিনুনের ৪ আয়াত, সূরা আন-নামলের ৩ আয়াত, সূরা আর-রুম-এর ৩৯ আয়াত, সূরা লুকমানের ৩ আয়াত, সূরা ফুস্সিলাত-এর ৭ আয়াত দ্রষ্টব্য।

আর নিশ্চিতরূপে বলা যায়, নবী করীম (স) ইব্রীয় ভাষা জানতেন না। আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতে পারা তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভবপরও ছিল না। ইয়াহুদীদের সাথে তার দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলামেশা সম্ভব হয়েছিল মদীনা শরীফে হিজরতের পর, তার পূর্বে নয়। তাহলে তিনি কুরআনের এসব মক্কী সূরার আয়াতে ব্যবহৃত 'যাকাত' শব্দ ইয়াহুদ বা ইয়াহুদী ভাষা থেকে কি করে গ্রহণ করতে পারেন? সুতরাং শাখ্ত-এর ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

দ্বিতীয়ত, দুই ভাষায় সমন্বিত অর্থের কোন শব্দ পাওয়া গেলে তা যথাযথ উদ্ধৃত করার কথা চিন্তা করা গবেষণা পদ্ধতি ও আলিমদের পরিণাম-চিন্তা-উদাসীন বিরোধী চরিত্রের ব্যাপার। একই অর্থের শব্দ হলে দুই ভাষার এক ভাষায় অপর ভাষা থেকে গ্রহণ করা কোন জরুরী ব্যাপার নয়।

তৃতীয়ত, দুই ভাষার মধ্যে একটিকে নকলকারী এবং অপরটিকে তা থেকে নকল করা হয়েছে মনে করা একটা যুক্তি বা প্রমাণহীন জবরদস্তি ব্যাপার। যা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য নয়, তাকেই অগ্রাধিকার দান করা। এ পদ্ধতিকে যারা অভ্যাস হিসেবে

১. دائرة المعارف الاسالاميه ج ١٠ ص٣٥٦

গ্রহণ করে, তাদের জ্ঞানের আমানতে খিয়ানত হয়ে যায় এবং আলিম চরিত্রের পরিপন্থী কাজ হয়, তাতে সন্দেহ নেই।

সাদকার অর্থ

কুরআন ও সুন্নাতের ভাষায় শরীয়াতসম্মত 'যাকাত' 'সাদ্‌কা' নামে অভিহিত। মা-ওয়ার্দী লিখেছেন ঃ সাদকা যাকাত, যাকাত সাদকা। নাম পার্থক্যপূর্ণ হলেও যে জিনিসের নামকরণ করা হয়েছে, তা এক ও অভিন্ন।[১]

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

خُذْمِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا (التوبه- ١٠٣)

তাদের ধন-মাল থেকে সাদকা গ্রহণ কর, তুমি তার দ্বারা তাদের পবিত্র করবে ও পরিচ্ছন্ন নির্মল করবে।

বলেছেন ঃ

وَمِنْهُمْ مِنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقْتِ فَاِنْ اُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَاِنْ لَّمْ يُعْطَواْ مِنْهَا اِذَاهُمْ يَسْخَطُوْنَ- (التوبة -٥٨)

এদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা সাদকাতের ব্যাপারে তোমাকে দোষী করে, তা থেকে তাদের দেয়া হলে তারা সন্তুষ্ট হয়। আর দেয়া না হলে তখন তারা হয় অসন্তুষ্ট।

اِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسكِيْنِ- (التوبه - ٦٠)

সাদকাত (যাকাত) ফকীর ও মিসকীনের জন্য ..... ।[২]

হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةَ اَوْسَقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ - (بخارى-مسلم)

---

১. الاحكام السلطانيه একাদশ অধ্যায়।

২. মরহুম মূসা 'শাখ্‌ত' ইউসুফ সম্পর্কে বিশ্বকোষ دائرة المعارف-এর টীকায় লিখেছেন ঃ 'কুরআন' সর্ব প্রথম যাকাতকে 'সাদকা' নামে ভূষিত করেছে। পরে 'যাকাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআনের মক্কী সূরা-সমূহ সম্মুখে রেখে চিন্তা করলে বোঝা যায় কুরআন সর্বপ্রথম 'যাকাত' শব্দটিকে ব্যবহার করেছে। 'সাদকা' বা 'সাদকাত' শব্দের ব্যবহার কেবলমাত্র মাদানীয় সমাজেই হয়েছে।'

পাঁচ অসক্ ফসলের 'সাদকা' নেই। তিন বছর থেকে দশ বছর বয়সের উষ্ট্রের পাঁচটির কমে সাদকা নেই। আর পাঁচ আওয়াকের (اواق) কমে সাদকা নেই।

হযরত মুয়ায (রা)-কে ইয়েমেনে প্রেরণ সংক্রান্ত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِىْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُمِنْ اَغْنِيَائِهِمْ-

তাদের জানিয়ে দাও যে, তাদের ধন-মালে আল্লাহ্ তা'আলা সাদকা ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনী লোকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে।

এ সব ঘোষণা ও অকাট্য বিধান 'যাকাত' সম্পর্কেই উদ্ধৃত হয়েছে, যদিও শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'সাদকা'। যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীকে 'মুসাদ্দিক'—'সাদকা আদায়কারী' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা সে সাদকা একত্র করে এবং বণ্টন করে।

তবে একথা সত্য যে, প্রচলন ও সাধারণ ব্যবহার 'সাদকা' শব্দটির উপর অনেক অবিচার করেছে। ফলে তা 'দান' অর্থদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা মানুষের ইচ্ছাধীন, যা প্রার্থী ও ভিখারীদের দেয়া হয়।

কিন্তু প্রচলিত ব্যবহার যেন আমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং কুরআন নাযিল হওয়া কালে আরবদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের মূল তত্ত্ব থেকে যেন আমরা বঞ্চিত হয়ে না থাকি, সেদিকে আমাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। আর 'সাদকা' শব্দটি সিদ্ক—সত্যতা থেকে গৃহীত।

কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী 'যাকাত'-কে 'সাদকা' নামে অভিহিত করা সম্পর্কে একটা দৃঢ় কথা বলেছেন। তাঁর কথা হল, এ শব্দটি মুখের কথা ও দিলের বিশ্বাসের অনুরূপ কাজ বোঝানোর জন্যে 'সিদ্কা' থেকে গৃহীত হয়েছে।

ص - د - ق এ তিনটি অক্ষর দ্বারা গঠিত শব্দ صدق একটি জিনিস দ্বারা অপর একটি জিনিস প্রমাণ করা ও তাকে শক্তিশালী করার দিকে ইংগিত করা বোঝায় صداق لامراة 'নারীর মোহ্রানা' বলতে বোঝায়, শরীয়াত অনুযায়ী বিয়ের মাধ্যমে অর্থের বিনিময়তার হালাল হওয়া এবং তার সত্যতা প্রমাণ করা।

শব্দটির রূপান্তর ঘটলে অর্থেও পার্থক্য ঘটবে। যেমন বলা হয়ঃ صدق فى القول صداقا وتصديقا 'সে সত্য কথা বলেছে, কথার সত্যতা প্রমাণিত করেছে, যেমন করে তা প্রমাণ করতে হয়।'

আর -

تَصَدَّقْتُ بِالْمَالِ تَصَدُّقًا ·

আমি অর্থ দান করেছি। যেমন করে তা দান করতে হয়।

اَصْدَقْتُ الْمَرْاَةِ اَصْدَاقًا

স্ত্রীটিকে আমি মোহরানা দিয়েছি, যেমন করে তা দিতে হয়।

শব্দের রূপান্তর বলতে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থের প্রতি ইংগিত করা বোঝায়। এ সিদ্‌ক বা সত্যতার সদৃশ শব্দ হচ্ছে 'সাদকা'। দ্বীনের সবচাইতে বেশী প্রত্যয়পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে, পরকালীন পুনরুত্থান সত্য। পরকালীন ঘরই হচ্ছে চূড়ান্ত পরিণতি। আর এ নিকটবর্তী ঘর পরকালে যাওয়ার সিঁড়ি। মন্দ কিংবা ভালোর দিকে যাওয়ার দ্বার—যার জন্যে সে কাজ করেছে। সে অগ্রে যা পাঠিয়েছে, তা-ই তথায় পাবে। এ ব্যাপারে সে সন্দেহ করলে বা সেজন্যে কাজ করায় আলস্য করলে, তার উপর পৃথিবীর জীবনকে অধিক গুরুত্ব দিলে সে তার ধন-মালে কার্পণ্য করবে, তার কামনা-বাসনা পূরণে প্রস্তুতি নিলে পরিণামের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না।[১]

আমি বলব, এ কারণেই আল্লাহ্ আ'আলা اعطاء দেয়ার ও تصدىق সত্য বলে মানা—এ দুইয়ের সমন্বয় করেছেন, যেমন সমন্বয় করেছেন কার্পণ্য ও মিথ্যা মনে করার মধ্যে নিম্নের আয়াতে ঃ

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى- وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى- فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى- وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى- وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى- فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى- (الليل- ٥-١٠)

অতএব যে দিল ও ভয় করল এবং জান্নাতকে সত্য বলে মেনে নিল, আমরা অবশ্যই তার জন্যে জান্নাত সহজলভ্য করে দেব। আর যে লোক কার্পণ্য করল—বেপরোয়া নীতি অনুসরণ করল এবং জান্নাতকে মিথ্যা মনে করল, তার জন্যে কষ্টের জাহান্নাম অবশ্যই সহজপ্রাপ্য করে দেব।

কাজেই 'সাদ্‌কা' ঈমানে সত্যতার প্রমাণ এবং বিচার দিনের সত্যতা যথার্থতার স্বীকৃতি। এ জন্যেই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

الصدقة برهان- (مسلم)

সাদকা অকাট্য দলীল।

কুরআন মজীদে যাকাত

কুরআন মজীদে 'যাকাত' শব্দটি বারবার উল্লিখিত হয়েছে একটি সর্বজন-পরিচিত শব্দ (معرفة) হিসেবে[২] ত্রিশটি আয়াতে। তন্মধ্যে সাতাশটি আয়াতে নামাযের সঙ্গে একত্র করে। একটি আয়াতে নামাযের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত হয়েছে। আয়তটি হচ্ছেঃ

---

১. احكام القران - ق ٢- ص ٩٤٦.

২. মাত্র দুটি আয়াতে 'অপরিচিত' (نكره) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্ন অর্থে। একটি সূরা কাহাফে, অপরটি সূরা মরিয়ামে।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ - (المؤمنون- ٤)

আর যারা 'যাকাত' দানে সক্রিয়। এরই পূর্বে রয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ- (المؤمنون-٢)

যারা তাদের নামাযে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিমগ্ন।

অবশিষ্ট যে ত্রিশটি আয়াতে 'যাকাত' শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে, তন্মধ্যে আটটি হচ্ছে মক্কী সূরার আয়াত। আর সবকয়টিই মাদানী সূরায় রয়েছে।[১]

কোন কোন গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনের ৮২টি আয়াতে 'যাকাত' শব্দটির নামাযের সাথে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু এটা খুব বাড়াবাড়ি মনে হয়। উপরে উল্লিখিত গণনা তার প্রতিবাদ করে। তারা যদি বলে যে, 'যাকাত' বলতে সে সবই বোঝায়, যাতে 'ব্যয়' করা সম্পর্কে বলা হয়েছে—যেমন طعام المسكين ও ماعون মিসকীনের খাবার প্রভৃতি, তাহলে বলব এ সংখ্যাটি সুসংবদ্ধ নয়। বাহ্যত মনে হয়, ৩২ সংখ্যাকে ভুল বশত ৮২ লিখা হয়েছে।

আর 'সাদকা' الصدقة এবং 'সাদকাত' الصدقات শব্দটি কুরআনে ১২টি বার এসেছে। এ সবই মাদানী সূরায়।

---

১. المعجم القهرس لالفاظ القران الكريم এ 'যাকাত' শব্দ দ্রষ্টব্য—মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী লিখিত।

প্রথম অধ্যায়

যাকাত ওয়াজিব ঃ ইসলামে তার স্থান

প্রাচীন সভ্যতায় দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থা

দরিদ্রদের প্রতি কল্যাণকরণে আসমানী ধর্মসমূহের উদারতা

মক্কী পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্রদের প্রতি ইসলামের সহানুভূতিমূলক অবদান

মক্কী জীবন পর্যন্ত শুধু যাকাতের উৎসাহ দান

সুনির্দিষ্ট পরিমাণে যাকাত ফরয ঘোষণা—মাদানী যুগে

ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব ও স্থান

যে তা দিতে অস্বীকার করে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

ইসলামের যাকাত ও অন্যান্য ধর্মের কল্যাণকর কাজের মধ্যে পার্থক্য

যাকাত সম্পর্কে শাখ্ত-এর বিভিন্ন ধারণার সমালোচনা

শুরু কথা

দ্বীন-ইসলামে 'যাকাত' ফরয হওয়া এবং তার গুরুত্ব ও স্থান সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে ইসলাম-পূর্ব সমাজে দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণী লোকদের কি অবস্থা ছিল তার বিশ্লেষণ দেয়া সমীচীন মনে হচ্ছে। প্রাচীন কালের ধর্মবিধান তাদের প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যার সমাধানে কতটা অবদান রেখেছে, সেই বর্ণনাও এ প্রসঙ্গে উপস্থাপন আবশ্যক। এই অধ্যয়নে জানা যাবে যে, এহেন গুরুত্বপূর্ণ দিকটির সংশোধনে ইসলাম অন্যান্য সর্ব প্রকার ধর্ম ও মতকে অতিক্রম করে গেছে। শুধু তাই নয়, ইসলাম এর মৌলিক সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছে। ইসলাম সুবিচারের ভিত্তি স্থাপনের সাথে সাথে সামাজিক-সামষ্টিক নিরাপত্তা দানেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ইসলামের এই অবদান দৃঢ় ভিত্তিক, তার স্তম্ভসমূহ অত্যন্ত মজবুত। কুরআন মজীদ এর অবতারণা করেছে এবং রাসূলের হাদীস বা সুন্নাত তার রূপায়ণ করেছে।

প্রাচীন সভ্যতার দরিদ্র সমাজ

মানুষ অতীব প্রাচীনকাল থেকেই দারিদ্র্য ও অধিকার বঞ্চনার সাথে মুকাবিলা করে এসেছে। দূর অতীতকালের ইতিহাসে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানবতার উল্লেখ বিদ্যমান। সত্য কথা হচ্ছে, মানব সভ্যতা কোন এক যুগেও এমন সব লোক থেকে শূন্য ছিল না, যারা মানবতাকে আহ্বান জানাতে সতত কর্তব্যরত ছিল। মানবতাকে দারিদ্র্য ও বঞ্চনার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা আজকের দিনে কোন নতুন কথা নয়।

তবে দরিদ্র জনগণ খুবই মর্মান্তিক অবস্থার সম্মুখীন হয়ে রয়েছে চিরকাল। মানবতার ললাটদেশে তা ছিল একটা কলংক টিকা। এ যুগের মনীষী-বিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকগণ সমাজকে যে উপদেশ দিয়েছেন, সমাজ তা কখনই গ্রাহ্য করেনি।

এখানে একজন খ্যাতনামা গ্রন্থকারের উল্লেখ করা যায়।[১] তিনি সেই প্রাচীনকাল থেকেই এ কালো ইতিহাসকে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। সব-পাওয়া ধনী ও সর্বহারা দরিদ্রের মধ্যকার এই ইতিহাস খুবই মর্মস্পর্শী। তিনি লিখেছেন ঃ

'প্রাচীনকালের জাতিসমূহের ইতিহাসে গ্রন্থকার যেখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, দেখতে পেয়েছেন, মানুষ মাত্র দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এ দুয়ের মাঝে তৃতীয় শ্রেণীর কোন অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়নি। শ্রেণী দুটি হচ্ছে ঃ ধনী ও দরিদ্র। এর পশ্চাতে

১। তিনি উস্তাদ আল্লামা মুহাম্মাদ ফরীদ ওজদী ١٨١-١٧٩ الاسلام دين عالم خالد طبع اول ص দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্য যোগ্য ব্যাপার ছিল, ধনী শ্রেণীর স্ফীতি সীমা ছাড়িয়ে গেছে আর দরিদ্র শ্রেণী ক্ষীণ হতে হতে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তেলহীন প্রদীপের ন্যায় নিভু নিভু জীবন প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে মাত্র। এরূপ দুর্বলতার ভিত্তির উপর সমাজ-প্রাসাদের ভিত্তি সংস্থাপিত। ধনী সুখী শ্রেণী কোন্ দিক থেকে যে তাদের মাথার উপর ছাদ ধ্বসে পড়বে, তা ভাবতেও সক্ষম নয়। প্রাচীন মিসর ছিল পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র জান্নাত। তথায় যে ফসল ও খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হত তা সেখান কার অধিবাসীদের কয়েকগুণ বেশী লোকের জন্য যথেষ্ট হত। কিন্তু সেখানকার দরিদ্র শ্রেণী খাবার থেকে বঞ্চিত ছিল। কেননা ধনী শ্রেণীর লোকেরা তাদের জন্যে নিতান্ত উচ্ছিষ্ট বা তলানী ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখতো না। আর তা খেয়ে তাদের জীবন ধারণ ছিল অসম্ভব।

দ্বাদশ পরিবারের রাজত্বের আমলে যখন মারাত্মক ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তখন দরিদ্ররা ধনীদের কাছে নিজেদের বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হল। আর তারা তখন সুযোগ পেয়ে দরিদ্রদের চরমভাবে গ্রাস করে ফেলল এবং অমানুষিক আযাব ও নির্যাতন-নিষ্পেষণে তাদের জর্জরিত করে দিল।

ব্যাবিলনেও দরিদ্রদের অবস্থা মিসরের মতই ছিল। তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির কোন ফল দরিদ্রদের ভাগ্যে জুটত না, যদিও প্রবৃদ্ধি ও উৎসর্গতায় তারা ফিরাউনের দেশের তুলনায় কিছুমাত্র পশ্চাদপদ ছিল না। সেখানকার ঝরণাসমূহ পারস্য পর্যন্ত প্রবাহিত হত। প্রাচীন গ্রীক সমাজের অবস্থা এ থেকে ভিন্নতর কিছু ছিল না বরং কোন কোন রাজত্বকালের এমন ঘটনা ইতিহাসে উদ্ধৃত হয়েছে, যা অন্তরে কম্পন এবং দেহে লোমহর্ষণ সৃষ্টি করে। দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের তারা অত্যন্ত হীন কাজে নিয়োজিত করত এবং সামান্য কারণে ছাগল যবেহ করার ন্যায় তাদের যবেহ করত।

স্পার্টার শাসন আমলে দরিদ্র শ্রেণীর লোকদেরকে সম্পূর্ণ অনুর্বর ও অ-আবাদযোগ্য জমিতে চাষাবাদের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেখানে তারা প্রাণপণ পরিশ্রম করেও খাদ্যোৎপাদনে অক্ষম থেকে যায় এবং তারা না খেয়ে থাকতে ও মরতে বাধ্য হয়।

আবিসিনীয়ায় ধনী শ্রেণীর লোকেরা দরিদ্রের উপর এমনভাবে শাসন ও প্রশাসন চালাত যে, তারা তাদের ঠিক ক্রীতদাসের মত হাটে-বাজারে বিক্রয় করে দিত যদি তাদের উপর ধার্যকৃত কর ও র‍্যালটি দিতে অক্ষম হয়ে পড়ত।

রোম ছিল আইন-বিধানের কেন্দ্রভূমি। বড় বড় আইনবিদ ও আইনের মূলনীতি-বিদদের অধিবাস ও অবস্থান ছিল এখানে। ধনী শ্রেণীর লোকেরাই জনগণের উপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সাধারণ মানুষ থেকে তারা অত্যন্ত ভিন্নতর ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিল, আর তাদের অন্তরালে সাধারণ মানুষ ছিল সবদিক দিয়ে পরিত্যক্ত, অবহেলিত ও পদদলিত। তাদের তারা কিছুই দিত না। তারা যখন খুব বেশী দুর্বল হয়ে পড়ত, তখন তারা শহর-নগর ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হত।

এ দিক দিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে 'মিশলিয়া' লিখেছেনঃ

> দরিদ্ররা প্রতিদিন দরিদ্রতর হয়ে যেত, ধনীরা ক্রমশ অধিকতর ধনশালী হয়ে যেত। তারা বলত, দেশের সব লোক ধ্বংস হোক, না খেয়ে মরুক। তাহলে তারা আর যুদ্ধের ময়দানে যেতে পারবে না।[১]

রোমান সম্রাজ্যের পতনের পর তার সমাধির উপর যখন ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ গড়ে উঠল, তখন দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থা আরও মারাত্মক ও মর্মান্তিক হয়ে পড়ল। তখন তারা তাদের অঞ্চলে তাদের জমি-ক্ষেতসহ ঠিক গরু-ছাগলের মত ক্রয়-বিক্রয় হত।

প্রাচীন সুদীর্ঘকালের দরিদ্র সমাজের এটাই হল ইতিহাস। ধনী লোকদের ভূমিকা এ সমস্ত কালে এক ও অভিন্ন ছিল। এক্ষণে প্রশ্ন জাগে যে, এরূপ অবস্থায় দরিদ্রদের মুক্তি এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা বিলোপের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের কি ভূমিকা ছিল?

দরিদ্রের ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মের ভূমিকা

সত্য কথা এই যে, দুনিয়ার সব ধর্মই—মনগড়া ধর্ম ব্যবস্থাসমূহ ও কোন আসমানী কিতাবের সাথে যে-সব ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই—মানব সমাজের এ দিকটির প্রতি যথাসাধ্য দৃষ্টিপাত করেছে। কেননা এ ছাড়া সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও পবিত্র জীবনের ভাবধারা প্রবহমান হতে পারে না।

চার হাজার বছর পূর্বে দুটি খালের মাঝে অবস্থিত দেশগুলোতেও আমরা তাই দেখতে পাই। সর্বপ্রথম শরীয়াতের বিধান ও আইন হাম্বুরাবীর মাধ্যমে পাওয়া যায়। তিনি প্রথম বিধানের সম্বর্ধনা পর্যায়ে বলেছিলেনঃ

> আল্লাহ্গণ তাকে পাঠিয়েছেন দুর্বল লোকদের উপর নিগ্রহ-নির্যাতন চালানো থেকে শক্তিশালীদের বিরত রাখার উদ্দেশ্যে, জনগণকে হিদায়েতের পথ দেখাতে এবং সুযোগ-সুবিধাকে সাধারণের জন্যে নিরাপত্তাপূর্ণ করে দেয়ার লক্ষ্যে।

কয়েক হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন মিসরের জনগণ এ দিক দিয়ে সচেতন ছিল যে, তারা যখন বলত ঃ আমি ক্ষুধার্তকে খাবার দিয়েছি, বস্ত্রহীনকে পোশাক দিয়েছি, যারা নদী পার হতে পারছিল না, তাদের আমার নৌকায় পার করে দিয়েছি, আমি ইয়াতীমের পিতা হয়েছি, বিধবার স্বামী হয়েছি এবং প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটায় ছিন্ন-ভিন্ন লোকদের সংরক্ষণকারী হয়েছি—তখন তারা ঠিক ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করছিল।[২]

আসমানী ধর্মসমূহের অবদান

তবে আসমানী ধর্মসমূহের দরিদ্র ও দুর্বল লোকদের কল্যাণের জন্যে যে দাওয়াত ছিল, তা ছিল অধিকতর বলিষ্ঠ ও গভীর প্রভাবশালী। অন্যান্য মানবীয় দর্শনের তুলনায় সে সবের অবদান ছিল অসামান্য। মানব রচিত ধর্মমত বা বৈষয়িক ধর্মবিশ্বাস অনুরূপ

---

১. من محاضرات: الدكتور كارل شويضز فى حاقة الدراسات الاجتماعية

২. المؤتمر الاول لمجمع البحوث الاسلامية- ص ٣٤١

অবদান রাখতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। কুরআন 'যাকাত' নামে যে জিনিসকে অভিহিত করেছে, কোন নবী-রাসূলের দাওয়াত এ মানবিক দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে পারে নি।

এ পর্যায়ে যখন আমরা কুরআন মজীদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, —এ কুরআনই হচ্ছে বিশ্বমানবতার জন্যে সর্বশেষ ও অবশিষ্ট নির্ভরযোগ্য ও সহীহ্তম দলীল—তখন আমরা দেখতে পাই, হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِ نَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةِ
وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ- وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ- (الانبياء- ٧٣)

আমরা তাদের ইমাম (নেতা) বানিয়েছি, তারা আমার বিধান অনুযায়ী চলে এবং আমরা তাদের প্রতি ভালো-ভালো কাজ, নামায কায়েম করা ও যাকাত দেয়ার জন্যে ওহী পাঠিয়েছি। আর তারা বস্তুতই আমাদের ইবাদতকারী ছিল।

হযরত ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرْ فِىْ الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِوكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيًّا- وَكَانَ
يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ- وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا- (مريم ٥٤-٥٥)

কিতাবে ইসমাইলের কথা স্মরণ কর। সে ওয়াদা সত্যপ্রমাণকারী ছিল। ছিল রাসূল, নবী। সে তার জনগণকে নামায পড়ার ও যাকাত দেযার জন্যে নির্দেশ দিত। আর সে তার আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দ, সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ছিল।

বনূ ইসরাঈলীদের সাথে চুক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لَاتَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ- وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا....
وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوْالزَّكٰوةَ...... (البقرة-٨٣)

আর স্মরণ কর, আমরা যখন বনূ ইসরাইলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এই বলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করবে না, পিতামাতার সাথে আন্তরিকভাবে....... ভালো ব্যবহার করবে ...... নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও......

অপর এক সূরায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَخَذَا اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ- وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا-
وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ- لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ

وَعَزَّرْ تُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَاالْاَنْهٰرُ-فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ - (المائدة ١٢)

আল্লাহ্ তা'আলা বনূ ইসমাইলের কাছ থেকে চুক্তি গ্রহণ করেছেন। আমরা তাদের মধ্য থেকে বারজন দল-প্রধান প্রেরণ করলাম। আর আল্লাহ্ বলেন, আমি তোমাদের সাথেই রয়েছি যদি তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আমার নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান আন, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা কর, আর আল্লাহ্কে 'করযে হাসানা' দাও, তাহলে আমি তোমাদের থেকে তোমাদের সব খারাপ ও দোষ দূর করে দেব এবং তোমাদের সেই জান্নাতে দাখিল করে দেব, যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা সতত প্রবহমান। আর যে কুফর করবে এরপর, সে তো সঠিক সরল পথ হারিয়ে ফেলল।

হযরত ঈসা (আ) দোলনায় থাকাকালেই বলেছিলেন ঃ

وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا- (مريم-١٣)

এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন নামায ও যাকাত সম্পর্কে যদ্দিন আমি জীবিত থাকব।

সাধারণ আহ্লি কিতাব সম্পর্কে আল্লাত্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُواالزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ- (البينة ٥)

তাদের শুধু এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা একমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করবে, তারই জন্যে আনুগত্যকে খালেস করে একমুখী হবে। আর তারা নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। আর এ-ই হচ্ছে স্থির-সঠিক সুদৃঢ় দ্বীন।

আমরা যখন তওরাত ও ইনজীল—পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম—দেখি—যা আমাদের সামনেই রয়েছে—তখন তাতে দুর্বল ও দরিদ্র লোকদের প্রতি সহৃদয়তা ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ গ্রহণের বহু আদেশ ও নির্দেশ দেখতে পাই। বিধবা, ইয়াতীম ও দুর্বল-অক্ষম লোকদের অধিকার আদায়ের জন্যে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আদিপুস্তকে বলা হয়েছে ঃ

যে দরিদ্রের ক্রন্দনে কর্ণরোধ করে সে আপনিই ডাকিবে কিন্তু উত্তর পাইবে না। গুপ্তদান শান্ত করে ক্রোধ আর বক্ষ স্থলে দত্ত উপঢৌকন শান্ত করে প্রচণ্ড ক্রোধ।
(হিতোপদেশ ঃ ২১ ঃ ১৩, ১৪)

সুনয়ন ব্যক্তি আশীর্বাদযুক্ত হইবে; কারণ সে দীনহীন লোককে আপন খাদ্যের অংশ দেয়। (পূর্বোক্ত ঃ ২২ ঃ ৯)

যে দরিদ্রকে দান করে সে পরমুখাপেক্ষী হয় না। আর যে তার চক্ষুদ্বয় আড়াল করে, তার উপর অশেষ অভিসম্পাত। (পূর্বোক্ত ঃ ২৭)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

তোমার ভাইদের মধ্যে কেউ দরিদ্র হলে, তোমার দরজায় কোন দরিদ্র এলে—তোমার দেশে যা, তোমার আল্লাহ্ সদাপ্রভু তোমাকে দিয়েছেন তার প্রতি তোমার মন কঠিন করিও না। তোমার দরিদ্র ভাই থেকে তোমার হাত গুটিয়ে নিও না। বরং তার জন্য উন্মুক্ত কর তোমার হস্ত। তাকে ঋণ দাও, যতটা তার প্রয়োজন সেই পরিমাণ দাও তাকে। দেওয়ার সময় তোমার মন যেন খারাপ হয়ে না যায়। কেননা এ কাজের দরুন তোমার আল্লাহ্ সদাপ্রভু তোমাকে বরকত দেবেন। তোমার সব কাজে এবং সেইসব ক্ষেত্রে, যেদিকে তোমাকে হাত প্রসারিত করবে। কেননা পৃথিবীতে দরিদ্রদের কখনও হারাবে না। এ জন্যে আমি তোমাদের উপদেশ দিয়ে বলছি ঃ তোমার দরিদ্র ভাইয়ের জন্যে তোমার হস্ত উন্মুক্ত কর তোমার নিজ দেশে। (দ্বিতীয় বিবরণ ঃ ১৫ ঃ ৭,৮)

বলা হয়েছে ঃ

তুমি তোমার বীজ হইতে উৎপন্ন যাবতীয় শস্যের বীজ বৎসর বৎসর যাহা ক্ষেতে উৎপন্ন হয়, তাহার দশমাংশ পৃথক করিবে। (পূর্বোক্ত ঃ ২২)

তৃতীয় বৎসরের শেষে তুমি সেই বৎসরে উৎপন্ন আপন শস্যাদির যাবতীয় দশমাংশ বাহির করিয়া আনিয়া আপন নগর-দ্বারের ভিতরে সঞ্চয় করিয়া রাখিবে।

তাহাতে তোমার সাথে যাহার কোন অংশ কি অধিকার নাই, সেই লেবীয় এবং বিদেশী, পিতৃহীন ও বিধবা, তোমার নগর-দ্বারের মধ্যবর্তী এই সকল লোক আসিয়া ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে; এইরূপে যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তকৃত সমস্ত কর্মে তোমাকে আশীর্বাদ করেন।

বলা হয়েছেঃ

তোমরা যা কিছু সব বিক্রয় কর এবং সাদকা দাও। (১৩ ঃ ৩৩)

যাহার দু'খানা কাপড় সে যেন যার নাই তাহাকে দেয়। যাহার খাদ্য আছে সেও যেন তাহাই করে। (১৪ ঃ ১০)

বরং ভিতরে যাহা আছে, তাহা দান কর, আর দেখ, তোমাদের পক্ষে সকলই শুচি। (লূকঃ ১১ ঃ ৪১)

তুমি যখন মধ্যাহ্নভোজ কিংবা রাত্রিভোজ প্রস্তুত কর, তখন তোমার বন্ধুগণকে বা তোমার ভ্রাতাদিগকে বা তোমার জ্ঞাতিদিগকে কিংবা ধনী প্রতিবেশীগণকে ডাকিও না; কি জানি তাহারাও তোমাকে পাল্টা নিমন্ত্রণ করিবে, আর তুমি প্রতিদান পাইবে।

কিন্তু তুমি যখন ভোজ প্রস্তুত করিবে তখন দরিদ্র, লুলা, খঞ্জ ও অন্ধদিগকে নিমন্ত্রণ করিও, তাহাতে ধন্য হইবে, কেননা তোমার প্রতিদান করিতে তাহাদের কিছুই নাই, তাই ধার্মিকগণের পুনরুত্থান সময়ে তুমি প্রতিদান পাইবে। (লুক–১৪ ঃ ১২ ঃ ১৪)

পরে তিনি চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন, ধনবানেরা ভাণ্ডারে আপন-আপন দান রাখিতেছে। আর তিনি দেখিলেন, একটি দীনহীনা বিধবা সেই স্থানে দুটি সিকি পয়সা রাখিতেছে; তখন তিনি কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, এই দরিদ্র বিধবা সকলের অপেক্ষা অধিক রাখিল, কেননা ইহারা সকলে আপন আপন অতিরিক্ত ধন হইতে কিছু কিছু দানের মধ্যে রাখিল কিন্তু এ নিজ অনটন সত্ত্বেও ইহার যাহা কিছু ছিল, সমুদয় জীবনোপায় রাখিল।

যে তোমার কাছে যাচ্ঞা করে তাহাকে দাও, এবং যে তোমার কাছে ধার চায় তাহা হইতে বিমুখ হইও না।

সাবধান, লোককে দেখাইবার জন্য তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদের ধর্ম কর্ম করিও না, করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে তোমাদের পুরস্কার নাই।

অতএব তুমি যখন দান কর, তখন তোমার সম্মুখে তুরি বাজাইও না, যেমন কপটরা লোকের কাছে গৌরব পাইবার জন্য সমাজ-গৃহে ও পথে করিয়া থাকে। আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে।

কিন্তু তুমি যখন দান কর, তখন তোমাদের দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে তাহা তোমার বাম হস্তকে জানিতে দিও না। এইরূপে তোমার দান যেন গোপনে হয়, তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন।

(মথি , ৬ ঃ ৪-১)

আর যে কেহ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে কোন একজনকে শিষ্য বলিয়া কেবল এক বাটি শীতল জল পান করিতে দেয়, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, সে কোন মতে আপন পুরস্কার বঞ্চিত হইবে না। (মথি, ১০ ঃ ৪২)

পর্যালোচনাঃ

দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ লোকদের ব্যাপারে প্রাচীন ধর্মসমূহ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার কিছুটা উজ্জ্বল নমুনা উপরে উদ্ধৃত হল। কুরআনের পূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহের এটাই ছিল দাওয়াত।

কিন্তু এখানে কতিপয় বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলে মনে করছি ঃ

১. এ সব উদ্ধৃতি থেকে এ কথা স্পষ্ট জানা গেল যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ দরিদ্রদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্যে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছে। স্বার্থপরতা ও কার্পণ্যের পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়েছে এবং ব্যক্তিগত ও ইচ্ছামূলকভাবে দান সাদকা করার জন্যে স্পষ্ট বলিষ্ঠ আহ্বান পেশ করেছে।

২. তবে এগুলো এই কাজকে কর্তব্য ও বাধ্যতামূলক করার দিক দিয়ে উচ্চতর মানে উন্নীত হতে পারে নি। এসব কাজ না করলেও দ্বীনের কোন মৌলিক কাজ ত্যাগ করা হয়েছে বলে এসব কথা দ্বারা অনুভূতি জেগে উঠে না এবং তদ্দরুন ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করবেন, সে কথাও তা থেকে জানা যায় না।

৩. এই কাজকে ব্যক্তির খুশী—ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাদের মনকে এদিকে উৎসাহিত করতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের উপর এই কাজ করানোর জন্যে রাষ্ট্রকে কোন কর্তৃত্ব দেয়া হয়নি। না সংগ্রহ ও আদায় করার জন্যে, না তা বণ্টন করার জন্যে।

৪. সাদকা ও দান করার কাজ কর্তব্য হওয়ার জন্যে ধন-মালের কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। তার জন্যে কোন শর্তও আরোপ করা হয়নি। কত পরিমাণ দিতে হবে, তাও অনির্ধারিতই রয়ে গেছে। এর ফলে রাষ্ট্র তা আদায় করে নেয়ার কোন দায়িত্ব বুঝতে পারে না। কেননা যার পরিমাণ নির্ধারিত নয়, সীমা অনির্দিষ্ট, তা আদায় করা রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব।

৫. দরিদ্রদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান তার লক্ষ্য নয়। দারিদ্র্য মূল্যোৎপাটিত করাকে লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। দারিদ্র্যকে মালিকদের মুখী করে দেয়ারও কোন ইচ্ছা নেই বরং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শুধু তাদের দুরবস্থার মাত্রা হ্রাস করা এবং তাদের ফরিয়াদের ধ্বনিকে ক্ষীণ করা মাত্র।

এই প্রেক্ষিতে আমরা বলতে চাই দরিদ্র ও দুর্বল লোকেরা সক্ষম ধনী শ্রেণী লোকদের দয়া ও অনুগ্রহের অধীন বেঁচে থাকত। যখন তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রেম, পরকালের ভয় জাগত কিংবা জনগণের কাছ থেকে প্রশংসা ও খ্যাতি লাভের ইচ্ছা জাগত, ঠিক তখনই তারা কিছু দান করত—পরিমাণ তার যত সামান্যই হোক-না-কেন, দুর্বল ও দারিদ্র্য জর্জরিত লোকেরা ঠিক তখনই ধনীদের কাছ থেকে কিছু একটা পেতে পারত। তখন এই ধনীরা বড় দাতা ও বদান্যতাসম্পন্ন লোক বলে প্রশংসিত হয়। কিন্তু তারা যখন ধন-প্রেম ও স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে যেত, তখন দরিদ্রদের ছটফট করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া ছাড়া কোন পরিণতি হত না। দারিদ্র্যের থাবা তাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। তা থেকে আত্মরক্ষা করার মত কোন অবলম্বনই তাদের ছিল না। অধিকারের দাবি তোলার সামর্থ্যও ছিল না তাদের। কেননা তাদের কোন অধিকার স্বীকৃত ও সুপরিজ্ঞাত ছিল না। এই অনুগ্রহদানের ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

দারিদ্র বিমোচনে ইসলামের অবদান

দারিদ্র বিমোচনে ইসলামের ভূমিকা এবং দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত ও দুর্বল-অক্ষম লোকদের প্রতি কর্তব্য পালনে ইসলামের যে নীতি ও অবদান; কোন আসমানী ধর্ম বা মানব রচিত

বিধানই তার সমতুল্য হতে পারে না। শুধু লালন ও শিক্ষণ প্রশিক্ষণের দিক দিয়েই হোক কিংবা আইন প্রণয়ন ও সংগঠন গড়ে তোলার দিক দিয়েই হোক আর বাস্তবায়ন ও কার্যকরকরণের দিক দিয়েই হোক—কোন একটি দিক দিয়েও ইসলামের সাথে অন্য কিছুরই তুলনা হতে পারে না।

মক্কী যুগ থেকে কুরআনের ভূমিকা

দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে ইসলাম যে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে, গরীব জনগণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছে, ইসলামের শুভ সূর্যোদয়কালীন মক্কা শরীফস্থ অবস্থাই তার বড় প্রমাণ। তখন মুসলমান ছিল আংগুলে গণনা করা কয়েকজন ব্যক্তি মাত্র। দ্বীন-ইসলাম কবুল করার কারণে তারা ছিল কঠিনভাবে বিপদগ্রস্ত। দ্বীনের দাওয়াত দানে তারা ছিল প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন। তাদের হাতে রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক শক্তি বলতে কিছুই ছিল না। তখনও এই মানবিক সামষ্টিক—গরীব-মিসকীনদের ব্যাপারটি খুব বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। কুরআন মজীদ তার জন্যে বিশেষ ও স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কুরআন মজীদ এ পর্যায়ে কখনও মিসকীনকে খাদ্য দান ও সেজন্যে অন্যদের উৎসাহিতকরণের গুরুত্ব দিয়েছে, কখনও আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় ও বণ্টনের কথা বলে উৎসাহিত করেছে; কখনও বলেছে, এ হচ্ছে প্রার্থী, বঞ্চিত মিসকীন ও নিঃসম্বল পথিকের অধিকার আদায়, কোথাও স্পষ্ট ভাষায় 'যাকাত' দেয়ার তাকীদ করেছে। বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন শিরোনামে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন মজীদ থেকে এ পর্যায়ে কতিপয়ের আয়াত এখানে উদ্বৃত করা হলে আমাদের পূর্বোক্ত কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

মিসকীনকে খাবার দেয়া ঈমানের অংগ

সূরা 'আল-মুদ্দাস্‌সির' প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। তাতে কিয়ামতের দিনের চিত্র অংকিত হয়েছে। দক্ষিণ বাহুপন্থী মু'মিনগণ অপরাধী কাফির ও অমান্যকারীদের সম্পর্কে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করেছে; এদের জন্যে তো জাহান্নাম নির্ধারিত করা হয়েছে। তাদের উপর কি ধরনের আযাব এসেছে, কি কি কারণে সে আযাবে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তা-ই হচ্ছে তাদের জিজ্ঞাস্য। দেখানো হয়েছে যে, তাদের আযাবের মূল কারণ হচ্ছে মিসকীনদের অধিকারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও বস্ত্রহীনতার আগুনে তাদের দগ্ধ হওয়ার জন্যে ছেড়ে দেয়া ও তাদের এই মর্মান্তিক অবস্থা বিদূরণে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বলা হয়েছেঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ- اِلاَّ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ فِىْ جَنّٰتٍ يَتَسَاءَلُوْنَ-
عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ- مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ- قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ- وَلَمْ نَكُ

نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ- وكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ- وكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ-
(المدثر-٣٨-٤٦)

প্রতিটি প্রাণী স্বীয় উপার্জনের বিনিময়ে রেহেনবন্দী—দক্ষিণ বাহুওয়ালা লোকদের ব্যতীত। তারা তো জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখানে তারা অপরাধী লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে ঃ কোন্ জিনিসটি তোমাদের জাহান্নামে নিয়ে গিয়েছে, তারা বলবে ঃ আমরা নামায পড়া লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না, মিসকীনদের খাবার খাওয়াতাম না। আর প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে কথা রচনাকারীদের সাথে মিলিত হয়ে আমরাও অনুরূপ কথাবার্তা রচনার কাজে মশগুল হয়েছিলাম। সেই সাথে প্রতিফল দেয়ার দিনটিকেও আমরা অসত্য মনে করতাম।

মিসকীনদের পোশাক দান, আশ্রয় দান এবং তাদের প্রয়োজন ও অভাব-অনটন বিদূরণ প্রভৃতিও এই 'খাদ্যদান' (اطعام) কথাটির অন্তর্ভুক্ত।

সূরা 'আল-কলম'-এর ভাষণে আল্লাহ্ তা'আলা সেই বাগান মালিকদের কিস্‌সা বর্ণনা করেছেন, যারা রাত্রিকালেই ফল আহরণের ওয়াদা পরস্পরে করেছে, যেন ফল পাড়ার সময় দরিদ্ররা যে স্বভাবতই ভিড় জমায় ও তা থেকে অংশ পেতে চায়, তার সুযোগটা না আসে বরং তারা যেন বঞ্চিতই থেকে যায়। কিন্তু আল্লাহ্র আযাব খুব শিগগিরই তাদের গ্রাস করে ফেলল।

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ- فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ- فَتَنَا دَوْا مُصْبِحِيْنَ- اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ- فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ- اَنْ لاَّيَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ- وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ-فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْا اِنَّا لَضَالُّوْنَ- بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ- قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُوْنَ- قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ- فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلاَوَمُوْنَ- قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ- عَسٰى رَبُّنَا اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ- كَذٰلِكَ الْعَذَابُ- وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ- (القلم- ١٩-٣٣)

রাতের বেলা তারা নিদ্রামগ্ন ছিল। এই সময় তোমার আল্লাহ্র কাছ থেকে একটি বিপদ সেই বাগানের উপর আপতিত হল এবং তার অবস্থা যেন কর্তিত ফসলের মত হয়ে গেল।

সকালবেলা তারা পরস্পরকে ডাকল যে, ফল পাড়তে হলে খুব সকাল-সকালই ক্ষেতের দিকে রওয়ানা হয়ে চল। অতঃপর তারা রওয়ানা হয়ে গেল। তারা পরস্পর চুপে চুপে (কথা) বলতে বলতে চলছিল যে, আজ যেন কোন ভিখারী তোমাদের কাছেও ঘেঁষতে না পারে; তারা কাউকে কিছু না দেয়ার সিদ্ধান্ত করে খুব ভোরে ভোরে তাড়াহুড়া করে সেখানে এমনভাবে উপস্থিত হল যেন তারা ফল পাড়তে খুব সক্ষম। কিন্তু বাগানটি যখন তারা দেখল, তারা বলতে লাগল, আমরা নিশ্চয় পথ ভুলে গেছি। না, বরং আমরা বঞ্চিত রয়ে গেছি। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম ছিল, সে বলল, আমি কি তোমাদের বলি নি যে, তোমরা তসবীহ্ করো না কেন? .. তারা উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলঃ মহান পবিত্র আমাদের রব্! আমরা সত্যই বড় গুনাহ্গার ছিলাম। পরে তারা পরস্পরকে তিরস্কার করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা বললঃ আমাদের অবস্থার জন্যে বড়ই দুঃখ! আমরা নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী হয়ে গিয়েছিলাম। খুব অসম্ভব নয় যে, আমাদের রব্ আমাদের এ থেকেও উত্তম বাগান দান করবেন। আমরা আমাদের ইলাহ্র দিকেই ফিরে যাচ্ছি। ... এমনি হয়ে থাকে আযাব। আর পরকালের আযাব তো আরও অনেক বড়। যদি তারা তা জানতো।

মিসকীনের অধিকার আদায়ের জন্যে উৎসাহ দান

কুরআন মজীদের মক্কায় অবতীর্ণ সূরা ও আয়াত মিসকীনদের প্রতি দয়া প্রদর্শন, তাদের খাবার দানের ও তাদের দুঃখ দূরীকরণের জন্যে উৎসাহ দান, তাদের প্রতি অবহেলা ও নির্মমতা প্রদর্শনে ভয় দেখানো প্রভৃতি কাজটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি, তা অতিক্রম করে সম্মুখের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। ইসলাম প্রত্যেক মুমিনের উপর মিসকীনের অধিকার ধার্য করে দিয়েছে তাদের খাবার দেয়ার ও তাদের দুঃখ মোচনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসার জন্যে। অন্যদের উৎসাহিত করাও তাদেরই দায়িত্ব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ কাজ না করাকে আল্লাহ্র প্রতি কুফরী সমতুল্য এবং আল্লাহ্র ক্রোধ-অসন্তোষ ও পরকালীন আযাব উদ্রেককারী বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

সূরা 'আল-হাক্কাহ্' -এ বামপন্থীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ- فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ- وَلَمْ اَدْرِمَا حِسَابِيَهْ- يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ- مَا اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ- هَالَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ- (الحاقه- ٢٥-٢٩)

আর যার আমলনামা তার বাম হস্তে দেয়া হবে, সে বলবে, হায় আমার আমলনামা আমাকে যদি না-ই দেয়া হত আর আমার হিসেব কি তা যদি আমি না-ই জানতাম। হায়, আমার দুনিয়ায় ঘটিত মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হত। আজ আমার ধন-মাল আমার কোন কাজে এলো না। আমার সব ক্ষমতা-আধিপত্য-প্রভুত্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে!

পরে রাব্বুল আলামীন তার উপর সুবিচারপূর্ণ ফয়সালা জারি করেছেন, সে যে আযাব পাওয়ার যোগ্য, সেই আযাবই তাকে দেয়া হল। বলা হয়েছে ঃ

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ- ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ- ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذَارِعًا فَاسْلُكُوْهُ- (الحاقة- ٣٠-٣٢)

ধর লোকটিকে, তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। আর তারপর তাকে সত্তর হতে দীর্ঘ শিকলে বেঁধে ফেল।

এভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণার মাধ্যমে আযাব, অপমান ও লাঞ্ছনা দেয়ার কারণ কি? তার কারণ দুটো। একটি, সে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখতো না। আর দ্বিতীয়, মিস্‌কীনদের খাবার দেয়ার জন্যে লোকদের উৎসাহিত করতো না।

এসব আয়াতে কঠিন আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে। এ ভয় দিলকে কাঁপিয়ে দেয়। এগুলো ঠিক তেমনি, যেমন হযরত আবুদ-দারদা (রা) তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন ঃ

হে উম্মে দারদা! আল্লাহ্‌র একটা শিকল রয়েছে, যা সব সময়—যে সময় জাহান্নাম সৃষ্টি হয়েছে, সেই সময় থেকেই জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হচ্ছে। তা সেই দিন পর্যন্ত উত্তপ্ত করতে থাকা হবে, যেদিন তা লোকদের গলায় পরানো হবে। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার কারণে তার অর্ধেক থেকে তো তিনি আমাদের নাজাত দিয়েছেন। (এক্ষণে বাকী অর্ধেক থেকে মুক্তির জন্যে) হে উম্মে দারদা! মিসকীনকে খাবার দেয়ার জন্যে উৎসাহিত করতে থাক।[১]

কুরআনের পূর্বে দুনিয়ায় এমন কোন ধর্মগ্রন্থ দেখা যায়নি, যা মিসকীনদের খাবার দেয়ার উৎসাহিত করার কাজ না করাকে জাহান্নামে যাওয়ার ও কঠিন আযাব ভোগ করার কারণস্বরূপ উল্লেখ করেছে।

সূরা 'আল-ফজর'-এ আল্লাহ্ তা'আলা জাহিলিয়াতের লোকদের সম্বোধন করেছেন যারা ধারণা করত যে, তাদের ধর্ম তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেবে এবং তারা তাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মের উপর কায়েম রয়েছে। আল্লাহ্ তাদের ধিক্কার দিয়ে ভর্ৎসনা করে বলেছেনঃ

كَلاَّ بَلْ لاَّ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ- وَلَا تَحٰضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ- (الفجر ١٧-١٨)

তোমাদের ধারণা সত্য নয়। তোমরা বরং (অপরাধ করছ এই যে,) তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না এবং মিসকীনদের খাবার দেয়ার জন্যে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।

---

১. كتاب الاموال - ص ٢٥٠

বস্তুত এই ছোট্ট আয়াতে সমাজের গরীব-মিসকীনদের মৌলিক অধিকার আদায়ের নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা হয়েছে।

শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুহু এ প্রসংগে লিখেছেন, আয়াতে মিসকীনকে খাবার দিতে বলার পরিবর্তে খাবার দেয়ার জন্যে উৎসাহ দানের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি বলার হলে বলা হত ولم تطعموا المسكين 'তোমরা মিসকীনকে খাবার দাও না।'—এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে কথা স্পষ্ট হত। কিন্তু তা বলা হয়নি। কেননা সমাজের ব্যক্তিরা পরস্পরের জন্যে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকেরই উচিত অপর প্রত্যেক লোককে ন্যায় কাজের আদেশ দান এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা। সেই সাথে যে কাজের আদেশ সে অন্যকে করবে, সে নিজে তা অবশ্যই পালন করবে। অনুরূপভাবে যে কাজ করতে অন্যদের নিষেধ করবে, সে নিজেও তা থেকে বিরত থাকবে—এটাই স্বাভাবিক।

সূরা আল-মাউন এ ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয়া ও মিসকীনকে খাবার দেবার জন্যে উৎসাহ দান না করাকে বিচার দিনের প্রতি অবিশ্বাস ও কুফরী করার অনিবার্য ফলশ্রুতি বলা হয়েছে।[১]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

أَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ- (الماعون-١)

তুমি কি সেই লোকটিকে দেখেছ, যে লোক বিচারের দিনকে অসত্য মনে করে?

এই জিজ্ঞাসা প্রতিটি সমঝদার ব্যক্তির প্রতি। অর্থাৎ পরকাল ও বিচারের দিনকে অসত্য মনে করে কে, তা কি তুমি বুঝতে পেরেছ? যদি না-ই বুঝে থাক, না-ই চিনে থাক, তাহলে জেনে নাও, সে হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে খাবার দেয়ার জন্যে লোকদের উৎসাহিত করে না।

মিসকীনকে খাবার দেয়ার জন্যে উৎসাহ দান বলতে বোঝায় এই কাজের ব্যবস্থাপনার জন্যে লোকদের আহবান জানানো। কেননা যে লোক মিসকীনকে খাবার দেয়ার জন্যে লোকদেরে উৎসাহিত করে না, সে স্বভাবতই নিজে মিসকীনকে খাবার দেয় না। কাজেই আল্লাহ্র কথাঃ

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ- (الماعون-٢)

মিসকীনকে খাবার দেবার জন্যে উৎসাহিত করে না—

সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যে খাদ্যাভাবী ও উপার্জনে অক্ষম দরিদ্র ব্যক্তিকে নিজের ধন-মাল থেকে একবিন্দু পরিমাণও দান করে না। এখানে ইংগিতপূর্ণ কথা বলার কারণে প্রকারান্তরে একথাই বোঝানো হয়েছে যে, তোমার কাছে মিসকীনের প্রয়োজন প্রকাশিত ও উপস্থাপিত হলে আর তোমার কাছে দেবার মত কিছু না থাকলে তখন অন্যদেরকে তা

১. تفسير جزءعم ص ١٦٢

দিতে বলা ও উৎসাহিত করা তোমার কর্তব্য। এখানে পরকালে বিশ্বাসী লোকদেরে দরিদ্রের ফরিয়াদে তাদের দান করার জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে, তা অন্যদের কাছ থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে হলেও অবশ্যই করতে হবে। আর এ হচ্ছে খয়রাতী কাজে সংগঠন ও সংস্থা গড়ে তোলার একটা পন্থা। কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতটিই হল তার মৌল ভিত্তি। যেমন সূরা আল-ফাজ্‌র-এ বলা হয়েছে।

كَـلاَّ بَلْ لاَّتُكْرِمُـوْنَ الْيَـتِـيْمَ- وَلَا تَحٰـضُّـوْنَ عَلٰى طَعَـامِ الْمِـسْكِيْنِ-

(الفجر-١٧-١٨)

না, কখনই নয়, আসলে তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান দেখাও না এবং মিসকীনকে খাবার দেয়ার জন্যে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।

বস্তুত এ একটা অতীব উত্তম পন্থা। এর মাধ্যমে দরিদ্রদের সাহায্য করা যায়, মিসকীনদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এ ভাবেই সম্ভব।[১]

পরকালে অবিশ্বাসী লোকদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে পরে বলা হয়েছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ-اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاُؤْنَ- وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ- (الماعون ٤-٧)

দুঃখ সেই নামাযীদের জন্যে, যারা নামাযের ব্যাপারে অবসাদ ও উপেক্ষা প্রদর্শন করে। তারা ওরাই, যারা লোকদের দেখানোমূলক কাজ করে এবং নিত্য সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে পরস্পরকে সাহায্য করতেও কুণ্ঠিত হয়।

আল্লামা ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

অর্থাৎ তারা তাদের আল্লাহ্‌র ইবাদত উত্তমভাবে সম্পন্ন করতে পারেনি যেমন, তেমনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের প্রতিও কোন কল্যাণমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। এমনকি সামান্য-নগণ্য যেসব জিনিস দিয়ে পরস্পরকে সাহায্য করা যায়, যা দ্বারা লোকদের বেশ উপকারও হয় এবং মূল জিনিসটিও যথাযথ অক্ষুণ্ন থাকে; বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয় না ও তা আসল মালিকের কাছে ফিরে আসে। এ সব লোক যে যাকাত ও অন্যান্য রকমারি উপকারী জিনিস দিতেও রাযী নয়, তা তো আরও সত্য কথা।[২] এই ধরনের লোকদের নামাযও তাদের কোন কাজে আসবে না এবং পরকাল-বিশ্বাসী লোকদের মধ্যে তাদের গণ্যও করা হবে না।

---

১. تفسير جزءعم- ١٢٦

২. تفسير ابن كثير - ج ٤-١ ص- ٤٥- الجلى

ভিখারী, বঞ্চিত. মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের অধিকার

সূরা আয্-যারিয়াত-এ আল্লাহ্ তা'আলা সে সব মুত্তাকী লোকের উল্লেখ করেছেন, যারা তাঁর কাছে জান্নাত ও অফুরন্ত নিয়ামত পাওয়ার অধিকারী হবে। এই লোকদের সবচেয়ে উজ্জ্বল পরিচিতি হচ্ছে ঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ- (الذريت- ١٩)

তাদের ধন-মালে ভিখারী প্রার্থী ও বঞ্চিতদের সুস্পষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত অধিকার রয়েছে।

'ভিখারী' বা প্রার্থী বলতে বোঝানো হয়েছে সে লোক, যে এসে দয়াস্বরূপ কিছু পেতে চায়; যদিও তার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আর 'বঞ্চিত' বলে সেই লোককে বোঝানো হয়েছে, যার ধন-মাল কিছুই নেই, উপার্জন নেই, জীবিকা নির্বাহের কোন রোজগারও নেই।

এ কথার দরুন উপরিউক্ত মুত্তাকী লোকেরা অনুধাবন করতে পারল যে, তাদের কাছে যে ধন-মাল রয়েছে, তারা তার নিরংকুশ মালিক নয়। তার কারণে তারা অন্যদের থেকে কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা বা অধিকারেরও দাবিদার হতে পারে না। তাতে নিশ্চিতরূপে অভাবগ্রস্থ অন্য লোকদের অধিকার রয়েছে। তা তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের 'হেবা' করেও দিয়ে দেয়া হয়নি। আর এর কারণে তোমরা তাদের থেকে কোন বিশিষ্ঠতাও পেয়ে যাওনি। এ মূলতই তাদের হক-পাওনা। আর 'পাওনা' গ্রহণের কারণে তাদের অমর্যাদাও কিছু হতে পারে না। তোমরা তা দিয়ে দিলেও তাদের উপর তোমাদের অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে বলে দাবি করতে বা কোনরূপ অহমিকতাও বোধ করতে পার না।

সূরা 'আল-মা'আরিজ'-এ এই পরিচিতিটিরই পুনরুল্লেখ হয়েছে। তবে তাতে একটা অতিরিক্ত শব্দ বসানো হয়েছে। সেই মু'মিনদের পরিচিতি প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে, যারা তাদের ঈমান ও নৈতিকতার শক্তিতে মানবীয় দুর্বলতাকে জয় করেছে।[1] মানবীয় দুর্বলতার উল্লেখ করে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا- اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا- وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا-اِلاَّ الْمُصَلِّيْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلاَ تِهِمْ دَائِمُوْنَ- وَالَّذِيْنَ فِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ- لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ- (المعارج- ١٩-٢٥)

মানুষ খুবই সংকীর্ণমনা (ছোট আত্মার) সৃষ্ট হয়েছে। তার উপর যখন বিপদ আসে তখন ঘাবড়িয়ে যায় এবং যখন স্বাচ্ছন্দ্য আসে তখন সে কার্পণ্য করতে শুরু করে। কিন্তু সেই সব লোক (এই জন্মগত দুর্বলতা থেকে মুক্ত), যারা নিজেদের নামায রীতিমত ও স্থায়ীভাবে আদায় করে, যাদের ধন-মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের একটা নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে।

---

১. تفسير ابن كثير ج٤- ص ٣٣٤

এ আয়াতে ধনীদের ধন-মালে একটা সুপরিজ্ঞাত (Known) অধিকারের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বলেছেন, এ 'সুপরিজ্ঞাত অধিকার' হচ্ছে 'যাকাত'। কেননা ধনীদের ধন-মালে পরিমিত ও সুপরিজ্ঞাত হক তো এটাই।

তাঁরা এ-ও জানে; উল্লেখও করেছেন যে, এ সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ। এতে কোনই সন্দেহ নেই। আর এ কথাও সকলেরই জানা যে, যাকাত কার্যত মদীনাতেই ফরয ঘোষিত হয়, তাহলে বলতে হবে ঃ উক্ত আয়াতে যে 'সুপরিজ্ঞাত হক'-এর কথা বলা হয়েছে, তা ভাগ করে দেয়া অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তা ভাগ করে দিয়ে দেয়ার কাজটিকে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ফরয করে নিয়েছিল এবং তারা প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্যে নির্দিষ্টও করে দিয়েছিল।[১]

তাহলে এ 'হক' ও সুপরিচিত 'যাকাত'—এ দুইয়ের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, উক্ত 'হক' তারা নিজেরাই পরিমিত ও নির্ধারিত করে নিয়েছিল নিজেদের জন্যে বাধ্যতামূলক হিসেবে। আর 'যাকাত' সুনির্দিষ্ট হয়েছে—পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে স্বয়ং শরীয়াতের বিধানদাতা কর্তৃক।

সূরা 'আল-ইসরা' ও 'সূরা আর্-রূম'-এ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاٰتِ ذَالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا-

(بنی اسرآيل- ٢٧)

এবং নিকটাত্মীয়দের তাদের হক, আর মিসকীন, নিঃস্ব পথিককে এবং বেহুদা ব্যয় করো না।

فَاٰتِ ذَالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ- ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ- (الروم- ٣٨)

অতএব দাও নিকটাত্মীয়কে হক এবং মিসকীন ও নিঃস্ব পথিককে।

তা অতীব উত্তম সেই লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পেতে চায়। এ সব কথা দ্বারা কুরআন মজীদ মক্কীযুগের প্রথম দিনগুলো থেকেই মুসলমানের প্রাণে এ ভাবধারা দৃঢ়মূল করে বসাতে চেয়েছে যে, নিকটাত্মীয় ও অভাবগ্রস্ত সাধারণ লোকদের এক নিশ্চিত অধিকার রয়েছে তার ধন-মালে এবং সেই হক আদায় করা তার একান্তই কর্তব্য। এটা নিছক ইচ্ছামূলক নফল দানমাত্র নয়। তাই ইচ্ছা হলে দেবে নতুবা দেবে না—এটা নয় আদপেই বরং এটা অবশ্য দেয়।

---

১ تفسر ابن كثير- ج ٤ – ص ٢٣٤

শস্য কর্তনকালীন অধিকার

সূরা আল-আন'আমের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَجَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًاوَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ- كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ- وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ-

(الانعام-١٤١)

সেই মহান আল্লাহ্ই নানা ধরনের বাগ-বাগিচা, আঙুর বাগান, খেজুর বাগান সৃষ্টি করেছেন, খেত-খামার বানিয়েছেন, যা থেকে নানা প্রকারের খাদ্য-উৎপন্ন হয়, জয়, জয়তুন ও আনারের বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, যার ফলসমূহ দেখতে সদৃশ কিন্তু স্বাদে ভিন্ন। .... খাও তার ফসল, যখন তা হবে এবং আল্লাহ্র হক দিয়ে দাও যখন তার ফসল তুলবে। আর সীমালংঘন করো না, আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

এ আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সাবধান করে দিয়েছেন। বলেছেন, জমি যে ফল বা ফসল ফলায়, তাতে অনিবার্যভাবে দেয় হক রয়েছে এবং তা সেদিনই আদায় করে দিতে হবে যেদিন তা পাড়া বা কাটা হবে।

হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেছেন ঃ

এই নির্দেশ ছিল যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তখন তার ক্ষেতের ফসল থেকে দান করত, পশুরা বিচরণ করত। ইয়াতীম মিসকীন ও কামাই-রোযগারে অক্ষম লোকেরা তা থেকে হিসসা লাভ করত।

এ অধিকার ছিল শর্তহীন এবং ওশর বা অর্ধেক ওশর অনির্ধারিত। ক্ষেত্র ও বাগান-মালিকের ঈমানের উপর এই কাজটি ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। কেননা তাদের চতুর্দিকে অভাবগ্রস্ত লোক কিলবিল করত। পরবর্তীকালে রাসূলে করীম (স) এই হক-এর পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেন এবং তা মদীনা শরীফে সংঘটিত হয়। যেমন আল্লাহ্র তরফ থেকে ওশর বা অর্ধেক ওশর দেয়া ফরয করে দেয়া হয়েছে পাঁচ অসাক্ পরিমাণ শস্য ও ফল-পাকড় থেকে। বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলেছেন, মক্কায় যে ব্যবস্থা ছিল, এই পরিমাণ নির্ধারণ তা নাকচ করে দিয়েছে। কিন্তু শেষের দিকের ফিকাহ্বিদদের মতে এই পারিভাষিক নাকচকরণ (نسخ) এখানে প্রযোজ্য নয়। এ পর্যায়ে আমরা বিশদ আলোচনা করব 'ফসল ও ফলের যাকাত' পার্যায়ে।

মক্কায় 'যাকাত' দান

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহের প্রায় সর্বত্রই এই ধরণ ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। সকল অবস্থায়ই দরিদ্রদের দুঃখ মোচনের আহবান জানানো হয়েছে।

ধন-মাল থেকে তাদের অংশ দিয়ে দেয়ার জন্যে তাকীদ করা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হল মু'মিনদের সমাজে দরিদ্ররা যেন কষ্ট না পায়।

শেষ পর্যায়ে এই পদ্ধতি ও স্টাইল পরিবর্তিত হয়েছে এবং 'যাকাত দান' কথাটি বলা হয়েছে। যারা তা দেয় তাদের প্রশংসা করা হয়েছে আর যারা দেয় না তাদের তিরস্কার করা হয়েছে। কুরআনের মক্কী সূরাসমূহের আয়াত সমষ্টি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

সূরা 'আর-রুম'-এ আল্লাহ্ তা'আলা নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের হক্ আদায় করে দেয়ার আদেশ করেছেন। তাতে সুদ, যা বাহ্যত ধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হ্রাস করে এবং যাকাত বাহ্যত ধনের পরিমাণহ্রাস করে; কিন উ প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি করে—এ দুইয়ের মাঝে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

فَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ-ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَافِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَاللّٰهِ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ- (الروم- ٣٨-٣٩)

অতএব তোমরা দাও নিকটাত্মীয়কে তার হক এবং মিসকীন ও নিঃস্ব পথিককে। তা অতীব উত্তম তাদের জন্য, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে ইচ্ছুক। আর তারাই সফলকাম। আর তোমরা যে সুদ দাও—লোকদের ধন-মালের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, তা আল্লাহ্র কাছে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। আর তোমরা যে যাকাত দাও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য, তারাই আসলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধনের মালিক হয় (যারা যাকাত দেয়)।

আর সূরা 'আন-নামল-এ আল্লাহ্ মু'মিনদের পরিচিতি স্বরূপ বলেছেন, যাদের জন্যে তাঁর কিতাবকে হিদায়েত ও সুসংবাদবাহক বানিয়ে নাযিল করেছেন। তাতে বলা হয়েছেঃ

تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتٰبٍ مُّبِيْنٍ- هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِهُمْ يُوْقِنُوْنَ- (النمل- ١-٣)

এসব কুরআনেরই আয়াত, সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব, হিদায়েতের ও সুসংবাদের গ্রন্থ মু'মিনদের জন্যে, যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর তারা প্রকৃত পক্ষে পরকালের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়শীল।

যাকাত দানের কথাটি নামায কায়েম করার কথার পর যেভাবে বলা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ধন-মালের যাকাতের কথাই বলা হয়েছে। কেননা এটাই কুরআনের রীতি।

সূরা 'লুকমান'-এর শুরুতে বলা হয়েছে ঃ

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ-الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ ...

(لقمن- ٤)

হিদায়েতের বিধান ও রহমত ঐকান্তিক নিবেদিত (বান্দা)-দের জন্যে যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় .....

পূর্ববর্তী আয়াত প্রসংগে যা বলা হয়েছে, এ পর্যায়েও তা-ই বলা যায়। সূরা 'আল-মু'মিনুন'-এ ফিরদাউস জান্নাতের অধিকারী মু'মিনের পরিচিতি বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ- (المؤمنون-٤)

আর যারা যাকাত দান করে ...

সূরা 'আল-আ'রাফ'-এ মূসা নবী ও তাঁর জনগণের কিসসা বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ- (الاعراف-١٥٧)

আর আমার রহমত সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত। আমি তা লিখব তাদের জন্যে, যারা মুত্তাকী, যারা যাকাত দেয়, আর যারা আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে, যারা উম্মী নবী-রাসূল (স)-কে অনুসরণ করে চলে।

সূরা 'ফুস্সিলাত'-এ মুশরিকদের জন্যে অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তাদের প্রধান ও বিশেষ পরিচিতির উল্লেখ করেছেন। সে পরিচিতি হচ্ছে, তারা যাকাত দেয় না এবং পরকাল অবিশ্বাস করে। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ-

দুঃখ মুশরিকদের জন্যে, যারা যাকাত দেয় না এবং তারা পরকালে অবিশ্বাস করে। স্পষ্ট কথা, নিষ্ঠাবান মু'মিনরা যাকাত দেয়, তারাই পরকালের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়শীল। আর ওরা যাকাত দেয় না ও পরকালে অবিশ্বাসী। মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে এটাই বড় পার্থক্য।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'যাকাত' বলে মনের যাকাত—পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা ও পবিত্রতা বুঝিয়েছেন। কেননা শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় ময়লা-আবর্জনা। যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا–

সত্যিই কল্যাণ লাভ করেছে, যে (আত্মাকে) পবিত্র করেছে।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

নিশ্চয় সাফল্য লাভ করেছে, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে।

এ ধরনের তাফসীর করে আসলে ধন-সম্পদের যাকাতের ব্যাপারে 'পলায়নী নীতি' গ্রহণ করা হয়েছে, যা মদীনায় বিধিবদ্ধ হয়েছে বলে সকলেই জানেন। তাই ইবনে জরীর তাবারী এরূপ তাফসীর প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ের তাফসীর ও তাৎপর্যে বলেছেন ঃ "তারা তাদের ধন-মাল থেকে তার যাকাত বের করে ব্যয় করে না। তার বড় দলীল হল, 'যাকাত' শব্দটি বিশেষভাবে 'ধন-মালের যাকাত' অর্থেই ব্যহৃত হয়েছে, অন্য অর্থে নয়।

কুরআনে প্রায় সর্বত্রই যাকাত প্রসঙ্গে ايتاء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ, الاعطاء দেয়া বা দান করা। ধন-মালের যাকাত দেয়া প্রসঙ্গে এই শব্দের ব্যবহার সঠিক ও উত্তমভাবেই হয়েছে।

মক্কী সূরাসমূহে 'যাকাত' প্রসঙ্গে 'আদেশ' নাযিল হয়নি। তাহলে তা পালন করা ফরয হয়ে যেত। বরং সংবাদ দানের ভঙ্গীতে বলা হয়েছে, মু'মিন, মুত্তাকী ও মুহসিন লোকদের একটা মৌলিক গুণ হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে।[১] এবং কাফিরদের পরিচিতিস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে তার তরককারী বলে।

বস্তুত কল্যাণ প্রাপ্ত মু'মিনদের মৌলিক গুণাবলীর মধ্যে গণ্য হচ্ছে যাকাত দান। তা না-দেয়া মুশরিকদের অবিচ্ছিন্ন গুণপনা। কথার এ ধরণই প্রমাণ করে যে, তা দেয়া ফরয। কেননা মু'মিনদের গুণপনায় ভূষিত ও সুশোভিত হওয়া এবং মুশরিকদের বিশেষসমূহ থেকে মুক্ত ও রিক্ত হওয়া ঈমানদার ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। তাতে কোনরূপ মতদ্বৈধতা নেই। আর এ সবের উপর স্পষ্ট আদেশ হচ্ছে ঃ

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ–

এবং দাও তার হক্ তা কাটার দিনেই।

মক্কী যুগের যাকাত নিঃশর্ত

প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামী আইন রচনার ইতিহাসে সর্বজনজ্ঞাত কথা হচ্ছে, যাকাত মদীনায় ফরয হয়েছে। তাহলে উপরিউক্ত কথা ও কুরআনের মক্কী সূরার আয়াত বা সূরাসমূহে যাকাতের উল্লেখ কি করে সাযুজ্যপূর্ণ হতে পারে?

১. সূরা المزمل -এর শেষ আয়াতে যা বলা হয়েছে তা মক্কী বলে বলা হয়েছে, কিন্তু কেউ কেউ মাদানী বলে উল্লেখ করেছেন। এতে যে মতভেদ রয়েছে–তা স্পষ্ট।

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, মক্কী সূরাসমূহে যে যাকাতের উল্লেখ হয়েছে, তা হুবহু সেই 'যাকাত'-ই নয় যা পরে মদীনায় বিধিবদ্ধ হয়েছে এবং তার পরিমাণ ও নিসাব নির্ধারিত হয়েছে। তা সংগ্রহ ও আদায় করার জন্যে কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছে। তার সংগঠন করার জন্যে রাষ্ট্র সরকার দায়িত্বশীল হয়েছে।

মক্কায় যাকাত ছিল নিঃশর্ত, নিসাব ও পরিমাণ অনির্ধারিত। আর তা আদায় করা ব্যক্তিদের ঈমান ও তাদের মু'মিন ভাইদের প্রতি ভ্রাতৃত্বের কর্তব্যবোধের উপর ছিল ন্যস্ত। তখন ধন-মাল থেকে কিছু একটা পরিমাণ দিয়ে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। যদিও অভাব আরও অধিক ব্যয় করার দাবি করছিল।

মক্কী সূরাসমূহে উদ্ধৃত 'তার হক' ও 'প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক্' 'সুপরিজ্ঞাত হক্' প্রভৃতি কথার একটা ভিন্নতর ব্যাখ্য দিয়েছেন কোন আলোচনাকারী। তাঁরা বলেছেন এটা সম্ভব যে, মক্কী পর্যায়েই নবী করীম (স) হয়ত যাকাতের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে যারা তা দিতে সক্ষম তাদের জন্যে তা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন।[১]

কিন্তু এ কথাটি প্রমাণিত হয়নি বরং তার বিপরীত কথাই উদ্ধৃত হয়েছে। বস্তুত তখনকার সময় এ নির্ধারণ ছিল সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। কেননা তখন তো লোকেরা নিজেরাই দিয়ে দিচ্ছিলেন এবং যা কিছু তাঁদের হাতে আসত, তা প্রায় সবই দ্বীনের পথে ব্যয় করে দিচ্ছিলেন অকাতরে। আর রাসূল (স) কর্তৃক পরিমাণ নির্ধারণ ছাড়া গরীবদের হক্ সুপরিজ্ঞাত হতে পারে না, এটাও কোন জরুরী কথা নয়। হয়ত প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি নিজেই স্বীয় ধন-মালে গরীবদের হকের পরিমাণ নির্ধারণ করতেন। কোন তাফসীরকার এ কথার উল্লেখও করেছেন। অথবা তখনকার অবস্থার ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে একটা পরিমাণ প্রচলিত ও সর্ব জনবিদিত ছিল এবং সেই অনুযায়ীই তাঁরা ব্যয় করতেন।

হাফেয ইবনে কাসীর সূরা 'আল-মু'মিনুন'-এর আয়াত ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ- —এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ অধিকাংশ তাফসীরবিদ মনে করেন, এখানে 'যাকাত' বলতে ধন-মালের যাকাতই বুঝিয়েছেন, যদিও এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং যদিও যাকাত ফরয হয়েছে, তা নিসাব ও পরিমাণভিত্তিক। নতুবা আসল কথা হচ্ছে মৌলিকভাবে যাকাত মক্কা শরীফেই ফরয হয়।[২] আল্লাহ্ তা'আলা সূরা 'আল-আন'আম'-এ বলেছেন ঃ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِه- 'এবং দাও তাঁর হক তা কাটার দিনই।' এ সূরাটি মক্কাশরীফেই নাযিল হয়েছে। আমাদের পূর্বোদ্ধৃত বহু আয়াত থেকেই এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মদীনা-পর্যায়ে যাকাত

মুসলিমগণ মক্কা শরীফে একক ব্যক্তি হিসেবে দ্বীনী দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মদীনায় পৌছার পরই তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন যাপন করতে শুরু

১. 'সীরাতুর-রাসূল' কুরআন থেকে গৃহীত আকৃতি' মুহাম্মাদ ইজ্জাত দরোজা লিখিত—২য় খন্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা।

২. تفسير ابن كثير ج ٣- ص ٢٢٨-٢٣٨

করেন। সেখানে তাঁদের ছিল ভৌগোলিক ভূখণ্ড (Territory) প্রশাসন-সংস্থা ও সার্বভৌমত্ব। তাই এখানে ইসলামী প্রশাসনিক আইন-বিধান এমন এমন একটা নতুন রূপ পেয়েছে, যা এ উত্তরণের সাথে পুরোপুরিভাবে সাযুজ্যপূর্ণ। এখানে সব কিছু সুনির্দিষ্ট, বিশেষভাবে চিহ্নিত। যদিও পূর্বে মক্কী পর্যায়ে তা-ই ছিল সাধারণ ও শর্তহীন। মক্কায় যা ছিল শুধু উপদেশ, দৃষ্টি আকর্ষণ ও নিতান্তই উৎসাহদান পর্যায়ে, মদীনায় তা-ই হয়েছে শক্তি ও সার্বভৌমত্ব বলে জারী ও কার্যকর। এখানেও মানুষের ঈমান ও মনের প্রতি আবেদন পরিত্যক্ত হয়নি। যাকাতের ব্যাপারে এ মাদানী রীতি অত্যন্ত প্রকট। এখানে শরীয়াত প্রদাতা কত পরিমাণ ধন-মালে যাকাত ফরয, ফরয হওয়ার শর্ত ও পরিমাণ এবং তার ব্যয়ের ক্ষেত্র ইত্যাদি সব কিছুই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যাকাত আদায় ও বন্টনের একটা পূর্ণাংগ সংস্থা গড়ে উঠেছিল এখানে।

কুরআনের মাদানী আয়াতে যাকাতের তাকীদ ও বিধি-বিধান

মদীনা শরীফে অবতীর্ণ কুরআন যাকাত ফরয হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে স্পষ্ট আদেশের ভঙ্গীতে এবং তা দেয়ার জন্যে স্পষ্ট ভাষায় আদেশ উদ্ধৃত হয়েছে। মদীনায় অবতীর্ণ সূরা 'আল্-বাকারা'য় আমরা পড়িঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ- (البقره- ١١٠)

আর তোমরা কায়েম কর নামায এবং দাও যাকাত।

ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত। কিন্তু উদ্ধৃত যাকাত সংক্রান্ত আদেশের গুরুত্বের কারণেই আমি আর একটি আয়াতের উল্লেখ করছি। তা হচ্ছে সূরা 'আত্-তওবা'র আয়াত। এই সূরা সর্বশেষে নাযিল হয়েছে।

'যাকাত' প্রসঙ্গে সূরা তওবা'র দৃষ্টান্ত

ক. এই সূরা'র শুরুতে চুক্তি ভঙ্গকারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি তাদের জন্যে চার মাসের অবকাশও নির্দিষ্ট করেন, যেন এই সময়ের মধ্যে তারা দুনিয়া পরিভ্রমণ করতে ও নিজেদের জন্যে একটা পন্থা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْلَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ- فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ-اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- (التوبه- ٥)

হারাম মাসসমূহ অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদের পাও। তাদের পাকড়াও কর, পরিবেষ্টিত কর, এবং তাদের জন্যে প্রতিটি

ঘাঁটিতে অপেক্ষায় বস। অতঃপর তারা যদি তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তখন তাদের পথ উন্মুক্ত করে দাও। জানবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

এ আয়াত অনুযায়ী মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে বিরত থাকা ও তাদের পথ উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্যে শর্ত তিনটি ঃ

প্রথম. শিরক থেকে তওবা। আর তার প্রমাণ হবে, ' লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'র সাক্ষ্য দান।

দ্বিতীয়. মুসলিমদের জন্যে ফরয করা নামায কায়েম করা—তা ঈমানের প্রকাশ ক্ষেত্র, ইসলামের সর্বাপেক্ষা বড় স্তম্ভ, প্রতি দিন-রাতে পাঁচবার কাম্য। মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে তা-ই হচ্ছে প্রধান পার্থক্যকারী এবং মুসলিমদের পারস্পরিক, আত্মিক, সামষ্টিক ও দ্বীনী যোগাযোগের প্রধান সূত্র। এবং

তৃতীয়ঃ ধনীদের ধন-মালে অভাবগ্রস্ত ও সাধারণ জনগণের কল্যাণের জন্যে ফরয-করা যাকাত রীতিমত আদায় করা। তা মুসলিম সমষ্টির পরস্পরের সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামষ্টিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক সূত্র।

খ. এই সূরাটিতে ছয়টি আয়াতের পরই আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য মুশরিক জাতির প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেনঃ

فَانْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِيْ الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ- (التوبه-١١)

অতঃপর তারা যদি তওবা করে ও নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। জানে, এমন লোকদের জন্যে আমরা আয়াতসমূহকে আলাদা-আলাদা করে বর্ণনা করছি।

তাহলে কাফিরদের জন্য মুসলিম সমাজে প্রবেশ করার ও তাদের সাথে এমন দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন পথই উন্মুক্ত নেই—যে ভ্রাতৃত্ব প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমষ্টির একজন বানিয়ে দেয়, যেখানে ব্যক্তির জন্যে তা-ই হয় যা সমষ্টির জন্যে; ব্যক্তির দায়িত্ব তা-ই হয় যা সমষ্টির দায়িত্ব এবং পরস্পরকে অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বেঁধে দেয়, এই রকমের ভ্রাতৃত্বের কোন পথ দেখা যায় না। তবে তার একটি মাত্র পথই রয়েছে। আর তা হচ্ছে শিরক থেকে তওবা করা এবং তার আনুষাঙ্গিক প্রথম কাজ হচ্ছে, মুসলিমদেরকে আল্লাহ্র অনুগত বানায় যে নামায, সেই নামায কায়েম করা। এই নামাযের মাধ্যমেই তারা পরস্পরের সাথে পরিচিত, নিকটবর্তী ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে যাকাত দেয়া। যার মাধ্যমে তারা পরস্পরের দুঃখ মোচন করতে পারে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারে।

সাহাবীদের সময় থেকেই বিশেষজ্ঞগণ একটি ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন, এখানে তা উল্লেখ্য। তা হচ্ছে এই যে, নামাযের পাশাপাশিই যাকাতের উল্লেখ করা কুরআন মজীদের একটা রীতি। এ দুটিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে খুব কমই উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ

أُمِــرْتُمْ بِاِقَــامَــةِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَــاءِ الزَّكٰــوةِ وَمَنْ لَّمْ يُزَكِّ فَــلاَ صَــلٰوةَ لَهُ

(تفسير الطبرى- ج.١٤- ص ١٥٣ ط المعارف)

তোমাদেরকে একসঙ্গে আদেশ করা হয়েছে নামায কায়েম করার ও যাকাত দেয়ার জন্যে। তাই কেউ যাকাত না দিলে তার নামাযও হবে না।

ইবনে যায়েদ বলেছেন ঃ

أُفْتُرِضَتِ الصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ جَمِيْعًا لَّمْ يُفْرَقْ بَيْنَهُمَا-

নামায ও যাকাত এক সাথে ফরয করা হয়েছে, এ দুটির মাঝে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি।

অতঃপর তিনি পড়লেন ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُو الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِىْ الدِّيْنِ-

বললেন ঃ যাকাত ছাড়া শুধু নামায গ্রহণ করতে অস্বীকার করা হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আবূবকর (রা)-কে রহমত করুন। তিনি ছিলেন খ্যাতিমান ফিকাহ্‌বিদ। কেননা তিনিই সর্ব প্রথম বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ যে দুটি জিনিসকে একত্র করেছেন, আমি সে দুটিকে কখনই বিচ্ছিন্ন করব না।

গ. এ সূরাতেই আল্লাহ্ তা'আলা সেসব মসজিদ প্রতিষ্ঠাকারীদের উল্লেখ করেছেন, যাঁদের কাছ তেকে তিনি তা কবূল করবেন। বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللّٰهَ-فَعَسٰى اُولٰئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ-

(النوبه- ١٨)

সন্দেহ নেই, আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ প্রতিষ্ঠা ও আবাদ করে সেই লোক, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি, পরকালের প্রতি এবং নামায কায়েম করেছে ও যাকাত

দিয়েছে, আর আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করেনি। খুবই সম্ভব এ লোকেরাই হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

অর্থাৎ কাফির—মুশরিকরা যদি মসজিদও প্রতিষ্ঠা করে, তবু তা গ্রহণ করা হবে না—যতক্ষণ তারা ঈমান না আনবে, নামায কায়েম না করবে ও যাকাত না দেবে।

ঘ. এ সূরাতেই কঠিন আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যেসব স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয়কারীদের প্রতি, যারা তা থেকে আল্লাহ্র হক আদায় করে না।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ-يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَامَاكَنَزْتُمْ لاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ- (التوبه- ٣٤-٣٥)

আর যারাই স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে আটকে রাখে, তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদের পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন তাদের উপর তা উত্তপ্ত করে তাদের মুখাবয়বে ও পার্শ্বে-পিঠে দাগ দেয়া হবে, বলা হবে যে, এই সেই অপরাধের শাস্তি যা তোমরা (স্বর্ণরৌপ্য) সঞ্চয় করে নিজেদের জন্যে সংগ্রহ করেছ। অতএব তোমরা তার স্বাদ আস্বাদন কর যা তোমরা নিজেরাই সঞ্চয় করেছিলে।

বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন ঃ এ পর্যায়ে এত বড় শাসনবাণী উচ্চারিত হওয়ার কারণ হল, অর্থ-সম্পদের লোভ ও কার্পণ্য মানব-প্রকৃতি নিহিত স্বভাব। তাই তারা যদি এ ব্যাপারে ভয় করে এবং তা থেকে বিরত থাকতে পারে, তা হলে তারা আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক সব কাজে বিনয়ী ও নিবেদিত হবে বলে আশা করা যায়।[১]

ঙ. যাকাত বাবদ লব্ধ সম্পদ কোথায় ও কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় করা হবে, তা-ও এই সূরাতেই বলে দেয়া হয়েছে। সাদ্‌কা সম্পর্কেও বলা হয়েছে। এ কথা মূলত বলা হয়েছিল লোভী ও লালসান্ধ সেসব লোকের প্রতিবাদস্বরূপ, যারা কোনরূপ অধিকার ব্যতীতই যাকাতের সম্পদ পেতে চেয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَاهُمْ يَسْخَطُوْنَ- وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَااٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ-

(التوبه- ٥٨-٥٩)

---

১. احكام القران لابن العربى- قسم ٢

এদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা তোমাকে সাদ্‌কার ব্যাপারে দোষী করে। তা থেকে তাদের দেয়া হলে তারা খুশী হয়, আর দেয়া না হলে তারা তখন অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। তারা যদি সন্তুষ্ট হতো তা পেয়ে, যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তাদের দিয়েছেন এবং বলত যে, আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ থেকে আমাদের দেবেন অবশ্যই এবং তাঁর রাসূলও (তা হলে নিশ্চয়ই ভাল হত)। ... আমরা তো আল্লাহ্‌র দিকেই আগ্রহী।

এর সাথে সাথেই বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ- فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ- وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ- (التوبه- ٦٠)

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, সাদ্‌কা-যাকাত কেবলমাত্র দরিদ্র, মিসকীন, যে (যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন) কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, যাদের দিল আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, যারা বন্দী, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্‌র পথে এবং নিঃস্ব পথিকের জন্যে। এ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ফরযরূপে নির্ধারিত। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞানী।

এই চূড়ান্ত কথা ঘোষণাকারী আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা লোভীদের লোভ বন্ধ করার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাদের লেলিহান জিহবা কর্তন করলেন। যাকাত বণ্টনের কাজটিকে লোভীদের লোভ-লালসার অধীন রাখলেন না। কোন প্রশাসকের ইচ্ছাধীনও করে দিলেন না। তার বণ্টন আটটি খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট করে দিলেন। আর এই বণ্টন খাত যে অতীব ইনসাফপূর্ণ, তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

বস্তুত ঈমানদার লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র চাইতে উত্তম ফয়সালাকারী আর কে হতে পারে? (আল-মায়েদা ঃ ৫০)

আয়াতটি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, যাকাত আদায়, সংগ্রহ ও বণ্টনের কাজ 'সে কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের' মাধ্যমে সমাধা করতে হবে। সেই সাথে বলা হয়েছে যে, যাকাত সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব ব্যক্তিদের উপর নয়, সরকারের উপর ন্যস্ত (পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে)।

চ. মুসলিম সমাজের মৌল কাঠামো গড়ে তোলার পদ্ধতি ও বিধি-বিধানের কথাও এ সূরাতেই বলে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ- يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ- أُوْلٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ- اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ- (التوبه - ٧١)

আর মু'মিন স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, অভিভাবক। তারা ভাল ও ন্যায় কাজের আদেশ করে, খারাপ ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করে। এসব লোককে আল্লাহ্ অবশ্যই রহমত দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞানী।

মু'মিন সমাজ ও মুনাফিক সমাজের মধ্যে পার্থক্যকারী অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। উক্ত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে ঃ

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ- نَسُوْاللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ- اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ- (التوبه- ٦٧)

মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রীগণ পরস্পরের (পৃষ্টপোষক)। তারা পাপ ও অন্যায় কাজের আদেশ করে, ভাল ও পুণ্যের কাজ করতে নিষেধ করে। আর তাদের হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে, আল্লাহ্ও তাদের ভুলে গেছেন। আসলে মুনাফিকরাই সীমালংঘনকারী।

মুনাফিকদের 'হাত মুষ্টিবদ্ধ' করার অর্থ লোভ ও লালসান্ধ হওয়া। ফলে তারা আল্লাহ্র কাছেও বিস্মৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের ত্যাগ করেছেন কিন্তু মু'মিনগণ হাত উন্মুক্ত ও প্রশস্ত প্রসারিত করে রাখে। তারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের কারণে ব্যাপকভাবে দান-খয়রাত ও আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করে। ফলে তারা আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার যোগ্য অধিকারী হয়।

ছ. আলোচ্য সূরা তওবায়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল এবং তাঁর পরে যারাই মুসলিম উম্মতের পরিচালক হবে তাদের সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

خُذْمِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَاوَصَلِّ عَلَيْهِمْ- اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ- وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- (التوبه - ١٠٣)

তাদের ধন-মাল থেকে 'সাদ্কা' (যাকাত) গ্রহণ কর, পবিত্র কর, তাদের পরিচ্ছন্ন পরিশুদ্ধ কর তাদের তা দিয়ে। আর তাদের জন্যে পূর্ণ রহমতের দোয়া কর। কেননা তোমার দোয়া তাদের জন্যে শান্তির বাহক। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীরকারগণ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ أَمْوَالِهِمْ শব্দের পূর্বে مِنْ বসানো হয়েছে বলে ধন-মালের একটা অংশ গ্রহণের নির্দেশ বোঝায়। কেননা ফরয যাকাত বাবদ সম্পূর্ণ ধন-মাল দিতে হয় না, তার থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশই শুধু দিয়ে দিতে হয়। আর مِنْ أَمْوَالِهِمْ (তাদের মালসমূহ থেকে) বলা হয়েছে; مِنْ مَالِهِمْ (তাদের মাল থেকে) বলা হয়নি। বহুবচনের এই শব্দ বিভিন্ন প্রকার ও ধরনের মাল সম্পদ সামিল করছে বলে সেই সব কিছু থেকেই নির্দিষ্ট অংশ আদায় করতে হবে। আর (তাদের) বলে সমস্ত মুসলিম উম্মত বোঝানো হয়েছে। সর্বসাধারণ তাফসীরকারদের এটাই মত।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত মুসলিমের সর্বপ্রকারের ধন-মাল থেকেই যাকাত গ্রহণ করতে হবে। কেননা দ্বীনের হুকুম-আহ্কাম পালনে তারা সকলেই সমানভাবে বাধ্য।[১]

আয়াতটি এ কথাও বলেছে যে, যাকাত আদায় করবে রাষ্ট্র প্রধান অথবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি। হাদীস থেকেও এ কথাই প্রমাণিত। খুলাফায়ে রাশেদুন বাস্তবভাবে যে আমল করেছেন, তা-ও এ কথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'যাকাত আদায়' শীর্ষক আলোচনায় আমরা এ পর্যায়ে বিস্তারিত কথা বলব।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে যাকাত দিতে অস্বীকারকারী বিদ্রোহীরা এ আয়াতকে ভিত্তি করেই বলেছিল ঃ

আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে রাসূলে করীম (স)-কে। কাজেই কেবল তিনি যাকাত আদায়ের অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কেউই যাকাত আদায় করতে পারেন না। (আর তিনি তো ইহকাল ত্যাগ করে চলে গেছেন, অতএব আর যাকাত নেয়া যাবে না, দিতেও হবে না)।

বিশেষজ্ঞগণ এ ধারণাটির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন, তাদের এই সন্দেহ নিতান্তই ভিত্তিহীন। একটু পরই আমরা এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন, উপরিউক্ত আয়াতে যে 'সাদাকাত'-এর কথা বলা হয়েছে, তাতে 'যাকাত' বোঝায় না। তবুক যুদ্ধে যারা যোগদান করেনি, যারা নেক আমলের সঙ্গে বদ আমল সংমিশ্রিত করেছে, আয়াতটি তাদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তাদের কাছ থেকে যে 'সাদ্কা' গ্রহণ করা হয়েছে, তা-ই তাদের উক্ত গুনাহের কাফ্ফারা হয়েছে। তাহলে তা 'নফল দান' বিশেষ এবং তা বিশেষভাবে তাদের জন্যে প্রযোজ্য। পূর্বকথা থেকেও তা-ই মনে হয় অথচ সাধারণ অর্থবোধক শব্দে কারণের কোন বিশেষত্ব গণ্য হতে পারে না। যাকাত যে ফরয সেখানেও তাদের বিশেষত্ব কিছু নেই। আর তাদের যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত থাকাটাও তার কারণ হতে পারে না। কেননা যাকাত হচ্ছে ইসলামের অধিকার। অপরাধের 'প্রায়শ্চিত্ত' বা কাফ্ফারাস্বরূপও তা ফরয

---

১. تفسير مجمع البيان للطبرسى فى تفسير الايه.

করা হয়নি।[১] ইমাম তাবারীও এ কথাই সমর্থন করেছেন। বহু সংখ্যক ব্যাখ্যাকারের এ অভিমত বলেও তিনি জানিয়েছেন।

কিন্তু বিপুল সংখ্যক তাফসীরকার বলেছেন, উপরিউক্ত আয়াতের শব্দ الصدقات এর অর্থ 'যাকাত'। প্রাচীন ও পরবর্তী সর্বকালের দ্বীন-অভিজ্ঞগণ এ আয়াতের ভিত্তিতেই যাকাতের যাবতীয় আইন-বিধান সংকলন করেছেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী কথা 'সাদ্‌কা' শব্দের অর্থ হিসেবে যাকাত মনে করণে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। আর পরবর্তী আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে যুক্ত করে তাফসীর করতে হলে তার জন্যে অকাট্য দলীলের প্রয়োজন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এ কথা বর্ণিত। কুশাইরীর উদ্ধৃতি অনুযায়ী ইকরামাও এ মতই প্রকাশ করেছেন।

তবে পূর্ব ও পরবর্তী আয়াতের মধ্যে সংযুক্তি সূত্র হিসেবে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী অপর একটি যুক্তিসঙ্গত দিকের উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে এই যে, যাকাত তাদের উপর ফরয ছিল। তারা যখন যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকার গুনাহ থেকে তওবা করল, উত্তমভাবে ইসলাম মেনে চলতে শুরু করল এবং যাকাতও দিতে লাগল, তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (স)-কে তা গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন অথচ কোন মুনাফিকের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা যায় না।[২]

'বিশেষ কারণ' শব্দের সাধারণ অর্থ জ্ঞাপনের বিরোধী নয়। বিশেষজ্ঞদের কাছে এটাই গ্রহণযোগ্য মত।

উপরিউক্ত আয়াতের 'সাদকাত' শব্দের অর্থ যে যাকাত, তার বড় ও স্পষ্ট দলীল হচ্ছে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে যাকাত দিতে অস্বীকারকারীরা তো এই আয়াতটিকেই দলীল হিসেবে পেশ করেছিল। দাবি করেছিল যে, এই নির্দেশ বিশেষভাবে রাসূলের প্রতি, অতএব তার পরে এর কোন অবকাশ নেই (একটু পূর্বেই আমরা এ কথার উল্লেখ করেছি, পরেও করা হবে)। অথচ তখন কোন সাহাবীই এ কথার প্রতিবাদ করেন নি। যদিও আয়াতটি সম্পর্কে এবং কোন্ কথা বোঝবার জন্যে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল সে সম্পর্কে তাঁরাই ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক ওয়াকিফহাল। এ আয়াতটি 'ফরয সাদকা—যাকাত ছাড়া অপর কোন বিষয়ে নাযিল হয়েছে এমন কথা কেউই বলেন নি। পরবর্তী কোন আলিম-বিশেষজ্ঞও এই মত প্রকাশ করেন নি। সকলেই একবাক্যে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, উক্ত আয়াতে রাসূল (স)-কে সম্বোধন করা হয়েছে যেমন তেমনি তাঁর পরে যারাই মুসলিম উম্মতের কর্ণধার হবে তাদের সকলকেই এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।[৩]

'সাদাকাত' অর্থ যে যাকাত তার কতগুলো লক্ষণও রয়েছে। বনূ হাশিম গোত্রের কতিপয় যুবক রাসূলে করীম (স)-এর কাছে যাকাত-সংস্থার কর্মচারী হওয়ার দাবি জানায়। তাদের এই দাবির জবাবে নবী করীম (স) বলেছিলেনঃ

---

১. الروض التضيه ج ٢- ص ٤١

২. ইমাম রাযী ও কাসেমী লিখিত তাফসীর।

৩. تفسير ابن كثير- تفسير القاسمى

اِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَنَا اٰلِ مَحَمَّدٍ اِنَّمَا هِیَ اَوْسَاخُ النَّاسِ-

এই যাকাত (তা সংগ্রহের কর্মাচারী হওয়া) মুহাম্মাদের বংশের লোকদের জন্যে হালাল নয়। কেননা তা জনগণের ময়লা।

এই প্রতীকী ও ইঙ্গিতপূর্ণ কথাটি আল্লাহ্‌র কথার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ঃ 'তুমি তাদের পবিত্র করবে, নির্মল ও পরিচ্ছন্ন করবে।'

ইমাম মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

كَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اُوْتِیْ بِصَدَقَةِ قَوْمٍ صَلّٰی عَلَیْهِمْ فَاَتَاهُ اَبِیْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِ اَبِیْ اَوْفٰی-

যখন কোন লোক-সমষ্টির 'সাদ্‌কা (যাকাত) নিয়ে আসা হত তখন নবী করীম (স) তাঁদের জন্যে রহমতের দোয়া করতেন। আমার পিতা তাঁর 'সাদকা' নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্! পূর্ণ রহমত নাযিল কর আবূ আওফার বংশের লোকদের প্রতি।'

রাসূলে করীম (স) লোকদের 'সাদকা' গ্রহণের আদেশ পালন করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র পরবর্তী আদেশ 'সাদ্‌কা' দাতাদের জন্যে রহমতের দোয়া করার আদেশও পালন করেছেন, তা উক্ত হাদীসের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট জানা যায়। এ থেকে সব আলিমই এই মত দিয়েছেন যে, মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর স্থলাভিষিক্তের কর্তব্য হল 'যাকাত' দানের জন্যে দোয়া করা।

সূরা তওবায় যাকাত পর্যায়ে যত কথাই এসেছে, তন্মধ্যে এটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা। আর তা মাদানী সূরাসমূহে যাকাত ফরয হওয়ার এবং তার বিধি-বিধানের গুরুত্ব বোঝাবার ব্যাপারে প্রযুক্ত সাধারণ ভঙ্গীর প্রতীক।

কুরআনের দৃষ্টিতে যাকাত না দিয়ে কোন লোকই কল্যাণ পেতে পারে না, সত্যবাদী নেক্‌কার ও মুত্তাকী লোকদের মধ্যে গণ্যও হতে পারে না। তা হতে হলে অবশ্যই রীতিমত যাকাত দিতে হবে।

পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী মুনাফিকদের থেকেও কেউ ভিন্নতর পরিচিতি লাভ করতে পারে না নিয়মিত যাকাত না দিলে। মুঠিবন্ধকারী এবং লোকদের জন্যে ব্যয় করতে অস্বীকারকারী মুনাফিকদের থেকেও ভিন্নতর পরিচয়ে ভূষিত হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হয় না।

যাকাত না দিয়ে লোকেরা রহমত পাওয়ার যোগ্য অধিকারীও হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ নিজেই যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের জন্যে রহমত লিপিবদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। বলেছেন ঃ

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ- (الاعراف - ١٥٦)

আমার রহমত সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে নিয়েছে। তা আমি লিখে দেব সেই লোকদের জন্যে, যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং তারাই আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে, 'যাকাত' না দিলে আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব, রাসূলের এবং মু'মিনদের পৃষ্ঠপোষকত্বও লাভ করা যেতে পারে না।

কেননা আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُو الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ- وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ- (المائده -٥٥-٥٦)

তোমাদের একমাত্র বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আর ঈমানদার লোকেরা, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, তারাই অনুগত । আর আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও ঈমানদার লোকদের যারাই অভিভাবক বানাবে, (তারাই আল্লাহ্‌র দলভুক্ত) আর শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী হবে।

কুরআনের ঘোষণা, যারাই আল্লাহ্‌র সাহায্য করবে, আল্লাহ্ তাদেরই সাহায্য করবেন। কিন্তু এই সাহায্য সেই লোক কখনই পাবে না, যে যাকাত দেবে না। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ- اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ- اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ-وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ- (الحج- ٤٠-٤١)

যে লোক আল্লাহ্‌কে সাহায্য করবে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। সন্দেহ নেই, আল্লাহ্ শক্তিসম্পন্ন, সর্বজয়ী। তারা সেই লোক, যাদের আমরা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি, তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখবে। আর সর্বকাজের পরিণতি আল্লাহ্‌র জন্যেই।

কুরআনের মোটামুটি বলা কথার ব্যাখা দেয়া সুন্নাত

কুরআন ইসলামের সংবিধান, তার মৌল উৎস। কাজেই তাতে শুধু মৌলিক নিয়ম-কানুন (Fundamental Principles)-ই দেয়া হয়েছে, সাধারণ (Common)

নিয়ম-বিধিরই উল্লেখ রয়েছে তাতে। বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ বড় একটা নেই। তাও আছে শুধু সেই বিষয়ে, যেখানে খুঁটিনাটি বলে না দিলে মতদ্বৈধতার কারণে আল্লাহ্‌র বিধান অ-পালিত থেকে যাওয়ার ও বিভ্রান্তি হওয়ার আশংকা বিদ্যমান।

সুন্নাতই হচ্ছে কুরআনের বাক-ব্যাখ্যা, বাস্তব রূপ। কুরআনে যা মোটামুটি, সুন্নাতে তার বিস্তারিত রূপ প্রস্ফুটিত। কুরআনে যা অস্পষ্ট, সুন্নাতে তা স্পষ্ট। কুরআনে যা অনির্দিষ্ট, নিঃশর্ত, সুন্নাতে তা সুনির্দিষ্ট। রাসূলে করীম (স)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনের সাহায্যে এই কাজ সম্ভব হয়েছে এজন্যে যে, তিনি মহান আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এ ক্ষমতা, যোগ্যতা ও জ্ঞান লাভ করেছেন। আল্লাহ্ নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ- (النحل- ٤٤)

আমরা তোমার কাছে কুরআন নাযিল করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, যা কিছু জনগণের জন্যে নাযিল হয়েছে, তুমি তা তাদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করবে।

কুরআনে 'যাকাত' ফরয ঘোষিত হয়েছে। সুন্নাত তারই তাকীদ করছে বলিষ্ঠ কণ্ঠে এবং তা মক্কী জীবন থেকেই।

হযরত জাফর ইবনে তালিব (রা) হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানদের নামে হাবশা-সম্রাট নাজ্জাশীকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন, তাঁকে নবী করীম (স) সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি তাদের কি কি শিক্ষা দিয়েছেন, সেই পর্যায়ে বলতে গিয়ে বলেছেনঃ

وَيَاْمُرُنَا بِاصَّلٰوةِ والزَّكٰوةِ وَالصِّيَامِ- (ابن خزيمه فى صحيحه من حديث ام سلمة)

তিনি আমাদের আদেশ করেন নামায পড়তে, যাকাত দিতে ও রোযা রাখতে।

এখানে শুধুই নামায-রোযা-যাকাতের কথা বলা হয়েছে। তার কোন নির্দিষ্ট রূপ তখনও গড়ে উঠেনি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও তখন পর্যন্ত ফরয হয়নি, রমযানের রোযাও নির্দিষ্ট হয়নি। আর নিসাব ও পরিমাণসহ যাকাত তখনও চালুও হয়নি।[১] এ সবের বিস্তারিত, স্পষ্ট ও সুনির্ধারিত বিধান তো পরে মদীনা শরীফে নাযিল ও কার্যকর হয়েছে।

'ফরয যাকাত' পর্যায়ে কথা বলার প্রশস্ত স্থান ও পরিবেশ গড়ে উঠেছিল মদীনা শরীফে। তাই এখানেই তার নিসাব, পরিমাণ ও শর্তসমূহ সবিস্তারে বর্ণিত ও বিবৃত হয়। তা আদায় করার উৎসাহদান ও দিতে অস্বীকারকারীদের ভয় প্রদর্শন ও এখানেই সম্ভব ছিল।

---

১. فتح البارى ج- ٣، ص- ١٧١

যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ সুন্নাত কর্তৃক নির্ধারিত

যে সব ধন-মালে যাকাত ফরয হয়, তার পূর্ণ বিবরণ সুন্নাতে উদ্ধৃত হয়েছে। প্রতিটির নিসাব অর্থাৎ কত পরিমাণের হলে যাকাত ফরয হবে এবং কোন্ জিনিসে যাকাতের পরিমাণ কত, তা বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু যাকাত বাবদ লব্ধ সম্পদ কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় করা হবে, কোন্ কোন্ ধরনের লোক তা পাবে, তার মৌল কথা কুরআনের আয়াতে বলা হলেও তার বিস্তারিত আলোচনা সুন্নাতে পাওয়া যায়। আমরাও এ গ্রন্থে সে পর্যায়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত করব। এখানে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হল, সুনির্দিষ্ট নিসাব ও পরিমাণসহ যাকাত ফরয হওয়ার ইতিহাস।

আমরা জানতে পেরেছি যে, নিঃশর্ত ও পরিমাণ-অনির্ধারিত যাকাত মক্কী পর্যায়েই ফরয হয়েছে। বহু সংখ্যক ফকীহ ইমামও মত দিয়েছেন। কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীসের ভিত্তিতে তা-ই প্রমাণিত হয়। মাদানী সূরার আয়াতে ফরয যাকাতের উপর তাকীদ এসেছে, তার কোন কোন আইন ও বিধান বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছে। নিসাব, যাকাতের পরিমাণ ও তার সীমা-শর্ত উপস্থাপিত করেছে। এখানে অবশ্য প্রশ্ন উঠে, এ সব নির্ধারণ হিজরতের পর কখন এবং কোন্ সনে সুসম্পন্ন হয়েছে।

সকলের জানা ও প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে, হিজরতের দ্বিতীয় বছরেই তা ফরয হয়েছে—রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে। সা'দ ইবনে উবাদা বর্ণিত হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়।

তিনি বলেন ঃ

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ تُنَزَّلَ الزَّكٰوةُ ثُمَّ نَزَلَتْ فَرِيْضَةُ الزَّكٰوةِ-

রাসূলে করীম (স) যাকাত সংক্রান্ত হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে 'সাদকায়ে ফিতর' দেয়ার জন্যে আমাদের আদেশ করেছিলেন। যাকাত ফরয হওয়ার কথা নাযিল হয়েছে তার পরে।

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, এ হাদীসটির সনদ সহীহ্। তা প্রমাণ করে যে, 'সাদকায়ে ফিতর' ফরয হয়েছে যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে। কাজেই তা রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পরেই হয়ে থাকবে।[১] আর বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, রমযানের রোযা ফরয হয়েছিল হিজরতের পর। কেননা যে আয়াত এ ফরয ঘোষণা করেছে, তা সর্বসম্মতভাবেই মদীনায় অবতীর্ণ।

ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর দৃঢ়তা সহকারে লিখেছেন ঃ যাকাত ফরয হয়েছে হিজরতের নয় বছর পর। সা'লাবা ইবনে হাতিব সংক্রান্ত ঘটনা থেকেও এ কথার সমর্থন

১. فتح البارى -ج-٣، ص-١٧١

মেলে। তাতে বলা হয়েছে ঃ 'সাদকা'র যাকাতের আয়াত নাযিল হলে নবী করীম (স) তা আদায় করার উদ্দেশ্যে কর্মচারী পাঠালেন। সে গিয়ে বলল ঃ 'এটা জিযিয়া ছাড়া কিছু নয়, তা জিযিয়ার বোন।' জিযিয়া ওয়াজিব হয়েছে নবম হিজরী সনে। অতএব যাকাত ফরয হয়েছে এ নবম হিজরীতে, একথাই বলতে হয়।

'ফতহুল বারী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এ হাদীসটি যয়ীফ। এটাকে দলীল হিসেবে পেশ করা (গ্রহণ করা) যায় না।[১]

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেনঃ যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারটি ঘটে নবম হিজরী সনের পূর্বে। জিমাম ইবনে মা'লবাত সংক্রান্ত একটি হাদীস হযরত আনাস থেকে বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি এসে নবী করীম (স)-কে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করছিলেন এবং রাসূলে করীম (স) যেসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল ঃ

> "আল্লাহ্ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আমাদের মধ্যকার ধনী লোকদের কাছ থেকে এ সাদকা (যাকাত) গ্রহণ করবেন এবং তা আমাদের মধ্যকার দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করবেন?"
>
> নবী করীম (স) এর জবাবে বললেন ঃ "হ্যাঁ।

এ জিমাম রাসূলে করীম (স)-এর কাছে হিজরী পঞ্চম সনে এসেছিলেন ও তখন এই প্রশ্নোত্তর হয়েছিল। তবে যাকাত আদায়ের জন্যে কর্মচারী প্রেরণের ব্যাপারটি নবম হিজরী সনেই সংঘটিত হয়েছিল। তাহলে তার পূর্বেই যাকাত ফরয হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে।

সূরা তওবার পূর্বোদ্ধৃত আয়াত انما الصدقات للفقر-টি লোভী লোকদের লোভ নিবারণের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল। তারা ছিল মুনাফিক, তারা রাসূলে করীম (স)-এর সাদকা বন্টনের ব্যাপার নিয়ে তাঁকে নানাভাবে অভিযুক্ত করেছিল—এ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, যাকাত কার্যকর ও কায়েম ছিল তার পূর্ব থেকেই। আর রাসূল (স) তার সংগ্রহ বন্টনের জন্যে দায়িত্বশীল ছিলেন। তা যে আয়াতটির নাযিল হওয়ার পূর্ব থেকেই চলে আসা ব্যাপার এটা নিঃসন্দেহ।

রোযার পরই যাকাত

হাদীস সমষ্টি থেকে এবং ইসলামী আইন প্রণয়নের ইতিহাস দৃষ্টে আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রতিভাত যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই মুসলিমদের প্রতি সর্বপ্রথম ফরয হয়েছিল। আর তা হয়েছিল মক্কা শরীফে মি'রাযের পরই। অতঃপর মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছর রমযানের রোযা ফরয হয়। সেই সাথে করা হয় ফিতরার যাকাত; ফরয রোযাদারের বেহুদা কাজ—ইত্যাদি থেকে তাকে পবিত্র রাখার ব্যবস্থাস্বরূপ এবং ঈদের দিনে গরীব-মিসকীনের দারিদ্র্য-মুক্তি বিধানের উদ্দেশ্যে। তার পরে ধন-মালের যাকাত ফরয

---

১. تحزيج الكشاف - ৭৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, হাদীসটি খুব বেশী যয়ীফ।

ঘোষিত হয় নিসাব ও পরিমাণ নির্ধারণ সহ। অবশ্য এই নির্ধারণ ঠিক কোন্ সনে হয় তা আমরা নির্দিষ্টভাবে বলতে পারছি না। আর জিমাম ইবনে মা'লাবাতা রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন পঞ্চম হিজরী সনে। সেখানকার কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর থেকে একথা অকাট্যভাবে জানা যায় যে, তাঁর আগমনের পূর্ব থেকেই যাকাত সুপরিচিত ফরয হিসেবেই সমাজে চালু ও কার্যকর ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)- থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কালেমার সাক্ষ্যসহ। লোকেরা যখন তা গ্রহণ করে নিল, তাদের জন্যে নামায ফরয করা হল। তা-ও যখন তারা পালন করতে লাগল, তখন রোযা ফরয করা হল। তাকে যখন তারা সত্যরূপে গ্রহণ করে নিল, তখন তাদের উপর যাকাত ফরয করা হল। তা মেনে নেয়ার পর হজ্জ ফরয করা হল। তারপর ফরয করা হল জিহাদ। অতঃপর তাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলেন। বললেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا- (المائره - ٣)

আজকের দিনে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। সম্পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত। আর তোমাদের দ্বীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।

ইবনে আকীল الواضح গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

اِنَّ الزَّكٰوةَ بَعْدَ الصَّوْمِ-

যাকাত ফরয হয়েছে রোযা ফরয হওয়ার পর—।

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ

নবী করীম (স) মদীনা শরীফে যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে তাকীদ করেছেন, দ্বীন-ইসলামে তার স্থান ও গুরুত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁর ব্যাখ্যানুযায়ীই তা দ্বীন-ইসলামের অন্যতম মৌল স্তম্ভ। তিনি তা আদায় করার জন্যে উৎসাহ দিয়েছেন, দিতে যারা অস্বীকার করে তাদের জন্যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, বহু সংখ্যক হাদীসের মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতি ও ভঙ্গীতে। প্রখ্যাত 'হাদীসে জিবরীলে' উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ইসলাম কি?" রাসূলে করীম (স) জবাবে বললেন, "ইসলাম হচ্ছে তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। তুমি নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে এবং আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ করবে যদি তার সামর্থ্য তোমার থাকে।" (বুখারী, মুসলিম)

১. الفروع فى الفقه الحنبلى ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৭

হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত প্রখ্যাত হাদীসের বক্তব্য হল ঃ 'ইসলাম পাঁচটি জিনিসের উপর ভিত্তিশীল। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'র সাক্ষ্য দান, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা রাখা, সামর্থ্য থাকলে আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ করা।' (বুখারী, মুসলিম)

উপরোদ্ধৃত হাদীস দুটির মাধ্যমে নবী করীম (স) ঘোষণা করেছেন—(এ পর্যায়ের আরও বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে)ঃ ইসলামের 'রুকন'—স্তম্ভ পাঁচটি। তার প্রথম হল. দুটি কথার সাক্ষ্য দান। দ্বিতীয় হল নামায এবং তৃতীয় যাকাত।

অতএব বলা যায়, কুরআনে যেমন, হাদীসেও তেমনি যাকাত হচ্ছে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। এটা না হলে ইসলামের ভিত্তিই রচিত হতে পারে না। ইসলাম এই কয়টির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

অবশ্য রাসূলে করীম (স) কখনও কখনও পাঁচটির পরিবর্তে দুটি বা তিনটিরও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নামায ও যাকাতের উল্লেখ সর্বত্রই হয়েছে কথার সূচনা-স্বরূপ। এই দুটির প্রতিই লোকদের আহবান জানিয়েছেন, মুসলমানের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করেছেন প্রধানত এ দুটির উপরই।

বুখারী-মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়েমেন প্রেরণকালে বলেছিলেন ঃ[১]

> তুমি আহ্লে-কিতাবের একটা জাতির কাছে যাবে।[২] তাদের তুমি দাওয়াত দেবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সাক্ষ্যদানের জন্যে। তারা যদি তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানাবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর ফরয করেছেন দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায। তা-ও তারা মেনে নিলে তাদের জানাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর 'সাদকা' (যাকাত) ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরই গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে।[৩] তারা এ কথাও মেনে নিলে পর তোমাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেন তাদের ধন-মালের উত্তম অংশই তুমি নিয়ে না নাও, আর মজলুমের ফরিয়াদকে অবশ্যই ভয় করবে। কেননা তার ও আল্লাহ্র মাঝে কোন আবরণ বা অন্তরাল নেই।

---

১. ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ এটা দশ হিজরীর ঘটনা, রাসূলের বিদায় হজ্জের পূর্বের। কারো মতে তা ছিল নবম সনের ঘটনা, তবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে। কেউ বলেছেন, তা ছিল মক্কা বিজয়ের বছরের ঘটনা। তবে এ ব্যাপারে পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে যে, হযরত মুআয হযরত আবূ বকরের খিলাফতকাল পর্যন্ত ইয়েমেনে অবস্থান করেছেন। ইবনে আব্দুল বার-এর মতে তিনি ছিলেন বিচারপতি। আর নাসায়ীর মতে তিনি ছিলেন গভর্ণর।

২. ওসীয়ত বা উপদেশের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে একথা তাকে বলেছিলেন, যেন তার গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করেন। কেননা তদানীন্তন 'আহ্লে কিতাব' মোটা-মুটি শিক্ষিত লোক ছিল। তাই তিনি যেন তাদের সাথে তেমনভাবে কথা না বলেন, যেমন মূর্খ লোকদের সাথে বলা হয়।

৩. কেবল فقرا গরীব লোকদেরই উল্লেখ করা হয়েছে অথচ যাকাত ব্যয়ের খাত [illegible] এর কারণ হচ্ছে, তখন ওরাই ছিল বেশী সংখ্যক।

এই ভাষণে নবী করীম (স) নামায ও যাকাত উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। কেননা শরীয়াতে প্রকৃতপক্ষে এ দুটির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষ করে ইসলামের দিকে লোকদের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে এটাই করা হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে ঈমানের সাক্ষ্যের পর এ দুটির উল্লেখ অবশ্যই পাওয়া যাবে। যেমন আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُواالصَّلٰوةَ وَاٰتُوالزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِىْ الدِّيْنِ-

তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।

উপরের হাদীসটি থেকে একথা প্রমাণিত হয়ে যে, যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের জন্যে নবী করীম (স) দায়িত্বশীল কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। যাকাতের বিশেষত্ব হচ্ছে, তা আদায় করে নিতে হবে, সংগ্রহ করতে হবে। ব্যক্তিদের উপর তা ছেড়ে দেয়া যাবে না। রাসূলের প্রতি যাকাত গ্রহণের যে নির্দেশ কুরআনের আয়াতে এসেছে, এখানে তার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

বুখারীতে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

بَايَعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَقَامِ اصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ-

আমি রাসূলের হাতে বায়'আত করেছি নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া ও প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে কল্যাণ কামনার উপর।

বুখারী-মুসলিমে হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ-

আমি আদিষ্ট হয়েছি এ জন্যে যে, আমি যুদ্ধ করব লোকদের সাথে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে।

এখানে 'লোকদের' বলতে সেসব মূর্তি পূজারী আরবদের বুঝিয়েছেন, যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে ও সীমালংঘন করেছে এবং যাদের সাথে সন্ধি করার আর কোন পথ থাকেনি। কেননা আসলে তাদের কোন ধর্ম ছিল না যা বিলীন করা যেত, কোন আইন-বিধান ছিল না, যা তাদের সুশৃঙ্খলিত করতে পারত। তাদের শাসকও কেউ ছিল না, যার কথা তারা

মানতে প্রস্তুত হতে পারে। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা আরব জমীনকে ইসলামের হেরেম ও কেন্দ্রভূমি বানাবার ইচ্ছা করেছিলেন। এই কারণে দেশটিকে শিরকের ময়লা থেকে পবিত্র করার এবং এই ভূমির জনগণকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে মুক্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْاِخْلَاصِ لِلّٰهِ وَعِبَادَتِهٖ لَا يُشْرِكُ بِهٖ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ فَارَقَهَا وَاللّٰهُ عَنْهُ رَاضٍ- (بزار)

আল্লাহ্‌র প্রতি পরম আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, তাঁর শিরক মুক্ত ইবাদত নামায কায়েম ও যাকাত দিতে থাকা অবস্থায় যে লোক দুনিয়া ত্যাগ করল সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবেই দুনিয়া ছেড়ে গেল।

হযরত আনাস (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র এ দ্বীন নিয়েই নবী-রসূলগণ এসেছেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তা প্রচার করেছেন, ঘটনা-দুর্ঘটনার উত্তেজনা ও ইচ্ছা-বাসনার বিভিন্নতা সৃষ্টির পূর্বে। আল্লাহ্‌র কিতাবের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতে তার সমর্থন রয়েছে। বলেছেন, 'তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ উন্মুক্ত করে দাও।' বলেছেন, 'মূর্তিপূজা পরিহার করা, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, নামায কায়েম করা ও যাকাত দেয়াই হচ্ছে তাদের তওবা।' অপর এক আয়াতে বলেছেন ঃ 'তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।'

যাকাত না দেয়ায় কঠোর আযাবের ভয় প্রদর্শন

অপরাপর বহু কয়টি হাদীসে নবী করীম (স) যাকাত দিতে অস্বীকারকারী লোকদের পরকালীন কঠিন আযাবের ভয় দেখিয়েছেন। এরূপ ভয় প্রদর্শনের মূলে চেতনাহীন মন-মানসে চেতনা সৃষ্টি এবং লোভী ও স্বার্থপর মানুষকে দানশীল বানানোর উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। তিনি উৎসাহদানের ও ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে লোকদেরকে কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। জানিয়ে দিয়েছিলেন, কর্তব্য পালনে অবহেলা করলে আইনের চাবুক ও তরবারির ঝংকার তাদের প্রকম্পিত করবে।

পরকালীন আযাব

বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا

كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا لنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاٰ يَةَ- وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْراً الَّهُمْ- بَلْ هُوَ شَرُّلَّهُمْ سَيُطَوَّ قُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ- (الاعمران- ١٨٠)

আল্লাহ্ যাকে ধন-মাল দিয়েছেন, সে যদি তার যাকাত আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তা একটি বিষধর অজগরের—যার দুই চোখের উপর দুটি কালো চিহ্ন রয়েছে—রূপ ধারণ করবে। বলবে, আমিই তোমার ধন-মাল, আমিই তোমার সঞ্চয়। অতঃপর নবী করীম (স) এ আয়াতটি পাঠ করলেনঃ 'যারা আল্লাহ্র দেয়া ধন-মালে কার্পণ্য করে, তারা যেন মনে করে না যে, তাদের জন্যে তা মঙ্গলময় বরং তা তাদের জন্যে খুবই খারাপ। তারা যে মাল নিয়ে কার্পণ্য করছে তা-ই কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি হবে।

ইমাম মুসলিম তারই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَّلَا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّيْ حَقَّهَا الاَّ اذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُعِلَتْ لَهُ صَفَائِحُ- ثُمَّ اُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجُبْهَتُهُ وَ ظَهْرُهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ- حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ فَيُرٰى سَبِيْلُهُ امَّا الَى الْجَنَّةِ وَامَّا الَى النَّارِ- وَمَا مِنْ صَاحِبِ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَايُؤَدِّيْ حَقَّهَا الاَّ اُوْتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَطْوُهُ بِاَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا مَضٰى عَلَيْهِ اُخْرٰهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اَوْلَاهَا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهٖ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يُرٰى سَبِيْلُهُ امَّا الَى الْجَنَّةِ وَامَّا الَى النَّارِ-

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যে মালিকই তার উপর ধার্য হক আদায় করে দেবে না, কিয়ামতের দিন সেগুলোকে তার পার্শ্বে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেয়া হবে। পরে তার উপর জাহান্নামের আগুনে তাপ দেয়া হবে, সেই উত্তপ্ত বস্তু দ্বারা তার পার্শ্ব, ললাট ও পৃষ্ঠে দাগ দেয়া হবে; সেই দিন—যার সময়কাল পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ। শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে। পরে তাকে তার পথ দেখানো হবে। হয় জান্নাতের দিকে নতুবা জাহান্নামের দিকে। গরু বা ছাগলের মালিকও যদি তার উপর ধার্য হক আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে আসা হবে,

সেগুলো নিজেদের দুভাগে বিভক্ত পায়ের খুর দিয়ে মালিককে লাথি মারবে এবং তার শিং দ্বারা তাকে গুঁতোবে যখনই তার উপর অপরটি এসে যাবে, প্রথমটি প্রত্যাহার করা হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন, যে দিনের সময়-কাল তোমাদের গণনামতে পঞ্চাশ হাজার বছরকালের সমান। পরে তাকে তার পথ দেখানো হবে, হয় জান্নাতের দিকে, নয় জাহান্নামের দিকে।

যাকাত না দেয়ার বৈষয়িক শাস্তি

রাসূলের সুন্নাত যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের জন্যে কেবল পরকালীন আযাবের ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, বৈষয়িক শাস্তির কথাও বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছে। সে শাস্তি যেমন শরীয়াতসম্মত, তেমনি পরিণামগত। তা প্রযোজ্য হবে এমন সব ব্যক্তির, যে তার মালে ধার্য আল্লাহ্র ও ফকীরের হক আদায় করে দিতে কার্পণ্য করবে।

পরিণামগত শাস্তি—যা উচ্চতর মূল্য লাভে সক্ষম হবে। এ পর্যায়ে নবী করীম (স) বলেছেনঃ 'যে লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আল্লাহ্ তাদের কঠিন ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করে দেবেন।[১]

দ্বিতীয় একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'ওরা ওদের ধন-মালের যাকাত দিতে অস্বীকার করে আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতকে বন্ধ করিয়েছে মাত্র। তারপরও অবশ্য কেবল জন্তু জানোয়ারের কারণেই বৃষ্টিপাত হয়। (ইবনে মাজা, বাজ্জার, বায়হাকী)

অপর একটি হাদীসের কথা হল ঃ যাকাত যে মালের সাথে মিশ্রিত হয়ে থাকবে, তা অবশ্যই বিপর্যয় হবে। (বাজ্জার, বায়হাকী)

এ হাদীসটির দুটি অর্থ হতে পারে ঃ

প্রথম, সাদকা অর্থাৎ যাকাত কোন ধন-মালের মধ্যে রেখে দেয়া হলে তা হিসেব করে মূল ধন-মাল থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা করা না হলে তা-ই সেই ধন-মালের ধ্বংস ও বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

অপর একটি হাদীসের বক্তব্যেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে ঃ

مَاتَلَفَ مَالٌ فِىْ بَرٍّ وَّلَا بَحْرٍ اِلاَّ بِحَبْسِ الزَّكٰوةِ– (مجمع الزوائد)

স্থল ও জলভাগে ধন-মাল বিনষ্ট হয় শুধু যাকাত আটকে রাখার দরুন।[২]

---

১. الطبراني فى الاوسط। এ হাদীসের বর্ণনাকারিগণ সিকাহ্, হাকেম ও বায়হাকীতে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা অতিরিক্ত কথা নকল করেছেন ولامنع قوم الزكوة الا حبس عنهم القطر —যে জাতি যাকাত দেয় না, তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেয়া হয়। হাকেম বলেছেন, মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ্।

২. তাবরানী বলেছেন. উমর ইবনে হারুন নামক বর্ণনাকারী 'যয়ীফ'।

দ্বিতীয়, এক ব্যক্তির যাকাত গ্রহণ করে—যদিও সে যাকাতের মুখাপেক্ষী বা এর উপর নির্ভরশীল নয়। সে এ কাজ করে তার নিজের ধন-মালের সঙ্গে যাকাতকেও ধ্বংস ও বিনষ্ট করে।

ইমাম আহমদ হাদীসটির এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর শরীয়াতসম্মত শাস্তি

যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর জন্য একটা শরীয়াতসম্মত শাস্তিও রয়েছে। প্রশাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানই এ শাস্তি দানের জন্যে দায়িত্বশীল। নবী করীম (স) যাকাত পর্যায়ে বলেছেনঃ

مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ اَجْرُهُ وَمَنْ مَنْعَهَا فَاَنَا اٰخِذُهَا وَشَطْرَ مَا لِهِ عَزْمَةٌ مِّنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا- لَا يَحِلُّ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ مِّنْهَا شَىْءٌ- (احمد، نسائى، ابوداؤد)

যে লোক সওয়াব পাওয়ার আশায় যাকাত দিয়ে দেবে, সে তার সওয়াব অবশ্যই পাবে। আর যে তা দিতে নারায হবে, আমি তা অবশ্যই গ্রহণ করব তার ধন-মালের অংশ থেকে। তা হচ্ছে আমাদের রব্ বহু সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের অন্যতম। মুহাম্মাদ (স)-এর বংশের লোকদের পক্ষে তা থেকে কিছু গ্রহণ করা হালাল নয়।[১]

এ হাদীসটিতে যাকাত পর্যায়ের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলনীতি বলে দেয়া হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

এক, যাকাত সম্পর্কে আসল কথা হল, মুসলিম ব্যক্তি তা দেবে সওয়াব পাওয়ার নিয়তে ও আশায়। সে সওয়াব মহান আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই পাওয়া যাবে, এই দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করবে সে। কেননা সে তো তা দিয়ে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ইবাদত পালন করছে মাত্র। কাজেই যে তা করবে, সে তার সওয়াব—শুভ কর্মফল অবশ্যই পাবে। আল্লাহ্‌র কাছে তা-ই তার ইবাদতের চূড়ান্ত প্রতিফল।

দুই, যে লোক কার্পণ্য, লোভ-লালসা ও পার্থিব প্রেমে অন্ধ হয়ে পড়বে ও যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, তাকে সে অবস্থায় থাকবার সুযোগ দেয়া যাবে না। তার কাছ থেকে তা জোরপূর্বক আদায় করতে হবে। সে জোর আসবে শরীয়াতের সার্বভৌমত্বের বলে। রাষ্ট্রই এই শক্তি প্রয়োগ করবে। তখন তার যাকাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং শাস্তি ও দণ্ডস্বরূপ তার অর্ধেক ধন-মাল নিয়ে নেয়া হবে। কেননা সে তার ধন-মালে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হককে গোপন ও অস্বীকার করছে। তা অন্যদের জন্যেও শিক্ষামূলক হবে। ফলে আর কেউ যাকাত অস্বীকৃতির পথে অগ্রসর হবে না।

বলা হয়েছে, ইসলামের সূচনাকালে এরূপ শাস্তিদানের ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু উত্তরকালে তা বাতিল হয়ে যায়।[২] কিন্তু এ কথার কোন দলীল বা প্রমাণ নেই। কেবল

১. বায়হাকী এ হাদীসটি বর্ণনা করে লিখেছেন। আবূ দাউদও তা উদ্ধৃত করেছেন। বুখারী ও মুসলিম উদ্ধৃত করেন নি। কেননা বর্ণনাকারী মুআবিয়া ইবনে হায়দাতা দুর্বল।

২. শীরাজী তাঁর গ্রন্থ المهذب। -এ এই কথার উল্লেখ করেছেন।

সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে এই ধরনের কোন কথা বলাও যুক্তিসঙ্গত নয়। আমি মনে করি, এরূপ কোন শাস্তির ব্যবস্থা করা রাষ্ট্র-পরিচালকের ইচ্ছার উপর ন্যস্ত। যেখানেই দেখা যাবে লোকেরা যাকাত অস্বীকৃতিতে চরম সীমায় পৌঁছে গেছে, সেখানেই তা কার্যকর করা যাবে। কেননা এই কাজ থেকে তাদের বিরত রাখার বিকল্প কোন পন্থা নেই। আমরা 'যাকাত আদায়' আলোচনায় এ পর্যায়ে বিস্তারিত কথা বলব।

তিন. যাকাত আদায়ে এরূপ কঠোরতা ও দৃঢ়তা অবলম্বনের কারণ হচ্ছে সমাজের গরীব ও মিসকীনদের অধিকার আদায়ের দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা। কেননা আল্লাহ্ই তাদের জন্যে যাকাত ফরয করেছেন। তা তাদের প্রাপ্য। কিন্তু নবী করীম (স) এবং তাঁর বংশের লোকদের জন্যে এই যাকাতে কোন অংশ নেই। তাদের পক্ষে এ থেকে একবিন্দু গ্রহণ করাও হালাল নয়। এটি 'সাদ্‌কা' সম্পর্কে ইয়াহুদীদের অবলম্বিত নীতিরও বিরোধী। কেননা তথায় যাকাতের দশমাংশ হযরত হারুন নবীর বংশধরদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। আর অপর একটি অংশ ধর্মীয় পদাধিকারী লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল।[১]

যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

যাকাত দিতে অস্বীকারকারী লোকদের শাস্তিদান পর্যায়ে ইসলাম কোন জরিমানা ধরনের ব্যবস্থা চালু করেনি বা তাছাড়াও ভিন্ন ধরনের কোন শাস্তির প্রয়োগ থেকে বিরত রয়েছে। বরং যাকাত দিতে অস্বীকারকারী শক্তি ও দাপট সম্পন্ন বিদ্রোহী প্রতিটি দল বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তরবারি ব্যবহার ও যুদ্ধ ঘোষণাকেই ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এ পথে নরহত্যা ও রক্তের বন্যা প্রবাহিত করাকেও বিন্দু মাত্র পরোয়া করা হয়নি। কেননা অধিকার রক্ষা ও আদায়ের উদ্দেশ্যে যে রক্তপাত করা হয়, তা কখনই নিষ্ফল যায় না। আল্লাহ্র পথে—পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় যে প্রাণ দান করা হয়, তা কখনই মরে না, কখনই মরতে পারে না।

এ কথাটি আমাদের সম্মুখে প্রকট হয়ে দেখা দেয়, যখন আমরা সত্যের জন্যে ও আল্লাহ্র বিধান কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বনকারী ঈমানদার লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। তাদের ছাড়া অন্যান্য যেসব লোক আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানী করেছে, তাদের ধন-মালের ধার্য আল্লাহ্র হক আদায় করতে অস্বীকার করেছে, তাদের উপর অর্পিত আমানত রক্ষায় যত্নবান হয়নি, তারা নিষ্ফল ও অন্যায়ভাবেই রক্ত দিয়েছে, প্রাণ বিসর্জন করেছে। যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছিল তাদের কর্তব্য তারই উপর তারা বিপরীতভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। তাদের জান ও মালের নিরাপত্তার যা ছিল ভিত্তি, তারা নিজেরাই তাকে চূর্ণ করেছে।

বস্তুত যাকাত দিতে অস্বীকারকারী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বহু সংখ্যক সহীহ্ হাদীস দ্বারা যেমন প্রমাণিত, তেমনি এর উপর সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্য (ইজমা)-ও কায়েম হয়েছে।

---

১. আবুল হাসান নদভী লিখিত الاركان الاربعه দ্রষ্টব্য।

বস্তুত যাকাত দিতে অস্বীকারকারী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বহু সংখ্যক সহীহ্ হাদীস দ্বারা যেমন প্রমাণিত, তেমনি এর উপর সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্য (ইজমা)-ও কায়েম হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বুখারী মুসলিমে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছে। নবী করীম (স) ঘোষণা করেছেনঃ

أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتاَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمفوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ- فَاِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّىْ دِمَاءَ هُمْ اِلاَّ بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ-

লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দেবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। তারা যদি তা করে, তাহলে তাদের রক্ত আমার কাছ থেকে নিরাপত্তা পেয়ে গেল—তবে ইসলামের অধিকার আদায়ের জন্যে কিছু করার প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা। আর তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ আল্লাহ্র কর্তৃত্বাধীন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আমাকে আদেশ করা হয়েছে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্য দেবে, আমার ও আমি যে দ্বীন নিয়ে এসেছি তার প্রতি ঈমান আনবে। তারা তা করলে তাদের রক্ত ও ধন-মাল আমার কাছে নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে তার হক আদায়ের জন্যে কিছু করার প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা। তাদের হিসেব আল্লাহ্র কাছে।

ইমাম বুখারী, মুসলিম এবং নাসায়ী এ হাদীসটি নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। মুসলিম ও নাসায়ী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকেও এ রকমের হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।[১]

এসব হাদীস অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং তা চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না তারা তা দিয়ে দেয়। বাহ্যত মনে হয়, হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর কাছে এরূপ স্পষ্ট বলিষ্ঠ ভাষার হাদীস পৌছায়নি;[২] পৌছালে তাঁরা ইসলামের নামায-রোযা ইত্যাদি শরীয়াতী বিধান পালনে প্রস্তুত লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকৃত হলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে কি না, তা নিয়ে সেরূপ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হতেন না, যা তাঁরা করেছিলেন।

---

১. نيل الاوطار- ج ٤ ص ١٢١

২. তা অসম্ভব বা অস্বাভাবিকও কিছু নয়, কেননা কোন কোন সাহাবী হয়ত একটা হাদীস শুনেছেন , অন্যরা তা শুনেন নি।

এ ঐতিহাসিক তথ্য সর্বজনবিদিত যে, রাসূলের প্রথম খলীফার আমলে আরবের বিভিন্ন গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে। যদিও তারা নামায-রোযা পালনে প্রস্তুত ছিল। মুসায়লামা কায্যাব, সাজাহ্ ও তুলায়হা প্রভৃতি মিথ্যা নবুয়ত দাবিকারী এবং তাদের লোকজন তাদের নীতিকে প্রবল সমর্থন জানায়।

এ পর্যায়ে হযরত আবূ বকর (রা) -এর ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক ও অনন্য। তিনি দৈহিক ইবাদত—নামায এবং আর্থিক ইবাদত—যাকাত-এর মধ্যে কোনরূপ বিচ্ছিন্নতা বা পার্থক্যকে বরদাশ্ত করতে ও মেনে নিতে প্রস্তুত হন নি। এর কোন একটির প্রতি একবিন্দু উপেক্ষাও তাঁর সহ্য হতে পারে নি। কেননা তাঁর পূর্বে রাসূলের যামানায় তা করা সম্ভব ছিল না। একটা ছোট ছাগল বা উষ্ট্র বাঁধার একটা রজ্জুর ক্ষেত্রেও নয়।

এ পর্যায়ে মহান সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র বর্ণনা এখানে অবশ্যই উদ্ধৃত করতে হবে। তা থেকে প্রকৃত পরিস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তিনি বলেন ঃ

নবী করীম (স) যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা হলেন। এ সময় আরবের কিছু লোক কুফরী অবলম্বন করে। তখন হযরত উমর (রা) বললেন ঃ আপনি কি করে এ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্য দেবে। তারা যদি তা বলে, তাহলে তাদের রক্ত ও ধন-মাল আমার কাছে রক্ষা পাবে। তবে তার হক্ রক্ষার জন্যে কিছু করতে হলে ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত?

তখন হযরত আবূ বকর (রা) জবাবে বললেনঃ

وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ- وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا-

আল্লাহ্র শপথ; আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব সেই লোকের বিরুদ্ধে, যে নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হল ধন-মালের হক। আল্লাহ্র কসম. ওরা যদি একটা উষ্ট্রও দিতে অস্বীকার করে, যা রাসূল (স)-এর যামানায় তারা দিত, তা হলে আমি তাদের এই অস্বীকৃতির কারণে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্য যুদ্ধ করব।

এ কথা শুনে হযরত উমর (রা) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

فَوَاللّٰهِ مَاهُوَ اِلاَّ اَنْ قَدْشَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ-

আল্লাহ্র শপথ! এ আর কিছু নয়, আল্লাহ্ই আবূ বকরের অন্তরকে যুদ্ধের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছি, এটাই সত্য ও সঠিক সিদ্ধান্ত।

হযরত উমর (রা) প্রথমে বাহ্যিক কথার মধ্যেই জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কথার শেষ দিকটার দিকে লক্ষ্য দেন নি এবং তার শর্তসমূহও অনুধাবন করেন নি। তিনি মনে করেছিলেন কলেমা পড়ে ইসলামে দাখিল হলেই বুঝি ব্যক্তির রক্ত ও ধন-মাল নিরাপত্তা পেয়ে যেতে পারে। সাধারণত কতিপয় হাদীস থেকে যদিও এ কথাই বোঝা যায় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা সত্য নয়।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুক্তির দুটি দিকঃ

একটি, হাদীসটির মূল বক্তব্য, যার সাথে এ নিরাপত্তার শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, তা হল لابحقها। 'তবে তার হক রক্ষার জন্যে কিছু করতে হলে ভিন্ন কথা।' আর যাকাত হচ্ছে ধন-মালের হক্। এ হক রক্ষার জন্যে যুদ্ধও করা যাবে। এ কথা হযরত উমর (রা) ও অন্যরা অস্বীকার করতে পারে না।

দ্বিতীয়টি, যাকাতকে নামাযের মতই মনে করতে হবে। কেননা তা নামাযেরই 'বোন'। কুরআন ও সুন্নাতে এ দুটি একসঙ্গে ও পাশাপাশি উদ্ধৃত হয়েছে সর্বত্র।

হযরত আবূ বকর (রা) যে দলীল পেশ করেছেন, তা থেকে মনে হয়, হযরত উমর (রা) ও অন্যান্য সাহাবা প্রকাশ্যে নামায অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন। এটা হল ঐকমত্যের ক্ষেত্রে। পরে মতদ্বৈধতার বিষয়টিকে ঐকমত্যে নিয়ে আসা হয়। তাই হযরত উমরের নিকট হযরত আবূ বকরের অভিমত সত্য বলে স্থিতি লাভ করে। তিনি তা নির্ভুল মনে করেন এবং যাকাত অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধকে তিনি মনে প্রাণে মেনেও নেন। তার উপরোদ্ধৃত স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

রাসূলে করীম (স)-এর পর যে সব আরব গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসে, তাদের ব্যাপারে প্রথম খলীফার অনুসৃত নীতি ছিল এই। সকল সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর এ নীতি অকুণ্ঠিতভাবে সমর্থন করেন এবং যুদ্ধে শরীক হন। এমনকি প্রথমে এ ব্যাপারে যাঁর মনে সংশয় জেগেছিল তিনিও। এ থেকে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঐকমত্য (ইজ্মা) প্রতিষ্ঠিত হল। ইসলামী শরীয়াতে এ ইজ্মা একটা অন্যতম দলীল। এ প্রেক্ষিতে ইমাম নববী লিখেছেন ঃ এক ব্যক্তি বা একটা জনগোষ্ঠী যদি যাকাত দিতে অস্বীকৃত হয়, যুদ্ধ করতেও তারা রাযী না হয়, তবুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র কথা থেকে এরই সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেনঃ প্রথম দিকে সাহাবায়ে কিরাম যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করতেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) যখন যুদ্ধের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন, তাঁর দলিলও তিনি সকলের সমক্ষে পেশ করেন, তখন এ মতের যৌক্তিকতা সকলের কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তখন সকলেই তা মেনে নেন এবং সর্বসম্মতভাবে এ যুদ্ধ কার্যকর হয়।[১]

সম্ভবত ইতিহাসে হযরত আবূ বকর (রা) পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রই সর্বপ্রথম দরিদ্র, মিসকীন ও সমাজের দুর্বল ব্যক্তিদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। সমাজের শক্তিমান লোকেরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত এদেরই শোষণ করে আসছিল। কিন্তু

১. المجموع- ج- ٥، ص- ٣٣٤

তারা কোন শাসকের কাছে এর প্রতিকার পায় নি। ধনী ও শক্তিমানদের কাতার ছেড়ে দুর্বলদের পক্ষে দাঁড়াতে এ পর্যন্ত কেউই রাযী হয়নি। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথী সাহাবিগণ যাকাত দিতে অস্বীকারকারী লোকদের সৃষ্ট সংশয়ে বিভ্রান্ত হতে রাযী হননি। তাঁরা অকুণ্ঠ চিত্তে সেই যুদ্ধ করে দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

যাকাত অস্বীকারকারীরা কুরআনেরই (সূরা তওবার) আয়াত : خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ- وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- দিয়েই এই বিভ্রান্তির জাল বিস্তার করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, এ নির্দেশ তো বিশেষভাবে নবী করীম (স) -এর প্রতি। তিনি ছাড়া অন্য কারো প্রতি এই নির্দেশ ছিল না এবং অন্য কেউ সেই যাকাত আদায় করার অধিকারও পেতে পারে না। ফলে রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের সাথে সাথেই যাকাত দেয়ার বাদ্যবাধকতাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা আরও বলেছিল যে, "রাসূলে করীম (স) আমাদের কাছ থেকে যাকাত নিয়ে তার বিনিময়ে আমাদের দিতেন পবিত্রকরণ ও বিশুদ্ধকরণ কাজ। আমাদের জন্যে তিনি রহমতের দোয়া করতেন। আর তাঁর দোয়া আমাদের জন্যে শান্তি ও সান্ত্বনার কারণ হত। তাঁকে হারিয়ে আমরা এসব থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেছি। কিন্তু তাদের এই ধারণা ছিল একটা মারাত্মক বিভ্রান্তিপ্রসূত, একটা ভিত্তিহীন সংশয়মূলক ব্যাপার। কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী তাই লিখেছেন যে, কুরআনের ব্যাপারে এরূপ ধারণা মূর্খ লোকদের মনেই জাগতে পারে, যে লোক শরীয়াতের উৎস সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত। অথবা যে লোক দ্বীন নিয়ে খেল-তামাশায় অভ্যস্ত, দৃষ্টি সংকীর্ণ।[১]

তার কারণ এই যে, উপরিউক্ত আয়াতে স্পষ্টত নির্দেশ যদিও রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি ছিল কিন্তু আসলে এই নির্দেশ সব রাষ্ট্র পরিচালকদের প্রতিই—যারা মুসলিম উম্মতের উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন হয়। এ আয়াতটির সম্বোধন সেই বিশেষ সম্বোধন নয়, যেরূপ নিম্নে এ আয়াতটির রয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ-

হে নবী, আমরা তোমার জন্যে তোমার স্ত্রীদের হালাল করে দিয়েছি।

অথবা

وَمِنَالَّيْلِ فَتَهَجَّدْبِهِ نَافِلَةً لَّكَ-

রাতের বেলা তুমি তাহাজ্জুদ পড়, তোমার জন্যে তা নফল।

---

১. احكام القران- ج ٢، ص- ٩٩٥

এ দুটি আয়াতেই সম্বোধন বিশেষভাবে রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি। অন্য কারোর প্রতি নয়।

ইমাম খাত্তাবী লিখেছেন ঃ কুরআন মজীদের সম্বোধন তিন প্রকারের—একটি সম্বোধন সাধারণ, যার সম্মুখে সাধারণ লোকজন রয়েছে। যেমন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ ..... الاية-

হে ঈমানদার লোকেরা। তোমরা যখন নামাযের জন্যে প্রস্তুতি নেবে, তখন তোমরা ধৌত করবে তোমাদের মুখমণ্ডল ...

দ্বিতীয় প্রকারের সম্বোধন বিশেষভাবে রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি। তাতে অন্য কেউই শরীক নেই। এ ধরনের সম্বোধনে বিশেষ একটা স্পষ্ট লক্ষণ থাকে, যাতে অন্য কারো না হওয়ার কথা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। যেমন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْبِه نَافِلَةً لَّكَ-

রাতের বেলা তাহাজ্জুদের নামায পড় এটা তোমার জন্যে নফল।

অথবা

خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

একান্তভাবে তোমার জন্যে, মু'মিনদের ছাড়াই।

তৃতীয় এক প্রকারের সম্বোধন যদিও রাসূলে করীম (স)-কে লক্ষ্য করেই হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে তিনিসহ গোটা মুসলিম উম্মত শামিল রয়েছে।

যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ الَّيْلِ-

নামায কায়েম কর সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়া সময় থেকে শুরু করে রাত্রি আচ্ছন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত...।

অথবা

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, আল্লাহ্র নামে পানা চাইবে—

এ নির্দেশসমূহ বাহ্যত রাসূলের প্রতি হলেও তা সকলেরই পালনীয়। যাকাত সম্পর্কিত আয়াতঃ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً টিও এ পর্যায়ের এবং এ সম্বোধনও

বাহ্যত রাসূলের প্রতি হলেও তা সাধারণভাবে সব মুসলিমকেই পালন করতে হবে। কেবল রাসূলই তা পালনে বাধ্য নন। এই ধরনের সম্বোধনে একটা বিশেষ ফায়দা নিহিত আছে। প্রথমত তিনিই দ্বীনের আহবানকারী—আল্লাহ্র দিকে। আল্লাহ্র কথার মূল বক্তব্যের ব্যাখ্যাদাতা তিনিই। কাজেই এ ধরনের নির্দেশে তাঁকে সম্বোধন করা হলে দ্বীনের শরীয়াত প্রথমে তাঁরই দ্বারা পালিত হবে এবং তাঁর দেখানো পদ্ধতিতে গোটা উম্মতই তা পালন করতে সমর্থ হবে।

যাকাত অমান্যকারীরা বলেছে যে, রাসূলে করীম (স) যাকাত নিতেন, আর তার বদলে তিনি আমাদের পবিত্র-পরিশুদ্ধ করতেন, আমাদের জন্যে দোয়া করতেন—অন্য কারো কাছ থেকে তা পাওয়া যাবে না, এটা একটা ভিত্তিহীন কথা। কেননা এই পবিত্রকরণ ও পরিশুদ্ধকরণ যাকাতের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। কাজেই তা রাসূলের বেলায় যেমন, তাঁর পরে অন্যদের বেলায়ও ঠিক তেমনিভাবেই সম্পন্ন হতে থাকবে। রাসূল ছাড়া অন্যদের মাধ্যমে তা হবে না, এমন কথা নয়।

তাদের জন্যে দোয়ার ব্যাপারটিও অনুরূপ। যিনিই লোকদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করবেন—তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হোন, কি তাঁর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি—তিনি যাকাতদাতাদের ধন-মালে বরকত ও শুভ-প্রতিফলের জন্যে দোয়া করতে আদিষ্ট। আর এই দোয়াতেই ধন-মালের মালিকের জন্যে সান্ত্বনা নিহিত রয়েছে। এভাবেই কার্য ও কারণে আল্লাহ্র বিধানে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। এ এক সাধারণ ব্যাপার, রাসূল (স)-এর জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট নয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, রাসূল (স)-এর দোয়ার মর্যাদা সর্বোচ্চ এবং তার তাসীরও মনে প্রাণে অনেক ব্যাপক ও গভীর, যার তুলনা হয় না।

এ দিকে দৃষ্টি রেখে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেনঃ যাকাতাদাতার জন্যে রাসূল (স)-এর পবিত্রকরণ পরিশুদ্ধকরণ ও দোয়া সবই পাওয়া যাবে আল্লাহ্ ও রাসূল (স)-এর আনুগত্য করার মাধ্যমে। নবীর জীবদ্দশায় নেক আমলের যে সওয়াব নির্ধারিত ছিল, তাই চিরদিনই কার্যকর থাকবে, কোনদিনই তা ফুরিয়ে যাবে না।[১]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছিল, এরা তাদের একটা গোষ্ঠী। তাদের পন্থায় বিদ্রোহকারী আরো ছিল। তারা নিঃসন্দেহে প্রকাশ্যে কুফরী অবলম্বন করেছিল। নবুয়্যাত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। মুসায়লামা, কায্যার প্রভৃতি নবুয়্যাতের মিথ্যা দাবিকারীদের সহায়তা করেছিল। নামায ও যাকাত সমান ও অভিন্নভাবে ফরয হওয়ার কথা তারা অস্বীকার করেছিল।

দ্বীন-ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব

অতঃপর দ্বীন-ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা পর্যায়ে আলোচনা আবশ্যক। ইসলামের অন্যতম 'রুকন' বা স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। এ কথা বিশেষ ও সাধারণ

---

১. দেখুনঃ نيل الاوطار الشوكانى-ج ٤ ص ٢ অথবা احكام القران لابن العربى ق ٢ -ص ٩٩٤ ومعالم السنن للخطابى ج - ٦ - ص ١٦٠-

সকলেই জানেন। যাকাত যে ফরয, তা বার বার আবৃত্ত কুরআনের আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণার দ্বারা সপ্রমাণিত। নবীর 'মুতাওয়াতির' সুন্নাত দ্বারা তা প্রমাণিত। পূর্বের ও পরের গোটা উম্মতের লোকদের সামষ্টিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা অস্বীকৃত। যুগের পর যুগ—বংশের পর বংশের মাধ্যমে তা প্রচলিত ও প্রতিপালিত।[১]

যাকাত অমান্যকারী কাফির

ইসলামী শরীয়াতে যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ বলে আলিমগণ বলেছেন, যে লোক তা অস্বীকার করবে, তার ফরয হওয়াকে অমান্য করবে, সে অবশ্যই কাফির হয়ে যাবে এবং ধনুক থেকে তীর যেমন করে বের হয়ে যায়, সেও ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

ইমাম নববী বলেছেন ঃ যাকাত দেয়া ফরয একথা স্বীকার করে কেউ যদি তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে দেখতে হবে, সে কি নও-মুসলিম হিসেবে এ সম্পর্কে এখনও জানতে পারেনি বলে তা করছে কিংবা সমাজসভ্যতা থেকে বহু দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কারণে এরূপ মনোভাব পোষণ করছে? যদি তা হয়, তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না। তখন তাকে ভালোভাবে জানাতে ও বোঝাতে হবে এবং তারপর তার কাছ থেকে যাকাত নিয়ে নিতে হবে। তখন দিতে অস্বীকার করলে অবশ্যই তাকে কাফির বলতে হবে।

যদি লোকটি এমন হয় যে, প্রকৃত ব্যাপার তার কাছে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে না। যেমন মুসলিম সমাজে মিলেমিশে বসবাসকারী মুসলমান; সে যদি তা অস্বীকার করে, তা হলে যে নির্ঘাত কাফির বলে গণ্য হবে। তার উপর মুরতাদ হওয়ার শাস্তি কার্যকর হবে। প্রথমে তাকে তওবা করতে বলা হবে এবং তওবা না করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কেননা যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত, তা দ্বীন-ইসলামের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। কাজেই তা অস্বীকার করা হলে আল্লাহ্‌কেই অস্বীকার করা হয়। রাসূলকেও অমান্য

---

১. কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা ছাড়া নিতান্ত বিবেক-বুদ্ধির বিচারেও যাকাত ফরয প্রমাণিত। অবশ্য এ বিবেক-বুদ্ধি ঈমানদার লোকের—বেঈমানের নয়। ঈমানদার ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার ও সৃষ্টির প্রতি তাঁর অফুরন্ত রহমতের কথা বিশ্বাস করে। অন্তত তিনটি দিক দিয়ে বিবেচনা করা চলে ঃ (১) যাকাত দিলে গরীব. মিসকীন. অক্ষমের সাহায্য হয়। তা পেয়ে তারা আল্লাহ্‌র নেক বান্দার দায়িত্ব পালন করে বেঁচে থাকার সুযোগ পেতে পারে। আল্লাহ্‌র ধার্যকৃত ফরয আদায় করার যোগ্যতা হয় তাদের ; (২) যাকাত আদায়কারীর মন-অন্তর পবিত্র করে, পাপের গ্লানি ও মলিনতা থেকে পরিচ্ছন্ন করে। তার চরিত্রকে দানশীলতার গুণে বিভূষিত করে। সে কার্পণ্য ও লোভ-লালসা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। যদিও মানুষ স্বাভাবগতভাবেই লোভী ও স্বার্থপর। যাকাত দেয়ার ফলে তার মধ্যে বদান্যতা ও মহানুভবতা জেগে ওঠে। আমানত সমূহ আদায় করতে অভ্যস্ত হয়। পাওনাদারদের পাওনা ও হক্‌দারদের হক্ দিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়। আর (৩) আল্লাহ্ তা'আলা ধনী লোকদের নিয়ামত দিয়েছেন, নানা ধন-সম্পত্তি ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ধন-মাল দিয়েছেন। সে তা দিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্য সহকার জীবন-যাপন করে। এ জন্যে তার শোকর আদায় করা কর্তব্য। যাকাত দিয়ে সে এ শোকর আদায়ের সুযোগ পায়।

করা হয়। অতএব তাদের কাফির হওয়ায় কোনই সন্দেহ থাকে না। ইবনে কুদামা প্রমুখ বড় বড় ফিকাহ্‌বিদেরও এই মত।[১]

শরীয়াতের এই সুস্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও ঐকমত্য ভিত্তিক সিদ্ধান্তের আলোকেই আমরা সেসব লোক সম্পর্কে ধারণা করতে পারি, যারা যাকাতকে অবহেলা ও উপেক্ষার চোখে দেখে এবং বলে, "তা এ যুগের উপযুক্ত নয়" তারা নাকি আবার মুসলমান। মুসলিম বংশের সন্তান এবং মুসলিম জাহানের প্রাণকেন্দ্রে লালিত-পালিত। প্রকৃত-পক্ষে এটা সুস্পষ্ট মুরতাদ হওয়ার কাজ, যদিও তাদের শাসনের জন্যে আবূ বকরের মত খলীফা নেই।[২]

ইসলামের যাকাত ও অন্যান্য ধর্মের যাকাতের মধ্যে পার্থক্য

দ্বীন-ইসলামে যাকাত ফরয হওয়া ও তার স্থান বা মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র ভিত্তিতে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল। এক্ষণে আমরা এ ফরযকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিচার-বিবেচনা সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করতে পারি। এ পর্যায়ে প্রথম কথা হল, প্রাচীন ধর্মসমূহ দরিদ্র ও অক্ষম লোকদের প্রতি যে করুণা ও অনুগ্রহ বাস্তবায়িত করেছে, যাকাত তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ব্যবস্থা। এ দুইয়ের মাঝে কোন তুলনা করা চলে না। এখানে কয়েকটি দিক দিয়ে আমাদের বক্তব্য পেশ করা হচ্ছেঃ

এক. ইসলামে যাকাত কখনই একটা নিছক নেক কাজ বা খুব ভাল অভ্যাসের ব্যাপার ছিল না। তা সব সময়ই ইসলামের একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ 'রুকন' রূপে গণ্য। তা ইসলামের এক তুলনাহীন অবদান। চারটি প্রধান ইবাদতের অন্যতম হচ্ছে এই যাকাত। তা দিতে অস্বীকার করা চিরকালই ফিস্‌ক—ইসলামের সীমালংঘন বলে চিহ্নিত। তার ফরযিয়াত অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়েছে। এটা কোন ইচ্ছামূলক নেক কাজ বা অনুগ্রহ বিশেষ কোন দিনই ছিল না। আর এটি নফল সাদ্‌কাও নয়। বরং এটা বড় ফরয কাজ, অতীব উচ্চমানের, নৈতিক ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পর্যায়ে গণ্য।

দুই. ইসলামের দৃষ্টিতে তা ধনীদের ধন-মালে গরীবদের সুনির্দিষ্ট হক। ধন-মালের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ্‌ই এ হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারাই খলীফা হবে, তাদের কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে তা আদায় ও বন্টন করা। তারা হচ্ছে যাকাতের ভাণ্ডারী। এ কারণে তাতে গরীবদের উপর ধনীদের অনুগ্রহ হওয়ার কোন ভাবধারাই নেই। কেননা ধন-ভাণ্ডারের আসল মালিকের নির্দেশে তার কোন অংশ কাউকে দিলে তাতে ভাণ্ডারী বা বন্টন কারীর অনুগ্রহের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

তিন. এ 'হক' সুপরিজ্ঞাত। ইসলামী শরীয়াতই তার 'নিসাব' ও পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এর সীমা ও শর্তও তারই নির্ধারিত। কখন তা দিতে বা আদায় করতে হবে, তার পন্থা ও নিয়ম কি, এই সব কিছুই আগে থেকে বলে দেয়া। প্রতিটি মুসলিমই জানে তার দলিল ও প্রমাণ।

---

১. المجموع - ج٥ - ص ٣٢٢٤

২. আবুল হাসান নদভী লিখিত এক পুস্তিকা।

চার. এই অধিকারটি ব্যক্তিদের মনের ভাল-না-লাগার উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। তা সংগ্রহ বা আদায় করা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এবং বন্টন করা ইনসাফের নীতি অনুযায়ী সরকারের উপর অর্পিত দায়িত্ব। আর তা করা হবে এই কাজে নিযুক্ত বিশেষ কর্মচারীর মাধ্যমে এবং সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত করের মতই তা আদায় করা হবে। এই কারণে কুরআনের 'তাদের-ধন-মাল থেকে সাদ্‌কা গ্রহণ কর।'—এ এই নির্দেশের ব্যাখ্যায় সুন্নাত বলেছে ঃ 'তা গ্রহণ করা হবে ধনীদের কাছ থেকে।'

পাঁচ. এই ফরয কাজ করতে অর্থাৎ যাকাত দিতে অস্বীকারকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সরকার শাস্তি দেবে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সে শাস্তি মালিকের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে নেয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে রাসূলের কথা—"আমি তা গ্রহণ করবই এবং তার সম্পদের অর্ধেক।"

ছয়. এই ফরয আদায়ে যে প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীই বিদ্রোহ করবে, মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হল তার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করা। যতক্ষণ না তাদের ধন-মাল থেকে আল্লাহ্ নির্ধারিত গরীবদের হক দিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়। সহীহ্‌তম হাদীসমূহ একথা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর সঙ্গী-সাথী, সাহাবায়ে কিরাম বাস্তবে তা-ই করেছেন।

সাত. মুসলিম ব্যক্তি এই ফরয আদায় করার জন্যে আর্দিষ্ট—রাষ্ট্র ও সরকার বা সমাজ-সংস্থা যদি তা আদায় করার কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ নাও করে। কেননা এই ফরযটি প্রথমে তো একটা বড় ইবাদত, যা পালন করে মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করতে পারে এবং স্বীয় মন-মানসিকতা ও ধন-মাল পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে পারে। কাজেই রাষ্ট্র সরকার তার দাবি না করলেও তার ঈমান ও কুরআন তার প্রতি এজন্যে তাকীদ করছে। অতএব শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী তাকে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে।

আট. যাকাত বাবদ সংগ্রহীত সম্পদ শাসক-প্রশাসকদের খামখেয়ালীর ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না।—ইয়াহুদী সমাজে যেরূপ করা হয়েছিল। বরং পাওয়ার অধিকারী নয় এমন লোভী লোকদের লোভ-লালসা বা খেয়াল-খুশি অনুযায়ীও তা যথেচ্ছ ব্যয়-ব্যবহার করা যেতে পারে না। এজন্যে ইসলাম তার সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং পাওনাদারদের তালিকাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। যেমন কুরআনের আয়াত—নিঃসন্দেহে যাকাত-সাদকাত হচ্ছে গরীব ও মিসকীনদের জন্যে—। হাদীসেও তার স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা রয়েছে। লোকেরা তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পেরেছে যে, এখানে ধন-সম্পদ সংগ্রহ করাটাই সমস্যা নয়, তার ব্যয়-বণ্টনটাও অতি বড় সমস্যা। এই কারণে নবী করীম (স) ঘোষণা করেছিলেন যে, আমার ও আমার বংশের লোকদের জন্যে তাতে কিছু নেই। তা প্রতিটি এলাকার সমাজের ধনী লোকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং সেই সমাজেরই গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।"

নয়. গরীবদের উপস্থিত প্রয়োজন পূরণ কিংবা তাদের সাময়িক দৈন্য-দুর্দশা বিদূরণের জন্যে এই যাকাত কোন বদান্যতার ব্যাপার নয়। তা দারিদ্র্য ও দৈন্যের

ব্যবদান করা গ্রাসের মুখে ছেড়ে দিলেই চলবে না। আসলে তার লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্যের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানা, দরিদ্রদেরকে দারিদ্র্য থেকে চিরমুক্তির ব্যবস্থা করা। তাদের জীবন থেকে অভাব তাড়নার মূলোৎপাটন করা, জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনভাবে বিচরণ করার যোগ্য করে তোলা। কেননা এ একটি নিয়মিত আবর্তনশীল কর্তব্য। গরীবদের জৈবিক মেরুদণ্ড শক্ত ও সোজা করে দেয়া তার কাজ। 'যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র' পর্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

দশ. কুরআন নির্ধারিত ও সুন্নাত কর্তৃক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাকৃত যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট মনে হয়, তা দিয়ে বহু সংখ্যক আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, সামষ্টিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করাই উদ্দেশ্য। এই কারণে যাদের মন জয় করতে হবে, যারা বন্দী, ঋণগ্রস্ত এবং আল্লাহ্র পথে—এই সবকে ব্যয়ের ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর এগুলো যে প্রশস্ত ক্ষেত্র অন্যান্য ধর্মের প্রবর্তিত যাকাত ব্যবস্থার তুলনায় অনেক সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যসম্পন্ন, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

এ সব পার্থক্যকারী দিক আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলা যে, ইসলামের যাকাত একটা নবতর বিধান, অন্যান্য ধর্ম প্রবর্তিত ব্যবস্থাসমূহ থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্নতর ও স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। অন্যান্য ধর্মের উপদেশ-নসীহত, পুণ্য কাজের উৎসাহ দান এবং কার্পণ্য সম্পর্কিত সতর্কবাণী ইত্যাদির সাথে ইসলাম প্রবর্তিত যাকাত ব্যবস্থার কোন তুলনাই হতে পার না। অনুরূপভাবে রাজা-বাদশাহ ও শাসক-প্রশাসকদের আদায় করা ট্যাক্স বা খাজনা ইত্যাদির সাথেও তার কোন সাদৃশ্য নেই। বরং সে ব্যবস্থায় গরীবদের কাছ থেকে নিয়ে ধনীদের মধ্যেই বন্টন করা হয়, কর্তাদের ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থাপনায় ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের মনের অভিলাষ চরিতার্থ করার কাজে, তাদের রাষ্ট্রীয় গদী রক্ষার্থে উদার হস্তে উড়ানো হয়।

যাকাতের প্রকৃতি সম্পর্কে শাখ্ত (Joseph Schacht)-এর ধারণা ভুল

ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব, স্থান ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা উপরে পেশ করা হল এই প্রেক্ষিতে যাকাত সম্পর্কে কতিপয় ভিত্তিহীন ধারণা ও মন্তব্য সম্পর্কে একটা পর্যালোচনা উপস্থাপিত করা হচ্ছে। এ সব ধারণা ও উক্তি যাদের, তারা আসলে জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধির দিকপাল কিছু নন। কেননা জ্ঞানের ব্যাপারে সাধারণ দায়িত্বই এখানে উপেক্ষিত।

ইসলামী বিশ্বকোষ-এর প্রবন্ধকার 'যাকাত' সম্পর্কে লিখেছেনঃ

হাদীসে এমন কিছু অবস্থার উল্লেখ আছে, যখন যাকাত দেয়া হয় তা পরে প্রবর্তিত যাকাত ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সে যাই হোক, যাকাতের প্রকৃতি নবী করীমের জীবদ্দশায় সব সময়ই প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট রয়ে গেছে; তা দ্বীনের ধার্য করা কোন করও ছিল না। এই কারণে নবীর ইন্তেকালের পর বহু সংখ্যক আরব গোত্র তা দিতে অস্বীকার করে। কেননা তারা মনে করে নিয়েছিল যে, মূল চুক্তিকারীর

ইন্তেকালে যাকাত দেয়ার চুক্তিটি বাতিল হয়ে গেছে। কোন কোন মু'মিনও তা দিতে অস্বীকার করেন। তাদের মধ্যে হযরত উমর (রা) অন্যতম। পরে তাঁরা তা মেনে নেন। (আরবী অনুবাদ-৩৫৮পৃঃ)

কিন্তু শাখ্‌ত (Joseph Schacht) যে হাদীসের কথা বলেছেন, তা চিহ্নিত করেন নি। করলে সে সব হাদীস সম্পর্কে আমাদের মতামত দিতে পারতাম। এখন আমরা বলতে পারি যে, শাখত-এর এই অন্তঃসারশূণ্য দাবির এক কানাকড়িও মূল্য নেই। তার বক্তব্যের 'পরে প্রবর্তিত যাকাত ব্যবস্থা' বলে তিনি এই ধারণা দিতে চেয়েছেন যে, ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা বুঝি নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম জনগণই উদ্ভাবন করেছেন, এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ ওহী-প্রবর্তিত নয়। বরং তা অবস্থা ও মানবীয় অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি, যা মুসলমানরা পারস্য ও রোমান সমাজ থেকে লাভ করেছে। শাখ্‌ত এবং তাঁর মত অন্যান্য অরিয়েন্টালিস্টদের মুখে এ ধরনের কথাই শোনা যায়, যার সত্যিই কোন ভিত্তি নেই।

বস্তুত কুরআন মজীদের আয়াত, সহীহ্ হাদীস, সাহাবা ও খুলাফায়ে রাশেদুনের অনুসৃত আদর্শ প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত করেছে। অকাট্যভাবে প্রমাণিত করেছে যে, যাকাত-ব্যবস্থা একান্তভাবে ইসলাম উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত, অন্য কোন ব্যবস্থা থেকে তা গ্রহণ করা হয়নি। তার পূর্ববর্তী, কোন ধর্মব্যবস্থা বা মানব রচিত বিধানে যাকাত-সদৃশ কোন অর্থ ব্যবস্থার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে কোন ইনসাফগার ব্যক্তি এ পর্যায়ে বলতে বাধ্য হবেন যে, এটা সম্পূর্ণ ও মৌলিকভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার অবদানঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً-

আল্লাহ্‌র রং, আল্লাহর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে?

দ্বিতীয়, রাসূলের যুগে যাকাত দুর্বোধ্য ছিল বলে শাখ্‌ত যে অভিযোগ তুলেছেন সেটা সত্যিই আজব কথা।

আমি বুঝতে পারি না, এই আলোচনাকারী এমন কথা কি করে বলতে পারলেন, অথচ তিনি ইসলামী শরীয়াত ও ফিকাহ-এ বড় বিশেষজ্ঞ হওয়ার দাবি করেছেন, আর রাসূলের যুগে 'যাকাত' ব্যবস্থা দুর্বোধ্য ছিল, তা দ্বীন-ইসলামের দাবি অনুযায়ী প্রবর্তিত কোন 'কর' ছিল না, বলে যুক্তি প্রদর্শন করার সাহস করেছেন।

তিনি দুর্বোধ্যতা কোথায় দেখতে পেলেন? অথচ রাসূলে করীম (স) নিজেই যাকাত সংক্রান্ত সব বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কোন্ কোন্ ধন-মালে যাকাত ফরয হয়, তা-ও স্পষ্ট করে বলে গেছেন। তাতে নবী যুগের আরব সমাজে সর্বপ্রকারের ক্রমবর্ধনশীল ধন-মালই শামিল ছিল। গৃহপালিত পশু, ফসল, ফল-পাকড়, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি সব বিষয়ের কথাই বলেছেন। সেই সাথে তিনি পরিমাণও বলে দিয়েছেন। ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ কি বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে, তা বলতেও বাকি রাখেননি। তা ফরয হওয়ার জন্য সময়সীমাও নির্ধারণ করেছেন। বলেছেন, প্রতিবারের

ফসলেই তা ফরয হবে। যাকাতলব্ধ সম্পদ কোথায়, কিভাবে ব্যয় বণ্টন করা হবে, তাও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন। এ পর্যায়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। হাদীসেও তার ব্যাখ্যা রয়েছে। যাকাত আদায় করার পন্থা কি হবে, তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বললেন, এ জন্যে সতন্ত্রভাবে সংগ্রহ ও বণ্টন করার ব্যবস্থা করতে হবে। কুরআনের শব্দ العاملين عليها (Collectors)-এ-ই তার ভিত্তি রয়েছে। তিনি নিজে মুসলিম জাহানের সর্বত্র কর্মচারী ও দায়িত্বশীল লোক প্রেরণ করেছেন। তারা যাকাত আদায় করেছে, বণ্টনও করেছে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান অনুযায়ী। এ ব্যাপারটি এতই সর্বজনবিদিত যে, সে সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নাই।

এতদ্‌সত্ত্বেও একথা বলা কি সঙ্গত যে, রাসূলের জীবদ্দশায় যাকাতের ব্যাপারটি দুর্বোধ্য ছিল? এবং তা কোন দ্বীনি বিধানভিত্তিক নয়।

তা কি করে সম্ভব হতে পারে? রাসূল (স) তো ইসলামের মৌল স্তম্ভের উল্লেখের সাথে সাথে সব সময়ই যাকাতের কথা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন। বেশ কিছু হাদীস আমরা এমনও দেখতে পাই, যাতে হজ বা রোযার হয়ত উল্লেখ নেই; কিন্তু নামায ও যাকাতের কথা শাহাদাতের কালেমাদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে সব সময়ই উল্লেখ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, এই যাকাত আদায়ের জন্যে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করার কথাও বলেছেন। হযরত ইবনে উমর, আবূ হুরায়রা ও জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহে তা-ই রয়েছে। রাসূলে করীম (স) নব দীক্ষিত আরব গোত্রসমূহের সাথে যত চুক্তি করেছেন তার সবটাতেই নামায ও যাকাতের উল্লেখ সমান গুরুত্ব সহকারে রয়েছে। তিনি তাঁর নিয়োজিত কর্মচারী ও গভর্নরদের প্রতি যেসব চিঠি পাঠিয়েছেন, তাতেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর কাছে বিভিন্ন দেশ ও গোত্রের পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি দল এসেছে, তাদের কাছেও তিনি নামায ও যাকাতের কথা এক সাথে বলেছেন।

ইসলামে নামাযের গুরুত্ব ও স্থান শাখ্‌ত ও তাঁর মত অন্যান্য প্রাচ্যবিদরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারেন না। তাহলে সকল প্রকার চুক্তি ও সরকারীভাবে প্রেরিত চিঠিতে সেই নামাযের সাথে মিলিয়ে যদি যাকাতের উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তাহলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তা নামাযের সমপর্যায়ের। অন্তত গুরুত্বের দিক দিয়ে তার চাইতে ন্যূন নয় একটুও। কুরআন ও সমস্ত হাদীস স্পষ্ট করে বলেছে যে, সকল প্রকার চুক্তি ও সরকারী চিঠিপত্রে যাকাত, তার পরিমাণ, নিসাব ও প্রকারসমূহের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তাতে কোন প্রকারের দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা বা শোবাহ্-সন্দেহের প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে কোথাও মে"টামুটিভাবে বলা হয়ে থাকতে পারে। সেখানে হয়তো বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি সহ বলা হয়নি, তাড্ডঅস্বীকার করা যায় না।

এ পর্যায়ে আর অধিক স্পষ্টড্ডও বলিষ্ঠ তথ্য জানতে হলে ডঃ হামিদুল্লাহ রচিত—

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الرشده-

নবী করীম ও খিলাফতে রাশেদাদ্দআমলের চুক্তিসমষ্টি পাঠ করুন।

শাখ্‌ত নবী যুগে যাকাতের ব্যাপারটি অস্পষ্ট থাকার কথা প্রমাণ করতে গিয়ে যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলের ইন্তেকালের পর বহু সংখ্যক আরব গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে। কেননা তারা মনে করেছিল যে, রাসূলের ইন্তেকালের সাথে-সাথেই যাকাত দেয়ার চুক্তিও নাকচ হয়ে গেছে। আরও অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে হযরত উমরও তা সমর্থন করেছেন। শাখ্‌তের এ কথাটি সম্পূর্ণ বাতিল। প্রকৃত অবস্থার সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই।

সত্যকথা হল, গোত্রগুলো ছিল বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন চরিত্রের।

তন্মধ্যে কিছু কিছু গোত্রে মুসায়লামা সাজাহ, আস্‌ওয়াদ, তুলায়হা প্রভৃতি নামের লোকেরা মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবিদার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের বহুসংখ্যক সাহায্য-সমর্থনকারীও দাঁড়িয়েছিল এসব গোত্রের লোকদের থেকে। তাই বলে নবুয়্যাতের ব্যাপারটিও অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য ছিল বলতে হবে নাকি?

কোন কোন গোত্র ইসলামী শরীয়াত পালন করতেই অস্বীকার করে বসেছিল। নামায ও যাকাত একসঙ্গেই পরিত্যাগ করেছিল। তা হলে দিনরাতে পাঁচবার করে পড়া এই নামাযের ব্যাপারটিও কি অস্পষ্ট ছিল নাকি?

এমন গোত্রও ছিল, যারা নামায ও শরীয়াতের অপরাপর হুকুম-আহকাম পালন করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু যাকাতের ব্যাপারে তাদের মনে সংশয়ের উদ্রেক হয়ে পড়ে। পূর্বেই বলা হয়েছে, তার কারণ নতুন মুসলিম হওয়া ও দূর মরুভূমিতে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করা। যাকাত-প্রকৃতির দুর্বোধ্যতার দরুন নয়। ইমাম আবূ সুলায়মান আল-খাত্তাবী প্রমুখ মনীষী তাই এদের মুরতাদ বলেন নি, বলেছেন 'বিদ্রোহী'। যদিও এদের মধ্যে রাসূলের ইন্তেকালের পর যাকাত ফরয থাকার কথা অস্বীকারকারী লোকও ছিল। আর তারা মরুবাসী ছিল, নও-মুসলিম ছিল বিধায় তাদের অন্যান্যের মত কাফির আখ্যায়িত করা হয়নি, তাদের মধ্যে অনেকে আবার যাকাতকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেনি। বরং তারা যাকাত অমান্যকারী গোত্র সরদারদের অধীনে বাস করত বলে তারা যাকাত দিতে পারেনি—কবীলা সরদাররা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বনূ ইয়ারবু কবীলার এই অবস্থাই হয়েছিল। তারা তাদের যাকাত সংগ্রহ করে একত্রিত করেছিল এবং খলীফার কাছে তা পাঠাবার ইচ্ছাও করেছিল। কিন্তু মালিক ইবনে নুয়াইরা তা পাঠাতে বাধা দান করে। তবে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর মনেও সংশয় জাগার কথাটি সত্য।

কিন্তু তা শুধু যাকাত অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সন্দেহ। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে কথা বলেছেন। তিনি তাঁর যুক্তি পেশ করেছেন; হযরত উমর তা মেনে নিয়েছেন। অতঃপর সর্বসম্মতভাবেই সে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ফলে এ নিয়ে আর কোন কথা উঠতে পারে না।

শাখ্‌ত মনে করেছেন, যাকাত অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে হযরত আবূ বকর কর্তৃক গ্রহীত নীতিই এ ফরযটির স্থিতি ও চিরন্তনতার ব্যবস্থা করেছে। শাখ্‌ত এ কথাটি

হযরত আবূ বকর (রা)-কে ভালবেসে বলেননি। বলেছেন এ কথা লোকদের সামনে স্পষ্ট করে তোলার কুমতলবে যে, যাকাতের ব্যাপারটি মুসলমানদের কাছে—এমন কি হযরত উমর ফারূক (রা) -এর কাছেও স্পষ্ট ছিল না। তিনি ভুলে গেছেন যে, এটা হযরত আবূ বকরের নিজস্বভাবে উদ্ভাবিত কোন নীতি ছিল না। তিনি রাসূলে করীমের প্রবর্তিত নীতিরই অনুসরণ করেছেন মাত্র। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন ঃ "রাসূলের সময়ে লোকেরা যে যাকাত দিত, তার একটা রশিও যদি তখন দিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করব।"

এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলের নীতিকে বাস্তবায়িত করেছেন মাত্র। নতুন কোন নীতির প্রচলন করেননি। রাসূলের নীতিতে তিনি অক্ষরেরও পরিবর্তন করে নি।

হযরত উমর (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা মনে করেছিলেন ঃ ওদের নামাযকে মুসলমানিত্বের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হোক, আর যাকাত ওদের জন্যে ছেড়ে দেয়া হোক। শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে যাবে। বিরোধ নির্মূল হবে এবং আল্লাহ্র দল জয়ী হবে।

কিন্তু হযরত আবূ বকরের নীতি ছিল অত্যন্ত দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। কেননা তাঁর দলীল ছিল অকাট্য এবং কুরআন ও সুন্নাত থেকে গ্রহীত। আল্লাহ্ সত্যিই বলেছেন ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ-

যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দিতে থাকে, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই গণ্য হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাকাত কার উপর ফরয

— *অমুসলিমের উপর যাকাত ফরয নয়*

— *বালক ও পাগলের ধন-মালে যাকাত*

প্রথম পর্ব

ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, যাকাত কেবলমাত্র স্বাধীন, বয়স্ক মুসলমানের উপর ধার্য কর, যার সুনির্দিষ্ট নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকানা রয়েছে।[১]

পূর্বে দলীলাদির ভিত্তিতে একথা বলা হয়েছে। কুরআনের স্পষ্ট আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলের প্রমাণিত হাদীসমূহেরও উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। সে সবের দ্বারা যাকাতের ফরয হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। মুসলমানরা যুগের পর যুগ ধরে এ গুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে এসেছে। মুতাওয়াতির বর্ণনাসমূহ রয়েছে রাসূলের কথা এবং কাজের। দ্বীন-ইসলামের মৌলিক বিধানের ভিত্তিতে জানা গেছে যে, নও-মুসলিম নয় এমন যে কোন মুসলিম ব্যক্তি যাকাতকে অস্বীকার করলে কাফির হবে।

মুসলমানদের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, কোন অমুসলিমের উপর যাকাত ফরয নয়। কেননা এটা ইসলামের স্তম্ভ। যারা ইসলামকেই মানে না তাদের উপর তা ফরয হতে পারে না। হ্যাঁ, তবে কোন অমুসলিম ইসলাম কবুল করলে ও যাকাত দেয়ার পরিমাণ ধনসম্পদ তার থাকলে তখন অবশ্যই তাকে তা দিতে হবে। এ কথার দলীল হচ্ছে বুখারী-মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস। তা এই—

> রাসূলে করীম (স) যখন হযরত মুআযকে ইয়েমেনে পাঠালেন তখন তিনি তাঁকে বললেনঃ তুমি আহলে-কিতাবের একটা জাতির কাছে যাচ্ছ। তাদের প্রতি তোমার সর্বপ্রথম দাওয়াত হবে, ' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দানের। তারা তা মেনে নিলে তাদের জানিয়ে দেবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। তা মেনে নিলে তাদের বলবে, আল্লাহ্ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে তাদেরই গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।[২]

ইমাম নব্বী যেমন লিখেছেন, এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, ইসলাম কবুল করলেই একজনকে ইসলামের ফরযসমূহ পালন করার কথা বলা যেতে পারে, তার পূর্বে নয়। এ পর্যন্তকার কথা সর্বসম্মত।[৩]

---

১. ফিকাহবিদগণ এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে তার পুনরাবৃত্তি করছি না। কেউ প্রয়োজন বোধ করলে দেখুন—

المجموع ج ٥ - ص ٢٢٦-٣٢٧- المغنى مع شرح الكبير ج ٢ ص
٤٩٤-ردالمحتار-ج ٢ ص ٥-بداية المجتهر - ج ١ ص ٢.٩-

২. দেখুন ফতহুল বারী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২৯।

৩. মৌলনীতির ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নমত রয়েছে। কাফিররা শরীয়াতের খুঁটিনাটি পালনে বাধ্য কি? তাহলে তা পালন না করার অপরাধে পরকালে তাদের আযাব অনেক বেশী হতে হবে কি? অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ এ মত দিয়েছেন। তবে হানাফীরা ভিন্নমত দিয়েছেন। আসলে এ একটা অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক।

বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, যাকাত যেহেতু ইসলামেরই একটি অন্যতম রুকন কাজেই তা কাফিরদের প্রতি ধার্য হতে পারে না যেমন নামায পড়া ও রোযা রাখা। এ পর্যায়ে ভিন্ন একটা কারণ প্রদর্শন করা হয়েছে। শাফিয়ী মাযহাবের শীরাজ ও নববী বলেছেন, আসল কাফিরের প্রতি তা ফরয নয়। এ একটা হক, যা সে নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নেয়নি বলে সে জন্যে সে বাধ্য নয়। সে যুধ্যমান ব্যক্তি হোক, কি যিম্মী, তাতে কোন পার্থ্যক্য সূচিত হবে না। কাজেই তার কুফরী অবস্থায় তার প্রতি শরীয়াতের হুকুম পালনের দাবি করা যায় না। আর ইসলাম কবুল করলে কুফরী জীবনের যাকাত দাবি করা যাবে না।

অমুসলিমের উপর যাকাত ফরয নয় বলে তার যাকাত দেয়াটাও একটি ইবাদত হিসেবে সহীহ্ কাজ হতে পারে না। কেননা ইবাদত কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত ঈমান ও ইসলামই এখানে অনুপস্থিত। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا – (الفرقان- ٢٣)

আর যা কিছু তাদের কৃতকর্ম রয়েছে, তা নিয়ে আমরা ধূলিকণার মত উড়িয়ে দেব।

তবে এ কথা খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, নেক-আমল পরকালীন আযাব অনেক পরিমাণে হালকা করে দেবে।

সব আসল কাফিরদের ব্যাপারেই একথা প্রযোজ্য। তবে যে লোক ফিত্নার সৃষ্টি করে ও মুরতাদ হয়ে যায়, মুসলিম থাকা অবস্থায় তার উপর যাকাত ফরয করা হয়ে থাকলে তা তার কাছ থেকে অবশ্যই নিতে হবে। কেননা এটা তো একটা হক্, যা তার মুরতাদ হয়ে যাওয়ার দরুন নাকচ হয়ে যেতে পারে না। এটা ইমাম শাফিয়ীর মত। ইমাম আবূ হানীফা ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

তবে মুরতাদ হয়ে যাওয়া কাল সম্পর্কে শাফিয়ী মাযহাবের ফিকাহ্বিদগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারটিকে চূড়ান্ত মনে করেন। কেননা তা গরীব ও অভাবগ্রস্তদের হক। তাই মুরতাদ হয়ে যাওয়ার দরুন তা বাতিল হতে পারে না।

ইসলাম অমুসলিমদের উপর যাকাত ফরয করেনি কেন

এ পর্যায়ে কোন কোন লোকের মনে প্রশ্ন জেগেছে ঃ ইসলাম অন্যান্য অমুসলিমদের জন্যে বিপুল সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছে। তাদের প্রতি আল্লাহ্ ও রাসূলের দায়িত্ব ঘোষিত হয়েছে। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপদমূলক আশ্রয়ে নিশ্চিত জীবন-যাপনের সুযোগ পায়। তাদের মর্যাদা তথায় সুরক্ষিত, তাদের স্বাধীনতা উন্মুক্ত ও অ-প্রভাবিত। সেখানে তারা মুসলিম নাগরিকদের সমান অধিকার লাভ করে, সমান দায়িত্ব তাদের উপরও বর্তে। তাহলে যাকাত ফরয করার ব্যাপারে মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করা হল কেন? অথচ যাকাত একটা সামাজিক দায়িত্বের ব্যাপার। একটা অর্থনৈতিক

কর বিশেষ। তদলব্ধ অর্থ-সম্পদ তো দেশের দুর্বল, অভাগ্রস্ত ও সাধারণ দরিদ্র নাগরিকদের মধ্যেই বন্টন করা হয়?

প্রশ্নটির জবাব দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ। মূলত এখানে দুটি দিক দিয়ে যাকাত ফরয হওয়ার মর্মকথা অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে।

প্রথম, যাকাত একটি সামাজিক ও সামষ্টিক দায়িত্বের ব্যাপার, একটি সুনির্দিষ্ট অধিকার (Determined claim)। প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের জন্য। তা একটা অর্থনৈতিক কর। আল্লাহ্ তা'আলাই তা ফরয করেছেন। জাতির ধনীদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে, যেন তাদেরই গরীবদের মধ্যে বন্টন করা যায়। এতে করে ভাই ভাইয়ের অধিকার রক্ষা করার সুযোগ পায়। এটা সামষ্টিক অধিকারের ব্যাপার যেমন. তেমনি আল্লাহ্রও হক।

দ্বিতীয়, তা ইসলামের ইবাদতসমূহের অন্যতম। যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের গোটা কাঠামো দাঁড়িয়ে রয়েছে যাকাত তার মধ্যে একটি। কালেমার সাক্ষ্যদান ও নামায কায়েম করা, রমযানের রোযা ও আল্লাহ্র ঘরের হজ প্রভৃতির মতই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বে বহুবার আমরা দেখিয়েছি, কুরআন মজীদে যাকাতকে নামাযের পাশেই উল্লেখ করা হয়েছে। শিরক থেকে তওবা করার একটা ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। নামায কায়েম করা ইসলামে প্রবেশের প্রকাশ্য লক্ষ্যণ, মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অধিকার লাভের একটা মাধ্যম। যাকাতের কোন কোন অংশ যেমন ইসলামের সাহায্যে ও দ্বীনের কালেমা প্রচারে ব্যয় হতে পারে—দ্বীনের দাওয়াতের সুবিধার্থে সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যেতে পারে-এ কারণে 'ফী–সাবীলিল্লাহ'—আল্লাহ্র পথে' বলে একটা খাত আছে। নির্দিষ্ট লোকদের মন রক্ষার কাজেও তা ব্যয় হতে পারে 'আল-মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' একটি খাত রয়েছে বলে।

বিভিন্ন হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, "তা ধনীদের কাছ থেকে নেয়া হবে, যেন গরীবদের মধ্যে বন্টন করা যায়"—এ অনুযায়ী যাকাতের প্রথম উদ্দেশ্য আদায় হতে পারে, আর তা হল গরীবদের পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তিদান। কিন্তু কুরআন তো আটটি খাতের উল্লেখ করেছে। পূর্বোল্লিখিত দুটি এরই মধ্যে শামিল।

এ দিকে লক্ষ্য রেখেই ইসলামের উদারতা ও অনুভূতিশীলতা অমুসলিমদের কাছে যাকাত গ্রহণে তাদের ধর্মীয় আকীদার প্রতি সম্ভ্রমবোধকে গুরুত্ব দিয়েছে। আসলে ইসলামের এ-একটি দ্বীনি ব্যবস্থা বলে তা অমুসলিমদের উপর ধার্য করতে চায়নি। যাকাত তো ইসলামের একটা বড় অনুষ্ঠান (Religious ceremony)-রূপে গণ্য চারটি বড় ইবাদতের একটি; পাঁচ 'রুকন'-এর অন্যতম। তা অমুসলিমদের উপর কি করে ধার্য হতে পারে?

অমুসলিমদের কাছ থেকে যাকাত-পরিমাণ কর গ্রহণ করা হবে কি না

এ পর্যায়ে আর একটি প্রশ্ন উঠেছে। যাকাত একটা দ্বীনি ইবাদত ও ফরয হিসেবে অমুসলিমদের কাছ থেকে নেয়া যাবে না, বুঝলাম। কিন্তু সেই পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ কর হিসেবে তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা যাবে কিনা, যা ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করা হবে? তখন মুসলমানরা যাকাত দেবে ফরয ইবাদত হিসেবে, আর অন্যরা দেবে কর হিসেবে? এ ব্যবস্থা দ্বারা একই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য ও তারতম্য সৃষ্টি থেকে বাঁচা যাবে এবং মুসলিমদের উপর অমুসলিম নাগরিকদের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ চাপ প্রয়োগ করা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে?

এ একটি বিতর্কিত বিষয়। এর মীমাংসার জন্যে ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের সামষ্টিক ইজতিহাদ প্রয়োজন। তবে এই ধরনের ইজতিহাদ সম্পন্ন হওয়া যখন কঠিন, তখন যদ্দিন তা না হচ্ছে, তার পূর্বে আমরা এ প্রসঙ্গে একটা অভিমত অবশ্যই প্রকাশ করতে পারি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যতটা অধ্যয়ন ও চিন্তাভাবনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তার ভিত্তিতেই এ মত প্রকাশ করা হবে। আর আসলেও ব্যক্তিপর্যায়ের ইজতিহাদ সামাষ্টিক ইজতিহাদের পথ সুগম করে দেয় বলে আমার এ মত প্রকাশ কিছুমাত্র অবান্তর হবে না বলে মনে করি।

আমার এ মত নির্ভুল হলে তা আল্লাহ্র অনুগ্রহ বলে মনে করতে হবে। আর ভুল হলে সেজন্যে আমাকে ও শয়তানকেই অভিযুক্ত করা যাবে। আমার সুস্পষ্ট মত হলঃ ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম যিম্মী নাগরিকদের কাছ থেকে যাকাতের মতই একটা কর গ্রহণ করার পথে প্রকৃতপক্ষে কোন বাধা নেই, যদি রাষ্ট্র পরিচালক তা গ্রহণ করা সমীচীন বা প্রয়োজন মনে করেন। ওই মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো পেশ করা যাচ্ছে ঃ

১. অমুসলিমদের উপর যাকাত ফরয নয় বলে ইসলামের আলিমগণ যে মত দিয়েছেন, তা হচ্ছে দ্বীনি ফরয হিসেবের কথা, তা দুনিয়ায় দাবি করা ও পরকালীন সওয়াব ও আযাবের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক 'পরামর্শ পরিষদের' (Parliament) বিবেচনা অনুযায়ী সামষ্টিক কল্যাণের জন্যে একটি রাজনৈতিক কর্তব্যরূপে অমুসলিমদের উপর ধার্য করা হলে তা কোনক্রমেই অন্যায় হবে না।

২. অমুসলিমদের উপর যাকাত ধার্য না করার কারণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, এটা এমন একটা হক যার বাধ্যবাধকতা তারা গ্রহণ করেনি, তাই সে জন্যে তাদের বাধ্য করা যায় না। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তারা যদি তা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়, তাহলে তা গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মিগণ সব সময়ই একটা আর্থিক কর দিত, কুরআন তার নাম দিয়েছে 'জিযিয়া'। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যয় নির্বাহে, জনকল্যাণমূলক কাজে ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়—তারা শরীক হচ্ছিল। তাদের অক্ষমতা, বার্ধক্য ও জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণও এর মধ্যে তাদের দারিদ্র্যের সময়ে রয়েছে। এদিক দিয়ে তারা সাধারণ মুসলিম

নাগরিকদের সমান সুযোগের অধিকারী। হযরত উমর (রা) এক ইয়াহুদীকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখে তার জন্যে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন বায়তুলমাল থেকে। কিন্তু বর্তমান সময়ের বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, মুসলিম দেশগুলোতে বসবাসকারী আহলে-কিতাব লোকেরা 'জিযিয়া' দেয় না, তারা তার নাম শুনতেও রাযী নয়। তাই তার পরিবর্তে যাকাতের সমপরিমাণ একটা 'কর' অনায়াসে দিতে পারে এবং তার 'জিযিয়া' নামকরণ কিছুমাত্র জরুরী নয়।

ঐতিহাসিক, হাদীসবিদ ও ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ বনূ তাগলিব নামক খৃস্টান গোত্রের সাথে হযরত উমরের অবলম্বিত যে নীতির বর্ণনা দিয়েছেন, তার আলোকে আমরা বাস্তবতা ও সাধারণ কল্যাণের প্রয়োজনে এ পর্যায়ে নতুন করে বিবেচনা করতে পারি।

হযরত উমর (রা) বনূ তাগলিবের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। তখন নু'মান ইবনে জুর্‌য়া বললেনঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন। বনু তাগলিব একটা আরব গোত্র। ওরা 'জিযিয়া' দেয়া পছন্দ করে না, স্বর্ণ-রৌপ্য বলতেও ওদের মালিকানায় কিছু নেই। ওরা কৃষিজীবী, পশুপালক। শত্রুদের মধ্যে ওদের একটা প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, এ জন্যে তাদের বিরুদ্ধে আপনার শত্রুদের আপনি সাহায্য করবেন না।' তখন হযরত উমর (রা) যাকাতের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ দেয়ার শর্তে তাদের সাথে সন্ধি করলেন। কোন কোন হাদীসের বর্ণনানুযায়ী হযরত উমর বললেন, 'তোমরা তার নাম যা ইচ্ছা রাখতে পার।'

বায়হাকী উবাদা ইবনে নু'মান থেকে এক দীর্ঘ হাদীসে এই কথাটুকু বর্ণনা করেছেনঃ হযরত উমর (রা) যখন বনূ তাগলিবের সাথে দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদানের শর্তে সন্ধি করলেন, তখন তারা বলল, 'আমরা তো আরব, অনারবরা যা দেয় আমরা তো দেব না। বরং আমাদের কাছ থেকে সেভাবে গ্রহণ করুন যেমন করে পরস্পর থেকে লোকেরা নিয়ে থাকে। হযরত উমর বললেন, 'না, এটা তো মুসলমানদের অংশ।' তারা বলল, 'তা হলে আপনি তা যতটা ইচ্ছা বাড়িয়ে দিন, কিন্তু জিযিয়ার' নামে নয়।' হযরত উমর (রা) তাই করলেন। তখন উভয় পক্ষই মুসলমানদের দেয় পরিমাণের দ্বিগুণ দেয়ার শর্তে রাযী হয়ে গেল। কোন কোন বর্ণনামতে হযরত উমর বলেছিলেন ঃ 'নাম তোমরা যা-ই দাও না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না।'[১]

বনূ তাগলিব সম্পর্কে হযরত উমর (রা) কর্তৃক গৃহীত এ নীতি সম্পর্কে ইমাম আবূ উবাইদ লিখেছেন ঃ যখন তাদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেছিলেন, তখন তার নাম—অপরাপর যিম্মীদের ন্যায় 'জিযিয়া' রাখলেন না; বরং তার নাম রাখলেন

১. কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৫৪১। ইবনে হাজম বনূ তাগলিব সংক্রান্ত গোটা ইতিহাসকেই দুর্বল বর্ণনা বলেছেন (আল্-মুহাল্লা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১১১)। কিন্তু আসলে এ ইতিহাসটি বহুল প্রচারিত। ইবনে আবূ শায়বা, ইমাম আবূ ইউসুফ (আল-খারাজ, পৃঃ ১৪৩) ও ইয়াহ্ ইয়া ইবনে আদাম উদ্ধৃত করেছেন (কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৬৬-৬৭)। বালাযুরী ফুতুহুল-বুলদানেও এর উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১৮৯)

"সিস্তনিত সদ্‌কা'। তাদের এরূপ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং 'জিযিয়া প্রত্যাহার করা হয়েছিল শুধু এজন্যে যে তার প্রতি তাদের মনে একটা ঘৃণা—একটা হীনত্ববোধ জেগেছিল। এর ফলে মুসলমানদের ক্ষতি কিছুই হয়নি। কেননা 'জিযিয়া' বাবদ যা কিছু পাওয়ার ছিল, তা তো পাওয়া গেলই; বরং সাদ্‌কা নামে তার দ্বিগুণ আদায় করা হল। যে ভাঙনটা তাদের দিক থেকে এসেছিল এভাবে সেটার মেরামত করা হল। তবে মুসলমানদের হক আদায় করে নিতে ত্রুটি করা হল না। হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ضَرَبَ بِالْحَقِّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهٖ-

আল্লাহ্ তা'আলা উমরের কণ্ঠ ও দিলের উপর সত্যকে মুদ্রিত করে দিয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেনঃ 'আমি উমর (রা)-কে যখনই দেখেছি, তাঁর দুটি চোখের উপর ফেরেশ্‌তাকে তা বন্ধ করতে দেখেছি।' হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ উমরের মুখের প্রশান্তি কথা বলে, তা বুঝতে আমাদের বিলম্ব হয়নি।' হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ 'তিনি কুণ্ডলি পাকানো একক বুনট ছিলেন। সর্ব ব্যাপারে তিনি প্রস্তুত থাকতেন।

ইমাম আবূ উবাইদ বলেছেনঃ 'হযরত উমরের এ কাজটি তাঁর অসংখ্য সৌন্দর্যের মধ্যে অন্যতম।'[১] এই উমর ফারুক (রা) তাঁর খিলাফতের অধীনে বসবাসকারী খৃস্টানদের কাছ থেকে 'সাদ্‌কা' নামে একটা কর বা জিযিয়া গ্রহণ করায় কোন দোষ দেখতে পান নি। কেননা তারা 'জিযিয়া' নামটিকে অপছন্দ করত। মুসলিমদের উপর ফরয করা সাদ্‌কা অপেক্ষা তার পরিমাণও দ্বিগুণ ছিল।

এই শর্তেই তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এ কারণেই জুহ্‌রী বলেছেন ঃ আহ্‌লে-কিতাবের পালিত গরু-ছাগল ইত্যাদির কোন যাকাত নেই। তবে তাগলিব খৃস্টানদের কথা ভিন্ন অথবা বলেছেন আরবের খৃস্টানদের সাধারণ ধন-মাল ছিল গৃহপালিত পশু।[২]

এটা হযরত উমরের অবদান। তাঁর সঙ্গী সাহাবায়ে কিরামও এ অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এই প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে—এ কালের ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে বসবাসকারী যিম্মী অমুসলিমদের কাছ থেকে 'জিযিয়ার স্থলাভিষিক্ত একটা কর গ্রহণ করা জায়েয হবে না কেন? তা তো ইসলামী ব্যবস্থার একটা বিধান; মুসলমানদের উপর অর্পিত দুটি দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিকল্প ব্যবস্থামাত্র। মুসলমানদের একটি কর্তব্য জিহাদ, যাতে রক্ত ও জীবন দিতে হয়। আর দ্বিতীয় কর্তব্য হল যাকাত, যা ধন-মাল থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে দিয়ে দিতে হয়।

---

১. كتاب الاموال- ص ٥٤١

২. كتاب الخراج ليحى ابن ادم - ص ٦٥

ইসলামী রাষ্ট্রের পরামর্শ পরিষদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই কর অমুসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে নেয়া হবে না কেন? তারা তা জিযিয়া বা যাকাত নামে দিতে না চাইলে হযরত উমর (রা) বনূ তাগলিবের ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা অনুসরণ করতে বাধা কোথায়?

আমার বিশ্বাস, হযরত উমরের এই নীতি একটা বড় আলোকবর্তিকা, যা এ ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের চাহিদা ও সমস্যা পূরণের উদ্দেশ্যে কোন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির চলার পথ সমুদ্ভাসিত করে দিয়েছে।

শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ মত প্রকাশ করেছেনঃ 'অমুসলিম জনগোষ্ঠী যদি খুব শক্তিশালী ও দাপটসম্পন্ন হয় এবং জিযিয়া দিতে প্রস্তুত না হয়ে বনূ তাগলিবের ন্যায় অন্য কিছু দিতে রাযী হয়ে সন্ধিচুক্তি করতে প্রস্তুত হয় এবং তাদের এই চুক্তি মেনে না নিলে যদি ক্ষতির আশংকা দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রপ্রধান তা মেনে নেয়ার যৌক্তিকতা অনুধাবন করেন, তাহলে মেনে নেয়া জায়েয হবে। তাবে তাদের কাছ থেকে 'জিযিয়ার' পরিমাণ বা ততোধিক অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। হযরত উমর (রা) বনূ তাগলিবের প্রতি যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন সেই নীতি অনুযায়ী এ কাজ সঙ্গত হবে।[১] এ কথাটি খুবই যুক্তি সঙ্গত এবং এর দলীল অকাট্য বলে মনে করি।

এ কথায় সন্দেহ নেই যে, প্রতিটি বর্ধনশীল সম্পদ থেকে যে যাকাত গ্রহণ করা হয় তা নিশ্চিতরূপে 'জিযিয়া'র পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশী, জিযিয়ার পরিমাণ তো খুবই সামান্য হয়ে থাকে—আর তা গ্রহণ করা হয়ে থাকে কেবলমাত্র অস্ত্র ধারণে সক্ষম ব্যক্তিদের কাছ থেকে। অথচ যাকাত গ্রহণ করা হয় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ধনশালী ব্যক্তির কাছ থেকেই। এমন কি, বালক ও পাগলের কাছে থেকেও। এটাই অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মত।

যিম্মীদের কাছে থেকে দ্বিগুণ পরিমাণ যাকাত গ্রহণ করা কোন অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার নয়। হযরত উমর (রা) তা কেবলমাত্র বনূ তাগলিব গোত্রের প্রতিই প্রয়োগ করেছিলেন। কেননা তারা তো এর জন্যেই দাবি করেছিল, এই শর্তেই তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। আর তা মেনেও নিয়েছিল। এটা শরীয়াতের প্রয়োগ নীতির ব্যাপার, দ্বীন ও রাষ্ট্রের সাধারণ কল্যাণ বিবেচনার ফলশ্রুতি মাত্র।

ইবনে রুশ্‌দ বিষয়টির উল্লেখ করেছেন এবং তার শিরোনাম দিয়েছেন الزكوة على اهل الذمة —'যিম্মীদের উপর যাকাত'। অতঃপর লিখেছেন অধিকাংশ ফকীহ্‌র মত হল, সমস্ত 'যিম্মী'র উপরই যাকাত ধার্য হবে না। বনূ তাগলিব খৃস্টান গোত্রের যাকাত পরিমাণ দ্বিগুণ করার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্য কথায়, প্রতিটি জিনিস বাবদ মুসলমাদের কাছ থেকে যতটা পরিমাণ যাকাত গ্রহণ করা হবে, যিম্মীদের কাছ থেকেও তা-ই গ্রহণ করা হবে। ইবনে রুশ্‌দের এ কথাটি খুবই যথার্থ। ইমাম শাফেয়ী, আবূ হানীফা, আহমদ ও সওরী প্রমুখ ফিকাহ্‌র ইমামগণ এই মতই দিয়েছেন। এ পর্যায়ে

---

১. احكام الذميين والمستامنين للدكتور عبد الكريم زيدان- ١٤٩

ইমাম মালিকের কোন মত জানা যায়নি। হযরত উমর (রা) তা-ই করেছিলেন বলেই ইমামগণ এই মত প্রকাশ করেছেন। মনে হচ্ছে, তাঁরা সকলে এটাকে শরীয়াতসিদ্ধ কথা বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু ফিকাহ্র মৌলনীতি তা সমর্থন করে না।[১]

আমার বক্তব্য এই যে, আবূ উবাইদ হযরত উমরের কাজের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আমরা দেখেছি। তাতে কিন্তু ফিকাহ্র মৌলনীতির সাথে এর সংঘর্ষ দেখতে পাইনি। মূলত মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ ও তাদের ক্ষতি বিদূরণই আসল লক্ষ্য। আর তা সব সময় শরীয়াতভিত্তিক হতে হবে, এমনটা জরুরী নয়। খুলাফায়ে রাশেদুনের সুন্নাত অনুসরণ করে চলার নির্দেশও আমাদের প্রতি রয়েছে।

৪. আমাদের কথার সমর্থনে উল্লেখ্য, ইমাম আবূ হানীফার সঙ্গী ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র) বলেছেনঃ মুসলিম ব্যক্তি যদি তার ওশরী জমি 'যিম্মীর' কাছে বিক্রয় করে দেয় যার খারাজ নেই, তাহলে যিম্মীকে ওশরই দিতে হবে। কেননা তার ক্রয় করা জমির উপর তো ওশর ধার্য হয়ে আছে। অতএব মালিকের পরিবর্তনে জমির ব্যবস্থা বদলে যাবে না। ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মী জমি ভোগ করবে আর তার বিনিময় দেবে না, তা হতে পারে না।[২]

৫. আহলে-কিতাবের লোকদেরও তাদের ধর্মগ্রন্থে যাকাত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; দরিদ্রদের কল্যাণ-কাজে ব্রতী হতে বলা হয়েছে। পূর্বে আমরা কুরআনের আয়াত এ পর্যায়ের দলীল হিসেবে উদ্ধৃত করেছি, যেখানে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ- (البينة-٥)

তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধু এ কাজের জন্যে যে, তারা আল্লাহ্র বন্দেগী করবে, দ্বীনকে তাঁরই জন্যে খালেস করে—একমুখী হয়ে এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে।

তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাদি থেকেও আমরা পূর্বে বিস্তারিত উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছি। কাজেই তাদের কাছে 'যাকাত' চাওয়া হলে তা তাদের ধর্মের বিধানের ভিত্তিতেই চাওয়া হবে। তাতে নতুন হবে শুধু পরিমাণ নির্ধারণ, সীমানা ঠিক করণ এবং বাধ্যবাধকতা আরোপ।

---

১. بداية المجتهد ج١- ص ٢٠٩

২. الهداية وفتح القدير- ج ٢ ص ١٠- وبدائع الصنائع- ج ٢- ٥٤-٥٥ এই মত দিতে গিয়ে ইমাম মুহাম্মাদ (রা) প্রধান দুজন ইমামের বিরোধিতা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, "যিম্মীকে খারাজ দিতে হলে জমি খারাজী হয়ে যাবে।" ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন, তাকে দুই ওশর দিতে হবে—বনূ তাগলিবের মত।"

৬. হযরত উমর (রা) ও কতিপয় তাবেয়ী যিম্মীদের জন্যে যাকাত সম্পদ ব্যয় করা জায়েয হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। আমরা এ গ্রন্থে 'কার জন্যে যাকাত হারাম' শীর্ষক আলোচনায় এ পর্যায়ে কথা বলেছি।

মুসলমানদের কাছ থেকে গৃহীত যাকাত বা তার একটা অংশ যখন যিম্মীদের জন্যে ব্যয় করা জায়েয, তখন তাদের ধনীদের কাছ থেকে এ বাবদ 'যাকাত' গ্রহণ করাও অবশ্যই জায়েয হবে, যেন তাদের সমাজেরই দরিদ্রের জন্যে তা ব্যয় করা যায়। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল মুসলিম-অমুসলিম সব নাগরিকেরই অর্থনৈতিক নিরপত্তা বিধান করা।

তাই তা 'সামষ্টিক নিরাপত্তা কর' নামে অভিহিত হবে। তাতে করে তা ইসলামের যাকাত থেকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত হতে পারবে। এর ফলে তাদের মনের দ্বিধা-সংকোচও দূর হবে এবং মুসলমানদের মনেও কোন উদ্বেগের কারণ থাকবে না।

বস্তুত মুসলমানদের যাকাত ও অমুসলিমদের কাছ থেকে গৃহীত কর ভিন্ন ভিন্ন খাতে ব্যয়িত হওয়া বাঞ্ছনীয়, পাত্র, শর্ত ও পরিমাণে এ দুটো অভিন্ন থাকলেও নাম, পরিস্থিতি ও ব্যয়ের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়ে আছে। কেননা প্রতিটির প্রকৃতি আলাদা আলাদা, লক্ষ্য ও ফরয হওয়ার মূলও এক নয়।

দ্বিতীয় পর্ব

বালক ও পাগলের ধন-মালে যাকাত

প্রত্যেক মুসলিম সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও বয়স্ক ব্যক্তির ধন-মালেই যাকাত ফরয। এ ব্যাপারে সব আলিম একমত হলেও বালক ও পাগলের ধন-মালে যাকাত ফরয কিনা, সে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বালক ও পাগলের ধন-মালে যাকাত ফরয কিনা? কিংবা বালক যতক্ষণ পূর্ণবয়স্ক না হবে এবং পাগল যতদিনে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন না হবে, ততদিন তাদের ধন-মালে যাকাত ফরয হবে কিনা?

এ পর্যায়ে ফিকাহবিদগণ যে বিরাট মতভেদের মধ্যে রয়েছেন, তাতে করে তাঁদের দুটো বড় বড় ভাগে বিভক্ত করা চলেঃ

(১) এক ভাগের ফিকাহবিদগণ তাদের ধন-মালে অথবা তাদের কোন কোন ধন-মালে আদৌ যাকাত হয় বলে মনে করেন না।

(২) দ্বিতীয় ভাগের ফিকাহ্‌বিদগণ এ দুই পর্যায়ের ব্যক্তিদের সকল প্রকার ধন-মালে যাকত ফরয হয় বলে মত দিয়েছেন।

যাকাত ফরয হয় না বলে যাঁরা মত দিয়েছেন

(ক) আবূ উবাইদ, আবূ জা'ফর ও শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, এ দুজন ফিকাহ্‌বিদের মত হচ্ছে, ইয়াতীমের মালে যাকাত হয় না।[১]

ইবনে হাজম নখয়ী শুরাইয়াহ্-ও এ মতই উল্লেখ করেছেন।

(খ) ইমাম হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ ইয়াতীমের মাল-সম্পদে যাকাত হয় না, তবে কৃষি ফসল বা অনুরূপ জিনিসে (যাকাত হবে)।

ইবনে হাজম তাঁর 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে অনুরূপ কথারই উল্লেখ করেছেন শিবরামা থেকে।[২]

(গ) 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে মুজাহিদ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে ইয়াতীমের যে ধন-মাল বর্ধনশীল অথবা বলেছেন, গরু, ছাগল বা কৃষি ফসল কিংবা যে মাল দ্বারা কর

---

১. كتاب الاموال ص ٤٥٣

২. المحلى ج ٥ ص ٢٠٥

দেয়া হয়, তার সবগুলোতেই যাকাত ফরয হবে। যা বন্ধ্যা, ফল দেয় না, তা থেকে যাকাত দিতে হবে না। তবে 'ফল' ধরতে শুরু করলে তাতে যাকাত হবে।[১]

মালিকী মাযহাবের আলিমগণের মধ্যে লাখ্মী বলেছেন, বালকের ধন-মালে যাকাত ধার্য হবে না। কেননা তার ধন-মাল তো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সে নিজে তা বাড়াতেও অক্ষম। যেমন মাটির তলায় রক্ষিত মালের মালিক যদি তার সন্ধান হারিয়ে ফেলে, তাহলে তা না পাওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত হবে না। কোন ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা যদি কেউ এক বা একাধিক বছর পর জানতে পারে, তাহলে তা না পাওয়া পর্যন্ত তার যাকাত দিতে হবে না।

ইবনে বশীর এ যুক্তির জবাব দিয়ে বলেছেন, বালকের মাল বৃদ্ধি সাধনে অক্ষমতা হচ্ছে মালিকানার দিক থেকে। আর যে লোক তার ধন-মালে প্রবৃদ্ধি সাধনে অক্ষম, তার ধন-মালেরও যাকাত হবে। তাতে কারোরই দ্বিমত নেই। তবে প্রবৃদ্ধি না হওয়াটা যদি মালের প্রকৃতির কারণে হয়, তা হলে ভিন্ন কথা। ইবনুল হাজেব বলেছেন ঃ উপরে লাখ্মীর যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, তা একটা দুর্বল মত।[২]

(ঘ) আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীগণ মত দিয়েছেন যে, বালকের শুধু কৃষি ফসল ও ফল-ফাঁকড়ায় যাকাত ধার্য হবে। তার অন্যান্য ধন-মালে হবে না।[৩]

ইবনে হাজম বলেছেন, এ ধরনের বণ্টন-বিভাগ আর কেউ করেছেন বলে আমরা জানি না। তবে যায়দীয়া মতের ফিকাহ গ্রন্থ البحر الذخار-এর প্রণেতা যায়েদ ইবনে আলী ও জা'ফর সাদিকের এ মত উদ্ধৃত করেছেন।[৪] আর এঁরা দুজনই ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক।[৫]

কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, যায়েদ সাদেক ও আহলে বায়ত থেকে নাসির হযরত আলী (রা) থেকে সহীহ্ বর্ণনার মাধ্যমে জানা মতের সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী (রা) তো আবূ রাফে'র ইয়াতীম বংশধরদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করতেন। যায়েদকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, "আমরা রসূলের বংশধরেরা এ মত অস্বীকার করি।"[৬]

এঁদের দলীল

(ক) উপরিউক্ত আলিমগণ দ্বিতীয় দিকটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন, যেমন পূর্বে বলেছি। তা হচ্ছে, যাকাত নামাযের মতই একটা নিছক ইবাদতের কাজ। আর

---

১. كتاب الاموال ص ٤٥٢

২. شرح الرسالة لا بن ناجى ١ ص ٣٢٨

৩. البدائع الصنائع ج ٢ ص ٤

৪. التحر الذخار ج ٢ ص ١٤٢

৫. যায়েদ ১২২ হিজরী সনে নিহত হন, জা'ফর ইন্তিকাল করেন ১৪৮ হিজরীতে। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, "তাঁর মত ফিকাহবিদ আমি আর দেখিনি।"

৬. الروض النظيرء شرح مجموعة الفقه الاكتر- ٢ ص ٤١

ইবাদতে নিয়ত জরুরী। কিন্তু বালক ও পাগল এ নিয়ত নির্ধারণে অক্ষম। অতএব তাদের উপর ইবাদত তো ফরয নয়। সেজন্যে তাদের উপর থেকে নামাযও নাকচ হয়ে গেছে। কাজেই অনুরূপ কারণে তাদের উপর থেকে যাকাত নাকচ হওয়াও বাঞ্ছনীয়।[১]

(খ) এ মতের সমর্থনে নবী করীম (স)-এর বাণী উল্লেখ করা যায়। তিন ইরশাদ করেছেন ঃ

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ حَتّٰى يَبْلُغَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَفِيْقَ-

তিন জনের আমল লেখা হয় না। তারা হলঃ বালক—যতদিনে পূর্ণ বয়স্ক না হবে, নিদ্রাচ্ছন্ন—যতক্ষণে জেগে না উঠবে এবং পাগল—যতক্ষণে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন না হবে।[২]

'লেখা হয় না'-র অর্থ এদের উপর শরীয়াত পালনের দায়িত্ব নেই। কেননা শরীয়াতের নির্দেশ পালনে বাধ্য সেই লোক, যে শরীয়াতদাতার কথা বুঝতে সক্ষম। কিন্তু বাল্যকাল, নিদ্রা ও পাগলত্ব তার বড় প্রতিবন্ধক।

(গ) কুরআনের আয়াত এ মতকে সমর্থন করে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا-

তুমি তাদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ কর, তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধি কর এর দ্বারা।

পবিত্র ও পরিশুদ্ধিকরণের কাজ হয় গুনাহের মলিনতা থেকে। কিন্তু বালক ও পাগলের কোন গুনাহ নেই। কাজেই যাকাত নিয়ে তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধিকরণের কোন প্রশ্ন উঠে না। অতএব যাকাত গ্রহণ করতে হবে যাদের কাছ থেকে, এ দুইজন তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সত্য কথা এই যে, উপরিউক্ত দলীল তিনটি এমন নয়, যাকে ভিত্তি করে হানাফী মাযহাবের লোকেরা—যাঁরা বালক ও পাগলের কোন মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করা ফরয মনে করেন—কোন কথা বলতে পারেন না। মুজাহিদ, হাসান ও ইবনে শবরামা প্রমুখ এরূপ বক্তব্য রেখেছেন।

উপরিউক্ত দলীল তিনটি ইমাম বাকের, শা'বী, নখয়ী ও শুরাইহ্-এর মতের সমর্থন দিচ্ছে। কেননা তাঁরা বালক ও পাগলের কোন শ্রেণীর ধন-মালের যাকাত ফরয হয় বলে মনে করেন না।

---

১. رد المحتار -ج ٢ ص ٤

২. নববী বলেছেন ঃ এ হাদীসটি সহীহ্, আবূ দাউদ ও নাসায়ী 'কিতাবুল হুদুদে' এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। আলী (রা) তার বর্ণনাকারী।

(ক) ইসলাম সকল প্রকারের আইন-বিধানে সার্বিক কল্যাণের দিকে নযর রেখেছে। এখানেও সে দিকটি কিছুমাত্র উপেক্ষিত নয় আর অল্পবয়স্ক ও পাগলের ধন-মাল যথাযথ অক্ষুণ্ন রাখায়ই নিহিত রয়েছে তাদের কল্যাণ। তাই তাদের ধন-মালে যাকাত ধার্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অন্যথায় যাকাতই তা নিঃশেষ করে দেবে। যাকাত ফরয হওয়ার যে মৌল কারণ (علت) তা এখানে অনুপস্থিত। নাবালেগ, বালক ও পাগল নিজেদের জন্যে কিছুই করতে পারে না, তাদের ধন-মালের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে কিছু চিন্তা করার সাধ্যও তাদের নেই। এমতাবস্থায় প্রতি বছর যাকাত গ্রহণ করা হলে তাদের ধন-মাল শেষ হয়ে গিয়ে তাদের কঠিন দারিদ্র্য ও অর্থাভাবে নিপতিত করবে।

এ ধরনের ব্যক্তির বর্ধনশীল ধন-মালে যাকাত ধার্য হওয়ার মূলে সম্ভবত এই তত্ত্বই নিহিত, যেমন কৃষি ফসল ও গৃহপালিত পশু অথবা কাজ করার দরুন যা বৃদ্ধি পায়—যেমন মূলধন, যদি তার দ্বারা ব্যবসা করা যায়।

হাসান বসরী ও ইবনে শাব্রামা নাবালেগের ধন-মালের যাকাত ফরয হওয়া থেকে কেবল তাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যকেই বাদ দিয়েছেন। কৃষি ফসল ও গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে যাকাত ধার্য করেছেন। কেননা শেষোক্ত দুটিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবৃদ্ধি কাজ করছে, স্বর্ণ ও রৌপ্য নিজস্বভাবে প্রবৃদ্ধিপ্রবণ মাল নয়। তা নিয়ে ব্যবসা করলে বা মুনাফায় বিনিয়োগ করা হলে তবেই তাতে প্রবৃদ্ধি ঘটে। বালক ও পাগল উভয়ই এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষম। অতএব এই প্রকারের ধন-মালে যাকাত দেয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

বালক ও পাগলের মালে যাকাত ফরয হওয়ার পক্ষের লোকদের কথা

আতা, জাবির ইবনে যায়দ, তায়ুম, মুজাহিদ ও জুহরী প্রমুখ তাবেয়ী ফিকাহ্‌বিদ এবং তাঁদের পরবর্তীকালের রবীয়া মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ইসহাক, হাসান ইবনে সালেহ, ইবনে আবূ ইয়ালা, ইবনে উয়াইনাহ্, আবূ উবায়িদ ও সওর প্রমুখ ফকীহ বালক ও পাগলের সকল প্রকারের ধন-মালে যাকাত ফরয হয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। হাদী ও মুয়াইদ বিল্লাহ্ প্রমুখ শিয়া ফিকাহ্‌বিদও এ মত দিয়েছেন। হযরত উমর (রা) তাঁর পুত্র, আলী, আয়েশা, জাবির প্রমুখ সাহাবীরও এই মত। মুজাহিদ বা হাসান ও ইবনে আবূ শায়বা কিংবা আবূ হানীফা যেমন কিছু কিছু ধন-মালকে যাকাত থেকে বাদ দিয়েছেন, পূর্বোক্তরা তা-ও করেন নি।

বালকের ধন-মালে যাকাত হওয়ার দলীল

তাঁরা কয়েকটি যুক্তির উল্লেখ করেছেন ঃ

১. প্রথম যুক্তি হল কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ সাধারণভাবেই সব ধনী লোকের ধন-মালে যাকাত ফরয হওয়ার কথাই বলেছে, তাতে কোন তারতম্য করা হয়নি। যেমনঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا-

তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর, তা দিয়ে তাদের পবিত্র পরিশুদ্ধ কর।

আবূ মুহাম্মাদ ইবনে হাজম বলেছেন, এ আয়াতটিতে ছোট-বড়, সুস্থ বিবেকবান ও পাগলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। কেননা তাদের সকলেরই প্রয়োজন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি লাভ। কেননা এরা সকলেই ঈমানদার।[১]

নবী করীম (স) হযরত মুআয (রা)-কে যখন ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন, তাদের জানিয়ে দেবে যে, তাদের ধন-মালে আল্লাহ্‌ যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এই কথাটিও এ পর্যায়ের একটি দলীল। কেননা বালক ও পাগল দরিদ্র হলে এ হাদীস অনুযায়ী তাদের জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে হবে। তাহলে তারা যদি ধনী হয়, তবে তাদের কাছ থেকে তা আদায় করা হবে না কেন?

২. তাদের দ্বিতীয় দলীল ইউসুফ ইবনে মালিক থেকে শাফেয়ী বর্ণিত হাদীসটি। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِبْتَغُوا فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ اَوْفِيْ اَمْوَالِ الْيَتَامٰى لَا تُذْهِبُهَا اَوْلَاتَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةَ-

তোমরা ইয়াতীমের মালের দিকে লক্ষ্য দিও। যাকাত যেন তা নিঃশেষ করে না ফেলে।

এই হাদীসটির সনদ সহীহ্‌। বায়হাকী ও নববীও তাই বলেছেন, কিন্তু ইউসুফ ইবনে মালিক তাবেয়ী, তিনি রাসূলে করীম (স)-কে দেখেন নি। কাজেই তাঁর হাদীসটি 'মুরসাল'। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী অন্যান্য সাধারণ দলীলের ভিত্তিতে এই মুরসাল হাদীসটিকে অধিক শক্তিশালী করে তুলেছেন। ইয়াতীমের মালে যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে সাহাবীদের পক্ষ থেকে বর্ণিত সহীহ্‌ হাদীসও উদ্ধৃত হয়েছে।[২]

তাবরানী আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِتَّجِرُوْا فِيْ اَمْوَالِ الْيَتَامٰى لَا تَاكُلْهَا الزَّكٰوةَ-

তোমরা ইয়াতীমের ধন-মাল নিয়ে ব্যবসা করবে, যেন যাকাত তা খেয়ে না ফেলে।

---

১. المحلى اتن حزم - ج ٥ ص ٢٠١-٢٠٢

২. الروض النظير-ج ٢ ص ٤١٧- السنن الكبرى - ج ٤ ص ١٠٧ المجموع- ج ٥ ص ٣٢٠

হায়সামী বলেছেন, এই হাদীসটির সনদ সহীহ।[১] হাফেয যয়নুদ্দিন আল-ইরাকীও তাই বলেছেন।[২]

'তিরমিযী' গ্রন্থে আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতার কাছ থেকে—তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে—তিনি নবী করীম (স)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

مَنْ وَلَّى يَتِيْمًا فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

যে লোক ইয়াতীমের অভিভাবক হবে, সে যেন তার পক্ষে ব্যবসা করে। তার ধন-মাল যেন বেকার ফেলে না রাখে। তাহলে যাকাত তা খেয়ে ফেলবে।

হযরত উমরের কথানুযায়ী এই হাদীসটি সহীহ্।

বায়হাকী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) বলেছেনঃ "তোমরা ইয়াতীমের মালের দিকে নযর দাও। তা যেন যাকাত দিয়ে শেষ করা না হয়।" বায়হাকী বলেছেন, এর সনদ সহীহ্। এখানেও সাদ্‌কা অর্থ যাকাত। বেশ কয়েকটি বর্ণনায় এর সমর্থন রয়েছে।

এ হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, নবী করীম (স) বিশেষ করে ইয়াতীমের অভিভাবকদের প্রতি এবং সাধারণভাবে গোটা সমাজের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন ইয়াতীমের মাল বৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করার জন্যে। পাগলদের ব্যাপারেও সেই কথা। মুনাফার আশায় ব্যবসা করার তাকীদ করা হয়েছে। তার ফল বৃদ্ধির চেষ্টা না করার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন—'অন্যথায় যাকাতই তা খেয়ে ফেলবে।' বস্তুত ধন-মালের প্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা না করে তা থেকে নিয়মিত যাকাত দিয়ে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে মূলধনটিকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা। আর যাকাত যদি প্রকৃতপক্ষে ফরযই হয়, তবেই তা রীতিমত দেয়ার প্রশ্ন উঠে। আর ইয়াতীমের অভিভাবকের পক্ষে তার ধন-মাল থেকে ফরয নয় এমন কাজে ব্যয় করা জায়েয হতে পারে না। তাহলে যা উত্তম নয়, এমন কাজে তার সব ধন-মাল উজাড় হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ্ আমাদের প্রতি নির্দেশ জারী করেছেন যে, আমরা যেন যা উত্তম নয় এমন কাজে ব্যয় করার জন্যে ইয়াতীমদের ধন-মালের কাছেও না যাই—যদ্দিন না সে পূর্ণ বয়স্ক হচ্ছে।[৩]

৩. এ ব্যাপারে সাহাবীদের কাছ থেকে যে বর্ণনা সহীহ্ প্রমাণিত হয়েছে, তা-ই হয়েছে এ পর্যায়ের তৃতীয় দলীল।

আবূ উবাইদ, বায়হাকী ও ইবনে হাজম বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর , আলী, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, আয়েশা ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বালকের

---

১. المجموع الزوائد- ج ٣ ص ٦٧

২. সুয়ূতীও তাঁর الجامع الصغير গ্রন্থে এই হাদীসটির সহীহ্ হওয়ার পক্ষে ইংগিত করেছেন। কিন্তু সে ইংগিত যথার্থ নয়; বরং বিকৃত মনে হয়। তাঁর ব্যাখ্যাকার আল-মুনাভী বলেছেন, সুয়ূতী جمع الجوامع গ্রন্থে বলেছেন এটি সহীহ্।

৩. যেমন সূরা আন আম—১৫২ আয়াত এবং সূরা আল-ইসরা—৩১ আয়াতে বলা হয়েছে।

ধন-মালেযাকাত ফরয হওয়ার কথা বলেছেন।[১] কোন সাহাবী তার বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায়নি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যে বর্ণনাটি রয়েছে, তা যয়ীফ বলে দলীল হিসেবে গ্রহণীয় নয়।[২]

৪. এ মতের চতুর্থ দলীল হচ্ছে সেই বিবেকসম্মত তাৎপর্য যার জন্যে যাকাত ফরয করা হয়েছে।

তাঁরা বলেছেন, ধনীদের—ধন-মালের অংশ দিয়ে গরীবদের দারিদ্র্য বিদূরণই যাকাতের আসল লক্ষ্য। তাতে করে যেমন আল্লাহ্র শোকর আদায় হবে, তেমনি ধন-মালের পবিত্রতা বিধানও হবে। আর বালক ও পাগলের ধন-মাল থেকে যখন সাধারণ ব্যয়ভার বহন করা যায়, ঋণ শোধ করা যায়, তখন যাকাত আদায় করা যাবে না কোন্ কারণে, কোন্ যুক্তিতে?[৩]

তাঁরা বলেছেনঃ একথা যখন সুনিশ্চিত হয়ে দাঁড়াল যে, অভিভাবককেই বালক ও পাগলের ধন-মাল থেকে যাকাত দিতে থাকতে হবে, তখন তা বয়স্ক ও সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের যাকাতের মতই আদায় করা ফরয হবে। তার সর্ব দেয় আদায় করার ব্যাপারে অভিভাবকই তার স্থলাভিষিক্ত হবে। তা যেহেতু বালক ও পাগলের ধন-মাল থেকে আদায় করা ফরয, কাজেই যাকাত তাদের পক্ষ থেকে আদায় করা অভিভাবকের পক্ষেই কর্তব্য হবে। যেমন নিকটাত্মীয়দের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহণ করা ইত্যাদি। যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে মালের মালিকের নিয়তের মতই অভিভাবকের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে।[৪]

মালিকী মাযহাবের কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন, বালকের ধন-মাল থেকে অভিভাবক যাকাত দেবে তখন, যদি সেজন্যে তার জবাবদিহি করার কোন আশংকা না থাকে। নতুবা দেবে না, আর যখন তা দেবে তার জন্যে সাক্ষী রাখবে। সাক্ষী না রাখা হলে ইবনে হুবাইব বলেছেন, সে যদি জবাবদিহি থেকে নিরাপদ থাকে, তাহলে তাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেয়া হবে।[৫]

অভিভাবক যদি ভয় করে যে, যাকাত দিলে বালক বড় হয়ে কিংবা পাগল ভাল হয়ে তার কাছে তা ফেরত চাইবে তাহলে ব্যাপারটি বিচারকের কাছে সোপর্দ করতে হবে।[৬]

---

১. আবূ উবাইদ লিখিত اموال। দ্রষ্টব্য। সুনানূল-কুবরা, আল-মুহাল্লাহ ও ইবনে শায়বাতেও এ কথা বলা হয়েছে। এজন্যে ইবনে হাজার লিখিত المجموع। ও নববীর التلخيص। লেখা দেখা যেতে পারে।

২. المجموع। ৫ম খণ্ড, ২-৮ পৃঃ المحلى। ৫ম খন্ড, ৩২৯ পৃঃ—হাদীসটির যয়ীফ হওয়ার কারণ ইবনে লাহ্ইয়া।

৩. المحلى। ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৮।

৪. المغني ج ٢ ص ٤٩٤

৫. شرح الرساله لا بن ناجى প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩২৮

৬. حاشيه المصاوى على المدر دير ص ٦٠٦

তুলনা ও অগ্রাধিকার দান

বালক ও পাগলের ধন-মাল থেকে যাকাত আদায় করা ফরয—এ মতের সমর্থনে যে সব দলীলের যুক্তি দেয়া হয়, তা উপরে এক এক করে উদ্ধৃত হল। প্রায় সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ীন ও পরবর্তীকালের আলিমরাই এ মত পোষণ করতেন। স্বীকার করতে হবে যে, এদের দলীল ও যুক্তি বিপরীত মতের যুক্তি ও দলীলের তুলনায় অনেক শক্তিশালী, অকাট্য এবং বলিষ্ঠ।

ক. যাকাতের পক্ষের সব দলীলই ছোট-বড়, অল্প বয়স্ক, পূর্ণ বয়স্ক এবং সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ও পাগল সবাইকেই পরিব্যাপ্ত করে। এ দলীল অকাট্য, সে সম্পর্কে কোন আপত্তি নেই। কেননা ধনীদের অর্থে সব গরীব-মিসকীনের জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ধনী হলেই এ হক স্বীকার করতে হবে। তাকে পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে, এমন কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি। যদিও ইয়াতীমের ধন-মালের সংরক্ষণের ওপর শরীয়াতে খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষণে যদি কেউ কোন শর্ত আরোপ করতে চায়, তাহলে তার মতের পক্ষে দলীল পেশ করা তারই কর্তব্য। কিন্তু সে দলীল কোথায়?

খ. ইয়াতীমের ধন-মাল বৃদ্ধি করার তাকীদ সম্পন্ন পূর্বোদ্ধৃত ইউসুফ ইবনে মাহাক বর্ণিত হাদীসটির সনদ সহীহ্ কথা স্পষ্ট, যদিও তা মুরসাল (অর্থাৎ হাদীসটির সাহাবী বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করেই রাসূল (স)-এর কথারূপে বর্ণনা করেছেন একজন তাবেয়ী), কিন্তু তা অন্যান্য বর্ণনার সাহায্যে যথেষ্ট মজবুত হয়ে আছে। সমার্থক সহীহ্ হাদীস আরও রয়েছে। সাহাবীদের বহু উক্তিও রয়েছে তার সমর্থনে। হযরত আনাসের যে হাদীসটি তাবরানী উদ্ধৃত করেছেন তাও এ পর্যায়েরই।

গ. হযরত উমর, আলী, আয়েশা, ইবনে উমর ও জাবির (রা) প্রমুখের উক্তি এ ধরনের বিষয়ে যখন অভিন্ন হয়, তখন বুঝতেই হবে যে, এটা সাধারণ ঘটনা, বিশেষ করে সেই সমাজে, যেখানে লোকেরা যুদ্ধ-জিহাদে পর পর শাহাদত বরণ করেছেন এবং ইয়াতীমের সংখ্যা ছিল গণনার বাইরে। তাদের উপরিউক্ত ধরনের উক্তি থেকেই তাই বোঝা যায়। এ সম্মিলিত উক্তিসমূহকে মূল্যহীন মনে করার অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। তাঁরা যেমন পরিস্থিতি বুঝতেন, তেমনি রাসূল (স)-এর সমসাময়িকও ছিলেন। ইয়াতীমের ধন-মাল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু নাযিল করেছেন, তার করাঘাত তাঁরা বুঝতে পারতেন। আর সত্য কথা এই যে, ইয়াতীমের মালে যাকাত ফরয না হওয়া পর্যায়ে সাহাবীদের কোন উক্তি কারো কাছ থেকেই সহীহ্ প্রমাণিত হয়নি। হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যা বর্ণিত, তা যয়ীফ। এ ধরনের কোন বর্ণনা দলীল হিসেবে পেশ করা বা গ্রহণ করা যায় না।[১]

ঘ. যাকাতের বিধান কার্যকর করার তাৎপর্য বিবেচনা করলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তা গরীব, মিস্‌কীন ও ধনীদের ধন-মালের অধিকারীদের হক। আর

---

১. আল্লামা মুবারকপুরী লিখিত مرعاة المفاتيح ২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বালক ও পাগলের ধন-মালেও তাদের হক ধার্য হতে পারে। কেননা তারা দুজনও এমন যে, তাদের ধন-মালে যাকাত ধার্য হওয়া কিছুমাত্র অযৌক্তিক নয়। যাকাতকে জনগণের, অধিকারসমূহের মধ্যকার একটি হক বলা হয় এজন্যে যে, তা নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে অন্তর্ভুক্ত ঃ

وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

আর যাদের ধন-মালে সুপরিজ্ঞাত হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্যে।

অপর আয়াতটি হল ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ .... الايه

যাকাত ফকির, গরীব ও মিসকীনদের জন্যে ....

আয়াতে যে لِلْفُقَرَاءِ বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য হচ্ছে যাকাত মালিকানার দিক দিয়ে গরীবদের জন্যে খাস .....।

'যাকাত' একটা অর্থনৈতিক অধিকার। প্রথম খলীফা হযরত উমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

وَاللّٰهِ لَا قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَانَّا الزَّكٰوةِ حَقُّ الْمَالِ- (بخاری، مسلم)

আল্লাহ্র শপথ, আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব তার বিরুদ্ধে, যে নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হচ্ছে ধন-মালের হক।

বালক ও পাগলের মালিকানাধীন ধন-মালে জনগণের হক ফরয হতে পারে এ কথাটি সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত। কেননা নাবালকত্ব ও পাগলামী জনগণের অধিকার আদায়ের পথে প্রতিবন্ধক হয় না। এ কারণে তাদের ধন-মাল থেকে ক্ষতিপূরণ, অপরাধের বিনিময় বা জরিমানা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের জন্যে ব্যয় ইত্যাদি গ্রহণ করায় কোনই বাধা নেই।[১]

এ প্রেক্ষিতে আমরা বলব, বালক ও পাগলের ধন-মালে যাকাত ফরয হবে সেই সব শর্তের ভিত্তিতে, যা আমরা এই পর্যায়ে বলে এসেছি। একটি হল মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া। তাদের নিজেদের প্রয়োজনে অপরিহার্য ব্যয়ের জন্যে নগদ অর্থ বের করা হবে এই শর্তের ভিত্তিতেই। কেননা তা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়।

এ সব কথা থেকেই ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবের উপর অপর তিনজন ইমামের মতের অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বিশেষ করে তাঁরা বালক ও পাগলের জমির ফসলের ওপর ফরয বলে মত প্রকাশ করেছেন। ফিত্রার যাকাত দেয়ার কথাও তাঁরা বলেছেন। কিন্তু এসব ছাড়া তাদের অন্যান্য ধন-মালে যাকাত ফরয বলেন নি।

১. البدائع والصنائع ج ٢ ص ٤- ردالمحتار- ج ٦ ص ٤.

অথচ বিবেকের দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে যার কৃষি ফসলের ওশর ফরয হয় তার সমস্ত ধন-মালের যাকাত ফরয হওয়ার যৌক্তিকতা সহজেই বুঝতে পারা যায়। কেননা নিম্নোদ্ধৃত দুটি আয়াতের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই ঃ

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ

ফসল কাটার দিনই তার হক দিয়ে দাও

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

তাদের ধন-মালে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।

প্রথমটি থেকে ওশর প্রমাণিত হয় এবং দ্বিতীয়টি থেকে প্রমাণিত হয় যাকাত।

অনুরূপভাবে রাসূল (স)-এর বাণী ঃ

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ

বৃষ্টির পানিতে সিক্ত জমি মাত্রেই ওশর ধার্য হয়।

فِىْ الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ-

মুদ্রায় দশ ভাগের চার ভাগের এক ভাগ দিতে হবে।

এ দুটির মধ্যেও কোন পার্থক্য হয় না।

হানাফী ফকীহগণ যে কৃষি ফসল ও ফল-ফাঁকড়া এবং অন্যান্য ধন-মালের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং বলেছেন যে, প্রথমটিতে সাহায্যের তাৎপর্য প্রবল; দ্বিতীয়টিতে নয়—এই পার্থক্য করণের কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। তেমনি কিছু বর্ণিত হয়নি।

ইমাম ইবনে হাজম এই পার্থক্যকরণ দেখে চিৎকার করে উঠেছেন। বলেছেন কৃষি ফসল ও ফল-ফাঁকড়া এবং গৃহপালিত পশু ও স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাতের মধ্যে কি করে পার্থক্য করা যায়, তা আমার বোধগম্য নয়।

তাদের এই কথাকে যদি উল্টিয়ে ধরা হয় এবং তাদের স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদিতে যাকাত ধরা হয় আর ফসল ও ফল-ফাঁকড়ার যাকাত নাকচ করা হয়, তাহলে এ দুটি জবরদস্তির হুকুমে বিপর্যয়ের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য হবে কি?

ইবনে রুশ্‌দ বলেছেন, যা জমির উৎপাদন এবং যা জমির উৎপাদন নয়, যা প্রচ্ছন্ন ও যা প্রকাশমান এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করার কোন দলীল আছে বলে আজ পর্যন্ত আমি জানতে পারিনি।[1]

---

১. بداية المجتهد-ج١ ص ٢٠٩

ফরয না-হওয়া মতের বাতুলতা

ক. বালক ও পাগলের ধন-মালে যাকাত ফরয হয় না, এ মতের পক্ষের দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

خُذْمِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا-

লোকদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করে তার দ্বারা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ কর।

এখানে যে পবিত্র ও পরিশুদ্ধি করণের কথা বলা হয়েছে, তা বালক ও পাগলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা এ উদ্দেশ্য কার্যকর হয় গুনাহের প্রতিকূলে। আর এ দুজনের কোন গুনাহ্ই হয় না। তাই তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণেরও কোন প্রশ্ন উঠে না।

এ কথার জবাবে বলা যায় যে, 'পবিত্র ও পরিশুদ্ধিকরণ' কাজটি বিশেষভাবে কেবল গুনাহের প্রতিকূলে হবে বা হতে হবে এমন কোন কথা নেই। চরিত্র-গঠন মনের পবিত্র ভাবধারার বৃদ্ধি সাধন এবং তাকে লোকদের প্রতি দয়া-সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্যেও তা হতে পারে। তাছাড়া ধন-সম্পদ পবিত্রকরণও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তখন 'তাদের পবিত্র করবে'—এ কথার অর্থ করা হবে 'তাদের ধন-মাল পবিত্র করবে।'

আমরা যদি স্বীকারও করি—যেমন ইমাম নববী বলেছেন।[১] আয়াতটি দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পবিত্র ও পরিশুদ্ধিকরণই যাকাত ফরয হওয়ার মৌল উদ্দেশ্য, তবুও কেবল বিশেষ ধরনের 'পবিত্র পরিশুদ্ধিকরণ'ই তার লক্ষ্য নয়। আর তা ফরয হওয়ার সেটাই একমাত্র কারণও নয়। আলিমগণ একমত হয়ে বলেছেন যে, যাকাত

ফরয় হওয়ার আর একটা কারণ রয়েছে এবং তা হচ্ছে, ইসলাম ও মুসলিমের দারিদ্র্য দূর কর। আর বালক ও পাগল উভয়ই মুসলিম সমাজের লোক।

খ. رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ তিনজন লোকের আমল লেখা হয় না ...... কথাটির তাৎপর্য সম্বন্ধে ইমাম নববী বলেছেনঃ গুনাহ্ এবং কোন কিছু ফরয হওয়া থেকে এ তিনজন মুক্ত; আমরা বলব, হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে তিনজনের কোন গুনাহ্ লেখা হয় না। আর যাকাতও তাদের উপর ফরয হয় না। তা ফরয হয় তাদের ধন-মালের উপর। তা তাদের অভিভাবকের কাছ থেকে আদায় করে নিতে হবে। যেমন তারা যদি কোন জিনিস নষ্ট করে ফেলে, তাহলে, তাদের সম্পত্তি থেকে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া অবশ্যই ফরয হবে এবং তাদের অভিভাবক তা দিতে বাধ্য হবে।[২]

---

১. ইমাম নববী বলেছেন, যাকাত ফরয হওয়ার বড় ও প্রধান কারণ হচ্ছে পরিশুদ্ধিকরণ; কিন্তু তা শর্ত নয়। কেননা তাদের ধন-মালে ফিতরা ও ওশর ফরয হওয়াকে আমরা একমত হয়ে মেনে নিয়েছি। যদিও তার আসল লক্ষ্য পরিশুদ্ধিকরণ।

২. مقارنة المذاهب- ص ٤٩. المجموع والمغنى ج ٢ ص ٤٩٣

গ. তাঁরা যে বলেছেন যাকাত নামাযের মতই ইবাদত বিশেষ, এ কারণে কুরআন মজীদে নামাযের পাশাপাশিই যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। আর ইবাদতে নিয়্যাতের প্রয়োজন; কিন্তু বালক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিহীন লোকের নিয়্যাত হয় না। এ কারণে নামাযও তাদের জন্যে ফরয নয়। অতএব যাকাত দেয়ার দায়িত্বও তাদের উপর অর্পিত হতে পারে না।

এ কথার জবাব এই যে, যাকাত একটা ইবাদত, কুরআনে তা নামাযের পাশাপাশি উল্লিখিত হয়েছে এবং তা ইসলামের পাঁচটি রুকনের অন্যতম, এ কথা আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমরা বলছি যাকাত অর্থনৈতিক সামষ্টিক ব্যাপার বলে তা প্রকৃতিগতভাবেই এক স্বতন্ত্র ধরনের ইবাদত। তা একটি অর্থনৈতিক ইবাদত বলে তাতে প্রতিনিধিত্ব চলে। তার অভিভাবক আদায় করে দিলে তা অবশ্যই আদায় হয়ে যাবে। এ কারণে তাতে জোর প্রয়োগ এবং সে কাজে নিযুক্ত কর্মচারীর কাছে হল্ চাওয়ার অবকাশ রয়েছে, এ দুইটি কাজ জনগণের অধিকার আদায়ে অবশ্যই চলবে। যেমন হানাফী ফকীহ্গণের মতে যিম্মীকে যাকাত আদায় করার জন্যে দায়িত্বশীল বানানো জায়েয। অথচ যিম্মী ইবাদতের যোগ্য লোকদের মধ্যে গণ্য নয়।

যাকাত নিয়্যাত ছাড়া আদায় হয় না বলে যাঁরা মত দিয়েছেন, তাঁদের জবাবে ইবনে হাজম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র আদেশক্রমে যাকাত আদায় করবে মুসলিম সমাজ ও তার রাষ্ট্রকর্তা। আর যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যেই যখন তা নেয়া হবে, তখন এ নেওয়াটা অনুপস্থিত, মূর্ছা যাওয়া ব্যক্তি, পাগল ও বালক—নিয়্যাত করতে পারে না—এমন সব লোকের তরফ থেকেই তা যথাযথভাবে আদায় হয়ে যাবে।

সারকথাঃ যাকাত অর্থনৈতিক ইবাদত, তাতে প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ততা চলে। অভিভাবক এ ব্যাপারে বালকের প্রতিনিধি। কাজেই এ ফরয কাজ সম্পন্নকরণে সে স্থলাভিষিক্ত হবে। তবে নামায ও রোযা ইত্যাদি দৈহিক ইবাদতের কথা স্বতন্ত্র। কেননা তা ব্যক্তিগত ইবাদত, তাতে অন্যকে দায়িত্বশীল বা প্রতিনিধি বানানো চলে না, তা ব্যক্তির নিজেরই সম্পন্ন করা উচিত। কেননা তাতে দৈহিক কষ্টের প্রয়োজন বলে ইবাদতের দিকটি স্পষ্ট। আল্লাহ্র হুকুম পালনের উদ্দেশ্যেই তা করা হবে।

কিন্তু নামায ও যাকাতের মধ্যে এমন অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্নতা নেই, যার দরুন দুটো এক সঙ্গে প্রমাণিত হলে এক সাথে নাকচও হতে হবে। কাজেই তাদের দুজনের নামায আদায়ের বাধ্যতা বাতিল হলে এবং যাকাত আদায়ের বাধ্যতা বহাল থাকলে শরীয়াতের দলীলের দিক দিয়ে কোনই অসুবিধা হয় না।[১] কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সবগুলোর ফরয কাজ এমনভাবে ধার্য করেন নি যে, তার একটি প্রমাণিত হলে অপরটিও প্রমাণিত হয়ে যাবে, আর একটি নাকচ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অপরটিকেও নাকচ হয়ে যেতে হবে। কাজেই নামায প্রত্যাহৃত হলে যাকাতকেও প্রত্যাহৃত হতে হবে এমন কথার কোন যুক্তি নেই। তারও কারণ এই যে, আল্লাহ্ বা তাঁর রাসূল যা ফরয

---

১. الام للشافعى ج ٢ص ٢٤।

করেছেন তা নাকচ হতে পারে যদি আল্লাহ্ ও রাসূল তা নাকচ করেন। আর একটি ফরয নাকচ হলে সেই কারণে ভ্রান্ত মতের ভিত্তিতে অন্যটিকেও নাকচ করে দেয়া যায় না—কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল ছাড়া।[১]

এ পর্যায়ে আবূ উবাইদ যা লিখেছেন, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তা হল ঃ ইসলামী শরীয়াতের কিছু অংশের উপর ভিত্তি করে চিন্তা করা যায় না। কেননা সেগুলো মৌলিক। আর প্রতিটিই নিজস্ব ফরয হওয়ার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।[২]

নামায বান্দাদের কাছে আল্লাহ্র হক, তা বান্দা ও মাবুদের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে বিশেষ অবদান রাখে। পক্ষান্তরে যাকাত হচ্ছে আল্লাহ্র নির্ধারিত ধনীদের ধন-সম্পদে গরীব-মিসকীনের হক।[৩]

একদিকে বালক ও পাগলের কল্যাণ, আর অপরদিকে গরীব-মিসকীনের কল্যাণ। দ্বীন ও রাষ্ট্রের কল্যাণের ব্যাপার। তা সত্ত্বেও শরীয়াত বালক-পাগলের ধন-মালে যাকাত ফরয করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কল্যাণের প্রতি কিছুমাত্র উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নি। কেননা যে কোন বর্ধনপ্রবণ ধন-মালেই যাকাত ফরয হওয়া অবধারিত; কার্যত তা বৃদ্ধি না পেলেও। যেমন মৌল প্রয়োজন পূরণের পর উদ্বৃত্ত ধন-মাল ছাড়া যাকাত ফরয হয় না। কোন কোন হানাফী ফিকাহ্বিদ মত দিয়েছেন, যে সব নগদ টাকা মালিকের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্যে নির্দিষ্ট, তাতে যাকাত ফরয হয় না, তা নিসাব পরিমাণ হলেও; এবং একটি বছরকাল অতিক্রান্ত হলেও। কেননা তা যেন অস্তিত্বহীন (তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে)। বালক ও পাগলের ক্ষেত্রেও আমরা এ চিন্তাই যথার্থ মনে করছি, যদি বালকের পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার সময় এবং পাগলের সুস্থ হওয়ার সময় তাদের মৌল প্রয়োজন পূরণের পরিমাণের অধিক নগদ টাকার মালিক না হয়।

এখানে কয়েকটা জরুরী কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবেঃ

প্রথম. বালক যে ইয়াতীম হবেই (এবং এই সুবাদে যাকাতের ক্ষেত্রে সে সুবিধা পাওয়ার অধিকারী) বলে মনে করতে হবে—এমন কোন কথা নেই। বালক তার মা'র সম্পদ-সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হতে পারে, কেউ-তাকে 'হেবা' করতে পারে, দাতা বা অন্য কোন নিকটাত্মীয়—কোন অপরিচিত ব্যক্তি তার জন্যে ওসীয়ত করতে পারে। এ কারণে এ আলোচনার শিরোনাম হওয়া উচিত ঃ বালকের মালের যাকাত'; ইয়াতীমের মালের যাকাত নয়।

দ্বিতীয়. ইয়াতীমদের ধন-মালের প্রবৃদ্ধি সাধনে মনোযোগী হওয়ার জন্যে কুরআন-হাদীসে অভিভাবকদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যেন যাকাত তা

---

১. المحلى ج ٥ ص ٢٠٦

২. كتاب الاموال ص ٤٥٥

৩. كتاب الاموال ص ٤٥٥

নিঃশেষ করে না দেয়। আমর ইবনে শুয়াইব কর্তৃক—তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) লোকদের সামনে ভাষণ দিয়ে বলেছেন ঃ

اَلَا مَنْ وَلِّى يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكْهُ فَتَاْ كُلُهُ الصَّدَقَةُ

তোমরা যারা ইয়াতীমের অভিভাবক হবে, সে ইয়াতীমের ধন-মাল থাকলে তা নিয়ে যেন ব্যবসা করা হয়, তা বেকার ফেলে রাখা না হয়। নতুবা যাকাত তা খেয়ে ফেলবে। (তিরমিযী, দারে কুত্‌নী)

ইউসুফ ইবনে মাহাক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ

اِبْتَغُوْا بَاَمْوَالِ الْيَتْمٰى لَاتُذْهِبْهَا الصَّدَقَةُ

ইয়াতীমের ধন-মালের প্রতি তোমরা লক্ষ্য রাখ, যাকাত যেন তা শেষ করে না ফেলে। (তিরমিযী, দারে কুত্‌নী)

অতএব ইয়াতীমের ধন-মালের দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হল তার প্রবৃদ্ধি সাধনে মনোযোগী হওয়া, অনুরূপভাবে তা থেকে যাকাত হিসেব করে দিয়ে দেয়াও তাদেরই কর্তব্য।

স্বীকার করছি, সম্পদের দিক দিয়ে এ দুটো হাদীসের দুর্বলতা রয়েছে, অথবা তার বর্ণনা-পরম্পরা অবিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু তা নানাভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছেঃ

প্রথমত. অনেক কয়টি সূত্রে এ অর্থের হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে তোলে। হাফেয ইরাকী তো কয়েকটি সূত্রকেই সহীহ্ বলেছেন।

দ্বিতীয়ত, কোন কোন সাহাবী থেকে অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, ইয়াতীমের ধন-মাল নিয়ে ব্যবসায় করার কথাটি কুরআনের এ আয়াতটির প্রতিধ্বনি ঃ

وَارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ- (النسأ)

তোমরা তাতে তাদের খোরাক-পোশাকের ব্যবস্থা কর। তা থেকে এ ব্যবস্থা করতে বলা হয়নি।

উক্ত কথাটি ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্পদকে উৎপাদনের কাজে লাগানো এবং পুঁজিকরণ নিষিদ্ধ হওয়া। উপরোদ্ধৃত হাদীসসমূহে ইয়াতীমদের ধন-মালের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে বিশেষভাবে তাদের অভিভাবকদের প্রতি এবং সাধারণভাবে মুসলিম সমাজে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি। কাজেই সরকারীভাবে ইয়াতীমের ধন-মালের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দায়িত্বশীল লোক নিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে, যেন তার প্রবৃদ্ধি সাধনের উত্তম ব্যবস্থার দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায়,

শরীয়াতের বিধান তাতে কার্যকর করা হয়, ক্ষতিপূরণসমূহ দেয়া হয়, ইয়াতীমের প্রয়োজন পূরণ ও তার প্রবৃদ্ধি সাধন সম্ভব হয়। তা হলে যাকাত সে ধন-মাল খেয়ে ফেলতে পারবে না।

ইয়াতীমের জন্যে কোন আশংকা বোধ করার কারণ নেই। কেননা প্রথমত, তারা সচ্ছল অবস্থার নিকটাত্মীয়দের রক্ষণাবেক্ষণ পাবে, অন্তত রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার উপর তারা নির্ভরশীল হতে পারবে। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ- قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ- وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ- (البقرة - ٢١٥)

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কি খরচ করবে? তুমি বলে দাও, তোমরা যে ভাল জিনিস ব্যয় করবে, তা করবে পিতামাতার জন্যে, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্যে। আর তোমরা যে ভালো জিনিসই ব্যয় করবে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ- وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ- وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ-

(البقرة-١٧٧)

পূর্বে ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোই প্রকৃত ধর্মপ্রাণতা (righteousness) নয়; বরং প্রকৃত ধর্মপ্রাণতা আছে তার, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশ্‌তা, কিতাব ও নবী-রাসূলগণের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার দরুন অর্থ সাহায্য দিয়েছে, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, প্রার্থী ও দাস বা বন্দীদের মুক্তির জন্যে।

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ- (الانفال- ٤١)

তোমরা জেনে রাখ, যে জিনিসই তোমরা গনীমত হিসেবে পাবে, তারই এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্যে, রাসূলের জন্যে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্যে।

مَـا اَفَـاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُـوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُـرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُـوْلِ وَلِذِى الْقُـرْبٰى وَالْيَـتٰمٰى وَالْمَـسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِـيْلِ - كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢبَيْنَ الْاَغْنِيَـاءِ مِنْكُمْ- (الحشر- ٧)

নগরবাসীদের থেকে যা কিছু আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে দান করেছেন, তা আল্লাহ্র জন্যে, রাসূলের জন্যে, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্যে, যেন তা তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তনশীল হয়ে না থাকে।

এ সব আয়াতের আলোকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ব্যক্তিদের ধন-মালে ইয়াতীমের অংশ রয়েছে যখন তারা যাকাত বা যাকাত ছাড়া অন্যভাবে কোন কিছু ব্যয় করবে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ—যাকাত, গণীমত ও 'ফাই' যাই হোক—তাতেই ইয়াতীমের অংশ রয়েছে। এটা তাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যবস্থা। তাদের অক্ষমতা-দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তা করা হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُـسْلِمٍ مِنْ نَّفْـسِـهٖ- مَنْ تَرَكَ مَـالًا فَلِوَرَثَـتِـهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْصِيَاعًا فَاِلَىَّ وَعَلَىَّ- (بخارى، مسلم)

প্রতিটি মুসলমানের কাছে তার নিজের তুলনায় আমি অধিক উত্তম। যে লোক ধন-মাল রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্যে হবে। আর যে লোক কোন ঋণ বা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মত সন্তানাদি রেখে যাবে, তাদের ব্যাপার আমার দিকে এবং তাদের দায়িত্ব আমার উপর।

বস্তুত ইয়াতীম ইসলামী সমাজের সামষ্টিক দায়িত্বে থাকবে। এ কারণে তার বিপদে পড়ার বা অর্থাভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কোনই আশংকা থাকতে পারে না।

সারকথা

বালক ও পাগলের ধন-মালে অবশ্যই যাকাত ফরয হবে। কেননা তা একটা হক. ধন-মালের সাথে তার সম্পর্ক। কাজেই তার মালিক ছোট বা পাগল হলে সে হক নাকচ হয়ে যেতে পারে না। আর সে ধন-মাল গৃহপালিত পশু হোক কিংবা কৃষি ফসল বা ফল-ফাঁকড়া, ব্যবসা পণ্য বা নগদ টাকা—তাতে কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য যে নগদ টাকা স্বীয় মৌল প্রয়োজন পূরণের জন্যে রাখা হয়েছে তার কথা নয়, কেননা তা তো তখন আসল প্রয়োজনের পরিমাণের অতিরিক্ত হবে না। বালক ও পাগলের অভিভাবকের কাছে যাকাত দাবি করা হবে। মালিকী মাযহাবের কোন কোন ফিকাহ্বিদের মত অনুযায়ী 'শরীয়াত বিভাগ'-ই তা আদায় করে নেবে।

তৃতীয় অধ্যায়

যেসব ধন-মালে যাকাত ফরয হয় তার নিসাব পরিমাণ

১. যে ধন-মালে যাকাত ফরয হয়
২. জন্তু ও পশু সম্পদের যাকাত
৩. স্বর্ণ ও রৌপ্যের নগদ অর্থ ও অলংকারের যাকাত
৪. ব্যবসা পণ্যের যাকাত
৫. কৃষি সম্পদের যাকাত
৬. মধু ও পশু উৎপাদনের যাকাত
৭. খনিজ ও সামুদ্রিক সম্পদের যাকাত
৮. ঘর-বাড়ী ও শিল্প-কারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের যাকাত
৯. স্বাধীন শ্রম ও উপার্জনলব্ধ সম্পদের যাকাত
১০. বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বিষয়ের আলোচনা শেয়ার, বণ্ডস্ ইত্যাদি।

যেসব ধন-মালে যাকাত ফরয এবং যাকাতের নিসাব পরিমাণ

এ অধ্যায়ে যাকাতের নিয়ম-বিধান আলোচিত হয়েছে, যাকাত কোন্ কোন্ ধন-মালে ফরয হয়, কত পরিমাণের মাল থাকলে যাকাত ফরয হবে তৎসংশ্লিষ্ট শর্তাবলী—ইত্যাদির আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে মোট দশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে সম্পদে যাকাত ফরয হয়

যে সব ধন-সম্পদে যাকাত ফরয হয় কিংবা ফরয হওয়ার শর্ত কি, এ পর্যায়ে কুরআন নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি। এমন কি কোন্ সম্পদে কি পরিমাণ যাকাত ফরয, সে ব্যাপারেও কুরআন নীরব। এ কাজটির দায়িত্ব সুন্নাতের উপর অর্পিত হয়েছে, তা কথার মাধ্যমে জানা যাক, কি কাজের বর্ণনার মাধ্যমে। বস্তুত কুরআনে যা মোটামুটিভাবে বলা হয়েছে, সুন্নাতই তা বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছে ও তার বাস্তব কর্মরূপ উপস্থাপিত করেছে। কুরআনে যা অস্পষ্ট রয়েছে, সুন্নাত তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। কুরআনে যা সাধারণভাবে বলা হয়েছে, সুন্নাত তা বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে; তার বাস্তবায়নের পন্থা নির্দেশ করেছে। কুরআনে যে মতাদর্শের রূপরেখা পেশ করা হয়েছে, সুন্নাতে তার বাস্তব রূপ তুলে ধরেছে, মানব জীবনে অনুসরণের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। কেননা রাসূলে করীম (স)-ই আল্লাহ্র নাযিল করা বিধানের বাস্তব ব্যাখ্যাদানের জন্যে দায়িত্বশীল। আর তা তিনি করেছেন তাঁর মুখের কথা দ্বারা, কাজের দ্বারা এবং সমর্থনের দ্বারা। আল্লাহ্র কালামের আসল বক্তব্য কি, তা দুনিয়ার সব মানুষের তুলনায় তিনিই অধিক ভাল জানেন।

এ পর্যায়েই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ-
(النحل- ٤٤)

আর তোমার প্রতি কুরআন এ জন্যে নাযিল করেছি যে, লোকদের জন্যে তাতে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা তুমি লোকদের সবিস্তারে ও সঠিকভাবে বলে দেবে এবং সম্ভবত তারাও চিন্তা-ভাবনা করবে।

দুনিয়ার মানুষের কাছে ধন-মাল সম্পদ বিচিত্র ধরনের। কুরআন এই কথার উল্লেখ করেছে এবং তার যাকাত দেয়া সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছে। তাতে আল্লাহ্র হক থাকার কথাও মোটামুটি বলেছে।

প্রথম —স্বর্ণ ও রৌপ্য। এর উল্লেখ হয়েছে কুরআনের এ আয়াতে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ- (التوبه- ٣٤)

আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, তাদের পীড়নকারী আযাবের সুসংবাদ দাও।

দ্বিতীয়—কৃষি ফসল ও ফল-ফাঁকড়া। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

كُلُوْ مِنْ ثَمَرِهِ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْ حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ- (الانعام- ١٤١)

তোমরা সকলে তার ফল খাও যখন তা ফল দেবে। আর তা কাটার দিনই তার হক আদায় করে দাও।

তৃতীয়—ব্যবসা ইত্যাদির উপার্জন। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ- (البقرة - ٢٦٧)

হে ঈমানদার লোকেরা। তোমরা যে সব পবিত্র ধন-মাল উপার্জন কর, তা থেকে ব্যয় কর।

চতুর্থ—জমি, খনি ইত্যাদির উৎপাদন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنْ الاَرْضِ-

আর সেই জিনিস থেকেও, যা আমরা জমি থেকে তোমাদের জন্যে উৎপাদান করেছি।

এসব ছাড়াও কুরআন সাধারণ ও নিঃশর্ত কথা দ্বারা যাকাত ফরয হওয়ার ধন-সম্পদের প্রতি ইংগিত করেছে। কুরআনে উদ্ধৃত একটি শব্দ হচ্ছে اموال। অর্থাৎ ধন-মাল-সম্পদ-সম্পত্তি। বলা হয়েছেঃ

خُذْمِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً-

তাঁদের ধন-মাল সম্পদ থেকে যাকাত আদায় কর।

অপর আয়াতে রয়েছে ঃ

فِيْ اَمْوَلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ-

তাদের ধন-মালে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।

'মাল' শব্দের অর্থ—আভিধানিক শরীয়াতের পরিভাষায়

কুরআন মজীদে এবং হাদীসেও যে 'মাল'-এর কথা বলা হয়েছে যার বহু বচন 'আম্ওয়াল'—তার অর্থ কি?

যে-আরবদের ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে, তাদের কাছে 'মাল' বলতে বোঝায় এমন জিনিসই যা অর্জন-দখল করা এবং মালিক হওয়ার কামনা-বাসনা ও চেষ্টা মানুষের মধ্যে থাকে। এই দিক দিয়ে উষ্ট্রও মাল, গরুও মাল, ছাগলও মাল, খেজুর গাছ, স্বর্ণ ও রৌপ্য এ সবই 'মাল'। আরবী অভিধান 'কামুসুল মুহীত' 'লিসানুল আরব'-এ বলা হয়েছে ঃ المال ما ملكته من جميع الاشياء —'জিনিস-পত্রের মধ্যে তুমি যারই মালিক হবে, তা-ই 'মাল'। তবে মরুবাসীরা সাধারণত 'মাল' বলতে কেবল গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুই বুঝে। আর নগরবাসীরা সাধারণ স্বর্ণ-রৌপ্যকেই 'মাল' মনে করে। যদিও সব জিনিসই 'মাল'।

ইবনুল আসীর লিখেছেন ঃ মূলত 'মাল' বলতে মালিকানায় লব্ধ বোঝায়। কিন্তু চলতি অর্থে যেসব জিনিসের মালিকানা লাভ হয় ও দখলে আনতে চাওয়া হয়, তা সবই 'মাল' রূপে গণ্য।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে 'মাল' শব্দের অর্থ নির্ধারণে ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন।

হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের মতে যা করায়ত্ত করা যায় এবং স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করা যায় তা-ই 'মাল'। এ দৃষ্টিতে দুটি গুণ ব্যতিরেকে কোন জিনিসকে 'মাল' বলা যাবে না। একটি হল অধিকৃত (possession) হওয়ার গুণ আর দ্বিতীয়টি স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাব্যতা। অতএব যে জিনিসই অধিকৃত হবে এবং কার্যত ব্যবহার করা যাবে, তা-ই 'মাল' বলে গণ্য হবে। জমি, পশু ইত্যাদি যে সবের আমরা মালিক হয়ে থাকি তা সব-ই মাল—তা বস্তু বা দ্রব্য হোক, কি নগদ টাকা। যেসব জিনিস উপস্থিত অবস্থায় অধিকৃত ও ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য নয়; কিন্তু সে সবের মধ্যে তা রূপায়িত হতে পারে তার সম্ভাব্য রয়েছে তা-ই 'মাল'-এর মধ্যে গণ্য। নদী-সমুদ্র গর্ভস্থ মাছ বা শুন্যে উড়ন্ত পাখী, বনজংগলের পশু। এগুলোর করায়ত্ত করা সম্ভব এবং স্বাভাবিকভাবেই তা ব্যবহৃত হতে পারে।

কিন্তু যা করায়ত্ত হওয়ার যোগ্য নয়, তা ব্যবহৃত হতে পারলেও 'মাল'রূপে গণ্য হবে না। যেমন সূর্যের আলো ও তাপ, বাতাস ইত্যাদি। তেমনি যা স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না—কার্যত তা অর্জিত হতে পারলেও 'মাল' বলা যাবে না। যেমন একমুঠি মাটি, পানির ফোঁটা, মৌমাছি, চাউলের একটা দানা ইত্যাদি।

এ অর্থ বিশ্লেষণের লক্ষ্য হচ্ছে এ কথা স্পষ্ট করা যে, 'মাল' 'বস্তু' ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুই করায়ত্ত করা যায়, দখল করা যায়। বস্তু ব্যবহারের ফায়দা 'মাল' বলে গণ্য হবে না—যেমন ঘরবাড়িতে বসবাস, গাড়ি ঘোড়ায় আরোহণ, বস্ত্র পরিধান কেননা এগুলো দখল ও করায়ত্ত করা যায় না। অধিকারসমূহও সেইরূপ। যেমন ইত্যাদি লালন-পালনের অধিকার, অভিভাবকত্বের অধিকার। এটা হানাফী মাযহাবের মত।

শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের মত হল, বস্তুর ব্যবহারিকতাই মাল। কেননা তাঁদের মতে মূল জিনিসের অধিকৃত ও করায়ত্ত হওয়ার সম্ভাব্যতাই আবশ্যকীয় নয়, তার

মৌল ও উৎস করায়ত্ত করার সম্ভাব্যতাই যথেষ্ট। আর ব্যবহারিকতার ক্ষেত্র ও উৎস করায়ত্ত করার দ্বারাই ব্যবহারিক মূল্য করায়ত্ত করা সম্ভব। যেমন কেউ কোন গাড়ি করায়ত্ত করে নিলে অপরকে তার অনুমতি ভিন্ন তা ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা যায়।

আইন প্রণয়নকারীরা এ মতই গ্রহণ করেছে বলে মালের ব্যবহারিক মূল্যকেও 'মাল' গণ্য করেছেন। যেমন গ্রন্থস্বত্ব, আবিষ্কারের সাক্ষ্যাদিও 'মাল'। ফিকাহ্‌বিদ্‌দের কাছে যা 'মাল' বলে গণ্য, তার চাইতে অধিক সাধারণ অর্থে তারা 'মাল' শব্দ ব্যবহার করেন।[১]

এ পর্যায়ে আমাদের মত হল, 'মাল' শব্দের যে তাৎপর্য হানাফী মতের ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন তা তার অভিধানের অর্থের নিকটবর্তী; আরবী অভিধানসমূহে যেমন বলা হয়েছে। যাকাত পর্যায়ে যত দলীল এসেছে তা সবই এ অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা মূল বস্তু ব্যবহারিকতা নয়; ইহা তো গৃহীত, হস্তগত ও সংগ্রহীত হতে ও বায়তুলমালে রক্ষিত হতে পারে এবং পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে তা বন্টন করা যেতে পারে।

ইবনে নজীম বলেছেন, মাল হচ্ছে ঃ

مَايُتَمَوَّلُ وَيُدَّخَرُ لِلْحَاجَةِ-

যা সংগৃহীত ও সঞ্চিত হতে পারে প্রয়োজনের জন্যে।

অর্থাৎ মূল বস্তু। ব্যবহারিকতার মালিক বানানো এর মধ্যে গণ্য নয়। 'কাশফুল কবীর' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

الزَّكٰوةُ لا تَتَادّٰى الاَّ بِتَمْلِيْكِ عَيْنٍ مُتَقَوِّمَةٍ حَتّٰى لَوْ اُوْ اُسْكِنَا لْفَقِيْرُ دَارَهُ بِنِيَّةِ الزَّكٰوةِ لَا يُجْزِئُهُ-

মূল দৃঢ় কঠিন বস্তুটির মালিক বানানো ছাড়া যাকাত আদায়ের উপায় নেই। এমন কি, কেউ যদি তার ঘরে কোন গরীব ব্যক্তিকে বসবাস করতে দেয় যাকাত আদায়ের নিয়তে, তাতে তা আদায় হবে না। কেননা ব্যবহারিকতা তো আর মূল বস্তু নয়। এ হল দুটি পন্থার একটি। অপরটি হল ব্যবহারিকতা ও মাল। প্রয়োগের সময় তা মূল বস্তুর দিকে প্রবর্তিত হবে।[২]

যে মালে যাকাত ফরয হয় তার শর্তাবলী

মানুষ যে জিনিসের মালিক হয়, যার কোন মূল্য আছে—তা-ই মাল। তাহলে সর্ব প্রকার মালেই কি যাকাত ফরয হবে? তার পরিমাণ যা-ই হোক না কেন? তার প্রয়োজন যতটাই থাক না কেন?

১. احكام المعاملات الشريعة- ص ٣٤

২. البحر الرائق-ج ٢ص ٦١٧

মানুষের বাসগৃহও মাল, পরিধেয় বস্ত্রও মাল, পড়ার জন্যে সংগৃহীত বই-পত্রও মাল। চাষ-বাস ইত্যাদি কাজে হাতে ব্যবহার্য যন্ত্র ও পাত্র ইত্যাদিও মাল। ...... তাহলে এগুলোর উপরও কি যাকাত ফরয হবে?

একজন আরব বেদুইন দুটি উষ্ট্রের মালিক কিংবা কিছু ব্যবহার্য দ্রব্যাদির। তার উপর যাকাত ফরয? কৃষক তার জমি চাষ করে এক বা দুই 'আরদেব' ফসল ফলায় তার নিজের ও পরিবারবর্গের খোরাকের জন্যে। তার উপরও কি যাকাত ধার্য হবে?

প্রায় প্রত্যেক মানুষই কিছু টাকার মালিক হয়ে থাকে। তার উপরও কি যাকাত ধার্য হবে?

ব্যবসায়ী কিছু না কিছু পরিমাণ পণ্যের মালিক হয়ে থাকে। কিছু নগদ টাকাও তার কাছে থাকা স্বাভাবিক, সেই সাথে তার থাকে সমপরিমাণের বা ততোধিক পরিমাণের ঋণ। এখন তাকেও কি যাকাত দিতে হবে?

ইসলাম যে ন্যায়বিচারের আহবান নিয়ে এসেছে, ইসলামী শরীয়াত মানবজীবনে যে সহজতা ও সুখ-শান্তি বিধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তা মানুষকে কষ্ট অসুবিধা কঠিনতায় নিক্ষেপ করতে অস্বীকার করে। কেননা আল্লাহ্ই তা তাদের থেকে দূর করে দিতে চান। এরূপ অবস্থায় যে মালের উপর যাকাত ফরয হতে পারে তার গুণ, পরিমাণ ও পরিচিতি সুনির্দিষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তার শর্তাবলীও সম্মুখে থাকা আবশ্যক।

আমরা এখানে এই শর্তাবলীর উল্লেখ করছি।

১. পূর্ণাঙ্গ মালিকানা

সমস্ত ধন-মাল আসলে আল্লাহ্র মালিকানায়। তিনিই তার উদ্ভাবক, তার স্রষ্টা। তিনি তা মানুষকে দান করেছেন। তা-ই মানুষের রিযিক। এ জন্যে কুরআন বারবার এই মহাসত্যকে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছে। বহু সংখ্যক আয়াতে সমস্ত ধন-মাল আল্লাহ্র বলে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

وَاٰتُوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ اٰتَاكُمْ- (النور)

এবং তোমরা তাদের দাও আল্লাহ্র সেই 'মাল' থেকে যা তিনি তোমাদের দান করেছেন।

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَا كُمْ- (البقرة- ١٨٠)

এবং ব্যয় কর তোমরা সেই রিযিক থেকে, যা আমরা তোমাদের দিয়েছি।

يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه- (ال عمران- ١٨٠)

তারা কার্পণ্য করে তা নিয়ে যা আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাঁদের দিয়েছেন।

এ সব ধন-মালে মানুষের স্থান ও মর্যাদা হচ্ছে উকিল বা প্রতিনিধিত্বের মাত্র। তারা শুধু ধন-ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বশীল। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ- (الحديد-٧)

এবং খরচ কর তোমরা সেই জিনিস থেকে, যাতে আল্লাহ্ তোমাদের খলীফা বানিয়েছেন।

আল্লাহ্ যদিও সব ধন-মালের প্রকৃত মালিক, প্রকৃত অধিকারী, তা সত্ত্বেও এ সব তিনি তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে, মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ। সেই সাথে তা আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহে বান্দাদের পরীক্ষার মাধ্যমও। আল্লাহ্ চান, তারা যেন আল্লাহ্র দানের কথা সচেতনভাবে স্বীকার করে। তারা আল্লাহ্র পৃথিবীতে তাঁর খলীফা, এ কথা যেন তারা ভুলে না যায়। আল্লাহ্ এ সব তাদের মালিকানায় দিয়ে তাঁরই প্রতি তাদের দায়িত্বশীল বানিয়েছেন, এ জন্যে তাঁর কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে, এ কথা যেন সব সময় তাদের স্মরণে থাকে। তারা যেন হয় এ সবের ব্যাপারে আল্লাহ্র আমানতদার। ঠিক যেমন পিতা তার বিত্ত-সম্পত্তির একাংশ তার সন্তানদের দান করে। যেন তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের চেতনা জাগ্রত হয়, তারা নিজস্বভাবে তা ব্যয়-ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। পিতা পরীক্ষা করে সন্তানদের, তারা তার শুভ ধারণানুযায়ী উত্তমভাবে সেগুলোর ব্যয়-ব্যবহার করতে পারছে কিনা, না তা খারাপভাবে ব্যবহার করে তাদের ব্যর্থতা প্রকট করে তোলে—বাস্তবভাবে তা দেখতে চায়। ধন-মালের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ মানুষকে এ সব দিয়ে ঠিক সেই কাজ করেছেন। এ একটা ভালো দৃষ্টান্ত মাত্র।

এর কারণে কুরআন শরীফেই আমরা দেখতে পাই, ধন-মাল প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা মানুষের বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন বলেছেন ঃ

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ- (التغابن-٩)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের ধন-মাল (যা তোমাদের আয়ত্তে রয়েছে) যেন তোমাদের গাফিল না বানিয়ে দেয়।

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ- (التغابن-١٥)

তোমাদের ধন-মাল ও তোমাদের সন্তান পরীক্ষার মাধ্যম।

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ- (الهمزة-٢)

ভাবে—মনে করে যে, তার ধন-মাল তাকে চিরন্তন বানিয়ে দেবে।

مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبَ- (اللهب-٢)

তাকে মুখাপেক্ষীহীন বানায় নি তার ধন-মাল আর যা সে উপার্জন করছে, তা।

وَفِى اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ- (الذاريات-١٩)

তাদের ধন-মালে হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের।

خُذْمِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً- (التوبه- ١٠٣)

তাদের ধন-মাল থেকে সদ্‌কা গ্রহণ কর।

فَلَاتُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ- (التوبة- ٥٥)

তাদের ধন-মাল ও সন্তান যেন তোমাকে বিস্মিত ও হতচকিত না করে।

فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ- (النساء- ٦)

অতএব তাদের ফিরিয়ে দাও তাদের ধন-মাল।

لَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ- (النساء- ٢٩)

তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিকভাবে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না।

এ সব আয়াতে ধন-মাল মানুষের বলে উলেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা দ্বিগুণিত ও চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁর দেয়া ধন-মাল থেকে মানুষের কাছে করয চান। তিনি নিজে সবকিছুর মালিক হয়েও তা তিনি তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে ক্রয় করেন। এটা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ ذَالَّذِى يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً (البقرة-٢٤٥)

কে আছে আল্লাহ্‌কে করযে হাসানা দিতে প্রস্তুত, তাহলে তিনি তা তাকে বহুগুণ বেশী করে ফিরিয়ে দেবেন।

مَنْ ذَاالَّذِى يَقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيْمٌ- (الحديد)

কে আছে আল্লাহ্‌কে উত্তম করয দিতে প্রস্তুত, তাহলে তিনি তাকে তার জন্য বহুগুণ বেশী করে ফিরিয়ে দেবেন এবং তার জন্যে উত্তম কর্মফল হবে।

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْاالزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوْا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا- (المزمل-٢٠)

অতএব তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে করযে হাসনা দাও।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ- (التوبة)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জানমাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই শর্তে যে, তাদের জন্যে জান্নাত হবে।

হাসান বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাদের থেকে জানমাল ক্রয় করে নিয়েছেন, যদিও তিনিই তার স্রষ্টা। জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন, যদিও তিনিই তার প্রদাতা।'

তা সত্ত্বেও মানুষের এ মালিকানা পূর্ণাঙ্গ নয়। প্রকৃত মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌র। কথিত মানুষের মালিকানার অর্থ করায়ত্তকরণ, ব্যয়-ব্যবহার করা মানুষের সাথে তা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া।

মানুষের কোন কিছুর মালিক হওয়ার অর্থ সেই জিনিসটি দ্বারা উপকৃত হওয়া বা তার কল্যাণ লাভ করার অধিকার অন্য কারোর তুলনায় তার বেশী হওয়া। শরীয়াত-সম্মত উপায়ে কেউ কোন জিনিস করায়ত্ত করে নিলে এরূপ হয়। আর সে উপায় হচ্ছে, শ্রম বা কাজ, চুক্তি অথবা উত্তরাধিকার; কিংবা অন্য কিছু। মানুষের এ মালিকানা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে এবং তাঁর শরীয়াত অনুযায়ী হয়।

মানুষকে মালিক বানানোর মর্মকথা—যা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী বলেছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন মানুষের জন্যে পৃথিবী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা ভোগ ব্যবহার করা মুবাহ্ করে দিয়েছেন, তখন একটা ঝগড়ার সৃষ্টি হল। তখন হুকুম হল, কেউ যেন অপরের দখল করা জিনিসে হস্তক্ষেপ না করে। আসলে সমস্ত পৃথিবী মসজিদ বা মুসাফিরখানার মত। পথিকদের জন্যে তা ওয়াক্ফ করা হয়েছে। তারা তাতে সকলেই শরীক। এখানে যে আগে আসবে সে আগে পাবে, এ নীতি কার্যকর হবে। আর কারোর কোন জিনিসের মালিক হওয়ার অর্থ, সে তা ভোগ ব্যবহার করার অন্যদের অপেক্ষা বেশী অধিকারী।[১]

এ ভূমিকার পর 'পূর্ণাঙ্গ মালিকানা' বলতে আমরা কি বোঝাতে চাই, তা বলব। তা একটা ফিকাহ্‌শাস্ত্রের পরিভাষা। তাতে দুটো অংশ রয়েছে। এক মালিকানা, দ্বিতীয়টি পূর্ণাঙ্গ। মালিকানার আভিধানিক অর্থ তা করায়ত্ত করা, তার ওপর শক্তি প্রয়োগ করা। কেউ মালিক হয়েছে অর্থ, তা দখল করে নিয়েছে, একার ব্যবহারের অধীন বানিয়েছে।

এ আভিধানিক অর্থই শরীয়াতে গৃহীত হয়েছে। ফিকাহ্‌বিদ কামাল ইবনুল হুমাম الفتح। নামের গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

---

১. حجة الله البالغة- ج ٢ ص ١٤٠.

اَلْقُدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ ابْتِدَاءً اِلاَّ لِمَانِعٍ-

হস্তপেক্ষ করার—ব্যয়-ব্যবহার করার প্রাথমিক শক্তি, কোন বাধাদানকারী ব্যতীতই।

অর্থাৎ এটা সূচনাকারী শক্তি, অন্য ব্যক্তি পর্যন্ত বিলম্বিত নয়।

কিরাফী الفروق গ্রন্থে তার সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ قُدْرُ وُجُوْدِهِ فِيْ عَيْنٍ اَوْفِيْ مَنْفَعَةٍ يَّقْتَضِيْ تَمْكِيْنَ مَنْ اُضِيْفَ اِلَيْهِ مِنَ الْاَشْخَاصِ مِنْ اِنْتِفَاعِهِ- بِالْعَيْنِ اَوْبِالْمَنْفَعَةِ اَوِالْاِعْتِيَاضِ عَنْهَا مَالَمْ يُوْجَدْ مَانِعٌ مِنْ ذٰلِكَ-

কোন জিনিসে তার অস্তিত্ব পরিমাণ শরীয়াতী হুকুম, যা যে ব্যক্তিকে তার ব্যবহার বা তার বিনিময় করণের অধিকারী বানানো হবে, তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে—যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে বাধাদানকারী কেউ থাকবে না।

'সদরুশ্ শরীয়াহ্' সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ কোন জিনিস ও ব্যক্তির মধ্যকার শরীয়াতসম্মত যোগসূত্র যা তাতে নিঃশর্ত হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয় এবং অপর লোকের হস্তক্ষেপে বাধাদান করে।

এ কয়টি সংজ্ঞাই কোন জিনিসের সাথে ব্যক্তির স্বতন্ত্র ও বিশেষত্বসম্পন্ন সম্পর্ক স্থাপনের কথাই বলেছে। অভিধান গ্রন্থসমূহ থেকে যেমন এ কথা জানা যায়, আইনের অভিজ্ঞ লোকেরাও তাই বলেছেন। একটি সংজ্ঞা এই ঃ

سُلْطَةٌ تَمَكَّنُ صَاحِبَهَا مِنْ اِسْتِعْمَالِ الشَّيْءِ وَالْاِفَادَةِ مِنْهُ بِجَمِيْعِ الْفَوَائِدِالَّتِيْ يُمْكِنُ الْحُصُوْلُ عَلَيْهَا عَلٰى نَحْوٍ مُؤَبَّدٍ وَقَاصِرٍ عَلَى الْمَلِكِ-

একটা কর্তৃত্ব যা তার মালিককে একটা জিনিস ব্যবহার ও তা থেকে ফায়দা লাভের অধিকারী বানায়—সে সর্বপ্রকারের ফায়দা সহ যা এ জিনিস থেকে লাভ করা সম্ভব—যা মালিকের জন্যে স্থায়ীভাবে হবে অথবা সঙ্কীর্ণ সময়ের জন্যে হবে।

সম্পূর্ণ মালিকানার অর্থ হল, মাল মালিকের হস্তগত, নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে থাকবে।[১]

কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন ঃ মালিকের হাতে মাল থাকাই তার মালিকানা, যাতে অন্য কারোর অধিকার নেই এবং সে নিজ ইচ্ছামত তা ব্যয়-ব্যবহার করতে সক্ষম। তার উপকারিতা বা কল্যাণ তার লব্ধ হবে।[২]

১. البحر الرائق -ج-٢ ص ٢١٨

২. مطلب اولى النهى شرح غاية المنتهى ج ٢ ص ١٢

এ কারণে তাঁরা বলেছেন ঃ ব্যবসায়ী যে পণ্য ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে তা হস্তগত করার পূর্বে তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। কেননা তা করায়ত্ত হয়নি এখনও। যা অপহৃত হয়েছে আর যা দিতে অস্বীকার করা হয়েছে, তা যখন তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তাতেও যাকাত হবে না। নিঃস্ব পথিকের উপরও যাকাত ধার্য হবে না। কেননা তার প্রতিনিধির হস্ত তার নিজের হস্তের মতই। যাকাত ফরয হওয়ার আর একটি প্রতিবন্ধক হচ্ছে বন্ধক রাখা, যখন সেই দ্রব্যটি 'বন্ধ রক্ষকের' হাতে থাকবে, কেননা তা মালিকের হাতে মজুদ নেই।[১]

কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ পূর্ণাঙ্গ মালিকানার শর্ত বলতে বুঝেছেন সুনিশ্চিত নির্ধারণ। যায়দীয়া ফিকাহ্‌র ফকীহ্‌গণ এ মত পোষণ করেন। তাঁরা শর্ত করেছেন যে, সমস্ত বছর ধরে নিসাব পরিমাণ মাল নির্দিষ্ট থাকতে হবে। তা মালিকের হাতে থাকতে হবে, তার স্থান জানা থাকতে হবে, তা ধরতে বা আনতে যেন কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে অথবা তার নিজের অনুমতিক্রমে অপর কারোর হাতে থাকবে। সেই 'অপর কেউ' নির্ভরযোগ্য হবে, অস্বীকারকারী হবে না অথবা তা এমন হতে হবে যে, তা চাইলেই পাওয়া যাবে—তা পাওয়ার আশা আছে, তাতে নৈরাশ্য নেই। যেমন কোন জিনিস হারিয়ে গেলেও তা ফিরে পাওয়ার আশা থাকে। কিংবা অপহৃত হয়ে থাকলেও তা ফিরিয়ে দেয়ার অথবা বিনিময় দেয়ার নৈরাশ্য থাকবে না। কারো কাছে গচ্ছিত থাকলে তা যদি দিতে অস্বীকার করা হয়, মালিকের কাছে দলীল-প্রমাণ আছে, যার বলে তা পাওয়ার আশা করা যায়। এগুলোকে 'আশা আছে' পর্যায়ে গণ্য করতে হবে। কিন্তু কোন মাল যদি আয়ত্তযোগ্য না হয়, ফিরে পাওয়ারও আশা না থাকে, তা কখনও ফিরিয়ে দিলে যে কয়টি বছর তার হাতের বাইরে রয়েছে,ততটি বছরের যাকাত ফরয হবে না। যদি কখনও ফিরে পাওয়া যায়, তাহলে তখন থেকে বছর গণনা শুরু করতে হবে ও তদনুরূপ যাকাত দিতে হবে।

এই শর্তটির যৌক্তিকতা

এ শর্তটির যৌক্তিকতা হচ্ছে, মালিকানা একটা মহান নিয়ামত। কেননা তা স্বাধীনতার প্রতীক, স্বাধীনতার ফলশ্রুতি। আর সত্যিকথা হচ্ছে তা মানবতার ফসল। কেননা জন্তু-জানোয়ার কোন কিছুর মালিক হয় না। মানুষই কোন কিছুর মালিক হয়, মালিকত্ব মানুষের মধ্যে শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা জাগিয়ে তোলে। তার মধ্যে যে স্বাভাবিক প্রবণতা তীব্রভাবে বর্তমান, তার চাহিদা পূরণ করে এ মালিকত্ব। পূর্ণাঙ্গ মালিকত্বই মানুষকে মালিকানাধীন জিনিস ভোগ-ব্যবহার করার এবং তার নিজের তার প্রতিনিধির পক্ষে তার প্রবৃদ্ধি সাধন ও তার উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার অধিকার দেয়।

এ নিয়ামতটি যে পেয়েছে, এ পাওয়ার জন্যে তার উচিত শোকর আদায় করা। তাই ইসলাম যদি তার মালিকের কাছে যাকাতের দাবি করে, তবে তা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার

১. البحر الرائق

হবে না। অতএব মালিকানাধীন ধন-মালের হক আদায় করা মালিকের কর্তব্য। এ হক আদায় করার জন্যেই যাকাত দিতে হবে।

এই শর্তের দলীল

এই শর্তটি আরোপের দুটি দলীল রয়েছে।

প্রথম—কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে ধন-মালকে তার মালিকের জিনিস বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

'তাদের ধন-মাল' থেকে যাকাত গ্রহণ কর।

'তাদের ধন-মালে' হক রয়েছে ঃ

হাদীসের কথা ঃ

انَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ فِىْ اَمْوَالِهِمْ..............

هَاتُوْا رُبُعَ عُشْرِ اَمْوَالِكُمْ

'আল্লাহ্ তা'আলা 'লোকদের ধন-মালে' তাদের উপর ফরয করেছেন' ..... 'তোমরা তোমাদের ধন-মালের' দশভাগের চারভাগের এক ভাগ দিয়ে দাও।

এ সব কথা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ নিজেই সব ধন-মালের মালিক হয়েও 'মানুষের ধন-মাল' বলে দিয়েছেন। অন্য কথায় তিনিই মানুষকে সে সবের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। তাদের মাল' 'তোমাদের মাল' কথাগুলোই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ ধরনের কথা তখনই বলা চলে, যখন মানুষ তার বিশেষভাবে মালিক হয়। তার ফলে সেই বিশেষ জিনিসের ক্ষেত্রে সে অন্যদের থেকে বিশিষ্ট হয়ে পড়ে। সেই জিনিস ভোগ-ব্যবহার করার কেবল তারই অধিকার হয়ে যায়।

দ্বিতীয়—যাকাত বলতে বোঝায়, যারা পাওয়ার উপযুক্ত ও অধিকারী তাদেরকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া। পাওয়ার উপযুক্ত ও অধিকারী যারা, তাদের কথা কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। আর 'মালিক বানানো' মালিকানারই প্রশাখা মাত্র। যে নিজে কোন কিছুর মালিক সে-ই অন্যকে সেই জিনিসের মালিক বানিয়ে দিতে পারে। যে তা নয়, সে তা পারেও না।

এ শর্তের আনুসঙ্গিক কথা

যে ধন-মালের নির্দিষ্ট মালিক নেই ঃ

যে ধন-মালের নির্দিষ্ট কোন মালিক নেই ,তার যাকাত নেই। যেমন সরকারায়ত্তাধীন ধন-মাল। সরকার নিজেই যাকাত ও কর ইত্যাদি আদায় বা সংগ্রহ করে। কাজেই তার আয়ত্তাধীন ধন-মালের যাকাত ফরয নয়। তার কারণ, তার কোন নির্দিষ্ট মালিক নেই।

তা সমগ্র জাতির মিলিত সাধারণ বিত্ত-সম্পত্তি। তা ছাড়া সরকারই যাকাত সংগ্রহের অধিকারী। তাই তার উপর যাকাত ফরয হওয়ার কোন অর্থ হয় না। এ কারণে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন ঃ 'ফাই' মালে যাকাত নেই। গনীমতের এক-পঞ্চমাংশেও যার মালিক সরকার—তারও যাকাত দিতে হয় না। কেননা তা তো মুসলিম জনগণের কল্যাণে ব্যয়িত হয়। সর্বসাধারণের সমান অধিকারের বিত্ত-সম্পত্তির ক্ষেত্রেও এই কথা।[১]

ওয়াক্ফকৃত জমি

সাধারণভাবে ওয়াক্ফ্কৃত জমি বা জিনিসের উপর কোন যাকাত নেই। গরীব, মিসকীন, মসজিদ, মুজাহিদ, অথবা ইয়াতীম, কিংবা মুসাফিরখানা, মাদরাসা প্রভৃতির জন্যে ওয়াক্ফ করা জমি বা জিনিস সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য। কেননা এ কাজ জনকল্যাণমূলক। অতএব সহীহ্ কথা হচ্ছে তাতে যাকাত ধার্য হবে না।

কিন্তু যা কোন নির্দিষ্ট এক ব্যক্তি বা সমষ্টির জন্যে ওয়াক্ফ করা হয়েছে, যেমন কারোর পুত্র বা সন্তানাদি অথবা একটা নির্দিষ্ট গোত্রের লোকদের জন্যে ওয়াক্ফ করা হয়, তাতে যাকাত ধার্য হওয়াই সহীহ্ কথা। কেননা ওয়াক্ফ করা সম্পদ সম্পত্তির ক্ষেত্রে মালিকানা হস্তান্তরিত হয় যার জন্যে ওয়াক্ফ করা হয়েছে তার প্রতি। সে-ই তার স্থায়ী মালিক হয়ে বসে, ঠিক যেন তা ওয়াক্ফ হয়নি এমনি।[২] কিন্তু সে মূল ওয়াক্ফ করা সম্পত্তির উপর কোন যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। মালিকত্বের স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে মালিক অন্যদের তুলনায় তা ব্যয়-ব্যবহার করার অধিক অধিকারী। তাকে তার থেকে উৎখাতও কেউ করতে পারে না।

কোন কোন ফিকাহবিদ মত দিয়েছেন যে, প্রতিটি ওয়াক্ফ সম্পত্তির উপরই যাকাত ফরয। তা সাধারণভাবে ওয়াক্ফ করা হোক কিংবা বিশেষভাবে। ইবনে রুশ্দ বলেছেন, মিসকীনের উপর যাকাত ফরয—এ কথা বলার কোন অর্থ নেই, যদি জমি বা অন্য কিছু তাদের জন্যে ওয়াক্ফ করা হয়। কেননা তাতে দুটি জিনিসের সমাবেশ ঘটে।

একটি, তা অসম্পূর্ণ মালিকানা,

দ্বিতীয়—তা যাকাত ব্যয়ের জন্যে নির্দিষ্ট খাতসমূহের কোন প্রকারের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে ওয়াক্ফ করা হয়নি। যাদের উপর যাকাত ফরয, তারা তাদের মধ্যেও নয়।[৩]

---

১. مطالب اولى النهى ج ٦ ص ١٢

২. المجموع للنبوى ج ٥ ص ٣٣٩

৩. بداية المجتهد ج ١ ص ٢٣٩

হারাম সম্পদের যাকাত হয় না

যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে মালিকানা শর্ত বিধায় ঘুষ বা হারাম কোন উপায়ে অর্জিত সম্পদ বা সম্পত্তিতে যাকাত ফরয হতে পারে না। পরস্বাপহরণ, চুরি, মিথ্যা বা প্রতারণা, সুদ, মজুদকরণ, ধোঁকাবাজি বা ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদও এ পর্যায়ে গণ্য। কেননা এগুলো বাতিল পন্থায় লোকদের মাল গ্রহণের ব্যাপার যা কুরআনে নিষিদ্ধ। অত্যাচারী রাজা-বাদশাহ্ ও চরিত্রহীন রাজন্যবর্গের ধন-সম্পদের ক্ষেত্রেও এ কথা।

কেননা তারা এ সব সম্পদের প্রকৃত মালিক নয়। তারা যদি তাদের হালাল মালকে তার সাথে মিশ্রিত করে এবং তা আলাদা করা সম্ভব না হয়, তাহলেও যাকাত হবে না।

বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, খারাপ (হারাম) মাল নিসাব পরিমাণের হলেও তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। কেননা তা প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া গেলে তার বা তার উত্তরাধিকারীর কাছে তা ফেরত দেয়াই তার কর্তব্য। আর তার সন্ধান পাওয়া না গেলে তা দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে। এক্ষণে সবকিছুই 'সদ্কা করে দিতে হবে। তার কতকাংশ দান করলে কোন লাভ হবে না।[১]

হারাম মালের যাকাত না নেয়ার যুক্তি স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা তো দাতার নিজের মালিকানাভুক্ত সম্পদ নয়। তাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করাই নিষিদ্ধ। যাকাত দেয়াও এক প্রকারের হস্তক্ষেপ। তা গ্রহণ করা হলে তার অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, তা একদিক দিয়ে আদিষ্ট ও অপর দিক দিয়ে নিষিদ্ধ। কিন্তু তা সম্ভব।[২]

সারকথা, হারাম মালের মালিক শরীয়াতের দৃষ্টিতে ধনী প্রমাণিত নয়। তা স্তূপাকারে হলেও এবং তা দীর্ঘদিন ধরে একজনের মালিকানাভুক্ত থাকলেও। ইমাম সারাখ্শীর মতে সে মাল জালিম রাজা-বাদশাহ্কেও দিয়ে দেয়া যেতে পারে। তিনি এদেরকে 'দরিদ্র' গণ্য করেছেন। কেননা তাদের হাতে যে-ধন-মাল রয়েছে তা তো মুসলিম জনগণের, তাদের নিজেদের নয়। তা যদি ফিরিয়ে দেয়, তা হলে তাদের কাছে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ফলে তারা দরিদ্রতম ব্যক্তি হয়ে যাবে।[৩] মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিমা বলেছেন, খোরাসানের শাসক আলী ইবনে ঈসা ইবনে হামানকে যাকাত দেয়া জায়েয, বলখের আমীরের উপর কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব হয়েছিল। তাঁকে ফতওয়া দেয়া

---

১. ইবনে নজীম লিখিত البحر الرائق। এবং ইবনে আবেদীন লিখিত তার টীকা ২য় খণ্ড, ২২১ পৃঃ এ পর্যায়ে ইমাম আবূ হানীফা (র) মনে করেন— কেউ যদি কিছু পরিমাণ টাকা অপহরণ করে ও তার নিজের টাকার সাথে তা মিশ্রিত করে তাহলে মনে করতে হবে, সে তা খরচ করে ফেলেছে। সে তা মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে দায়ী থাকবে। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদের মতে দায়ী হবে না। কেননা সেখানে মালিকানাই প্রমাণিত নয়; তা সম্মিলিত সম্পদ। তার উপর যাকাত ফরয হবে না।

২. فتح البارى ج ٣ ص ١٨٠

৩. ابن الهمام فى فتح لقدير عن المسبوط

হয়েছিল তিন দিনের রোযা রাখার। তা শুনে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। বলেছিল ঃ যার কিছুই নেই, তার যা কাফ্ফারা, আমাকেও সেই কাফ্ফারা দিতে বলা হচ্ছে।[১]

ইবনুল হুম্মাম বলেছেন, ওদের নিজের মাল এবং যা অন্যদের কাছ থেকে নিয়েছে তা মিলিয়ে-মিশিয়ে ফেলেছে, এক্ষণে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব না হলে ইমাম আবূ হানীফার মতে তা নিঃশেষ করে ফেলা হয়েছে। তখন সে তার মালিক হয়ে বসেছে। অতএব তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এমনকি তার উপর যাকাত ফরযও বলা হয়েছে। কোনরূপ ক্ষতি ব্যতিরেকেই তার উত্তরাধিকার কার্যকর হবে। কেননা অনুরূপ পরিমাণ মাল ফেরত দেয়া তার দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। আর যার হাতে যত পরিমাণ মাল আছে সে সেই পরিমাণ মালের ঋণগ্রস্ত হলে সে তো দরিদ্র ব্যক্তি।

এই ফতওয়ার আলোকে যে কথাটি প্রতিভাত হচ্ছে তা হল, হারাম মালের মালিক হওয়া যায় না। তা গ্রহণকারীর জন্যেও শুভ নয়। তার উত্তরাধিকারীদের জন্যেও নয়।

তবে উপরিউক্ত ধরনের জালিম শাসক-প্রশাসকদের দান করে দেয়া—এজন্যে যে তারা প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র কিংবা ঋণগ্রস্ত আদৌ জায়েয নয়। কেননা যে দরিদ্র ব্যক্তি অর্থ সাহায্য পেয়ে আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজ বেশী করবে বলে আশংকা হবে, তাকে যাকাতের মাল দেয়াই জায়েয নয়। অনুরূপভাবে যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি টাকা পেয়ে নাফরমানীর কাজে অধিক লিপ্ত হয় তা থেকে তওবা না করে, যাকাতের অংশ তাকে দেয়াও অবৈধ। যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র পর্যায়ে আমরা এ বিষেয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ঋণের যাকাত

ঋণের যাকাত পর্যায়ের আলোচনা এ শর্তের প্রসঙ্গেই আসে। প্রশ্ন হচ্ছে, যে ব্যক্তি মালের প্রকৃত ঋণদাতা, সে যাকাত দেবে, না গ্রহণকারী দেবে? যে সে মাল ব্যয় করছে এবং তা দিয়ে ফায়দা পেয়েছে অথবা উভয়ই সে দায়িত্ব থেকে মুক্ত? কিংবা উভয়েই সে যাকাত দিতে বাধ্য? .. উভয়েই ঋণের টাকার যাকাত দেবে, একথা কেউই বলেন নি। ইকরামা ও আতা প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদ্ বলেছেন, কাউকেই সে টাকার যাকাত দিতে হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, ঋণ গ্রহণকারীকে ঋণের যাকাত দিতে হবে না। আর ঋণদাতা—টাকার আসল মালিক তার যাকাত দেবে যখন তা সে ফেরত পাবে।[২]

ইবনে হাজম হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, ঋণ দেয়া টাকার যাকাত নেই অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতাকে তার যাকাত দিতে হবে না। যাহেরী মাযহাবের এটাই মত।

---

১. পূর্বোল্লিখিত উৎস। ইবনুল হুম্মাম বলেছেন, এ কাফ্ফারা জরুরী নয়।

২. المحلى ج ٢ ص ١٠١; ইমাম মালিকের ছাত্র ইবনুল কাসেম বলেছেন, অপহরণকারী যখন মাল অপহরণ করেছে তখন তার দায়িত্বে সে তা ফেরত দিতে বাধ্য। অতএব তার উপর যাকাত ধার্য হবে।

তার কারণ, এ টাকার মালিকত্ব উভয়ের ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ। ঋণগ্রহীতার হাতে ঋণ করা টাকা এলেও সে তার প্রকৃত মালিক নয়। তার দখলে তা থাকলেও এ দখলটা মালিকত্বের নয়, যদিও সে তা ব্যয়-ব্যবহার করছে। এ টাকা তো মূলত ঋণদাতার। সে যখনই চাইবে, তা ফেরত দিতে হবে।

আর ঋণদাতা যাকাত দেবে না এজন্যে যে, টাকা তো তার হাতে নেই। অন্য লোকে তা ব্যয়-ব্যবহার করছে। অতএব, তার মালিকত্বও সম্পূর্ণ নয়।

'কিতাবুল আমওয়াল'-এ ইমাম নখয়ী'র মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋণের টাকার রস ভক্ষণকারীকেই তার যাকাত দিতে হবে। কেউ যদি ব্যবসায়ীকে ঋণ দেয়, যে ব্যবসায়ী তা বৃদ্ধি করে তা দিয়ে ফায়দা পায় ও ফিরিয়ে দিতে বিলম্ব করে, তার যাকাত তাকেই দিতে হবে।

এ কথাটি বলা হল যার হাতে মাল রয়েছে তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে; যে তার আসল মালিক তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে নয়। অথচ তা পূর্ণাঙ্গ মালিকত্ব ধারণার পরিপন্থী। আর এ পূর্ণাঙ্গ মালিকত্বের ব্যাপারটিতে সব ফিকাহবিদই সম্পূর্ণ একমত। সম্ভবত ঋণগ্রহীতার উপর যাকাত ধার্য করা হয়েছে এজন্যে যে, সে তা ফিরিয়ে দিতে গড়িমসি করে।

সাহাবী ও তৎপরবর্তীকাল থেকে অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ মনে করেন যে, ঋণ দুই প্রকারের ঃ

১. এমন ঋণ যা আদায় হওয়ার ও ফিরিয়ে পাওয়ার আশা আছে। যেমন একজন সচ্ছল ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করেছে, সে তা স্বীকারও করে, তার কাছ থেকে তা ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়ই আশা আছে। এরূপ অবস্থায় সে অর্থাৎ ঋণদাতা তার ও তার অন্যান্য হস্তস্থিত মালামালের যাকাত দেবে।

এ কথাটি হযরত উমর, উসমান, ইবনে উমর ও জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত। জাবির ইবনে যায়দ, মুজাহিদ, ইবরাহিম ও মায়মুন ইবনে মাহরান প্রমুখ তাবেয়ীও এ মত পোষণ করেন।

২. দ্বিতীয় প্রকার ঋণ হল যা ফেরত পাওয়ার কোন আশা নেই। হয়ত ঋণগ্রহীতা খুব অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছে, তার সচ্ছলতার কোন সম্ভাবনা নেই। অথবা সে ঋণের কথা অস্বীকার করেছে কিংবা সে ঋণের প্রমাণপত্র কিছু নেই। এরূপ অবস্থায় কি করা হবে, সে পর্যায়ে কয়েকটি মত ব্যক্ত হয়েছে ঃ

প্রথম ঋণের টাকা যে কয় বছর পর ফেরত পাওয়া যাবে, তখনই সেই কয় বছরের যাকাত এক সাথে দিয়ে দেবে। হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস এ মত দিয়েছেন।

দ্বিতীয়, ফেরত পাওয়ার পর মাত্র এক বছরের যাকাত দেবে। হাসান ও উমর ইবনে আব্দুল আযীয প্রমুখ এ মত দিয়েছেন। আর সর্ব প্রকারের ঋণের ক্ষেত্রে তা ফেরত পাওয়ার আশা থাক আর নাই থাক; ইমাম মালিকের এটাই মত।

তৃতীয়, অতীত বছরগুলোর কোন যাকাত দিতে হবে না, সেই বছরেরও যাকাত দিতে হবে না—যে বছর ঋণের টাকা ফেরত পাওয়া গেছে। ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় এ মত প্রকাশ করেছেন। ঠিক যেমন নতুন পাওয়া মালের বছরটি গণনা করা হয়, এখানেও তাই করতে হবে।

ইমাম আবূ উবাইদ এ মত পোষণ করেন। তিনি হযরত উমর, উসমান, জাবির ও ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত উচ্চমানের হাদীসসমূহের ভিত্তিতে বলেছেন, যে মালিক তার নিজ হাতে বর্তমান ধন-মালের সাথে তারও যাকাত প্রতি বছরই দেবে যদ্দিন সে ঋণ ধনশালী লোকদের উপর ধার্য থাকবে। কেননা তার প্রাপ্য টাকা তো তার নিজের হাতে ও ঘরে রক্ষিত ধন-মালের মতই।

এ ভয়ে সতর্কতা স্বরূপ ঋণের টাকার যাকাত তা ফেরত পাওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করার পক্ষে ইমাম আবূ উবাইদ মত দিয়েছেন। তাই ঋণের টাকার যে অংশই প্রত্যর্পিত হবে তারই যাকাত দিতে হবে।

আর যে ঋণের টাকা ফেরত পাওয়ার কোন আশা নেই কিংবা প্রায় নৈরাশ্যজনক, সেক্ষেত্রে হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর মত অনুযায়ী আমল করতে বলেছেন। আর তা হল, খুব তাড়াহুড়া করে যাকাত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যখন তা নিজের হাতে ফেরত পাওয়া যাবে তখনই যাকাত দিতে হবে অতীত বছরগুলোর বাবদ, যেহেতু তা তার মালিকানায়ই রয়ে গেছে। তা হলে তার উপর আল্লাহ্‌র যে হক ধার্য তা নাকচ হবে কেমন করে? মালিকত্ব তো সেই আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই প্রাপ্ত।[১]

ফেরত পাওয়ার আশা আছে যে ঋণ, তাতে আবূ উবাইদের মতকে আমরা সমর্থন করি। কেননা তা তো তার হাতের সম্পদের মতই। কিন্তু যে ঋণের টাকা ফেরত পাওয়ার আশা নেই, তা তার মূল মালিকানায় থাকলেও তার যাকাত দিতে হবে না। কেননা তার হাতে নেই। এমতাবস্থায় তার উপর তার মালিকত্ব অসম্পূর্ণ। আর অসম্পূর্ণ মালিকত্ব সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ নিয়ামত নয়। যাকাত তো সেই পূর্ণাঙ্গ মালিকানার উপরই ধার্য হয়, যার সাথে অপর কারোর হক সম্পৃক্ত নয় এবং সে নিজ ইচ্ছামত তা ব্যয়-ব্যবহার করতে পারে।[২]

পূর্ণাঙ্গ মালিকত্বের দাবি হচ্ছে, মালিক তার মালিকানা ধন-সম্পদ-সম্পত্তি নিজ ইচ্ছানুযায়ী ব্যয়-ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। উপরিউক্ত অবস্থায় তা বাস্তবায়িত নয়।

ফেরত পাওয়ার আশা নেই, এমন ঋণের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা এবং তাঁর সে সম্পর্কেও এই কথা। কেননা যে সব ধন-সম্পদের মালিক তা ভোগ-ব্যবহার করতে পারে না, তার দরুন সে ধনী বলে গণ্য হবে না। আর যাকাত তো কেবল ধনী ব্যক্তিদের উপর ধার্য হয়ে থাকে।[৩]

---

১. আল-আমওয়াল, পৃঃ ৪৩৪-৩৫।

২. مطالب اولى النهى ج ٢ ص ١٤

৩. البدائع الصنائع ج ٢ ص ٩

যেসব ঋণ ফেরত দিতে অস্বীকার করা হয়েছে বা ফেরত পাওয়ার আশা নেই তার ক্ষেত্রে আমরা ইমাম আবূ হানীফার মত সমর্থন করি। আর সাধারণ ব্যবহারের অযোগ্য ধন-মাল যখন হস্তগত হবে তখন তা নতুন প্রাপ্ত ধন-মালের মতই গণ্য হবে। কাজেই অতীত বছরগুলোর যাকাত দিতে হবে না। যদিও আমরা হাসান, উমর ইবনে আব্দুল আযীয ও ইমাম মালিকের এই মতকে অগ্রাধিকার দিতাম যে তা ফেরত পাওয়া গেলে এক বছরের যাকাত দিতে হবে, নব প্রাপ্ত মাল সম্পর্কে আমাদের মতের ভিত্তিতে এবং বলতাম যে তার মালিক হয়ে ব্যয়-ব্যবহার করার সময়ই তার যাকাত দিতে হয় তাতে এক বছর অতীত হওয়ার শর্ত থাকবে না। এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে বিস্তারিত বলব।

চাকরীজীবীদের বেতন ও সঞ্চয়

এ পর্যায়ে সাধারণত একটি প্রশ্নই উঠে। চাকারীজীবীরা সরকার বা প্রতিষ্ঠান-সমূহে—যেখানে তারা কাজ করে—তাদের নগদ পাওনা জমা হয়ে থাকে। তা তাদেরই প্রাপ্য বটে অথবা তাদের হিসেবেই তা সঞ্চয় ও জমা করে রাখা হয়। তার কি যাকাত দিতে হবে।?

এর জবাব এ সম্পদের প্রকৃতি ও অবস্থার নির্ধারণের উপর নির্ভরশীল। প্রথমেই ঠিক করতে হবে, তা চাকুরীজীবীদের পূর্ণ মাত্রায় মালিকত্বের অধীন কি-না? অথাৎ তারা কি তা যখন ইচ্ছা তখন ব্যয়-ব্যবহার করতে পারে? কিংবা পারে না? তা তাদেরই হক, না তা সংশ্লিষ্ট সরকার বা প্রতিষ্ঠানের অনুগ্রহের দান? যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে তা হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত তার উপর মালিকত্ব কার্যকর হয় না। আর যদি তা চাকুরীজীবীর অধিকার হয়ে থাকে, তাহলে তা রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান অকেজো করে রাখতে পারে না। সে যখনই ইচ্ছা করবে, তা সে ব্যয়-ব্যবহার করতে পারবে। কাজেই আমার মতে তার উপর তার পূর্ণাঙ্গ মালিকানা স্থাপিত। আর তা এমন ঋণ, যা ফেরত পাওয়ার আশা রয়েছে। ইমাম আবূ উবাইদ এ পর্যায়ে বলেছেনঃ এই সম্পদ যেন তার হাতেই মজুদ রয়েছে এমন। কাজেই তার উপর প্রতি বছরই যাকাত ফরয হবে, যদি তার পরিমাণ নিসাব সমান হয় এবং অন্যান্য শর্তও মজুদ থাকে।[১]

প্রবৃদ্ধি

যাকাত ফরয হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, যে মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে, সে মাল প্রবৃদ্ধিমান হবে। অর্থাৎ সে মাল তার মালিককে মুনাফা বাড়িয়ে দেবে। পরিমাণে ক্রমশ বাড়তে থাকবে। তাতে নতুন নতুন মাল এসে শামিল হবে। ইসলামের ফিকাহ্‌বিদগণ প্রবৃদ্ধি বলতে এটাই বুঝিয়েছেন এবং তার অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা স্পষ্ট করে বলেছেন।

---

১. কিন্তু ইমাম মালিকের মত হলো—এই সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হবে তখন, যখন তা তার হাতে আসবে। তখন মাত্র এক বছর যাকাত দিলেই অতীতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া যাবে।

তাঁরা বলেছেন, বৃদ্ধিশীল সম্পদ দু'রকমের। একটা প্রকৃত, অপরটা পরিমাণগত। প্রকৃত প্রবৃদ্ধি জন্ম-প্রজনন, বংশবৃদ্ধি, ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর পরিমাণগত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে তা এমনভাবে বেড়ে যাওয়া যে, তার গ্রহণকারীর বা তার প্রতিনিধির হাতে তা বৃদ্ধি পাবে।[১]

প্রবৃদ্ধি শর্ত করার যৌক্তিকতা

ইবনুল হুম্মাম বলেছেন, যাকাত ফরয করার আসল উদ্দেশ্য যদিও সম্পদ-মালিককে পরীক্ষা করা; কিন্তু সেই সঙ্গে দরিদ্রদের দারিদ্র্য মোচনও তার অন্যতম লক্ষ্য এবং তা এমনভাবে, যেন সে নিজে দরিদ্র হয়ে না যায়। সে তার অতিরিক্ত সম্পদ থেকেই একটা অংশ দেবে মাত্র। তাই যে সম্পদ মূলত প্রবৃদ্ধিশীল নয়, তার উপর যাকাত ফরয করা হলে পর পর বছরগুলোতে যাকাত দেয়াটা তাই বিপরীত পড়ে যাবে। বিশেষত খরচের প্রয়োজন দেখা দিলে তা অস্বাভাবিক হয়ে পড়বে।[২]

এই প্রেক্ষিতে রাসূলে করীম (স)-এর বাণীটির যথার্থতা প্রকাশিত হয় ঃ مَانَقَصَ مَالٌ مِّنْ صَدَقَةٍ যাকাত দিলে মূল সম্পদে ঘাটতি পড়ে না।[৩]

কেননা যাকাত বাবদ যে অল্প পরিমাণ মাল দিয়ে দেয়া হয় বিপুল পরিমাণ সম্পদ থেকে, তা তো ক্রমবৃদ্ধিশীল। তা কখনই ঘাটতি সৃষ্টি করে না। এটাই আল্লাহ্‌র নিয়ম।

এ পর্যায়ে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, মাল মূলত বৃদ্ধিশীল কিনা, তাতে প্রবৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য আছে কিনা। কার্যত তা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা, তা বিবেচ্য। যেহেতু শরীয়াতে কার্যত প্রবৃদ্ধির গুরুত্ব নেই। কেননা এভাবে করতে গেলে তা কোন সীমায় সীমিত করা সম্ভবপর হবে না এবং তাতে অপরিমেয় মতভেদ দেখা দেবে।

ইমাম কাসানী লিখেছেন, যাকাত মানেই প্রবৃদ্ধি। তাই তা ক্রমবৃদ্ধিশীল সম্পদ থেকেই নেয়া হবে। আমরাও এই কথার যথার্থতা স্বীকার করছি। মূল সম্পদের বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট। তা ব্যবসা–বাণিজ্যের মাধ্যমে হতে পারে, ঘাস ইত্যাধি দিয়ে পশু পালনের মাধ্যমেও হতে পারে। কেননা গাভীকে ঘাস খাওয়ালে তার দুগ্ধ পাওয়া যাবে, তার বাচ্চা হবে, দুগ্ধ দিয়ে মাখন তৈরী হবে। তার ব্যবসা করে মুনাফা লাভ করা যায়। তখন মুনাফা লব্ধ সম্পদ মূল সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। আর তার উপরও যাকাত ফরয হয়।[৪]

এই শর্তের দলীল

যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে আরোপিত এই শর্তটি রাসূলে করীম (স)-এর কথা ও কাজ থেকে নিঃসৃত সুন্নাতের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর সাহাবী ও খলীফাগণের

১. حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٧
২. فتح القدير ج ١ ص ٤٨٢
৩. البدائع الصنائع ج ٢ ص ١١
৪. তিরমিযী, আবূ কাবশা আল-আসমায়ী বর্ণিত হাদীসের অংশ। হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

আমলও এই সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নবী করীম (স) ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে সংগ্রহীত মাল-সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করেন নি। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

মুসলিম ব্যক্তির নিজ ব্যবহার্য ঘোড়া ও ক্রীতদাসের উপর কোন যাকাত নেই।

ইমাম নববী বলেছেনঃ এই হাদীসটির মূল কথা হল, নিজ ব্যবহার্য দ্রব্য-সম্পদের উপর যাকাত হয় না।[১] নবী করীম (স) কেবলমাত্র ক্রমবর্ধনশীল বা বর্ধনপ্রবণ সম্পদের উপরই যাকাত ধার্য করেছেন। তদানীন্তন সময়ে আরব দেশে এই পর্যায়ের বহু প্রকারের সম্পদ মজুদ ছিল।

তন্মধ্যে উট, গরু ও ছাগল, স্বর্ণ ও রৌপ্য—ব্যবসায়ে মুলধন হিসেবে ব্যবহৃত হত, অনেকে তা পুঁজি করেও রাখত। ফল ও ফসল—যব, গম, খেজুর, কিশমিশ, মনাক্কা প্রভৃতি উল্লেখ্য। মধুও এ পর্যায়ে গণ্য। পূর্বের লোকদের মাটির নীচে জমা করে যাওয়া সম্পদ, যখন তা হস্তগত হবে। খনিজ সম্পদও এ পর্যায়ে গণ্য,—যদিও তা 'ফাই' গণ্য হবে না যাকাত ধার্য হওয়ার ক্ষেত্রে গণ্য হবে, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

শরীয়াতের আইন-বিধানের মূলে কারণ নিহিত আছে, এ কথায় বিশ্বাসী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, উপরোল্লিখিত দ্রব্য-সাম্রগ্রীর উপর যাকাত ফরয হওয়ার কারণ হল সেগুলোর কার্যত প্রবৃদ্ধি। অথবা তা প্রবৃদ্ধি প্রবণ।

গ্রহপালিত পশু কার্যত বৃদ্ধিশীল। তা পরিপুষ্ট ও মোটা হয়, বাচ্চা দেয়, দুগ্ধ দেয়। এদের প্রবৃদ্ধি স্বভাবসম্মত ও স্বাভাবিক। আর তার ফলে পশু সম্পদও বৃদ্ধি পায়। গোশ্‌ত ও দুগ্ধের কথা তো না বললেও চলে।

ব্যবসা পণ্যও কার্যত কমবর্ধনশীল। কেননা ব্যবসায়ে মুনাফা লাভ একটা সাধারণ ব্যাপার। যদিও তা পশু সম্পদ বা কৃষি সম্পদের মত ক্রমবৃদ্ধিশীল নয়। তা শৈল্পিক প্রবৃদ্ধি, স্বাভাবিকতার সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন। ইসলাম এই প্রবৃদ্ধিকে শরীয়াতসম্মত ও হালাল ঘোষণা করেছে। আজ পর্যন্তকার সব ধর্ম রাষ্ট্রীয় আইন ও মানবীয় বুদ্ধি-বিবেকও তা-ই গণ্য করেছে।

নগদ অর্থ ও বৃদ্ধিমান সম্পদ। তা পণ্যের বিকল্প বিনিময় মাধ্যম দ্রব্য সমূহের মূল্য নির্ধারণের মান। তা যখন শিল্প ও ব্যবসা ইত্যাদিতে বিনিয়োগকৃত হবে, তখন মুনাফা দেবে। আর এই প্রবৃদ্ধি কাম্য। এই নগদ অর্থ যদি পুঁজি করা হয় এবং উৎপাদন বিনিময় ও আবর্তনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা পালন থেকে তাকে আটকে রাখা হয়, তাহলে একটা সামগ্রিক অচলাবস্থা দেখা দেবে। পুঁজিকারী ব্যক্তি সেজন্যে দায়ী হবে; এ ঠিক একটা সুস্থ সবল ও কল্যাণদায়ক যন্ত্রকে অচল করে রাখার মত অবস্থা। ইসলামী শরীয়াত এ অবস্থা থেকে মুক্ত রাখার জন্যে নগদ অর্থ-সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেছে —যেন

১. সহীহ মুসলিমঃ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫।

তা কার্যত বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। তাহলে মালিক নিজে এবং গোটা সমাজ তা থেকে উপকৃত হতে পারবে।

কৃষি ফসল ও ফল-ফলাদি মূলত বৃদ্ধিমান। তা নব উৎপাদনে সক্ষম। মধু, সঞ্চিত ধন ও খনিজ দ্রব্যও তাই।

ফিকাহ্‌বিদগণ নবী করীম (স)-এর কাছ থেকে পাওয়া হিদায়েতের ভিত্তিতেই এই শর্তটি আরোপ করেছেন। খুলাফায়ে রাশেদুনের কার্যাবলীও তাঁদের সম্মুখে প্রতিভাত। 'যাকাত' শব্দটি এই ভাবধারাসম্পন্ন। কেননা তার প্রকাশ্য অর্থই হল প্রবৃদ্ধি বা বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, সম্পদ থেকে গ্রহীত পরিমাণটিকে যাকাত বলা হয় এজন্যে যে, তার চূড়ান্ত পরিণতিই হচ্ছে বরকত ও বৃদ্ধি। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এ ওয়াদাই করেছেন ঃ

وَمَا اَنْفَقْتُمع مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ- (سباء-٣٩)

তোমরা যা কিছু আল্লাহ্‌র জন্যে ব্যয় করবে পরে তিনি তা এনে দেবেন।

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَا وُلٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ- (الروم- ٣٩)

তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুটি লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দাও, সেই দাতারাই আসলে তাদের মাল-সম্পদ বৃদ্ধি করে।

তার আরও একটা দিক প্রকট। যাকাত আদায় করা হবে কেবলমাত্র সেসব ধন-মাল থেকে, যা ক্রমবৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত। এ কারণে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের যাকাত দিতে হয় না। কেননা তা প্রবৃদ্ধির কাজে লিপ্ত নয়। অনুরূপভাবে যেসব মাল-সম্পদ অপহৃত বা বিনষ্ট হওয়ার দরুন প্রবৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত হতে পারছে না, তাতেও যাকাত ফরয হয় না। বলা যায়, ধন-মাল প্রবৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত কর এবং এই প্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত সম্পদ থেকে যাকাত দাও।

প্রথম যুগ থেকেই মুসলিম সমাজ এই শর্তারোপ সম্পূর্ণ ঐকমত্যে কাজ করে এসেছে। নিজের ব্যবহার্য যানবাহন, বসবাসের ঘর, দালান-কোঠা, শিল্পী-কারিগরের যন্ত্রপাতি, ঘরের ব্যবহার্য দ্রব্যসম্ভার প্রভৃতির উপর যাকাত ধার্য হয় না এ কারণেই। কেননা তা যেমন কার্যত প্রবৃদ্ধি লাভের কাজে নিয়োজিত নয়, তেমনি তার যোগ্যতাও নেই।

এর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে লোকজন এও বলেছেন যে, যে লোক নিজের বা তার প্রতিনিধি তার ধন-মালে প্রবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম নয়, তাতেও যাকাত দিতে হয় না। যেসব মাল ফিরে পাওয়ার আশা নেই, তাতেও যাকাত নেই। পাওয়ার আশা থাকলে অবশ্য যাকাত হবে। যে মাল ব্যবহারের সুযোগ নেই—সামর্থ্য বহির্ভূত, তার উপর মূল মালিকত্ব বহাল থাকলেও তাতে যাকাত দিতে হয় না।

যাকাতের মালে প্রবৃদ্ধির শর্ত আরোপের দরুন বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, কৃষি ফসল ও ফল-ফলাদির যাকাত বছর আবর্তিত হওয়ার দরুন বার-বার দিতে হবে না। যেমন কৃষি

ফল-ফলাদিতে ওশর ফরয হয় কিন্তু তাতে অতঃপর আর কিছুই ফরয হবে না, তা মালিকের হাতে কয়েক বছর পর্যন্ত মজুদ হয়ে থাকলেও। কেননা যাকাত তো বর্ধনশীল ধন-মালে ধার্য থাকে। আর যেসব ফসল ও ফল সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে, তা প্রবৃদ্ধিবঞ্চিত। ক্রমশ ধ্বংস ও বিনাশমান।

প্রবৃদ্ধির শর্ত আরোপে ইমাম মালিকের মত অধিক প্রশস্ত। কেননা ঋণ বাবদ দেয়া সম্পদে—যা অন্য লোকের কাছে পাওনা—তিনি যাকাত ফরয মনে করেন না। তবে তা যখন ফেরত পাবে, তখন তাতে যাকাত ধার্য হবে এক বছরের মাত্র। অপহৃত ও মাটির তলায় গচ্ছিত মাল—যার সন্ধান নেই এর যাকাত দিতে হয় না। যেসব মাল বিনষ্ট হয়ে গেছে কিংবা মালিকানাচ্যুত হয়ে গেছে, তারও যাকাত নেই। তা ফেরত পাওয়া গেলে মাত্র এক বছরের যাকাত দিতে হবে।

সর্বপ্রকারের ঋণ বাবদ দেয় সম্পদের বেলায়ই এ নিয়ম। তবে যেসব ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয় করে ও নগদ মূল্যে বিক্রয় করে, তাদের দেয়া ঋণ যেহেতু আদায় হবে বলে আশা আছে, এজন্যে সে ঋণের ব্যাপার স্বতন্ত্র। এসব ঋণ নগদ ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত বলে তাতে অবশ্যই প্রতি বছর যাকাত ধার্য হবে।

ঋণ বাবদ দেয়া টাকার যাকাত ফরয না হওয়া পর্যায়ে মালিকী মতে যুক্তি হল তাঁর উপর যাকাত ফরয হতে পারে না। যেসব ব্যবসায়ী পণ্য কিনে পুঁজি করে রাখে ও মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে, তারা সেই সব জমি ক্রয়কারীর মত, যারা জমি খরিদ করে তার মূল্য বৃদ্ধি পাবে এই আশায়। তাদের পণ্যের উপর প্রতিবছর যাকাত ধার্য হবে না। তারা তার নিসাব পরিমাণ যদি বিক্রি করে তবে তার উপর যাকাত ফরয হবে এক বছরের জন্যে, যদিও তা তার হাতে বিক্রয়ের পূর্বে বেশ কয়টি বছর ধরে পুঁজিকৃত হয়েছিল। কেননা এসব আটকে রাখা পণ্য একবারই মাত্র মুনাফা দিয়েছে। তাই একবারই যাকাত ফরয হবে।[১]

বর্ধনশীলতা রহিত সম্পদ

যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে সম্পদের বর্ধনশীলতা যখন শর্ত, তখন যে মাল-সম্পদ বর্ধনশীলতা রহিত, সে সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত হবে? তাতে কি যাকাত ফরয হবে? যদি হয় তাহলে বছরের আবর্তনের সাথে সাথে যাকাত দেয়ার দরুন মূল সম্পদই নিঃশেষ হয়ে যাবে, নাকি তা যাকাত মার্জনা পাবে? বস্তুত তাহলে তা অবশিষ্ট থাকতে পারে।

এই প্রশ্নের জবাবে বলতে হয় যে, বর্ধনশীলতা রহিত মাল-সম্পদ দুই প্রকারের হতে পারেঃ

প্রথম, যেসব মাল স্বতঃই বর্ধন-রহিত। আর দ্বিতীয়, মালিকের অক্ষমতার দরুন বর্ধনশীলতা থেকে বঞ্চিত।

১. الشرح الكبير و حاشية اللسوتى عليه ج ١ ص ٤٥٧

যেসব ধন-মাল স্বতঃই বর্ধনশীলতা রহিত, যেমন তা লুণ্ঠিত বা অপহৃত হয়েছে; কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই কিংবা ঋণ দেয়া হয়েছে, যা ফেরত পাওয়ার কোন আশা নেই। অথবা মাটির তলায় প্রোথিত হয়েছে কিন্তু কোথায় রাখা হয়েছে তা ভুলে গেছে। এমতাবস্থায় তার যাকাত দেয়া সম্ভব হয় না—যতক্ষণ না তা হস্তগত হচ্ছে।

তবে যে সব মালের মালিক নিজেই বর্ধনশীলতায় বিনিয়োগ করতে অক্ষম, তার এই-অক্ষমতা শরীয়াতের বিধানদাতার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। তাই তার উপর যাকাত ফরয। অক্ষমতার কারণ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নেই। কেননা মুসলমান মাত্রের প্রতিই এটা ধরে নেয়া কথা যে, সে তার ধন-মালে প্রবৃদ্ধি সাধনে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। হয় সে নিজে তা করবে, না হয় অন্যকে এই কাজে শরীক করবে। আর সেজন্যে কার্যকরণের ব্যবস্থা করা ও প্রতিবন্ধক দূর করা মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব বা কঠিন কিছু নয়।

অতএব অক্ষমতা ইসলামের দৃষ্টিতে কোন 'ওযর' নয়, এ কারণে সম্পদের মালিক যাকাত দেয়ার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। বরং এজন্যে তাকে তিরস্কৃত হতে হবে। কেননা ব্যক্তির অক্ষমতা কিংবা সমষ্টির বিপর্যয়ের কারণে তা ঘটেছে।

এ কারণে নবী করীম (স) এই অক্ষমতা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানা চেয়েছেন, অক্ষম হতে নিষেধ করেছেন, অক্ষম ব্যক্তিকে তিরস্কার করেছেন।

নবী করীম (স) সব সময় দোয়া করতেন এই বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسْلِ- (بخادى)

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে অক্ষমতা ও অবসাদগ্রস্ততা থেকে পানা চাই।

তিনি বলেছেন ঃ

اَحْرِصْ عَلٰى مَايَنْفَعُكَاوَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ- (مسلم)

তোমার জন্যে যা কল্যাণকর তা তুমি লাভ করতে আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও, আর তুমি অক্ষম হয়ে পড়ো না।

এক ব্যক্তিকে তিনি বলেছিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَلُوْمُ عَلَى الْعِجْزِ- (ابوداؤد)

আল্লাহ্ অক্ষমতার জন্যে তিরস্কার করেন।

বর্ধনপ্রবণ সব সম্পদেই যাকাত

এই শর্তের আলোকে আমরা বলব, সর্বপ্রকারের বর্ধনশীল ধন-মালই যাকাত ধার্য হওয়ার ক্ষেত্র, যদিও ঠিক সেই প্রকারের মালের নাম করে নবী করীম (স) যাকাত ধার্য

করেন নি। সে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের সাধারণ অর্থবোধক ঘোষণাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট দলীল।

এ মতটি এক শ্রেণীর ফিকাহবিদের মতের বিপরীত। যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা খুবই সংকীর্ণ মত প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, নবী করীম (স) নিজে যে সব জিনিস থেকে যাকাত আদায় করেছেন, কেবলমাত্র সেসব জিনিস থেকেই যাকাত নেয়া যাবে। তা ছাড়া অন্য কোন জিনিস থেকেই নয়। ইমাম ইবনে হাজম এই মতের বড় প্রবক্তা। তিনি তাঁর 'আল-মুহাল্লাহ' গ্রন্থে মাত্র আটটি জিনিসের উপর যাকাত ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। তা হচ্ছে ঃ উষ্ট্র, গরু, ছাগল, গম, যব, খেজুর, স্বর্ণ ও রৌপ্য। এমনকি কিশমিশের উপর যাকাত ফরয হওয়ার কথা সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাতে যাকাত ফরয হওয়ার কথা বলেন নি।' পশু সম্পদের মধ্যে কেবলমাত্র উষ্ট্র, গরু ও ছাগলের কথাই বলেছেন। কৃষি সম্পদের মধ্যে কেবল ধান, গম, যব ও খেজুর ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। আর স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া আর কোন খনিজ ও নগদ সম্পদে যাকাত দেয়ার কথা বলেন নি। তাঁর মতে ব্যবসা পণ্যের উপর যাকাত ধার্য হয় না।

অন্যান্য ফিকাহবিদের মতে অনেকেই অনুরূপ বা তার কাছাকাছি মত দিয়েছেন। অনেকে আবার এই ক্ষেত্রকে বহু বিস্তীর্ণ করে দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা এ ক্ষেত্রে অধিক প্রশস্ততা ও ব্যাপকতার কথা প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, জমিতে যা-ই উৎপন্ন হবে—তার উদ্দেশ্য যদি প্রবৃদ্ধি সাধন হয়—তবে তার উপর যাকাত ফরয হবে। এজন্যে তিনি কোন নিসাবেরও শর্ত আরোপ করেন নি। ঘোড়ার উপর যাকাত ফরয হওয়ার কথা তিনিই বলেছেন। অলংকারাদিকেও তিনি বাদ দেন নি। তবে তা কেবল শরীয়াত পালনে বাধ্য এমন বয়স্কদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অল্প বয়স্ক ও পাগলের অলংকারে যাকাত হবে না বলে রায় দিয়েছেন। তিনি খারাজী জমিতে ওশর ধার্য হওয়ার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ফলে বিপুল সংখ্যক মুসলিমের জমিই ওশর ফরয হওয়ার বাধ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

ইবনে হাজম এবং তাঁর সাথে ঐকমত্য প্রকাশকারী শেষ দিকের দুজন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ইমাম শাওকানী ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান প্রমুখের যাকাতক্ষেত্র সংকীর্ণকরণের মত দুটি ভিত্তির উপর স্থাপিত ঃ

প্রথম, মুসলমানের মাল 'হারাম' সম্মানার্হ, কোন অকাট্য দলীল ছাড়া তা গ্রহণ করা যেতে পারে না।

আর দ্বিতীয়, যাকাত হচ্ছে একটা শরীয়াতভিত্তিক বাধ্যবাধকতা। মানুষ মূলত সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্বমুক্ত। তার উপর কেবল তা-ই পালন করার দায়িত্ব চাপানো যেতে পারে, যা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এমন কি আল্লাহ্ যে বিষয়ে কোন অনুমতি দেন নি সে কাজ করার বাধ্যবাধকতাও তার উপর চাপানো যেতে পারে না। এ ক্ষেত্রে 'কিয়াসা'কে ব্যবহার করা যেতে পারে না—বিশেষ করে যাকাতের ব্যাপারে।

আমাদের মত কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তা এ দুটি ভিত্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ভিত্তির উপর স্থাপিত। নিম্নে আমরা তার ব্যাখ্যা পেশ করছি ঃ

১. কুরআন ও সুন্নাহের সাধারণ ঘোষণাবলী সর্বপ্রকারের ধন-মালে গরীবের হক ধার্য করেছে, তা যাকাত বা সাদ্‌কা নামেই অভিহিত হোক-না কেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ-

আর তারা যাদের ধন-মালে সুনির্দিষ্ট হক রয়েছে।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً-

তাদের ধন-মাল থেকে 'সাদ্‌কা' গ্রহণ কর।

নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِيْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ-

তাদের জানিয়ে দাও, আল্লাহ্ তাদের ধন-মালে যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরই গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

বলেছেনঃ 'তোমরা তোমাদের ধন-মালের যাকাত আদায় কর।' এসব বাণীতে ধন-মালের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আর হাদীসের আলোকে আমরা এ কথাও জানতে পেরেছি যে, এসব অকাট্য দলীল ক্রমবর্ধনশীল ধন-মালের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে রক্ষিত দ্রব্যাদির ব্যাপারে নয়।

কাজেই যাকাত বা সাদ্‌কা আদায়ের বাধ্যবাধকতা থেকে কোন প্রকারের মালই বাদ যেতে পারে না। তবে সেজন্যে কোন দলীল থাকলে ভিন্ন কথা। কিন্তু এখানে তেমন কোন দলীলই নেই।

২. প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিরই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ করা কর্তব্য। আর তা সে লাভ করতে পারে ব্যয় ও দানের মাধ্যমে। পবিত্রতা লাভ করবে স্বার্থপরতা ও লোভ-লালসার পংকিলতা থেকে, আত্মম্ভরিতা ও আত্মপ্রেম থেকে। এ জন্যেই আল্লাহ্ বলেছেনঃ 'তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর—তাদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর এর দ্বারা।' এ কাজটি কেবলমাত্র গম ও যব উৎপাদনকারীদেরই কর্তব্য হবে এবং বড় প্রশস্ত ফলের বাগানের মালিকের কর্তব্য হবে না, কল-কারখানা মালিক ও বিশাল দালাল-কোঠার অধিকারী এ থেকে মুক্ত থাকবে, তা কোনক্রমেই বোধগম্য নয়। কেননা কৃষি উৎপাদকের তুলনায় এসবের মালিকদের মুনাফা ও আয় শত শত গুণ বেশী।

৩. প্রত্যেক ধন-মালেরই পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা লাভ জরুরী, কেননা তা উপার্জনে নানা প্রকারের শোবাহ্-সন্দেহের সংমিশ্রণ ঘটে। আর ধন-মালের পবিত্রতা কেবল যাকাত দেয়ার মাধ্যমেই। হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ الزَّكٰوةَ طُهْرَةً لِّلْاَمْوَالِ-

আল্লাহ্ তা'আলা ধন-মালের পবিত্রতা বিধানের উদ্দেশ্যেই যাকাত ফরয করেছেন।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِذَا اَدَّيْتَ زَكٰوةَ مَالِكَ فَقَدْ اَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ- (حاكم)

তুমি যখন তোমার মালের যাকাত দিয়ে দিলে, তখন তুমি তা থেকে তার খারাবীটা দূর করে দিলে।

কাজেই এ কাজটি ইবনে হাজম উল্লেখিত মাত্র আটটি জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। অন্যান্য ধন-মালের উপর প্রযোজ্য হবে না; বিশেষ করে বর্তমানে যেগুলো জাতি ও সরকারের সম্পদের প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা কল্পনাও করা যায় না। তাই বলতে হবে, সর্ব প্রকারের ধন-মালেরই পবিত্রতা অর্জন ও তার খারাপ দিক থেকে নিষ্কৃতি একান্তই জরুরী। আর তা সম্ভব যাকাত আদায় করে।

৪. যাকাত ফরয করা হয়েছে গরীব, মিসকীন, ঋণগ্রস্ত ও নিঃস্ব পথিকের প্রয়োজন পূরণার্থে, সাধারণ মুসলিম জনতার কল্যাণ বিধানের জন্যে। যেমন আল্লাহ্র পথে জিহাদ, ইসলামের দিকে অমুসলিমের দিল আকৃষ্টকরণ, তাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ, পারস্পরিক সম্পর্ক সুষ্ঠু রাখার জন্যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত লোদের সাহায্যে। কেননা এসব কাজের দ্বারাই তো ইসলামকে শক্তিশালী ও দুর্জয়ী করে তোলা যায়।

তাই এসব প্রয়োজন পরিপূরণ ও এসব কল্যাণ বাস্তবায়নের জন্যে সর্বপ্রকারের ধন-মালের মালিকের উপরই যাকাত আদায় করা কর্তব্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচটি উটের মালিক বা চল্লিশটি ছাগলের মালিক কিংবা পাঁচ 'অসাক' যবের মালিকের উপর যাকাত ধার্য করবেন, আর বড় বড় কল-কারখানা শিল্পোৎপাদনের মালিক পুঁজিপতি বিশাল দালান-কোঠার মালিক, বড় বড় নামকরা ডাক্তার, আইন ব্যবসায়ী, বড় বড় বেতনভুক্ত চাকুরীজীবী ও বড় বড় স্বাধীন উপার্জনকারীদের এ দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেবেন, আল্লাহ্ সম্পর্কে এ কথা চিন্তাও করা যায় না। কেননা প্রথমোক্তরা বছরের পর বছর ধরে শ্রম করে যা আয় করে, তা শেষোক্তরা একদিনে বা এক ঘণ্টায় আয় করে বসে।

ধন-মাল সম্পর্কে ইসলামের চিন্তা ও বিশ্বাসই হল এই যে, তার প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষ তাতে শুধু খলীফা বা প্রতিনিধি মাত্র। প্রকৃত মালিকের প্রতিনিধিত্ব করাই তার দায়িত্ব। সমাজের গরীব-মিসকীন ও অভাবগ্রস্ত লোকেরা যেহেতু আল্লাহ্র প্রতিপালিত, তাই এ সব মালেই তাদের হক রয়েছে। তা ছাড়া জাতির জনগণের সার্বিক কল্যাণ—ফী সাবীলিল্লাহ্—আল্লাহ্র পথে উৎসর্গীকৃত। কাজেই সর্ব প্রকারের ধন-মালই তার অন্তর্ভুক্ত এবং সব ধন-মালিকই যাকাত আদায় করতে বাধ্য। তা কৃষিলব্ধ হোক, শিল্পলব্ধ হোক, আর ব্যবসালব্ধই হোক-না কেন।

৫. 'কিয়াস' ইসলামী আইন প্রণয়নে গোটা মুসলিম উম্মতের কাছে স্বীকৃত ও সমর্থিত একটি মৌল ধারা। ইবনে হাজম ও অন্যান্য যাহেরী মতাবলম্বীরা যতই বিরোধিতা করুন না কেন, রাসূলে করীম (স) যেসব মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করেছেন, সেগুলোর উপর কিয়াস করে অন্যান্য সর্ব প্রকারের ধন-মালকেই যাকাতের ক্ষেত্ররূপে গণ্য করতে হবে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, শরীয়াত দুটি সদৃশ মালের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি—যেমন দুটি পরস্পর বিপরীত জিনিসের উপর একই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করেনি। কোন প্রকারের মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করা ফরয বলে আমরা যখন কিয়াসের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব, তখন তা শরীয়াতেরই সিদ্ধান্ত হবে। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ তখন হবে না। আর পূর্বে যেমন বলেছি যাকাত নিছক একটা ইবাদতের কাজই নয়, তা ইসলামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশও।

৬. মুসলিমের ধন-মাল 'হারাম'—সম্মানার্হ, এতে আমাদের দ্বিমত নেই। বরং তার এ বিশেষ মালিকানাভুক্ত ধন-মালেই তো 'হক্' ধার্য হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি, ধনীর ধন-মালে আল্লাহ্র হক, অন্য কথায় সমাজ-সমষ্টির হক, অভাবগ্রস্ত লোকদের হক অকাট্য দলীল দ্বারাই তা প্রমাণিত।

তবে ইবনে হাজম নিজেই অন্যভাবে আমাদের মতের সমর্থন যুগিয়েছেন। তিনি ধন-মালে যাকাত ছাড়াও হক্ ধার্য করেছেন; আর তা গরীব-মিসকীনের জন্যে আদায় করা—সেজন্যে ধনীদের উপর বল প্রয়োগ করা রাষ্ট্রকর্তাদের কর্তব্য ও অধিকার বলে ঘোষণা করেছেন। এজন্যে গরীবদের যুদ্ধ করা পর্যন্ত জায়েয বলেছেন।

কিন্তু যাকাত ছাড়া অন্যান্য মাল থেকে হক্ আদায়ের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, সর্বপ্রকারের মাল থেকেই যাকাত আদায় করা। তাতে সব ধনীই সমানভাবে যাকাত দিতে বাধ্য হবে। কোন ধনীই বাদ পড়বে না। যখনই প্রয়োজন অপূরিত থাকবে, সব ধনী লোকদের কাছে গিয়েই আমরা বলব, তোমাদের ধন-মালের যাকাত ছাড়াও লোকদের হক রয়েছে, তা দিতে হবে।

তবে নবী করীম (স) তাঁর যুগে কোন কোন বর্ধনশীল মাল থেকে যে যাকাত গ্রহণ করেন নি, তার দুটি কারণ বলা যেতে পারে।

একটি হচ্ছে, তার বর্ধনশীলতা তখন দুর্বল ছিল। মালিকদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এবং তার বর্ধনশীলতা বাড়াবার সুযোগ দান ও সেই সঙ্গে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে তিনি যাকাত গ্রহণ করেন নি।

দ্বিতীয়, তিনি সেই লোকদের ঈমান ও মন প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ না গ্রহণ করার দরুন সেই লোকদের চিরদিন পবিত্রকরণ ও পরিচ্ছন্নকরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে এমন কোন কথাই হতে পারে না। অথচ তারা তাদের দ্বীন থেকে জানতে পেরেছে যে, তাদের ধন-মালে হক রয়েছে এবং তা যাকাত বাবদ আদায় না করা পর্যন্ত তাদের কল্যাণ হতে পারে না।

৩. নিসাবের শর্ত

ইসলাম ক্রমবর্ধনশীল ধন-মালের যে-কোন পরিমাণের উপরই যাকাত ফরয করেনি, তা যতই দুর্বল ও ক্ষীণ হোক-না কেন, বরং যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল হওয়া অপরিহার্য শর্ত বিশেষ। ফিকাহ্‌র পরিভাষায় তাকেই 'নিসাব' বলে। যেমন হাদীসে নবী করীমের স্পষ্ট উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, পাঁচটির কম সংখ্যক উষ্ট্র ও চল্লিশটির কম ছাগলে যাকাত নেই। অনুরূপভাবে দুইশত নগদ রৌপ্যমুদ্রার কমের উপর এবং ফসল ও দানার পাঁচ অসাকের কম পরিমাণের উপর যাকাত নেই।

যাকাতের জন্যে এ পরিমাণ নির্ধারণের যৌক্তিকতা পর্যায়ে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী লিখেছেন ঃ

দানা ও খেজুরের পাঁচ অসাক পরিমাণ নির্ধারণের কারণ হল এজেন্য যে, এর কম পরিমাণ একটা পরিবারের বছরের প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট নয়। পরিবারের স্বামী-স্ত্রী ও তৃতীয় একজন লোক অবশ্যই থাকবে। সেই সাথে একজন সেবক ও সন্তানরাও থাকতে পারে। খুব কম পরিবারই এর বিপরীত হতে পারে আর মানুষের বেশীর ভাগের খাদ্য এক 'তরল' কিংবা এক মদ্ পরিমাণ শস্য। উপরিউক্ত লোকেরা সকলেই যদি খাদ্য গ্রহণ করে, তাহলে উক্ত পরিমাণ এক বছরের জন্যে যথেষ্ট হতে পারে। আর অবশিষ্ট যা থাকবে তা তাদের বিপদ-আপদ বা আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট হবে।

আর পাঁচ অসাক্ ও দুই'শ দিরহাম নির্ধারণ করা হয়েছে এজন্যে যে, তা এমন একটি পরিমাণ যা একটা পরিবারের সম্বৎসরের ব্যয়ের জন্যে যথেষ্ট; যদি অধিকাংশ এলাকায় দ্রব্যমূল্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় আর ভারসাম্যপূর্ণ দেশগুলোর দ্রব্যমূল্যের বেশী কমের খোঁজ খবর নিলে এটাই পাওয়া যাবে।

পাঁচটি উটের যাকাত বাবদ একটি ছাগী দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও মূলত যাকাত বাবদ সেই মালই গ্রহণ করা হয় যার যাকাত দেয়া হবে। তারই একটা পরিমাণকে নিসাব নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরূপ করার কারণ এই যে, উষ্ট্র বড় আকারের জন্তু। তার ফায়দা অনেক। তা যেমন যবাই করা যায়, তেমনি তার পিঠে সওয়ারও হওয়া যায়। তার দুগ্ধ দোহন ও সেবন করা যায়, তার বংশ বৃদ্ধি করা চলে, তার পশম ও চামড়া ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত করা যায়, তার বাছাই করা চামড়া দিয়ে জুতা বানানো যায়। আর সেকালে একটি উষ্ট্রকে দশটি ছাগলের সমান ধরা হত। ....যেমন বহু কয়টি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। এভাবে পাঁচটি উষ্ট্রকে ছাগলের মধ্যতম নিসাবের নিকটবর্তী বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এজন্যে তাতে একটি ছাগল নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[১]

যাকাতের মালের নিসাব পরিমাণ হওয়ার শর্ত আরোপ ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের কাছে সর্ববাদীসম্মত ও সমর্থিত। অবশ্য তা কৃষি ফসল, ফলফাঁকড়া ও খনিজ দ্রব্য

---

১. حجة الله البالغة ج م ٢ ٥٠

পর্যায়ে। ইমাম আবূ হানীফার মত হচ্ছে, জমি যা-ই উৎপাদন করবে, তার পরিমাণ বেশী হোক বা কম, তাতেই ওশর দিতে হবে। ইবনে আব্বাস ও উমর ইবনে আব্দুল আযীয প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে শাক-সব্জির প্রতি দশটি বোঝার উৎপাদন থেকে একটি বোঝা যাকাত বাবদ দিতে হবে।

কিন্তু জমহুর ফিকাহবিদগণ প্রত্যেক মালের যাকাত ধার্য করার জন্যে তার একটা নিসাব নির্দিষ্ট হওয়া একান্তই জরুরী মনে করেন, যা জমির উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এ পর্যায়ে তাদের দলীল হচ্ছে এ হাদীসঃ

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةَ اَوْسَقٍ صَدَقَةٌ

পাঁচ অসাকের কমে যাকাত নেই।[১]

তা অন্যান্য মালের উপর কিয়াস করার দাবি রাখে, যেমন পশু, নগদ টাকা ও ব্যবসা পণ্য ইত্যাদি।

বস্তুত যাকাতের নিসাব নির্ধারণের শর্ত খুবই স্পষ্ট ও প্রকট। কেননা যাকাত হচ্ছে ধনীদের কাছ থেকে গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্যে গ্রহণ করা কর। ইসলাম ও মুসলিমের কল্যাণে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। কাজেই সহানুভূতি কার্যত এমন পরিমাণই গ্রহণ করতে হবে। গরীবদের কাছ থেকে কর গ্রহণের তো কোন অর্থ হয় না। তারা তো সাহায্য পাওয়ারই অধিকারী, সাহায্য করতে তারা সক্ষম নয়। নবী করীম (স)-এর নিম্নোক্ত কথাটি এ পর্যায়েরইঃ

لَاصَدَقَةَ اِلاَّ عَنْ ظَهْرِغِنًى- (بخارى)

প্রকাশ্য ধনীর কাছ থেকেই যাকাত গ্রহণ করতে হবে।

আধুনিককালে কর ধার্যকরণ বিধানে একটা সীমাবদ্ধ পরিমাণ সম্পদ-সম্পত্তির মালিককে কর দেয়ার দায়িত্ব থেকে এ জন্যেই নিষ্কৃতি দেয়া হয়ে থাকে। এটাও তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন। তাদের অবস্থার দাবি অনুযায়ী তা কম করা হয়। কেননা তারা তা দেয়ার সামর্থ্য রাখে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই ইসলাম সঠিক পথ-নির্দেশ করেছে।

৪. মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া

কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ মালের বর্ধনশীলতা ছাড়াও নিসাবের পরিমাণটা মালিকের মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ার শর্ত করেছেন। হানাফী ফিকাহবিদদের সাধারণ কিতাবাদিতে এ কথা স্থিরভাবে লিখিত হয়েছে। কেননা এর ফলেই ধনাঢ্যতাও নিয়ামতের তাৎপর্য বলে প্রতিভাত হতে পারে। আর তা মনের খুশীর সাথেই দিয়ে দেয়া

১. পাঁচ অসাক হিজাজী ওজনে ১৮ মণ ৩০ সের এবং ইরাকী ওজনে ২৮ মণ ৫ সের হয়।

যেতে পারে। যে অভাবগ্রস্ত তার পক্ষে প্রয়োজনমুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না, সেটা তার জন্যে নিয়ামত হয় না। নিম্নতম প্রয়োজনীয় পরিমাণ সামগ্রী পাওয়া গেলে সুখ-সম্ভোগ হয় না। কেননা তা তো বেঁচে থাকার সামগ্রী। জীবন রক্ষার জন্যই তা প্রয়োজন। তার শোকর আদায় তো দৈহিক নিয়ামতের শোকর আদায়। এরূপ অবস্থায় কিছু দিতে হলে তা মনের সুখে ও আনন্দ সহকারে দেয়া হয় না। ফলে তখনকার দেয়াটা রাসূলে করীম (স)-এর এ হাদীস অনুযায়ী হবে না, যাতে তিনি বলেছেন ঃ

اَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا اَنْفُسُكُمْ-

তোমরা তোমাদের ধন-মালের যাকাত দাও তোমাদের মনের সুখ ও সন্তুষ্টি সহকারে।

তাই উপরিউক্ত লোকদের যাকাত দিতে হলে যাকাত আদায় হবে না।

কতিপয় ফিকাহবিদ এ শর্তটি এড়িয়ে গিয়ে বর্ধনশীলতার শর্তের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর তা এজন্যে যে , মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দ্রব্যাদি সাধারণত বর্ধনশীল হয় না। তার প্রবণতা বা যোগ্যতাও সে সবের মধ্যে থাকে না। বসবাসের ঘর, চলাচলের জন্তু বা যানবাহন, পরিধানের কাপড়, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, পড়ার বই এবং কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এ পর্যায়ের দৃষ্টান্ত; এগুলো অ-বর্ধনশীল।

তাঁরা আরও বলেছেন, প্রকৃত প্রয়োজনের ব্যাপারটি নিগুঢ় রহস্য-আচ্ছন্ন। তা সাধারণত জানা যায় না। ফলে সেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কি এবং কতটুকু তা-ও জানা সম্ভব হয় না। অতএব প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে যে দলীল পেশ করা হয়েছে, তা যথাস্থানে দাঁড়িয়ে। আর তা হচ্ছে ব্যবসায়ের জন্যে প্রস্তুতকরণ। এ প্রস্তুতকরণের দ্বারাই বর্ধনশীলতা বাস্তবায়িত হতে পারে।

সত্যি কথা হচ্ছে, বর্ধনশীলতার শর্ত পূর্ণ হওয়াটাই যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়; তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্তও হতে হবে। কেননা উক্ত ফিকাহ্‌বিদগণ নগদ অর্থ সম্পদকে স্বভাবতই বর্ধনশীল বলে দাবি করেছেন। কেননা তা আবর্তিত ও উৎপাদনশীল হওয়ার জন্যেই সৃষ্ট। তার মালিক তার প্রবর্ধন কার্যত না করলেও তার এ প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকবে। কাজেই এ শর্তটি আরোপিত না হলে নিসাব পরিমাণ নগদ অর্থের মালিক তার নিজের ও তার পরিবারবর্গের খোরাক-পোশাক, বসবাস, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্যে তার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। কেননা এগুলো পরিপূরণ করা তার কর্তব্য। ফলে সে এতটা ধনী নয়, যাতে সে যাকাত দিতে পারে। যদিও বহু বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে মৌল প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত সম্পদ অস্তিত্বহীনরূপেই গণ্য।

আমরা মৌল প্রয়োজনের কথা বলেছি। কেননা মানুষের প্রয়োজন তো সীমাহীন, অশেষ। আমাদের এ যুগে বহু বিলাস দ্রব্য 'প্রয়োজনীয়রূপে' গণ্য। কাজেই মানুষের মন

যা চায় তাকেই 'মৌল প্রয়োজন' মনে করা যায় না। কেননা মানুষের মনস্তত্ত্ব হচ্ছে, সে স্বর্ণের দুটি খনি লাভ করলে তৃতীয়টির জন্যে তার কামনা তীব্র হয়ে উঠবে। আসলে 'মৌল প্রয়োজন' বলতে আমরা বুঝি, যা না হলে মানুষের বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়। যেমন খাবার, পোশাক, পানীয়, বাসস্থান, প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের বই পত্র, তার পেশা উপযোগী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

হানাফী আলিমদের কেউ কেউ মৌলিক প্রয়োজনের খুব সূক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন ঃ যা মানুষকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে সুস্পষ্টভাবে, যেমন দৈনন্দিন খরচাদি, ঘরের প্রয়োজনীয়, যুদ্ধাস্ত্রসমূহ, শীত-গ্রীষ্ম উপযোগী পোশাক, অথবা ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা, যা দিয়ে সে নিজেকে পাওনাদারের দাবি থেকে রক্ষা করতে পারে। কেননা সে কারণে জেলে যেতে হলে তো নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলা হবে। আর পেশায় কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যানবাহন, শিক্ষার বই পত্র—কেননা মূর্খতা তো ধ্বংসেরই নামান্তর। কারো কাছে যদি এ সব প্রয়োজন পরিপূরণ পরিমাণের নগদ অর্থ থাকে, যা নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তা না থাকারই শামিল। যেমন কারো কাছে পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে প্রয়োজন পরিমাণ পানি থাকলেও সে তায়াম্মুম করতে পারে। কেননা সেই পানি দিয়ে ওযু করা হলে পিপাসা নিবৃত্তির কোন ব্যবস্থা তার কাছে থাকবে না।[১]

আমরা খুবই গুরুত্ব সহকারে এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, উক্ত আলিমগণ জ্ঞানকে জীবন ও মূর্খতাকে মৃত্যু ও ধ্বংস গণ্য করেছেন। আর মূর্খতা থেকে রক্ষাকারী জিনিসসমূহকে ক্ষুধা নিবৃত্তিকারী খাদ্যের, উলংগতা ও কষ্ট বিদূরণে পোশাকের মত মৌল প্রয়োজনের মধ্যে শামিল করেছেন। যেমন তাঁরা স্বাধীনতাকে জীবন এবং কারাগার ও কয়েদকে ধ্বংস গণ্য করেছেন।

আমরা প্রায়ই দেখতে পাই, মানুষের মৌলিক প্রয়োজনকাল, অবস্থা ও পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হয়ে যায় ও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কাজেই এ ব্যাপারটি বিশেষজ্ঞদের নির্ধারণ ও ইজতিহাদের উপরই ছেড়ে দেয়া আবশ্যক।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, যাকাত দিতে বাধ্য লোকদের মৌলিক প্রয়োজনের কথা। তাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ও পিতামাতা, নিকটাত্মীয়দের ভরণ-পোষণ ইত্যাদির ব্যাপার। কেননা তা-ও তাদের মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী ফিকাহ্ বহু পূর্বেই এক্ষেত্রে বিশেষ পথনির্দেশ উপস্থাপিত করেছে। আধুনিক কর ধার্যকরণের ক্ষেত্রে চিন্তা সম্পূর্ণ একালের জিনিস। তাতে জীবন ধারণের নিম্নতম পদ্ধতি ছিল মূল সম্পদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। ব্যক্তি, তার অবস্থা, প্রয়োজন, ঋণ, পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ইত্যাদির প্রতি কোনরূপ সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি না রাখা। কিন্তু বহু দেশে অর্থশালী বহু লোকই ও দৃষ্টিকোণের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারেনি। তারা বড়জোর কেবলমাত্র ব্যক্তির জৈবিক প্রয়োজন কিংবা তার

---

১. البحر الرائق ج ٦ ص ٢٢٢ وحاشيه ابن عابد ين ج م ٦

দুই-তিনটি ছেলেমেয়ের ব্যাপারকে মেনে নেয়, যদিও তাদের ছেলে-সন্তানদের সংখ্যা ৮-১০টি রয়েছে। পিতাম তা ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপর যতই থাক না কেন, তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না।

কুরআন ও সুন্নাত থেকে এই শর্তের দলীল

১. ফিকাহ্‌বিদগণ এ শর্তের পক্ষে যতই যুক্তি দিন-না-কেন, কুরআন-হাদীসেও এর দলীল রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেনঃ

انَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

ধনাঢ্যতার প্রকাশ থেকেই যাকাত হবে।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ 'ধনাঢ্যতার প্রকাশ না হলে যাকাত দিতে হবে না।'

ইমাম বুখারী তাঁর হাদীসগ্রন্থে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন ঃ 'ধনাঢ্যতা প্রকাশ ছাড়া যাকাত নেই।' যে লোক অসচ্ছল হয়েও দান-সদকা করবে তার পরিবারবর্গও নিশ্চিত অভাবগ্রস্ত হবে বা তার উপর ঋণের বোঝা থাকবে, তাহ্‌লে দান করার তুলনায় ঋণ শোধ করাই তার অধিক কর্তব্য।'

হাফেয ইবনে হাজার এ শিরোনামের ব্যাখায় লিখেছেন —যাতে তিনি হাদীসটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, সদকা যাকাত দানকারীর জন্যে শর্ত হচ্ছে সে নিজে ও যার যার ব্যয় বহন তার দায়িত্ব, তারা দরিদ্র হবে না।

(ক) কুরআনের আয়াত ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ- قُلِ الْعَفْوَ- (البقرة - ٢١٩)

লোকেরা জিজ্ঞাসা করে তারা কি (কত) খরচ করবে? তুমি বল যা অতিরিক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

'অতিরিক্ত' বলতে বোঝায় পরিবার বহনের সব দায়িত্ব পালনের পর যা অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট হবে তা।

হযরত ইবনে উমর, মুজাহিদ, আতা, ইকরামা , সাঈদ ইবনে যুবায়র, মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব, হাসান, কাতাদাহ্‌, কাসেম, সালেম, আতা খোরাসানী, রবী ইবনে আব্বাস প্রমুখ ফিকাহবিদও এই মতই দিয়েছেন।[১]

তার অর্থ মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকাত বাবদ ব্যয়ের ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করেছেন মৌল প্রয়োজন পূরণের পর যা অতিরিক্ত থাকে তা। কেননা ব্যক্তির নিজের

১. تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٥٢

প্রয়োজন অপর লোকদের প্রয়োজনের তুলনায় অগ্রাধিকারের দাবিদার। আর নিজের পরিবারবর্গের প্রয়োজন নিজেরই প্রয়োজনে গণ্য। কাজেই এজন্যে যা দরকার তা দান করার জন্যে শরীয়াত কোন দাবি করতে পারে না। কেননা তার সাথে ব্যক্তির মনের সম্পর্ক রয়েছে, সে ব্যয়ে ব্যক্তির মনের সন্তুষ্টি ও প্রশান্তি নিহিত।

হাসান উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেনঃ 'এটা এজন্যে যে, তুমি যেন তোমার ধন-মাল ব্যয় করে পরের কাছে ভিক্ষা চাইতে বাধ্য না হও।'

ইবনে জরীর আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ "এক ব্যক্তি এসে বলল, হে রাসূল! আমার কাছে একটি মাত্র মুদ্রা রয়েছে। বললেন, তা তুমি নিজের জন্যে ব্যয় কর। বলল, আমার কাছে আরও একটি আছে। বললেন, তা তোমার স্ত্রীর জন্যে ব্যয় কর। বলল, আমার কাছে আরও একটি আছে। বললেন, তা তোমার সন্তানের জন্যে ব্যয় কর। বলল, আমার কাছে আরও একটি আছে। বললেন তুমি নিজেই বোঝ।"

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ব্যক্তির নিজের, তার স্ত্রীর ও সন্তানাদির প্রয়োজন সর্বাগ্রে পূরণ করতে হবে।

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) এক ব্যক্তিকে বললেনঃ

اِبْدَا بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَاِنْ فَضُلَ شَيْءٌ فَلِاَهْلِكَ فَاِنْ فَضُلَ شَيْءٌ عَنْ اَهْلِكَ فَلِذَوِيْ قَرَابَتِكَ فَاِنْ فَضُلَ عَنْ ذَوِيْ قَرَابَتِكَ شَيْءٌ هٰكَذَا-

তোমরা নিজেকেই প্রথমে রাখবে। এর জন্যেই ব্যয় করবে। অতিরিক্ত কিছু হলে তোমার পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করবে। পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করার পর কিছু অতিরিক্ত থাকলে তা তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করবে। তার পরও অতিরিক্ত থাকলে এমনি ...... এমনি ভাবে ......।

এ সব হাদীসের কোন কোনটিতে যদিও নফল ব্যয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, তবুও তা-ই সাধারণ নিয়ম। ব্যয় পর্যায়ে ইসলামের হিদায়েত এমনিই। অতিরিক্তই হচ্ছে সাদ্‌কা-যাকাতের ক্ষেত্র। জমহুর আলিম ও ফিকাহ্‌বিদগণ তা-ই বুঝেছেন।

৫. ঋণমুক্তি

পূর্বে পূর্ণাঙ্গ মালিকানার যে শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে তারপর মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকার সে কথা বলা হয়েছে, সেই সঙ্গে যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে ঋণমুক্ত হওয়ার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকাও একটি জরুরী শর্ত। যদিও সম্পদের মালিক ঋণগ্রস্ত হয়, যার মধ্যে যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ নিমজ্জিত হয়ে যায় বা তার চাইতে কম হয়ে পড়ে, তাহলে তার উপর যাকাত প্রদান করা ফরয হবে না।

এ পর্যায়ে ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে বাহ্যিক ধন-মালের ঋণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ মতপার্থক্য মূলত যাকাত সংক্রান্ত ধারণার বিভিন্নতার দরুনই দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যাকাত কি শুধু একটা ইবাদত? না, ধন-মালে মিসকীন লোকদের আরোপিত অধিকার?'

তাঁরা এই শেষোক্ত মত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যাকাত দিতে হবে না। কেননা মিসকীনের অধিকারের আগেই তার উপর পাওনাদারের অধিকার আরোপিত। তখন আসলে তা পাওনাদারের টাকা যার হাতে রয়েছে তার নয়। আর যারা প্রথমোক্ত মত গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ যাকাতকে একটা ইবাদত মনে করেছেন, তাদের মতে মাল যার হাতেই রয়েছে তাকেই যাকাত দিতে হবে। কেননা এই ইবাদতের শর্তই হল মাল বর্তমান থাকা। তার উপর ঋণ চাপানো আছে কি নেই, তা এখানে অবান্তর প্রশ্ন। এখানে আসলে দুটি অধিকারের দ্বন্দ্ব। একটি আল্লাহ্‌র হক, অপরটি মানুষের হক। আর আল্লাহ্‌র হক অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিক অধিকারী।[১]

ইবনে রুশ্‌দ লিখেছেন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর থেকে যাকাত দেয়ার দায়িত্ব তুলে নেয়াই শরীয়াতের লক্ষ্য। শরীয়াতের দলীলাদি, তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও তার সাধারণ মৌলনীতি সবকিছু থেকেই এ কথা বোঝা যায়।

এ পর্যায়ের দলীলসমূহ নিম্নরূপ

প্রথম, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মালিকানা দুর্বল ও অসম্পূর্ণ। কেননা ঋণদাতার পাওনা তার উপর চেপে বসে আছে। সে অনবরত তার পওনা ফেরত চাচ্ছে। পাওনাদার তার পাওনা অবশ্যই নিয়ে নেবে। ইমাম আবূ হানীফার এই মত। আর পূর্ণ মালিকানা হওয়া যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে যে শর্ত, তা আমরা আগেই বলেছি।

দ্বিতীয়, ঋণদাতা তার মালের যাকাত দিতে বাধ্য। কেননা ঋণ বাবদ দেয়া অর্থ তার মালিকানাভুক্ত, সে-ই তার মালিক। এক্ষণে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিও যদি যাকাত দেয় তাহলে একই মালের দুইবার যাকাত দেয়া হবে। কিন্তু তা শরীয়াতে নিষিদ্ধ।

তৃতীয়, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ যদি নিসাব পরিমাণ হয় কিংবা তার কম হয়, তাহলে তার নিজের পক্ষেই যাকাত গ্রহণ সম্পূর্ণ হালাল। কেননা সে তো দরিদ্র ব্যক্তি। সে 'ঋণগ্রস্ত'—তাহলে তার যাকাত দেয়া কি করে কর্তব্য হতে পারে?

চতুর্থ, যাকাত-সাদকা ফরয হয়েছে ধনী লোকদের প্রতি। হাদীসে তা-ই বলা হয়েছে। আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তো ধনী নয়। তার ঋণ শোধন করাই প্রধান দায়িত্ব। কেননা সেজন্যে তার উপর দিনরাতের ভাবনা চিন্তা ও অপমান ভয় ছাড়াও কারাবরণের আতংক সওয়ার হয়ে আছে।

পঞ্চম, একথা সুস্পষ্ট যে, যাকাত ফরয হয়েছে অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি সহানভূতি স্বরূপ। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দরিদ্র ব্যক্তির মতই

---

১. بداية المجتهد ص ٢٣٨

কিংবা তার চাইতেও বেশী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সে অহর্নিশ ঋণ শোধের জন্যে চিন্তান্বিত। এমতাবস্থায় অপরের প্রয়োজন পূরণের জন্যে দেয়ার পরিবর্তে ঋণদাতার পাওনা ফেরত দেয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। এ জন্যেই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'প্রথমে নিজের প্রয়োজন, তারপরে তোমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রয়োজন পূরণ কর।'

ষষ্ঠ, হযরত উসমান (রা) বলেছেন ঃ এটা তোমাদের যাকাত দেয়ার মাস। যার ঋণ আছে তা প্রথমে দিয়ে দাও। তারপরে তোমাদের ধন-মালের যাকাত দাও।[১] অপর বর্ণনানুযায়ী কথাটি হল 'যার ঋণ রয়েছে, সে তার ঋণ প্রথমে আদায় করবে। পরে তার অবশিষ্ট মালের যাকাত দেবে।'[২] একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলের মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত উসমান (রা) উক্ত কথাটি বলেছিলেন বিপুল সংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতিতে। কিন্তু কেউ তার প্রতিবাদ করেন নি। তার অর্থ সব সাহাবীই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন।

এসব কারণে জমহুর ফিকাহ্‌বিদ এই মত গ্রহণ করেছেন যে, ঋণ যাকাত ফরয হওয়ার প্রতিবন্ধক অথবা তা গোপন মালের—নগদ টাকা ও ব্যবসা পণ্যের পরিমাণ হ্রাস করে দেয়। আতা সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, হাসান নখয়ী, লাইস, মালিক, সওরী, আওযায়ী, আহমদ, ইসাহাক, আবূ সওর, আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গিগণ এই মতই গ্রহণ করেছেন। রবীয়া, হাম্মাদ ও শাফেয়ীর নতুন মত ছাড়া এর বিপরীত মত আর কারো নেই।

প্রকাশমান ধন-মাল, পালিত পশু ও কৃষি ফসল পর্যায়ে কোন কোন ফিকাহ্‌বিদের মত হচ্ছে, এক্ষেত্রেও ঋণ যাকাত দেয়ার পথে বাধা। এ দুই ধরনের সম্পদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয় প্রকারের সম্পদের যাকাত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে যে, তা প্রকাশমান ও গরীবদের দৃষ্টি তার উপরই নিবদ্ধ। এ কারণে মালিকদের কাছ থেকেই যাকাত আদায় করে নেয়ার জন্যে সরকারী কর্মচারী প্রেরণের বিধান করা হয়েছে। নবী করীম (স) ও তাঁর খলীফাগণ তাই করতেন। তখন যে তা দিতে চায়নি, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)। তাঁরা অপ্রকাশমান ধন-মালের যাকাতের জন্যে কোন জোর প্রয়োগ করেছেন বলে কোন কথা শোনা যায়নি। সরকারী আদায়কারীরা প্রকাশমান ধন-মালের যে যাকাত পেত, তা-ই তারা গ্রহণ করত। তার উপর কোন ঋণ চাপানো আছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করত না। এ থেকে বোঝা যায় যে, ঋণ প্রকাশমান ধন-মালের যাকাতের পথে প্রতিবন্ধক নয়। আর দরিদ্রদের মনের চাহিদাও তার প্রতিই অধিক। তার সংরক্ষণের প্রয়োজন বেশী। কাজেই তার যাকাত দেয়া অধিকতর তাকিদপূর্ণ।[৩]

ইমাম মালিক, আওযায়ী ও শাফেয়ী এ মত দিয়েছেন। ইমাম আহমদেরও একটি মত এর পক্ষে।

---

১. كتاب الاموال ص ٢٣٧
২. المنوطا والشافعى
৩. المغنى ج ٤٦ ص ٤٢-٤٣

ইমাম আবূ হানীফা মনে করেন, ঋণ ফসল ও ফল-ফাঁক্‌ড়ার যাকাত ছাড়া সব যাকাতেরই প্রতিবন্ধক।

কৃষির উপর ঋণের ক্ষেত্রে ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফসলের ঋণ শোধ করার পর অবশিষ্টের যাকাত দিতে হবে। আর ইবনে উমর বলেছেন, ফসল থেকে ঋণ ও পরিবারবর্গের খরচাদি বাদ দিয়ে অবশিষ্টের যাকাত দেবে; আমাদের বিবেচনায় প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান ধন-মালের মধ্যকার কথিত পার্থক্য অস্পষ্ট। এটা আপেক্ষিক ব্যাপার। অনেক সময় একালের পণ্যদ্রব্য পশু ও কৃষি ফসলের অপেক্ষা অধিক প্রকাশমান হয়ে পড়ে। কাজেই বলতে হয়, উপরিউক্ত কারণ পূর্বোক্ত সাধারণ দলীলকে নাকচ করতে পারে না। ঋণ সর্বপ্রকার মালের যাকাতের পথেই প্রতিবন্ধক হবে। শরীয়াত ঋণগ্রস্তদের প্রতি সব সময় উদার দৃষ্টি রাখে।

আতা, হাসান, সুলায়মান, মায়মুন ইবনে মাহ্‌রান, নখ্‌য়ী, সওরী, লাইস, ইসহাক ও আহমদের একটি বর্ণনা এ মতের স্বপক্ষে। আবূ উবাইদ ও তায়ূসও এ ধরনেরই মত দিয়েছেন।

আবূ উবাইদ বলেছেন, ঋণ সত্য প্রমাণিত হলে কৃষি ফসল ও পশু মালিকের উপর যাকাত ফরয হবে না। সুন্নাতের অনুসরণ এভাবেই সম্ভব। কেননা নবী করীম (স) বলেছেনঃ 'যাকাত ধনীদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।' আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তো যাকাত প্রাপক, তার কাছ থেকে যাকাত কিভাবে নেয়া যাবে।

আর ঋণ থাকার কথা যদি কেবল মৌখিক হয় এবং তার সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত না হয়, তাহলে তার কাছ থেকে কৃষি ফসল ও পালিত পশু উভয়েরই যাকাত আদায় করা হবে। কেননা কৃষি ফসল ও পশুর যাকাত একটা প্রকাশমান কর্তব্য। তা অবশ্যই দিতে হবে। আর সে যে ঋণ থাকার কথা বলছে, তা প্রকাশমান, জানা যায় না, সে হয়ত মিথ্যা বলছে। তাই সে দাবি গ্রহণ করা হবে না। যেমন এক ব্যক্তির উপর বহু লোকের পাওনা রয়েছে। সে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার এবং তা আদায় করে দেয়ার দাবি করল। তখন তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া যাবে না। মোটকথা ঋণ যাকাত ফরয হওয়ার প্রতিবন্ধক এ শর্তে যে, ঋণ হওয়ার কথা সত্য প্রমাণিত হতে হবে। যেন ঋণের দাবি দ্বারা আল্লাহ্‌ ও গরীবের হক বিনষ্ট হতে না পারে।

যাকাতের প্রতিবন্ধক ঋণের শর্ত

এ পর্যায়ে যে শর্তে কোন মতপার্থক্য নেই, তা হচ্ছে ঋণের পরিমাণ নিসাব সমান বা তার কম হতে হবে এবং এ নিসাব পরিমাণ ছাড়া ঋণ শোধের আর কিছুই পাবে না। তা ছাড়া তার উপায়ও কিছু থাকবে না। যেমন একজনের হাতে বিশটি মুদ্রা রয়েছে আর ঋণ রয়েছে একটি মুদ্রা অথবা তার বেশী কিংবা কম। এক্ষণে ঋণ শোধ করা হলে

নিসাব পরিমাণে ঘাটতি পড়বে। নিসাব ছাড়া অন্য কিছু থেকে দিয়ে তা পূরণ করারও কিছু পাচ্ছে না। আর যদি তার ত্রিশটি মুদ্রা থাকে, আর ঋণ থাকে দশটি মুদ্রা। তা হলে তাকে বিশটি মুদ্রার যাকাত দিতে হবে। আর যদি দশটি মুদ্রার অধিক ঋণ থাকে, তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে না। আর পাঁচটি মুদ্রার ঋণ থাকলে পঁচিশটি মুদ্রার যাকাত দিতে হবে।

যদি কারোর কাছে একশত ছাগল থাকে, আর তার ঋণ থাকে ষাটটি ছাগলের মূল্য পরিমাণ, তা হলে সে অবশিষ্ট চল্লিশটি ছাগলের যাকাত দেবে। আর তার ঋণ পরিমাণ যদি একষট্টিটি ছাগল সমান হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। কেননা তা নিসাবের কম হয়ে যাচ্ছে।[১]

এই ঋণ বর্তমানকালের হওয়া কি শর্ত?

আসলে বর্তমান ও বিলম্বিতকালের ঋণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এ পর্যায়ের দলীলসমূহ নির্বিশেষ। যদিও কোন কোন আলিম বলেছেন, বিলম্বিত ঋণ যাকাত ফরয হওয়া প্রতিবন্ধক নয়। কেননা বর্তমানে তা ফেরত চাওয়া হচ্ছে না।[২]

এ বিলম্বিত ঋণের মধ্যে স্ত্রীর বিলম্বে দেয় মোহরানাও গণ্য হবে; যা তালাক বা মৃত্যু পর্যন্ত বিলম্ব হয়ে থাকে। কিন্তু তা যাকাত ফরয হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে কি হবে না, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন বিলম্বিত মোহরানা প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা তা সাধারণভাবে তাৎক্ষণিকভাবে দাবি করা হচ্ছে না। নগদ দেয় মোহরানার কথা ভিন্ন।

অপর লোকেরা বলেছেন, প্রতিবন্ধক হবে। কেননা তা-ও অন্যান্য ঋণের মতই একটা ঋণ বিশেষ।

অন্যান্যরা বলেছেন, স্বামী যদি তা নগদ আদায়ের সংকল্প রাখে, তবে প্রতিবন্ধক হবে, নতুবা নয়, কেননা তা ঋণরূপে গণ্য নয়।

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যদি স্বামীর উপর ঋণ হয়ে দাঁড়ায়, কোন সমঝোতার ভিত্তিতে অথবা চুকিয়ে দেয়ার দরুন নিকটাত্মীয়দের ভরণ-পোষণও অনুরূপ তাহলে তা যাকাতের প্রতিবন্ধক হবে।[৩]

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্র ঋণ ও মানুষের ঋণ কি সমান?

শাফেয়ী মায্হাবের ইমাম নববী বলেছেন, আমরা যখন বলি যে, ঋণ যাকাতের প্রতিবন্ধক, তখন অর্থই হয় যে, আল্লাহ্র ঋণ ও মানুষের ঋণ সমান।

---

১. المغنى ٢ ص ٤٣

২. البحر الرائق ج ٢ ص ٢١٩

৩. البحر الرائق ج ٢ ص ٢١٩

হানাফী মাযহাবের লোকেরা বলেছেন, ঋণ যাকাতের প্রতিবন্ধক, যতক্ষণ তা জনগণের দাবি হিসেবে উত্থিত। যাকাত এ পর্যায়ের। কেননা তাতেই সমগ্র দাবি নিবদ্ধ। তাতে পাওনাদাররা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর প্রভাবশালী হয়ে দাঁড়ায়। তখন প্রশাসকের অধিকার হবে পাওনাদারদের অধিকার আদায় করার জন্যে তার কাছ থেকে মাল গ্রহণ করা। তাই বলতে হয়, তার মালিকানা দুর্বল, অস্থায়ী। কিন্তু মানত ও কাফ্ফারা প্রভৃতি আল্লাহ্র হক্ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। যদি কারো উপর অতীত কয়েক বছরের যাকাত অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা সেই ঋণের মধ্যে গণ্য হবে, যার দাবি জনগণের পক্ষ থেকে হবে। তখন এ প্রশাসক পাওনাদারদের পক্ষের প্রতিনিধি বলে গণ্য হবেন।

আমরা এ মত গ্রহণ করতে পারি যদি সরকার মুসলিম ও ইসলামী হয়। তা-ই যাকাতের ব্যাপার নিয়ে দাঁড়াবে। যেন মালদার লোকদের মধ্য থেকে কেউ এ দাবি না করতে পারে যে, তার উপর অনেক মানত ও অনেক কাফ্ফারা চেপে বসেছে। কেননা এ দাবি এমন, যার সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণ করা কঠিন হবে।

মুসলিম ব্যক্তি নিজেই যদি নিজের যাকাত আদায় করে, তাহলে সে তার এ সব ঋণ হিসাব করে তার মাল থেকে আদায় করে দেবে যাকাত দেয়ার পূর্বেই। কেননা হাদীসের কথা হল, 'আল্লাহ্র ঋণ সর্বাগ্রে আদায় করতে হবে।'

৬. এক বছর অতিক্রমণ

অর্থাৎ মালিকানা সম্পদ মালিকের হাতে একটি বছর—পূর্ণ বারটি মাস—অবস্থিত থাকলেই যাকাত ফরয হবে। পশু, নগদ সম্পদ ও ব্যবসায়ের পণ্য সম্পর্কে এই শর্ত আরোপিত হয়েছে। বলা যায়, এ হচ্ছে মূলধনের যাকাত। কিন্তু কৃষি ফসল, ফল-ফাঁক্ড়া, মধু, খনি ও গচ্ছিত ধন ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এ এক বছরকালের মালিকানার কোন শর্ত নেই। তা হল উৎপাদনের যাকাত।

কতিপয় মালে এক বছরের শর্তের কারণ

যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে যে সব মালের মালিকানা এক বছরকাল থাকার শর্ত করা হয়েছে ও যে সব মালে তা করা হয়নি, এ দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে ইমাম ইবনে কুদামাহ্ বলেছেন, প্রথম পর্যায়ের ধন-মাল হচ্ছে বর্ধনশীল পর্যায়ের। পালিত পশুর বংশবৃদ্ধি হয়, ব্যবসায়ের পণ্য মুনাফা লাভ করে। এ জন্যে এ ক্ষেত্রে এক বছরকালের সময় অতিবাহিত হওয়ার শর্ত রাখা হয়েছে, কেননা প্রবৃদ্ধি লাভের জন্যে অন্তত এ সময়টা প্রয়োজন, যেন যাকাত বাবদ যা দেয়া হবে তা মুনাফার ভাগ থেকে দেয়া যায়। এটাই সহজ ও কল্যাণময়। আর যাকাত তো সহানুভূতিমূলক ব্যবস্থা।

বর্ধনশীলতার প্রকৃত রূপ কি? তা আয়ত্ত করা হয়নি। কেননা এতে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তা সুসংবদ্ধও করা হয়নি। আর যার সম্ভাব্যতা স্বীকার করা হয়েছে, তার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটনের দিকে লক্ষ্য দেয়া হয়নি। এসব মালে যাকাত বারবার ধার্য হয়। সেজন্যে একটা স্থির নিয়মের প্রয়োজন, যেন একটি বছরে একই মাল থেকে কয়েকবার যাকাত দিতে না হয়, তাহলে তো মালিকের সমস্ত ধনই ফুরিয়ে যাবে।

কিন্তু কৃষি ফসল ও ফল-ফাঁকড়া স্বতঃই বর্ধিষ্ণু। তা থেকে যাকাত বের করার সম্পূর্ণ মাত্রায়ই বর্তমান থাকে। কাজেই তার যাকাত তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হবে। পরে তো কমতির দিকে যাবে, প্রবৃদ্ধির দিকে নয়। তাই তার উপর দ্বিতীয়বার যাকাত ফরয হবে না এজন্যে যে, তার প্রবৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষিত নয়। আর ধনীর উৎপাদন কৃষি ফসল ও ফল-ফাঁকড়ার মতই ভূমি-উৎপন্ন। এ সব ক্ষেত্রে একটি বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়।

এক বছরের শর্তের প্রমাণ

ইবনে রুশ্দ লিখেছেন, সর্ব সাধরণ ফিকাহ্‌বিদগণ স্বর্ণ-রৌপ্য ও পালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে মালিকানার একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত করেছেন। কেননা চার খলীফা থেকেই তা প্রমাণিত। সাহাবিগণও তদনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। তা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নির্ধারিত। হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَازَكٰوةَ فِىْ مَالٍ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ-

একটা বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে কোন মালে যাকাত ফরয হয় না।

সব ফিকাহ্‌বিদই এ ব্যাপারে একমত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ পর্যায়ে কোন মতভেদ ছিল না। তবে ইবনে আব্বাস ও মুআবিয়া থেকে ভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সে পর্যায়ে কোন হাদীস উদ্ধৃত হয়নি।

কতিপয় সাহাবী ও তাবেয়ীনের ভিন্ন মত

ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও মুআবিয়া (রা) বলেছেন ঃ যখনই মাল ব্যবহারযোগ্য হবে, তখনই তাতে যাকাত ফরয হবে। এক বছর অতিবাহিত হওয়ার কোন শর্ত নেই। ভিন্ন মতাবলম্বী এ সাহাবিগণের সাথে কতিপয় তাবেয়ীন ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মত হচ্ছে, কারো মাল যখনই নিসাব পরিমাণ হবে, তখনই তার যাকাত দিতে হবে। মালিকানার এক বছর অতিবাহিত হোক আর না-ই হোক।

ইবনে রুশ্দ এ পার্থক্যের কারণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ পর্যায়ে কোন হাদীস উদ্ধৃত হয়নি।

সমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দু

প্রাচীন ও পরবর্তীকালের মনীষীদের পার্থক্যমুক্ত মত হচ্ছে, পশু ও নগদ সম্পদ, ব্যবসায়ী সম্পদ প্রভৃতি মূলধনে এক বছরে মাত্র একবারই যাকাত দেয়া ফরয। এক বছরে একই মাল-সম্পদ থেকে একাধিকবার যাকাত গ্রহণ করা হবে না। ইমাম জুহ্‌রী বলেছেন, এ জাতির কোন প্রশাসক মদীনা কেন্দ্রিক আবূ বকর, উমর ও উসমান—কেউই দুইবার যাকাত আদায় করেছেন এমন খবর আমাদের কাছে পৌঁছেনি। তাঁরা প্রতি বছর ফলনশীলতা বা বন্ধ্যাত্ব অবস্থায়ই যাকাত সংগ্রহকারী পাঠাতেন।

কেননা তা আদায় করা রাসূলের সুন্নাত। আসলে এটা ইসলামী শরীয়াতের সর্বাগ্রে দেয়া বিধান। এটাই তার সুবিচার এবং তাই তার মুজিযা। কাজেই যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারটি প্রশাসক ও লালসাকারীদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া যায় না। তারা যখন-ইচ্ছা তা আদায়ও করতে পারে না। তা একটি আবর্তনশীল নির্দিষ্ট ফরয। তা বৎসরান্তর সময়ে দিতে হবে। এই এক বছরে অনেক পরিবর্তন ঘটে, মালদার লোকদের উপার্জন নতুনত্ব পায় এবং অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজনও প্রবল হয়ে ওঠে। এই মেয়াদটি খুবই যুক্তিসংগত। মূলধনের প্রবৃদ্ধি এই সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ব্যবসায়ে মুনাফা প্রকাশ পায়। পালিত পশুরা বাচ্চা জন্ম দেয়, আর ছোটরা বড় হয়।

যাকাত পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর আদর্শ হচ্ছে, তিনি সাধারণ মালের ক্ষেত্রে তা বছরে একবার মাত্র ফরয করেছেন। আর কৃষি ফসল ও ফল-ফাঁকড়ার ক্ষেত্রে তার পরিপক্কতাই তার এক বছর। এটাই সুবিচারপূর্ণ নীতি। কেননা প্রতি মাসে বা প্রতি শুক্রবার দিন যাকাত আদায় করা হলে মালদার লোকদের পক্ষে কঠিন অবস্থা দেখা দিত। আর সারাজীবনে একবার দেয়ার ব্যবস্থা হলে গরীব লোকদের হক মারা যেত। পক্ষান্তরে ফল-ফাঁকড়ার ক্ষেত্রে প্রতি বছর একবার যাকাত ফরয হলেও তা সুবিচারপূর্ণ হত না।

প্রাপ্ত ধন-মালের ব্যাপারে মত পার্থক্য

এক ব্যক্তির কোন ধন-মাল ছিল না, পরে সে পেয়ে গেল। সে তার মালিক হল। তা সে বেতন থেকে পেয়েছে, কি পারিশ্রমিকরূপে ক্ষতিপূরণ, অস্থায়ী মুনাফা বা হেবা ইত্যাদি বাবদ পেয়েছে সে প্রশ্ন অবান্তর। তার মধ্যে ফসল, ফল-ফাঁকড়া, মধু, গচ্ছিত ধন বা খনি, তা ব্যবহারোপযোগী হলেই তার যাকাত দেয়া ফরয। অবশ্য যদি তা নিসাব পরিমাণের হয়। এ ব্যাপারে বিপরীত কোন মত নেই।

তবে একজন মুসলমান যখন এমন ধন-মালের মালিক হয় ও ব্যবস্থা করতে পারে যে, তা যদি এক বছরকাল ব্যবহারোপযোগী না থাকে যেমন নগদ অর্থ, ব্যবসায় পণ্য ও পালিত পশু তাহলে কি করা হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলা রয়েছে। ইবনে কুদামাহ এ পর্যায়ে তিন প্রকার কথা বলেছেন।

১. ব্যবহারোপযোগী মাল যদি কারো কাছে পূর্ব থেকে রক্ষিত মালের প্রবৃদ্ধি হয়ে থাকে, তা হলে তাতে যাকাত ফরয হবে। যেমন ব্যবসা পণ্যের মুনাফা ও পশুর বাচ্চা দান। এসব ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে রক্ষিত কোন মূল্যের সাথে তাকে শামিল মনে করতে হবে। তখন তার এক বছরেই প্রবৃদ্ধির ও বছর গণনা করতে হবে। ইবনে কুদামাহ বলেন, ' এ ক্ষেত্রে কোন মতবিরোধের কথা আমরা জানি না। কেননা তা তো তারই স্বজাতীয় প্রবৃদ্ধি। যেমন ব্যবসা পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিজনিত অতিরিক্ত লাভ।

২. মালিকের কাছে যদি প্রাপ্ত মাল তার কাছে পূর্ব থেকে রক্ষিত মালের স্বজাতীয় না হয়—যেমন কারো কাছে নিসাব সংখ্যক উষ্ট্র রয়েছে, পরে যে একটি গাভী লাভ করল। সে ক্ষেত্রে সেই নতুন প্রাপ্ত মাল নিয়েই মাসলা সাব্যস্ত করতে হবে। পূর্ব থেকে রক্ষিত ও বছর অতিক্রান্ত মালের সাথে তা মেলান হবে না ও তা শামিল ধরে নিসাবের হিসাব করা হবে না। বরং সেই নতুন প্রাপ্ত মাল যদি নিসাব পরিমাণ হয় ও এক বছর অতিবাহিত

হয়, তবেই তার যাকাত দিতে হবে, নতুবা নয়। সর্বসাধারণ আলিমদের এটাই সিদ্ধান্ত। ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও মুআবিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'তাতে যাকাত ফরয হবে যখন তা ব্যবহারোপযোগী হবে।' ইমাম আহমদ বলেছেন, 'তা যখন ব্যবহার করা হবে, তখন যাকাত দিতে হবে।' ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন ঃ 'আব্দুল্লাহ আমাদেরকে দান করতেন এবং তা থেকেই তার যাকাত দিতেন। যে ব্যক্তি তার ঘর কিংবা দাস বিক্রয় করল সে প্রাপ্ত মূল্যে যাকাত দেবে তখন, যখন সেই মূল্য তার হাতে আসবে। তাঁর জন্য যদি যাকাত দেয়ার একটা নির্দিষ্ট মাস থাকে, তবে সেই মাস পর্যন্ত বিলম্বিত করে অন্যান্য মালের সাথে একসাথে যাকাত দিয়ে দেবে।

৩. পরে প্রাপ্ত মাল যদি তার কাছে পূর্বে থেকে রক্ষিত নিসাব পরিমাণ মালের স্বজাতীয় হয় যার উপর যাকাত হওয়ার একটি বছর অতিবাহত হয়েছে স্বতন্ত্র কারণে—যেমন কারো কাছে যদি চল্লিশটি ছাগল থাকে, যার উপর একটি বছর অতিবাহিত হয়েছে, অতঃপর সে আর একশটি ছাগল ক্রয় করল কিংবা দান হিসেবে পেয়ে গেল। তাহলে তার এই ছাগলের উপর একটি বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ফরয হবে না—ইমাম আহমদ শাফেয়ীর মতে। আর ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, বিগত বছরে তার কাছে যা ছিল তার সাথে পরে পাওয়া ছাগল একসঙ্গে হিসেবে করে সবকিছুরই যাকাত দিতে হবে, তার কাছে পূর্ব থেকে রক্ষিত মালের একটি বছর পূর্ণ হওয়ার পর। তবে যাকাত দেয়া মালের বিনিময় হলে অন্য কথা। কেননা তা এক জাতীয় মালের সাথে শামিল হচ্ছে নিসাব গঠনে। ফলে বছর গুণতিতেও তারই সাথে গুণিত হবে। কেননা এই শেষে পাওয়া মালের বছর স্বতন্ত্রভাবে গণনা করা হলে ফরয আদায় খণ্ডিত হয়ে যাবে; যাকাত ফরয হওয়ার সময়ও বিভিন্ন হয়ে দাঁড়াবে। মালিকানা লাভে সময় স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষিত করতে হবে। আর সম্পদের প্রতি অংশের যাকাতের পরিমাণ আলাদাভাবে নির্ধারণ করতে হবে। এভাবে সামান্য পরিমাণ আলাদা করে দিয়ে দেয়া কঠিন হবে,পরের বছরগুলোতেও অনুরূপ অবস্থাই দেখা দেবে। আর এটা খুবই কঠিন কাজের দায়িত্ব চাপানো ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِىْ الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ- (الحج-٧٨)

দ্বীনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন কষ্ট চাপিয়ে দেন নি।

শরীয়াতে এরূপ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, শুধু ভিন্ন জাতীয় জিনিসের ক্ষেত্রে, পঁচিশটি উষ্ট্রের কম হলে আর মুনাফা ও উৎপাদন তার মূল ও আসলের বছরের সাথে গণনা করতে হবে। এই অসুবিধা দূর করাই এরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।[১]

ইবনে কুদামাহ্ যদিও হানাফী মাযহাবের এই মতের প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু সত্য কথা এই যে, বাস্তবায়নে হানাফী মতই অধিকতর সহজ। অতএব তা-ই গ্রহণীয়।

১. আল-মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১৭।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পশুসম্পদের যাকাত

পশু জগত বিশাল ও বহু প্রকার। তার বিভক্তি কয়েক হাজারে পৌঁছতে পারে। কিন্তু মানুষ তার মধ্য থেকে খুব কম সংখ্যক পশুই ব্যবহার করে থাকে। পশুর মধ্যে সবচাইতে বেশী ব্যবহৃত হয় সেই শ্রেণী, যাকে আরবগণ আল-আন'আম الانعام বলে চিনে। আর তা হচ্ছে উষ্ট্র, গরু, মহিষ—এগুলো। ছাগল, ভেড়া, দুম্বা এরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো দিয়ে তাঁর বান্দাদের প্রতি বিরাট কল্যাণ এনে দিয়েছেন। কুরআন মজীদে এই পশুগুলোর কল্যাণের কথা বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। সূরা আন-নাহলে বলা হয়েছে ঃ

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْ كُلُوْنَ- وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ- وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلاَّ بِشِقِّ الْاَنْفُسِ- اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ- (النحل ٥-٧)

(আল্লাহ্) জন্তু পয়দা করেছেন, তাতে তোমাদের জন্যে পোশাকও রয়েছে আর খাদ্যও। আরও নানাবিধ অন্যান্য ফায়দাও নিহিত রয়েছে। সেসবের মধ্যে তোমাদের জন্যে সৌন্দর্য রয়েছে, যখন সকালবেলা তোমরা সেগুলোকে বিচরণের জন্যে পাঠাও এবং যখন সন্ধ্যায় সেগুলোকে ফিরিয়ে আন। ওরা তোমাদের ভার বোঝা বহন করে এমন-এমন স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা খুব কঠোর শ্রম ছাড়া পৌঁছতে পার না। আসল কথা এই যে, তোমাদের আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহসম্পন্ন ও মেহেরবান।

এ সূরারই অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً- نُسْقِيْكُمْ مِمَّ فِىْ بُطُوْنِه مِنْ بَيْنَ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ- (النحل ٦٦)

আর তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ গৃহপালিত জন্তুতেও এক শিক্ষা নিহিত রয়েছে। ওদের পেট থেকে গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে তোমাদের খাঁটি দুগ্ধ পান করাই যা পানকারীদের জন্যে খুবই উপাদেয়।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

.... وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ-

(النحل- ٨٠)

কিন্তু জন্তু জানোয়ারের চামড়া থেকে তোমাদের জন্যে এমন ঘর সৃষ্টি করেছেন, যা তোমাদের জন্য বিদেশ সফরে ও এক স্থানে অবস্থান—উভয় অবস্থাতেই খুব হাল্‌কা থাকে। জিনি জন্তুর পশম উষ্ট্র ও খরগোসের পশম ও চুল দ্বারা তোমাদের জন্যে পরিধানের ব্যবহারের অসংখ্য জিনিস বানিয়ে দিয়েছেন, যা জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের কাজে আসে।

সূরা ইয়াসীন-এর আয়াত ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ- وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ- وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ - اَفَلَ يَشْكُرُوْنَ- (يس ٧١-٧٣)

এ লোকেরা কি দেখে না যে, আমরা আমাদের হাতে তৈরী করা জিনিসগুলো দিয়ে তাদের জন্যে গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছি আর এখন তারা এসবের মালিক? আমরা এগুলোকে এমনভাবে তাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছি যে, এগুলোর কোন একটির উপর তারা সওয়ার হয়, কোনটির গোশত খায় তারা। এগুলোর মধ্যে তাদের জন্যে রকম-বেরকমের কল্যাণ ও পানীয় রয়েছে। তাহলে তারা শোকর গুযার হয় না কেন?

কুরআন যে শোকর-এর জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে, তার সর্বাধিক প্রকাশ ক্ষেত্র হচ্ছে সুন্নাত প্রবর্তিত যাকাত। তারা নিসাব নির্দিষ্ট করে নিয়েছে এবং প্রতি বছর আদায়কারী পাঠিয়ে মালিকদের কাছ থেকে তা আদায় করার ব্যবস্থা করেছে। যারা তা দিতে অস্বীকৃত হবে তাদের দুনিয়ার শাস্তি ও আখিরাতের আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

বস্তুত আরবদের জন্যে বিশেষ করে উহা খুবই কল্যাণকর ছিল। অনেক দেশেই এ সম্পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শক্তিরূপে গণ্য। তা প্রায় সর্বত্রই এ উদ্দেশ্যে লালিত-পালিত হয়। তাই শরীয়াত তার উপর যাকাত ফরয হওয়ার নিসাব নির্ধারণ করে দিয়েছে।

এ পর্যায়ের যাকাতের বিস্তারিত বিধান আমরা এখানে পেশ করছি।

প্রথম আলোচনা

পশুর যাকাতের সাধারণ শর্ত

যে কোন সংখ্যক মালিকানার পশুর উপর শরীয়াত যাকাত ধার্য করেনি। সর্বপ্রকারের জন্তুর উপরও করা হয়নি। যে সব জন্তুর মধ্যে বিশেষ কতগুলো শর্ত পাওয়া যাবে, কেবল সেগুলোতে যাকাত ফরয করা হয়েছে। শর্তগুলো এইঃ

১. তার সংখ্যা নিসাবমাত্রা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে

প্রথম শর্ত হচ্ছে, শরীয়াত নির্ধারিত নিসাব সংখ্যক পর্যন্ত তার সংখ্যা পৌঁছতে হবে। কেননা ইসলামে কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিদের উপরই যাকাত ধার্য হয়েছে। কিন্তু একটি বা দুটি উষ্ট্রের মালিকই তো আর ধনী গণ্য হতে পারে না। এ জন্যে উষ্ট্রের ক্ষেত্রে সে সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ। এ ব্যাপারে সর্বকালের মুসলমান সম্পূর্ণ একমত। অতএব তার কম সংখ্যক উষ্ট্রের মালিকানায় যাকাত ফরয হবে না। আর চল্লিশ ছাগলের কম সংখ্যক হলেও যাকাত দেয়া লাগবে না। হাদীসমূহে তা-ই বলা হয়েছে এবং রাসূলে করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলও এ নীতিতেই চলেছে।

গরুর নিম্নতম নিসাব কত তা নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। পাঁচটা থেকে ত্রিশটা—পঞ্চাশটার কথা বলা হয়েছে।

২. মালিকানার এক বছর

মালিকের মালিকানায় একটি বছর অতিবাহিত হওয়া দ্বিতীয় শর্ত। নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলও তাই ছিল। তাঁরা যাকাত আদায়কারী লোক বছরে মাত্র একবারই পাঠাতেন পশুর যাকাত আদায় করার জন্যে।

পূর্বেই বলেছি, ব্যবহার্য সম্পদে এক বছরে মালিকানার শর্ত সর্বসম্মত। এমন কি, যে সব ফিকাহবিদ ব্যবহার্য মালে এক বছরকাল অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত করেছেন, তাঁরা গৃহপালিত পশুর উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা করেন নি। পশুর মায়েদের এক বছরকে বাচ্চাদেরও এক বছর ধরা হয়েছে।

৩. 'সায়েমা' হতে হবে

'সায়েমা'র শাব্দিক অর্থ বিচরণশীল। শরীয়াতের পরিভাষায় সেই পশুকে 'সায়েমা' বলা হয়, যা বছরের অধিকাংশ সময় বিচরণ করে আহার গ্রহণ করতে সক্ষম। দুগ্ধ,

মাখন ও পনিরের মাত্রা বেশী হওয়াই লক্ষ্য। তাই 'সায়েমা' বলা হয় সে পশুকে, যা নিজেই ঘাসে বিচরণ করে। মালিক নিজে ঘাস সংগ্রহ করে খাওয়ালে তা এর মধ্যে গণ্য নয়।

শর্ত হচ্ছে, জন্তু বছরের অধিকাংশ সময় নিজেই বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করবে, বছরের সমস্ত দিনগুলোতে বিচরণ করা শর্ত নয়। কেননা অধিকাংশ সময়ের ব্যাপারকেই সমগ্র সময়ের ব্যাপার ধরা যায়। আর 'সায়েমা' তো বছরের কোন না-কোন দিন নিজেই ঘাস খেয়ে নিতে পারে। দুগ্ধ, চর্বি ও মাখন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালন করা হলেই তাকে 'সায়েমা' মনে করা হবে ও তাতে যাকাত ফরয হবে। কিন্তু যদি ভার বহন বা যানবাহন হিসেবে ব্যবহার অথবা গোশ্‌ত খাওয়ার উদ্দেশে পালা হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। কেননা এ প্রবৃদ্ধিটা ব্যক্তিগত ফায়দার জন্যে।

'সায়েমা' হওয়ার শর্ত আরোপের কারণ হচ্ছে, যাকাত ফরয হয়েছে—এমনভাবে যেন মালিকের পক্ষে তা দিয়ে দেয়া সহজ হয়। কুরআনের 'অতিরিক্তটা গ্রহণ কর' কথার দ্বারা তা-ই বোঝানো হয়েছে। 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যয় করবে তারা?' বল, 'অতিরিক্ত।' আর এ 'অতিরিক্ত' শব্দটি বাস্তবায়িত হবে যদি তার জন্যে কষ্ট কম হয়, প্রবৃদ্ধি বেশী হয়। 'সায়েমা' হলেই তা হয়। কিন্তু যে জন্তুকে ঘাস এনে খাওয়াতে হয়, তাতে মালিকের কষ্ট বেশী হয়। এবং তা যাকাত বাবদ দিতে মানসিক কষ্ট হয়।

এ শর্তের দলীল হচ্ছে রাসূলের হাদীসঃ

فِىْ كُلِّ اِبِلٍ سَائِمَةٍ فِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ اِبْنَةُ لَبُوْنَ......

সায়েমা উষ্ট্রের প্রতি চল্লিশটি যাকাত বাবদ একটা বিনতে লবুন।

দুই বছর পার হয়ে তৃতীয় বর্ষে উপনীত উষ্ট্রী শাবক দিতে হবে। হাদীসের ইমামগণ এ হাদীসটিকে সহীহ্ মনে করেছেন। উষ্ট্রের 'সায়েমা' হওয়ার শর্ত করায় বোঝা যায় যে, যে সব উষ্ট্রকে ঘাস খাওয়ার জন্যে মাঠে পাঠানো হয় না, এনে খাওয়ানো হয়, তাতে যাকাত ধার্য হবে না। নিজের বিচরণ করার শর্ত করার অবশ্যই একটা ফায়দা থাকতে হবে। কেননা শরীয়াতের বিধানদাতার কালচক্র তো আর অর্থহীন হতে পারে না; স্পষ্ট মনে হয় যার উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে একটি বিশেষ হুকুম রয়েছে, যার উল্লেখ করা হয়নি, সে সম্পর্কিত হুকুমের বিপরীত। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন ঃ আরবরা যখন কোন জিনিসের দুটি অপরিহার্য গুণের উল্লেখ করে বিকল্প হিসেবে, তখন তার একটা গুণের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম হবার পূর্ণ সম্পন্ন জিনিস থেকে ভিন্নতর হবে।[১]

গুণের তাৎপর্য অনুযায়ীই ভাষাভাষীদের আমল হয়ে থাকে। কাজেই কোন একটি বিশেষ গুণ নির্ধারণ করা হলে তার লক্ষ্যটা সম্মুখে রাখতে হবে। আল্লাহ্ ও রাসূলের কালামে এ বিষয়ের গুরুত্ব সর্বাধিক।[২]

---

১. الروض النضير ج ٢ ص ٣٩٩

২. পূর্বোক্ত

বুখারী উদ্ধৃত ও হযরত আনাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস এ কথার সমর্থক। তা হচ্ছেঃ

وَفِىْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ مِنْهَا شَاةٌ-

স্ববিচরণকারী ছাগলের যাকাত হচ্ছে চল্লিশটিতে একটি ছাগী।

আর ছাগলের ক্ষেত্রে যখন স্ববিচরণকারী হওয়ার শর্ত আরোপিত, তখন উষ্ট্র ও গরুর ক্ষেত্রে তো তা অবশ্যই আরোপিত হবে ফিকাহ্র নীতি কিয়াস অনুযায়ী। কেননা এ দুইয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

রবীয়া, মালিক ও লাইস প্রমুখ ফকীহ্ সর্বসাধারণ ফিকাহ্বিদদের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হতে পারেন নি। তাঁরা উষ্ট্র, গরু ও ছাগলের মধ্যে যে সবকে ঘাস খাওয়ানো হয়, তার উপরও যাকাত ধার্য করেছেন।[১]

চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, এ জন্তু মালিকের কোন কাজে—জমি চাষ, ক্ষেত-খামারের সেচ বা বোঝা বহন ইত্যাদি ধরনের কাজে নিয়োজিত হবে না। এ শর্তটি উষ্ট্র ও গরুর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আরোপিত।

হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ

لَيْسَ فِىْ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ-

কর্মে নিয়োজিত গরুর কোন যাকাত হয় না।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলেছেনঃ

لَيْسَ عَلٰى الْحَرَّاثَةِ صَدَقَةٌ-

কৃষি কাজে নিয়োজিত জন্তুর যাকাত নেই।[২]

এছাড়া রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত এক হাদীসের ভাষা এই ঃ

هَاتُوْا رُبْعَ الْعُشُوْرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا-

প্রতি চল্লিশ দিরহামের দশের চার ভাগের এক ভাগ এক দিরহাম যাকাত বাবদ দাও।

বলা হয়েছে ঃ কাজে নিয়োজিত পশুর যাকাত হয় না। ইবরাহীম, মুজাহিদ, জুহরী, উমর ইবনে আব্দুল আযীয প্রমুখ ফিকাহ্বিদের এ মত বর্ণিত হয়েছে এবং আবূ হানীফা, সওরী, শাফেয়ী, যায়দিয়া ও লাইসও এ মতই সমর্থন করেছেন।

১. الروض النضير ج ٢ ص ٣٩٩

২. আল-আমওয়াল পৃঃ ৩৮০।

দুটো দিক দিয়ে পূর্বোক্ত বর্ণনাসমূহের সমর্থন পাওয়া যায় ঃ প্রথম যে সব মাল মালিকের সুখ বিধানের কাজে নিয়োজিত—যেমন কাপড়, চাকর-গোলাম, বসবাসের ঘর ও আরোহণের যানবাহন, পড়ার বই-কিতাব—এ সবের কোন যাকাত হয় না। এ দৃষ্টিতে চাষবাষে গরুর ও পানি তোলার চাকা বহনকারী বলদেরও যাকাত হওয়ার কথা নয়। বিবেচনাও তাই বলে, আর শরীয়াতের দলীলও এর সমর্থক।

'সায়েমা' ও এই গরু-বলদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। এগুলো ক্রমবৃদ্ধির দিক দিয়ে কাজে নিয়োজিত এবং তা কাপড় ও ঘরের মতই।

দ্বিতীয়, পানি বহনের বলদ ও গাভী এবং চাষের গরুর কোন যাকাত নেই, কেননা তা কৃষির পানি বহন ও কৃষিকাজে নিয়োজিত। এ কথা জুহরী থেকে বর্ণিত।[১]

সাঈদ ইবনে আব্দুল আযিয বলেছেন ঃ চাষের কাজে নিয়োজিত গরুর যাকাত নেই। কেননা কৃষি উৎপন্ন গমের যাকাত রয়েছে। আর এ সব তো গরুর সাহায্যেই পাওয়া গেছে। কেননা এগুলো যন্ত্রপাতি পর্যায়ের; কৃষি কাজে এগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর ফলে জমি যা উৎপাদন করে তাতে যাকাত ফরয। এক্ষণে এগুলোর উপরও যদি যাকাত ফরয হয়, তাহলে একই জিনিসের উপর দ্বিগুণ যাকাত ফরয হবে। ইমাম মালিক ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে কর্মে নিয়োজিত হোক আর নাই হোক, গরু ও বলদের উপর অবশ্যই যাকাত ফরয হবে।

মালিকী মতের কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের পূর্বোক্ত মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা এঁদের মত হচ্ছে, ভূমি হিসেবে ফরয হওয়া ও অনুরূপ অপরটিতে যাকাত ফরয না হওয়া পরস্পর বিরোধী কথা। আমাদের দৃষ্টিতে এটাই সুবিচারপূর্ণ মত।

১. আল-আমওয়াল পৃঃ ৩৮১।

দ্বিতীয় আলোচনা

উটের যাকাত

সমস্ত মুসলমান, নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীস ও সাহাবিগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, পাঁচটি থেকে একশত বিশটি উষ্ট্রের যাকাতের নিসাব ও যাকাতের পরিমাণ নিম্নোক্ত তালিকা অনুযায়ী হবে ঃ

বলদের নিসাব				যাকাতের পরিমাণ
১ টি	থেকে	৯টি	উষ্ট্রের যাকাত	১টি ছাগী
১০টি	”	১৪টি	” ”	২টি ”
১৫	”	১৯ টি	” ”	৩টি ”
২০টি	”	২৪	” ”	৪টি ”
২৫	”	৩৫	” ”	১ টি গরুর মাদী বাচ্চা যার বয়স ১ বছর অতিক্রান্ত হয়ে ২য় বছরে পদার্পণ করেছে।
৩৬	”	৪৫	” ”	দুই বছর পর তৃতীয় বছরে শুরু বয়স্ক একটি গাভী।
৪৬	”	৬০	” ”	তিন বছর অতিক্রমকারী একটি গাভী।
৬১	”	৭৫	” ”	চার বছর বয়স অতিক্রম করে পাঁচ বছরে প্রবেশকারী একটি গাভী।
৭৭	”	৯০	” ”	দুই বছর বয়স অতিক্রম করে তৃতীয় বর্ষে অতিক্রমকারী উষ্ট্রীর দুটি বাচ্চা।
৯১	”	১২০	” ”	তিন বছর বয়স অতিক্রম করে চতুর্থ বছরে প্রবেশকারী উষ্ট্রীর দুটি বাচ্চা।

যাকাতের এ নিসাব ও পরিমাণ সম্পর্কে ইজমা—সম্পূর্ণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে হযরত আলী (রা) থেকে একটা ভিন্ন কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ ২৫টি উটের যাকাত বাবদ পাঁচটি ছাগী দিতে হবে। আর উটের সংখ্যা ২৬টি হলে দুই বছরের একটি উষ্ট্রী শাবক দিতে হবে।

ইবনে মুনযির বলেছেন ঃ পঁচিশটি উষ্ট্রের যাকাত যে একটি দুই বছর বয়স চলা উষ্ট্রী শাবক, এ বিষয়ে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে হযরত আলী থেকে বর্ণিত কোন মত নির্ভুল সূত্রে প্রমাণিত হয়নি।

উটের সংখ্যা একশ' বিশটির ঊর্ধ্বে হলে অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মত ও আমল নিম্নোদ্ধৃত তালিকার অনুরূপ ঃ

প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি তিন বছর বয়স অতিক্রমকারী উষ্ট্রী শাবক; আর প্রতি চল্লিশটিতে তৃতীয় বর্ষে উপনীত একটি উষ্ট্রী শাবক।

১২১ থেকে ১২৯ টি সংখ্যার যাকাত	তিনটি তৃতীয় বর্ষের উষ্ট্রী শাবক।
১৩০ " ১৩৯ টি " "	একটি ৪ বছর বয়সে পড়া উষ্ট্রী, ২টি তৃতীয় বর্ষে উপনীত উষ্ট্রীর শাবক।
১৪০ " ১৪৯ টি " "	২টি চতুর্থ বর্ষে উপনীত উষ্ট্র শাবক +একটি তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক।
১৫০ " ১৫৯ টি " "	৩টি চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক।
১৬০ " ১৬৯ টি " "	৪টি তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক।
১৯০ " ১৯৯ টি " "	৩টি ৪র্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্র শাবক + ১টি তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্র শাবক।
২০০ " ২০৯ টি " "	৪টি ৪র্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক অথবা ৫টি ৩য় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক।

এ ভাবে দশটির কম সংখ্যক উষ্ট্রে কোন যাকাত হবে না। দশটি পূর্ণ হলে পূর্বে যেমন বলেছি, প্রতি ৫০টিতে একটি ৪র্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক। আর প্রতি ৪০টিতে একটি তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক।

পূর্বোক্ত তালিকা দুটো থেকে স্পষ্ট হয় যে, উষ্ট্রের যাকাত ফরয হওয়ার নিম্নতম সংখ্যা হচ্ছে পাঁচটি। তাই যার চারটি উষ্ট্র আছে, সে যাকাত দেবে না। দান-সাদ্‌কা করলে ভিন্ন কথা। পাঁচটি সংখ্যায় গেলেই তাকে একটি ছাগী যাকাত বাবদ দিতে হবে। বলা হয়েছে, এ পরিমাণ-নির্ধারণ মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কেননা উষ্ট্রের যাকাত ফরয হওয়ার নিম্নতম বয়স সীমা হচ্ছে একটি তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক। সেকালে তার মুল্য হতো ৪০ দিরহাম। আর একটি ছাগীর মুল্যও তাই পাঁচ দিরহাম ছিল। তাই পাঁচটি উষ্ট্রের যাকাত ফরয হওয়ার অর্থ দুইশত দিরহাম মূল্যের রৌপ্য যাকাত ফরয হওয়া।

পঁচিশটির কম সংখ্যার উষ্ট্রের যাকাতে ছাগী দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে—উষ্ট্র নয়। যদিও প্রত্যেক জিনিসের যাকাত সেই জিনিসের অংশ থেকে দেয়া সাধারণ নিয়ম। এর কারণ হচ্ছে, উষ্ট্র মালিকের উষ্ট্রের সংখ্যা কম হওয়া। এর ফলে ধন-মালিক ও দরিদ্র উভয় পক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কেননা পাঁচটি উষ্ট্র তো বিরাট সম্পদ বটে। তার উপর যাকাত ফরয করা না হলে দরিদ্রের অধিকার নষ্ট হয়। কিন্তু তারই একটা যাকাত বাবদ দিতে হলে মালের মালিকদের স্বার্থ বিনষ্ট হয়। আর একটি উষ্ট্রের কতকাংশ দেয়া সাব্যস্ত হলে মালিকের ধনের ক্ষতি সাধন হয়।

উপরে যে পরিসংখ্যানের উল্লেখ করা হয়েছে, তা খোদ নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত ও তৎকর্তৃক অনুসৃত।

ইমাম নববী লিখেছেন ঃ গৃহপালিত পশুর যাকাত নির্ধারণের ব্যাপারটি হযরত আনাস ও ইবনে উমর বর্ণিত দুটি হাদীসের উপর ভিত্তিশীল।

হযরত আনাস বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে—হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে বাহ্‌রাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে তাঁকে লিখেছিলেন ঃ

'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম'

রাসূলে করীম (স) মুসলমানদের জন্যে যে যাকাত ফরয করেছেন, যে বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন, তার হার তোমাকে লিখে পাঠাচ্ছি। মুসলমানদের কাছে যে তা চাইবে, সে যেন তাকে তা দিয়ে দেয়। এর বেশী চাইলে দেবে না। চব্বিশ বা তার চাইতে কম সংখ্যক উষ্ট্রের যাকাত ছাগী দ্বারা দিতে হবে অর্থাৎ প্রতি পাঁচটি একটিতে ছাগী। ২৫টি থেকে ৩৫টি পর্যন্ত উষ্ট্রের যাকাত বাবদ একটি তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক। ৩৫টি থেক ৪৫টি পর্যন্ত উষ্ট্রের যাকাত একটি ৪র্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক। ৪৬ থেকে ৬০টি পর্যন্ত উষ্ট্রের যাকাত ৪র্থ বর্ষে উপনীতা একটি উষ্ট্রী শাবক। ৬১ থেকে ৭৫টি পর্যন্ত পঞ্চম বর্ষে উপনীতা একটি উষ্ট্রী শাবক (بنت لبون)। ৭৬টি থেকে ৯০টি পর্যন্ত দুটি তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক। ৯১ টি থেকে ১২০ টি পর্যন্ত দুটি চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক। তার উর্ধ্ব সংখ্যক হলে প্রতি চারটির জন্যে একটি তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাসক। আর প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক। যার মাত্র চারটি উষ্ট্র রয়েছে তাকে যাকাত দিতে হবে না। ৫টি হলেই একটি ছাগী দিতে হবে।

নিজস্বভাবে বিচরণকারী ৪০টি থেকে ১২০টি পর্যন্ত ছাগলের যাকাত বাবদ ১টি ছাগী দিতে হবে। তার উর্ধ্বে ২০০টি পর্যন্ত ২টি ছাগী। ২০০ থেকে ৩০০ পর্যন্ত ৩টি ছাগী। ৩০০-এর বেশী থাকলে প্রতি ৩০০টিতে একটি। যদি নিজস্বভাবে বিচরণকারী ছাগীর সংখ্যা ৪০টির কম হয়, তাহলে যাকাত দিতে হবে না। আর নগদ সম্পদের দশ ভাগের একভাগের চতুর্থাংশ পরিমাণ দিতে হবে। যদি ১৯৯ সংখ্যক নগদ মুদ্রা হয়, তাহলে তাতে যাকাত দিতে হবে না।

এ চিঠিতে আরও লিখিত ছিল ঃ

যার যাকাত হবে একটি দ্বিতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক, কিন্তু তার কাছে তা যদি না থাকে, আর থাকে তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক, তাহলে তাঁর কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে। আদায়কারী তাঁকে বিশটি দিরহাম ফেরত দেবে অথবা দেবে দুটি ছাগী। আর যদি তার কাছে দ্বিতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক না থাকে, থাকে তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক, তাহলে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে, কিন্তু সে সঙ্গে কিছুই নেয়া হবে না। যার যাকাত হবে পঞ্চম বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক কিন্তু তার

কাছে তা না থাকে, তার কাছে থাকে চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক, তাহলে তার কাছ থেকে তাই গ্রহণ করা হবে, তার সঙ্গে আরও দুটি ছাগী বা বিশ দিরহাম নিয়ে নেয়া হবে। যার যাকাত হবে একটি চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবকঃ কিন্তু তা যদি তার কাছে না থাকে, থাকে পঞ্চম বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক; তবে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে, আর আদায়কারী তাকে বিশটি দিরহাম ফেরত দেবে অথবা দুটি ছাগী। আর যার যাকাত দিতে হবে একটি চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক, কিন্তু তার কাছে তা না থাকে—থাকে তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক, তা না হলে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে তাকে দুটি ছাগী বা বিশটি দিরহাম ফেরত দেবে। যার যাকাত একটি তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক, তার কাছে রয়েছে একটি চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক, তার কাছ থেকে সেটি নিয়ে বিশটি দিরহাম কিংবা দুটি ছাগী তাকে দিতে হবে। যার যাকাত হবে তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক; কিন্তু তার কাছে তা না থাকে, থাকে দ্বিতীয় বর্ষে উপনীত উষ্ট্রী শাবক তার কাছ থেকে তা নিয়ে বিশ দিরহাম কিংবা দুটি ছাগী তাকে ফেরত দেবে। দাঁত পড়া, দোষযুক্ত বা পাঠা যাকাত বাবদ দেয়া যাবে না। তবে আদায়কারী তা নিতে চাইলে স্বতন্ত্র কথা। খুচরা অংশ কখনো মিশানো হবে না। আর যাকাত দেয়ার ভয়ে একত্রে রাখা জন্তুগুলোকে বিচ্ছিন্ন করেও দেখানো যাবে না। দুই মিলানো অংশে সমান হারে যাকাত ধার্য হবে।

এ দীর্ঘ চিঠির বর্ণনা বুখারী শরীফের 'কিতাবুয যাকাত' অধ্যায়ে বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে তা একত্রিত করে লেখা হয়েছে। আহমদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারে কুতনীও এ বর্ণনা নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এর সনদ সহীহ্। শাফিয়ী, বায়হাকী ও হাকেমও এ চিঠির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইবনে হাজম বলেছেন, ' এ অত্যন্ত সহীহ্ বর্ণনা।'

ইবনে উমরের বর্ণিত হাদীস হচ্ছে ঃ

'রাসূলে করীম (স) যাকাত সম্পর্কিত ফরমান লিখে রেখেছিলেন। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রতি তা পাঠানোর পূর্বেই তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। পরে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর ফারুক (রা) তদনুযায়ী আমল করেছেন। তাতে লেখা ছিল ঃ

..পাঁচটি উষ্ট্রের যাকাত একটি ছাগী। আর দশটিতে দুটি ছাগী...।

হাদীসটি আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। এর সনদ উত্তম। দারে কুত্নী, হাকেম ও বায়হাকীও তা উদ্ধৃত করেছেন।

ইবনে হাজম হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, তা চূড়ান্ত মাত্রায় সহীহ। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক অন্যান্য সব সাহাবীর উপস্থিতিতেই তদনুযায়ী আমল করেছেন। এ থেকে ভিন্নমত পোষণকারী কেউ কোথাও নেই। আমাদের বিপরীত মতের লোকেরা তো এর চাইতেও কম অবস্থায় ইজমা হওয়ার দাবি করেন তাদের বিরোধী মতের প্রতিবাদে।

মুসলিম উম্মতের বিপুল সংখ্যক বিশেষজ্ঞ উপরিউক্ত দুটি বর্ণনানুযায়ী আমল করেছেন। যদিও ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুইন প্রমুখ কয়েকজন হাদীসবিদ্ এ দুটি বর্ণনার সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছেন।

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ এ নীরবতাকে যাকাত পর্যায়ের সব হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ বলে ধরে নিয়েছেন। তাঁর মতে গোটা যাকাত ব্যবস্থাটাই সন্দেহযুক্ত। মনে করেছেন, যাকাত পর্যায়ে যে সব ফিক্হী মত গ্রহীত হয়েছে, তা হাদীসের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

আমরা এ পর্যায়ে গোটা যাকাত ব্যবস্থা সবিস্তারে উল্লেখ করতে চাই, যা প্রধানত হযরত আবূ বকরের উপস্থাপিত। তা অনেক সময় স্বয়ং নবী করীম (স) -এর অথবা হযরত উমর ফারূকের কিংবা হযরত আলীর নামেও উল্লেখ করা হয়।

উপরিউক্ত প্রাচ্যবিদ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সুন্নাতের প্রতি যে চরম শত্রুতা পোষণ করেন, তা সর্বজনবিদিত। তিনি তাতে সন্দেহের উদ্রেক করার ও তার উপর ঘৃণা প্রকাশ করার কোন সুযোগই ছেড়ে দেন না। তিনি এ বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করে সর্বপ্রকারের সংশয়-সন্দেহ ও গালাগাল একত্রিত করে দিয়েছেন। কিন্তু ড ঃ মুস্তফা আযমী তাঁর লিখিত গ্রন্থে ব্যক্তির বিষদাঁত ভেঙে দেন এবং তার হিংস্র মস্তক চূর্ণ করে দিয়েছেন।[১]

বস্তুত মি ঃ শাখ্ত যদি একটু ন্যায়পরায়ণতার আশ্রয় দিতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারতেন যে, উষ্ট্র ছাগলের যাকাতের ন্যায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নবী করীম (স) কিছুই বলে যান নি, তা কিছুতেই কল্পনা করা যায় না। তিনিই নিশ্চয়ই তার হার নির্ধারণ করে গেছেন। কেননা তা-ই ছিল তদানীন্তন আরবের সবচাইতে বড় ধন ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তখন যাকাত আদায়কারী লোকেরা প্রতিবছর কবীলাসমূহের লোকদের কাছে উপস্থিত হয়ে তা-ই গ্রহণ করত ও যা পাওয়া যেত, তা নিয়ে এসে বন্টন করে দিত। তা তারা গ্রহণ করত ধনী লোকদের কাছ থেকে তাদের ধন-মাল থেকে প্রাপ্য অংশ হিসেবে। কিন্তু কি তারা গ্রহণ করত? কি তারা রেখে আসত? তাদের সাথে কিভাবে কার্য সম্পাদন করত? এ পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সেই সব হাদীসই মিথ্যা—কল্পরচিত, এমন কথা কোন সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই চিন্তা করতে পারে না।

কাজেই নবী করীম (স)-এ পর্যায়ে কোন 'চিঠি' লিখাবেন ও তাতে তার পরিমাণ ও নিসাব স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করবেন, তা কিছুমাত্র অসম্ভব বা বিচিত্র নয়। তাতে বিশেষ করে নিজস্বভাবে ঘাস খেয়ে বেড়ানো জন্তু ও সেকালের বর্ধনশীল ধন-মালের যাকাত নির্ধারণ করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক।

এ পর্যায়ে হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর ফারুকের চিঠিও উদ্ধৃত হয়েছে। দুটোর মূল উৎস নবী করীম (স) স্বয়ং। যেমন হযরত আবূ বকরের চিঠির শুরুতে বলা হচ্ছে ঃ

---

১. এটি ডঃ আযমীর থিসিস—ইংরেজী ভাষায় বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

যাকাতের দেয় ফরযের এ বিবরণ যা রাসূলে করীম (স) মুসলমানদের উপর ধার্য করেছেন।

আর হযরত উমর ফারূকের চিঠিখানির বর্ণনা, তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

'নবী করীম (স) যাকাত সংক্রান্ত এই চিঠি লিখেছিলেন।'

হযরত আলীর নামের চিঠি খোদ নবী করীমের চিঠি না তাঁর নিজের; তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে বটে এবং তা হযরত আবূ বকর ও হযরত উমরের চিঠির মত খ্যাত ও প্রসিদ্ধও নয়। সনদের দিক দিয়ে তা অপর দুটির ন্যায় শক্তিশালীও নয়। আর জন্তু জানোয়ারের যাকাত পর্যায়ে এই চিঠি কয়টিই চূড়ান্ত দলীল নয়। আরও কয়েকটি চিঠি রয়েছে; যেমন হযরত আমর ইবনে হাজমের নাজরানবাসীদের প্রতি প্রেরিত চিঠিও রয়েছে। তাতেও ফরয যাকাত ও দিয়ত সংক্রান্ত মসলার উল্লেখ রয়েছে।

গরুর যাকাত পর্যায়ে রয়েছে হযরত মুআযের চিঠি। এই সব চিঠিতে সম্মিলিতভাবে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলোর উল্লেখ রয়েছেঃ

১. পাঁচটি কম উষ্ট্রের কোন যাকাত নেই,

২. চল্লিশটির কম ছাগলের কোন যাকাত নেই,

৩. দুইশত দিরহাম মূল্যের রৌপ্যের (টাকার) কমে যাকাত নেই,

৪. পঁচিশটির কম সংখ্যক উষ্ট্রের যাকাত হচ্ছে ছাগল,

৫. আর তার যাকাতের পরিমাণ হচ্ছে প্রতি পাঁচটির উষ্ট্র বাবদ একটি ছাগী,

৬. পঁচিশটি থেকে একশ' বিশটি পর্যন্ত উষ্ট্রের যাকাত সমান হারে ধরা হয়েছে।

৭. এ কথায় ঐকমত্য হয়েছে যে, চল্লিশটি থেকে তিনশটি পর্যন্ত ছাগলের যাকাত প্রতি একশ'তে একটি ছাগী।

৮. নগদ অর্থের যাকাত দশম ভাগের এক-চতুর্থাংশ—এ বিষয়েও সকলে একমত।

৯. এ বিষয়েও ঐকমত্য রয়েছে যে, মধ্যম মানের মাল যাকাত বাবদ গ্রহণ করা হবে। বাছাই করা সর্বোত্তম মালও নয় এবং সর্ব নিম্নমানের মালও নয়।

অতঃপর কতিপয় খুঁটিনাটি বিষয়ে বিভিন্ন মতের উল্লেখ রয়েছে। যেমন একশ' বিশটি উষ্ট্রের পর আরও যে উষ্ট্র রয়েছে, তার যাকাত বাবদ কি দিতে হবে? হযরত আবূ বকরের চিঠি বলছে, প্রতি চল্লিশটি বাবদ একটি তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক দিতে হবে। আর প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক। হযরত আলী ও আমর ইবনে হাজমের চিঠিতে বলা হয়েছে ঃ 'অতঃপর প্রথম থেকে হিসাব ধরে আসতে হবে।'

এই দুই ধরনের মতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পন্থা হচ্ছে, তাৎপর্যের দিক দিয়ে উভয় দলীলকেই অভিন্ন মনে করতে হবে এবং দলীলের ব্যাখ্যায়ই মতপার্থক্য ধরে নিতে হবে। মূল দলীলে কোনরূপ মতপার্থক্য নেই।

এই চিঠিসমূহ নগদ স্বর্ণমুদ্রা বা গরু ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন অকাট্য দলীল পেশ করছে না। আমার মতে এসব বিষয়ে কোন অকাট্য দলীল না দেওয়াই এ চিঠিসমূহের সত্যতার অকাট্য দলীল এবং এসব চিঠির মৌল উৎস নবী করীম (স), তা-ও নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত। তা কখনো কৃত্রিম বা মিথ্যা হতে পারে না। তা যদি শাখ্ত্-এর ধারণানুযায়ী পরবর্তীকালে ফিকহী মতের প্রভাবে রচিত হত, তাহলে তাতে বিষয়গুলো সম্পর্কে নিশ্চয়ই বক্তব্য পাওয়া যেত এবং পরবর্তীকালে যেসব ধন-মাল আবিস্কৃত ও উদ্ভূত-উদ্ভাবিত হয়েছে, তা তার যাকাত পরিমাণের উল্লেখসহ সুন্দরভাবে সুমার্জিত ও সুবিন্যস্ত পাওয়া যেত। কিন্তু নবী করীম (স) প্রত্যেক জাতি ও গোত্রকে তাদের সম্মুখবর্তী বাস্তবভাবে উপস্থিত বিষয়ে পথনির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠাতেন। এ কারণে নগদ স্বর্ণমুদ্রা সম্পর্কে তিনি কোন স্পষ্ট কথা উল্লেখ করেছেন বলে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কেননা তদানীন্তন সমাজে তা খুব বেশী ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না। ছিল রৌপ্য মুদ্রা, তাই সে বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া গেছে। গরুও তখনকার দিনে সে দেশে বেশী ছিল না। এই কারণে সে বিষয়ে কেবলমাত্র ইয়েমেনে প্রেরিত মুআযকে লেখা চিঠিতেই তার উল্লেখ পাওয়া যায়, অন্যত্র নয়।

একশ'টির উপর সংখ্যক উষ্টের যাকাতে মতভেদ ও তার কারণ

আমরা পূর্বেই বলেছি, উষ্ট্রের সংখ্যা একশটির উর্ধ্বে উঠলে কি হিসেবে যাকাত দিতে হবে, তা নিয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ও জমহুর ফিকাহবিদগণ মনে করেন প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি করে চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্র শাবক দিতে হবে। আর প্রতি চল্লিশটিতে দিতে হবে একটি করে তৃতীয় বর্ষে উপনীত উষ্ট্রী শাবক। হযরত আনাস ও ইবনে উমর বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী হযরত আবূ বকর ও উমর ফারূকের চিঠিতে তা-ই বলা হয়েছে। আর আমর ইবনে হাজম ও হাজারামাউতের প্রতি যিয়াদ ইবনে ওয়ালীদ লিখিত পত্রে রাসূলে করীম (স)-এর কথা উদ্ধৃত হয়েছে।

> একশ' বিশটির উর্ধ্ব সংখ্যক উষ্ট্র হলে প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক যাকাত বাবদ দিতে হবে। আর প্রতি পঞ্চাশটিতে দিতে হবে একটি করে চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক।

কোন কোন বর্ণনায় সংক্ষিপ্তভাবে শুধু বিশেষ কথাটুকু উদ্ধৃত হয়েছে। কেননা নবী করীম (স) ইচ্ছা করেই 'চল্লিশ'টির উল্লেখ ত্যাগ করেছেন। তবে এ বর্ণনাসমূহ পরস্পর পরিপূরক।

হানাফী মাযহাবের মত ও তার পর্যালোচনা

নখ্য়ী, সাওরী ও আবূ হানীফা প্রমুখ ইমাম বলেছেনঃ উষ্ট্র যদি একশ' বিশটিরও অধিক থাকে, তাহলে নতুন করে ফরয সাব্যস্ত হবে অর্থাৎ ছাগল দিয়ে যাকাত দিতে

হবে—প্রতি পাঁচটিতে একটি ছাগী, ২৫টিতে একটি দুই বছর বয়সে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক এমনিভাবে।

তার অর্থ, নিম্নোক্ত তালিকা অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে ঃ

উষ্ট্রের সংখ্যা	চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক	ছাগী
১২৫	২+	১
১৩০	২+	২
১৩৫	২+	৩
১৪০	২+	৪
১৪৫	২+	দুই বছরে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক ১
১৫০	৩	×
১৫৫	৩	১টি ছাগী
১৬০	৩+	২টি ছাগী
উষ্ট্রের সংখ্যা	চতুর্থ বর্ষে উপনীতা শাবক	ছাগী
১৬৫	৩+	৩টি ছাগী
১৭০	৩+	৪টি ছাগী
১৭৫	৩+	দুই বছরে উপনীতা একটি উষ্ট্রী শাবক
১৮৬	৩+	তৃতীয় বর্ষে উপনীতা একটি উষ্ট্রী শাবক
১৯৬	৪	×
২০০	৪	অথবা ৫টি তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক

দুই শতের পর প্রতি পাঁচটি উষ্ট্রের জন্য একটি ছাগী। এমনিভাবে হিসাব চলবে। পঞ্চাশটি পর্যন্ত পৌঁছলে একটি চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক। তার পরে যাকাত দিতে হবে ছাগল দ্বারা। পরে দিতে হবে দুই বছরের উপনীতা উষ্ট্রী শাবক দ্বারা। তার পরে দেবে তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক। পরে আবার সেই চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক।

লক্ষণীয় যে, প্রথমবার নতুন করে যে হিসাব ধরা হয়েছে, একশ বিশটির পর একশ পঞ্চাশটি পর্যন্ত, তাতে তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক ধরা হয়নি।

হানাফী মতের দলীল হচ্ছে, অবূ দাউদে উদ্ধৃত একটি 'মুরসাল' হাদীস। তা ইসহাক ইবনে রাহওয়াই তাঁর মুসনাদ গ্রন্থেও উদ্ধৃত করেছেন। আর তাহাভী বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে সালমাতা থেকে। তিনি বলেছেন ঃ আমি কাইস ইবনে সায়াদকে বললাম ঃ 'আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে গাজমের চিঠিটি দিন। তিনি আমাকে একটি চিঠি

দিলেন। বললেন, এটি তিনি আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজম থেকে গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, নবী করীম (স) আমার দাদার নামে এই চিঠিটি লিখিয়েছিলেন। অতঃপর আমি তা পড়লাম। তাতে উষ্ট্রের যাকাত বাবদ কি দিতে হবে তা লিপিবদ্ধ ছিল।' পরে তিনি গোটা হাদীসটির উল্লেখ করলেন। একশ' বিশটি হলে কি দিতে হবে, তার উল্লেখ ছিল। তার অধিক হলে প্রতি পঁচিশটির জন্য একটি চার বছরে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক দেয়ার কথাও তাতে রয়েছে। এর অধিক হলে প্রথম ফরয অনুযায়ী হিসাব চালাতে হবে।

আর পঁচিশটির কম হলে ছাগল দিতে হবে। প্রতি তিন থেকে দশটি উষ্ট্রের জন্য একটি করে ছাগী দিতে হবে। এই সব সংখ্যা নির্ধারণ শরীয়াতের বিধান, তা কোন লোক কল্পনা করে বলতে পারে না। ইবনে রুশ্‌দ এ কথাটি বলেছেন।[১]

জম্‌হুর ফিকাহ্‌বিদগণ হানাফী মতের উপরিউক্ত দলীল প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের মতেও সব কথা সম্পূর্ণ যয়ীফ, গ্রহণের অযোগ্য। বায়হাকী বলেছেন, 'ইবনে মাস্‌উদ থেকে উপরিউক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্যভাবে বর্ণিত হয়নি।'

আর হযরত আলীর নিজের উক্তি কিনা, এ বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর লিখিত চিঠির সমর্থনে যেমন বর্ণনা এসেছে, তেমনি তার বিরোধী বর্ণনাও উদ্ধৃত হয়েছে। আর কোন হাদীসের বর্ণনায় এরূপ মতভেদ সংঘটিত হলে অন্যান্য বিরোধমুক্ত বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করাই শ্রেয়।

আসমের নিজের বর্ণনায় এমন সব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, যা প্রত্যাহার করা সম্পর্কে সকলেই একমত। যেমন পঁচিশটি উষ্ট্র বাবদ পাঁচটি ছাগী দিতে হবে, দুই বছরে উপনীতা উষ্ট্রীশাবক নয়। তবে হাদীসের সাথে সংগতিসম্পন্ন শুরু থেকেই ফরয ধরা সংক্রান্ত বর্ণনা সম্ভব মনে করা যায়।

আর আমর ইবনে হাজম বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে তাদের মনোভাব হল ঃ

ক. শুরু থেকেই ফরয ধরা অর্থ তা-ই, যা হযরত আবূ বকর ও হযরত উমরের চিঠিদ্বয়ে উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ প্রতি চল্লিশটিতে তৃতীয় বর্ষে উপনীতা একটি উষ্ট্রী শাবক ও প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি করে চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক দেয়া ফরয। এ মতে সমস্ত হাদীস একমত।[২]

খ. বহু লোকই উক্ত হাদীসকে যয়ীফ মনে করেন।

১) কেননা তা হযরত আনাস বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিরোধী।

২) কেননা হযরত আবূ বকর ও উমরের চিঠিদ্বয়ের সাথে সংগতিসম্পন্ন অন্যান্য হাদীসসমূহেরও তা বিপরীত। বায়হাকী প্রমুখ এ সব বর্ণনার উপর আস্থা স্থাপন করেছেন।[৩]

---

১. بداية المجتهد ج ١-ص ٤٣٢

২. نيل الاوطار ج ٤- ص ١.٩

৩. السنن الكبرى ج ٤- ص ٨٩-٩.

৩) যাকাত পর্যায়ে যে মূলনীতি, হাদীসটি তার বিরোধী। আর তা হচ্ছে, যাকাত যে মালের, সেই মালই যাকাত বাবদ গ্রহণ করতে হবে—নিতান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে ভিন্ন কথা। পঁচিশের কম সংখ্যক উষ্ট্রে যেমন হয়। তখন অন্য জিনিস দিয়ে যাকাত আদায় করা যাবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উষ্ট্রের বিপুলতার দরুন ছাগল গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। আরও এ জন্যে যে, পাঁচটির অধিক সংখ্যক উষ্ট্র থাকলে দ্বিতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবকের পরিবর্তে চতুর্থ বর্ষের উষ্ট্রী শাবক দিতে হয়। এটা সামান্য বৃদ্ধি। এ ক্ষেত্রে এরূপ পরিবর্তনের কোন আবশ্যক নেই। একুশটির অধিক হলে প্রথম ফরযের দিকে প্রত্যাবর্তন সর্বসম্মত।

ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, আমর বিন হাজমের চিঠিতে লিখিত কথা হযরত আবূ বকর ও উমর ফারুকের চিঠিদ্বয়ে উল্লিখিত কথা দ্বারা নাকচ হয়ে গেছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা জমহুর ফিকাহ্‌বিদ্‌দের মত গ্রহণ করে তাকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলেছেন। ইমাম শাফেয়ী, আওযায়ী, আহমদ, ইবনে হাম্বল এবং আহ্‌লি হাদীস ফকীহ্‌গণ এই মতই গ্রহণ করেছেন। এঁরা এ ক্ষেত্রে রাসূলের ও তাঁর খলীফাগণের সুন্নাতেরই অনুসারী। তিনটি মতের মধ্যে যেটি মধ্যম বা উত্তম, তাই তারা গ্রহণ করেছেন। আর তা হচ্ছে, বহু সংখ্যক উষ্ট্র থাকলে প্রতি চল্লিশটিতে তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী এবং প্রতি পঞ্চাশটিতে চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী দিতে হবে। কেননা নবী করীম (স)-এর যে দুটি কাজের বিবরণ জানা গেছে, এটি তন্মধ্যে সর্বশেষ আমল। কিন্তু একশ' বিশটির পর নতুন করে ফরযের হিসাব করার মতটি প্রথমে প্রকাশিত। কেননা আমর ইবনে হাজম নাজরানে নিযুক্ত হয়েছিলেন রাসূলে করীমের জীবনের শেষভাগে; মৃত্যুর প্রাক্কালে। আর হযরত আবূ বকর লিখিত চিঠি তো নবী করীম (স) কর্তৃকই শিখানো হয়েছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকরই তা সর্ব প্রথম প্রকাশ করেছেন।[১]

ইবনে তাইমিয়্যা আমর ইবনে হাজমের চিঠিকে দুর্বল বলেন নি। তিনি মনে করেছেন, তা নাকচ হয়ে গেছে। কেননা তা প্রথম দিকের কাজ ছিল। আবূ বকর ও উমরের চিঠি ছিল শেষ পর্যায় সংক্রান্ত বিষয়ে আর নিয়ম হচ্ছে, দুটি মতের মধ্যে সাম স্য বিধান সম্ভব না হলে শেষের মতটি গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় মতটিকে প্রথম মতটির নাকচকারী মনে করতে হবে—অবশ্য যদি প্রথম কোনটি ও শেষে কোনটি তা নির্ভরযোগ্যভাবে জানা যায়।

এ সব কথা থেকেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, দলীলের দিক দিয়ে জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মতই অকাট্য। হানাফী মতের তুলনায় এ মতটির পক্ষে দলীল অনেক বেশী। জমহুর আলিমগণ এ মতই প্রকাশ করেছেন। শেখ আব্দুল আলী বহরুর উলূম উপাধিধারী رسائل الاركان الاربعة গ্রন্থে (১৭০-১৭১পৃঃ) ইবনুল হুমামের

---

১. القواعد لنوونيه ص ৮৭

মতের প্রতিবাদ করেছেন। পরে লিখেছেন ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহ্মদের মতই অধিক গ্রহণযোগ্য।[১]

তাবারীর মত

ইমাম আবূ জাফর তাবারী এক মধ্যম মত গ্রহণ করেছেন। তাতে তিনি উভয় মতকেই সহীহ্ বলেছেন এবং বলেছেন ঃ এ দুটি মতের চরম লক্ষ্যকে অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়।[২]

আমার দৃষ্টিতে এটি একটি উত্তম মত। কেননা একটি মতের দ্বারা অপর মতটি নাকচ হয়ে যাওয়ার ব্যাপার তো তখনই গ্রহণীয় হতে পারে, যখন উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধান অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এক্ষেত্রে তাবারীর সমন্বয় সাধনের মত অবশ্যই গ্রহণীয়। কেনা লক্ষণীয় যে, এ বয়স, পরিমাণ, সংখ্যা ও রকম বা প্রকার নির্ধারণ কাজের সুবিধা ও সহজের জন্যেই তা করা হয়েছে। এতে করে হিসাব করাও সহজসাধ্য, ব্যাপকভাবে কার্যকর করাও সম্ভবপর। এমতাবস্থায় যাকাত দাতা যখনই বাছাই করে কোন একটা করার অধিকারী হবে, তখন তার পক্ষে তা করাও সহজ হবে।

যাকাত সংক্রান্ত পত্রসমূহের মধ্যে সামান্য পার্থক্যের তাৎপর্য

এখানে খানিকটা অপেক্ষা করে একটি বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুন থেকে যাকাত পর্যায়ে যেসব চিঠি বর্ণিত হয়েছে, আমরা সে সবের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য লক্ষ্য করছি। আমরা যে সব বর্ণনার কথাই বলছি, যার সনদ গ্রহণযোগ্য। যয়ীফ ও প্রত্যাখ্যাত সনদে বর্ণিত কথার প্রতি আমরা ভ্রুক্ষেপও করছি না। এই ধরনের একটি বর্ণনা হচ্ছে, হযরত আলীর চিঠি, যাতে লিখিত রয়েছে ঃ যাকাতদাতা যদি কোন এক বয়স অপেক্ষা অধিক বয়সের জন্তু যাকাত বাবদ দিয়ে দেয় তাহলে দশ দিরহাম কিংবা দুইটি ছাগী তাকে ফেরত দিতে হবে।[৩]

হযরত আবূ বকরের চিঠিতে নবী করীম (স)-এর ধার্য করা যাকাত পরিমাণ পর্যায়ে বলা হয়েছেঃ তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, দুটি ছাগী কিংবা বিশটি দিরহাম তাতে ফেরত দিতে হবে। পূর্বে উদ্ধৃত হযরত আনাসের হাদীসেও তা-ই বলা হয়েছে।

হযরত আবূ বকর ও উমরের চিঠিদ্বয়ের বিপরীত কিছু কিছু কথা হযরত আলীর চিঠিতে এসেছে।

এ কথা সত্য, হযরত আলীর কথা নবী করীম (স) থেকে পাওয়া বলে প্রমাণিত হয়নি। এ কথাও সত্য যে, তা হযরত আলীরই কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত আলী নবী করীম (স) -এর লিখিত কথার বিপরীত কথাকে কি করে চালু করলেন?

তাহলে আমরা কি হযরত আবূ বকর ও উমর ফারূক লিখিত চিঠিতে দোষ তালাশ করতে সচেষ্ট হব? অথচ তা অতীব বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হয়েছে?

---

১. المرقاة على المشكواة ج ٣ص ٥١

২. المجموع ج ٥ ص ٤٠٠

৩. المحلى ج ٦ ص ٣٩

অথবা আমরা কি বলব যে, হযরত আলী জানতে পেরেছেন, অন্যান্য চিঠি নাকচ হয়ে গেছে? আর তাঁর মতটাই সুরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন হয়, প্রথম দুজন খলীফার সময়ে তা অপ্রকাশিত থাকতে পারল কি ভাবে?

আসলে এসব সম্ভাবনাই অগ্রহণযোগ্য। আমার দৃষ্টিতে স্পষ্ট কথা হচ্ছে, নবী করীম (স) এসব পরিসংখ্যান ও পরিমাণ নির্ধারণের কাজ করেছেন এই মর্যাদা সহকারে যে, তিনিই মুসলিম উম্মতের উপর নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন। নবী হিসেবে নয়। আর নেতৃত্বের বিশেষত্ব ও অধিকার হচ্ছে সময়, স্থান ও অবস্থার প্রেক্ষিতে জনগণের জন্যে যা-ই সর্বাধিক কল্যাণকর হবে, তা-ই তিনি চালু করবেন; তা কার্যকর করার জন্যে সকলকে নির্দেশ দেবেন। আর সেই সময় স্থান ও অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেল—অথবা এর কোন একটিও পরিবর্তিত হলে সেই অনুপাতে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত ব্যবস্থা চালু করবেন। পক্ষান্তরে যা নবী হিসেবে বলা হবে, তা সংশিষ্ট্য সকলের জন্যে সর্বকালে ও সর্বস্থানে অবশ্য পালনীয়।

শরীয়াতী বিধানে এই যে বিভিন্ন বয়স এবং দুই ছাগী ও বিশ দিরহামের পার্থক্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যদিও এ ধরনের অবস্থায় একই স্থিতিশীল মূল্যের উপর পাথর্ক্য প্রামাণিত নয়; কেননা উষ্ট্র ও ছাগীর মধ্যে সম্পর্ক বা আনুপাতিকতা যদিও প্রমাণিত হয়, কিন্তু দুটি ছাগীর বিশ দিরহাম মূল্য নির্ধারণ কোনক্রমেই প্রমাণিত হয় না। কেননা এতে করে ছাগীর মূল্য অত্যধিক করা হয়েছে। অথবা দিরহামের ক্রয়শক্তি হ্রাস পেয়েছে। এর বিপরীতটা হয়েছে—যেমন একালে সর্বত্র লক্ষণীয়; নবী করীম (স) যখন ছাগীর মূল্য বিশ দিরহাম নির্ধারণ করেছেন, তখন তা করেছেন রাষ্ট্রনেতা হিসেবে চলমান বাজার মূল্যের অনুপাতে। তাই এ ছাড়াও পার্থক্য পরিমাপ করায় কোন বাধা আছে আমরা মনে করি না। কেননা বাজার মূল্য তো পার্থক্যপূর্ণ হয়ে থাকে। সব সময় বাজার মূল্য একই রকম থাকতে পারে না।

এ ভিত্তির উপর নির্ভর করেই রাষ্ট্রনেতা হযরত আলীর পরিমাণ নির্ধারণ কার্যকর হয়েছে। দুই ছাগীর বয়স কিংবা দশ দিরহামের পার্থক্য নির্ধারিত হয়েছে। এতে মনে হয় তাঁর খিলাফত আমলে ছাগলের মুল্য হ্রাস পেয়েছিল। তাই তাতে নবীর আদেশের বিরোধিতার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

চিঠিসমূহের পারস্পরিক পার্থক্যের—কিছু কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপারে পার্থক্যের—এ ব্যাখ্যা বা কারণ বিশ্লেষণ করা এসবের সনদ ও প্রমাণে সংশয় আরোপ করে তা প্রত্যাখ্যান করার পরিবর্তে অনেক উত্তম বলে মনে হয়। ইমাম ইয়াহ্ ইয়া ইবনে মুয়ীন যেমন করেছেন। বলেছেন, যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণের ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ্ প্রমাণিত হয়নি।—এই যেমন উষ্ট্রের বয়স বা পরিসংখ্যান, গরু ইত্যাদির নিসাব। ইবনে হাজম তীব্রভাবে এর প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, তাঁর এ কথাটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কেননা এটা একটা দলীলহীন দাবি মাত্র। আর প্রাচ্যবিদ শাখ্ত্ যেমন করে যাকাত সংক্রান্ত সমস্ত সহীহ্ হাদীসের প্রতিই সংশয় আরোপ করেছেন। অথচ এ হাদীসসমূহ নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত এবং তা থেকে যাকাত ব্যবস্থার বিস্তারিত রূপ প্রমাণিত হয়।

তৃতীয় আলোচনা

গরুর যাকাত

গরু বিশেষ প্রকারের গবাদিপশু। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করে মানুষের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। তার সাথে মানুষের বহু প্রকারের কল্যাণ যুক্ত করে দিয়েছেন। এগুলো যেমন বংশবৃদ্ধির জন্যে পালা হয়, তেমনি চাষাবাদ ও পানি টানার জন্যেও প্রয়োজনীয়। এর গোশ্ত, চামড়া, অস্থি সবই মানুষের কাজে লাগে। আর দেশ, অবস্থা ও প্রয়োজনের পার্থক্যের ভিত্তিতে দুনিয়ার সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়।

মহিষ এ গরুরই পর্যায়ে গণ্য গবাদিপশু। কাজেই এ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য করা চলে না। ইবনুল মুনযির তাই বলেছেন।[১]

আর গরুর যাকাত দেয়া তো সর্বসম্মতভাবেই ফরয। ইজমা ও হাদীস উভয়ই তা প্রমাণ করে।

উল্লেখ্য হাদীস হযরত আবূ যর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন' 'যার মুষ্টির মধ্যে আমার প্রাণ (বা যিনি ছাড়া ইলাহ্ কেউ নেই), যে লোকেরই উষ্ট্রী বা গরু বা ছাগল থাকবে; কিন্তু যাকাত দেবে না, কিয়ামতের দিন তার চাইতে বড় আকারের আকৃতি হয়ে তা আসবে এবং ক্ষুর দিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করবে এবং শিং দিয়ে তাকে আহত করবে। যখন দ্বিতীয়টি আসবে, প্রথমটিকে প্রত্যাহার করা হবে—যতক্ষণ না লোকদের মধ্যে চূড়ান্ত বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে।'

ইমাম বুখারী বলেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, 'যে লোক যাকাত দেবে না, কিয়ামতের দিন তাকে কঠিন ও কঠোর আযাব দেয়া হবে।' কেননা যাকাত হচ্ছে ধন-মালের দেয় হক্। হযরত আবূ বকর এজন্যেই যাকাত দিতে অস্বীকারকারী লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। হযরত উমর ও অন্যান্য সব সাহাবীই এ পদক্ষেপকে যথার্থ বলে সম্মতি দিয়েছিলেন।

সমগ্র মুসলিম সমাজ এ যাকাতের ফরয হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। কোন প্রকার শোবাহ-সন্দেহ এতে নেই। কোন এক যুগেও কোন সামান্য মত-পার্থক্য দেখা দেয়নি। অবশ্য নিসাব নির্ধারণে সামান্য মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।[২]

---

১. المغنى ج ٢ ص ٥٩٤

১. المغنى ج ٦ ص ٥٩١

গরুর যাকাতের নিসাব

একথা সকলেরই জানা যে, ইসলাম সর্বপ্রকারের ধন-মালে তা কম হোক কি বেশী, যাকাত ফরয করেনি। উপরন্তু যাকাত বাবদ খুব কম পরিমাণ মালই ফরয করা হয়েছে। কত পরিমাণ বেশী ধন-মাল থাকলে যাকাত দিতে হবে, তার সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাকেই পরিভাষায় 'নিসাব' বলা হয়। নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুন থেকে বর্ণিত বহু হাদীসেই এ সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে। বলা হয়েছে, পাঁচটি উষ্ট্র থাকলে যাকাত হবে এবং চল্লিশটি ছাগল থাকলে যাকাত দিতে হবে।

তাহলে কত সংখ্যক গরু থাকলে যাকাত দিতে হবে—যার কম হলে যাকাত ফরয হবে না? নবী করীম (স) থেকে এ পর্যায়ে কোন নিসাব নির্ধারণকারী সহীহ্ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়নি। তবে উষ্ট্রের নিসাব ও সংখ্যা এবং ফরযের পরিমাণ স্পষ্ট ভাষায় ও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

হিজাজে অনেক সময় গরুর সংখ্যাল্পতা দেখা দিত। এ কারণে তিনি তাঁর লিখিত ও প্রখ্যাত যাকাত সংক্রান্ত চিঠিপত্রে গরুর যাকাত সম্পর্কে কিছুই লিখেন নি, যেমন অন্যান্য বিষয়ে লিখেছেন। এটাও সম্ভব যে, উষ্ট্রের যাকাতের কথা বলে দেয়াকেই এ পর্যায়ে যথেষ্ট মনে করেছেন। কেননা শরীয়াতের দৃষ্টিতে দুটি একই ধরনের গবাদিপশু। আর এ কারণেই গরুর যাকাতের পরিসংখ্যানে ফিকাহ্‌বিদগণের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রসিদ্ধ কথা—নিসাব সংখ্যা ত্রিশ

চারটি মাযহাবেই সমর্থিত প্রখ্যাত করা হচ্ছে, গরুর নিসাব-সর্বনিম্ন সংখ্যা—ত্রিশ। অর্থাৎ ত্রিশটি গরু থাকলেই যাকাত দিতে হবে। তার কম সংখ্যার জন্যে নয়। আর ত্রিশটি গরু থাকলে ও তার যাকাত বাবদ এক বছর বয়সের একটা বাছুর দিতে হবে। আর চল্লিশটি থাকলে দিতে হবে দুই বছর বয়সের একটা বাছুর। অতঃপর ঊনষাটটি পর্যন্ত আর কিছুই দিতে হবে না। যদি ষাটটি হয়, তাহলে দুটি এক বছর বয়সের বাছুর দিতে হবে। ষাটের পর সত্তরটি হলে একটি দুই বছর বয়সের ও একটি এক বছর বয়সের বাছুর দিতে হবে। আশিটি হলে দুটি দুই বছর বয়সের বাছুর দিতে হবে। নব্বইটি হলে তিনটি এক বছর বয়সের, একশটি হলে একটি দুই বছর বয়সের ও দুটি এক বছর বয়সের এবং একশ' বিশটি হলে তিনটি দুই বছর বয়সের অথবা চারটি এক বছর বয়সের বাছুর দিতে হবে।

এ কথার দলীল হচ্ছে হযরত মুআয থেকে বর্ণিত হাদীস। তিন বলেন ঃ রাসূলে করীম (স) আমাকে ইয়েমেন পাঠালেন এবং আমাকে প্রতি ত্রিশটি গরুর যাকাত বাবদ একটি এক বছর বয়সের ও প্রতি চল্লিশটির জন্যে একটি দুই বছর বয়সের বাছুর গ্রহণ করতে আদেশ করলেন।[১]

---

১. المغني ج ٦ ص ٤٦٨

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে উত্তম এবং ইবনে হাব্বান ও হাকেম এ হাদীসটিকে 'সহীহ' বলেছেন। ইবনে আব্দুল বার্ বলেছেন, এই হাদীসটির সনদ বিঘ্নমুক্ত সহীহ্ এবং সপ্রমাণিত। মুয়াত্তা গ্রন্থেও এই হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে।

তবে ইবনে হাজম এই হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন। কেননা তার মতে বর্ণনাকারী মস্‌রুক হযরত মুআযের সাক্ষাত পান নি। কিন্তু পরে অন্যত্র এই ভুলের সংশোধন করে লিখেছেন যে, মসরুক মুআযের সাক্ষাত পেয়েছেন নিঃসন্দেহে। কাজেই গরুর যাকাত পর্যায়ে এ হাদীস অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

হাফেজ ইবনে হাজর আল-আসকালানী লিখেছেন, গুরুর যাকাত পর্যায়ে হযরত মুআয বর্ণিত হাদীসে বলা কথাই সর্বসম্মত, এই বিষয়ে কোন মতভেদই নেই।

রাসূলে করীমের যে চিঠি আমর ইবনে হাজমের প্রতি লিখিত, তাতেও এ কথাই উদ্ধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, ত্রিশটি গরুতে একটা এক বছরের বাছুর দিতে হবে।

কিন্তু মুআয ও আমর ইবনে হাজম বর্ণিত হাদীসে একথা বলা হয় নি যে, এই ত্রিশটিই সর্বনিম্ন নিসাব। কাজেই ত্রিশটির কম সংখ্যক গরুর যাকাত গ্রহণ করায় উক্ত হাদীসদ্বয়ে নিষেধ নেই।

ইবনে আবদুল বার গরুর উক্তরূপ যাকাত—নিসাব সর্বসম্মত ও তার উপর ইজমা রয়েছে বলে যে দাবি করেছেন তা অগ্রহণযোগ্য। কেননা সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব জুহরী, আবূ কালাবা ও তাবারী প্রমুখ ইমাম ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

হাফেয আবদুল হক্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, গরুর যাকাতের নিসাব পর্যায়ে সর্ব সমর্থিত কোন সহীহ্ হাদীস নেই।

মুআয বর্ণিত হাদীসে একটি কথা অকাট্য যে, গরু চল্লিশটির ঊর্ধ্ব সংখ্যক হলে ষাটটি না হওয়া পর্যন্ত আর কোন যাকাত নেই। মুআয বর্ণনা করেছেন, লোকেরা ভগ্ন সংখ্যার যাকাত নিয়ে এলে তা গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। তিনজন বড় ইমাম, আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও জমহুর আলিমগণ এই মতই সমর্থন করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা থেকে প্রখ্যাত মত পাওয়া গেছে যে, চল্লিশটির অধিক গরুর যাকাতের হিসাব হবে প্রতিটি গরুর জন্যে দুই বছর বয়সের বাছুরের দশ ভাগের এক-চতুর্থাংশ।

হাসান বর্ণনা করেছেন, চল্লিশটির বেশী হলে পঞ্চাশটি না হওয়া পর্যন্ত কোন যাকাত হবে না। পঞ্চাশটি হলে একটি দুই বছর বয়সের বাছুর ও এক-চতুর্থাংশ যাকাত বাবদ দিতে হবে।

ইমাম তাবারীর মতে নিসাব পরিমাণ পঞ্চাশটি

ইমাম আবূ জাফর তাবারী মত দিয়েছেন যে, গরুর নিম্ন সংখ্যক নিসাব হল পঞ্চাশটি। এ পর্যায়ে সুনিশ্চিত ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এতে কোনরূপ

মত-বৈষম্যের অবকাশ নেই। আর তা হচ্ছে, প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি গরু দিতে হবে। তাই তা গ্রহণ করাই জরুরী। আর তার কমে বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে তা ফরয হওয়ার পক্ষে কোন অকাট্য দলীল নেই। ইবনে হাজম ইমাম তাবারীর এই মত গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, এ ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছে এবং ফরয হওয়ার পক্ষে কোন দলীল নেই, তার ভগ্নাংশ করার পক্ষেও কোন কথা বলা হয়নি। কেননা তাতে মুসলিম ব্যক্তির মাল ফরয যাকাত বাবদ গ্রহণ করা হয় নিশ্চয়তাবিহীনভাবে। কেননা তার পক্ষে কুরআন বা সুন্নাহর কোন অকাট্য দলীল নেই।

ইবনে হাজম এ মতের সমর্থনে আমর ইবনে দীনার বর্ণিত একটি কথার উল্লেখ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, ইবনে যুবায়র ও ইবনে আউফের কর্মচারীরা প্রতি পঞ্চাশটি গরুর যাকাত বাবদ একটি গরু গ্রহণ করতেন। আর প্রতি একশটির জন্যে গ্রহণ করতেন দুটি গরু। তার অধিক হলে প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি গরু নিতেন। এ কাজটি সাহাবাগণের উপস্থিতিতেই করা হয়েছে; কিন্তু তাঁরা এর প্রতিবাদ করেন নি।

এই মতের উপর দুটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমটি হাদীসের বর্ণনার দৃষ্টিতে, আর দ্বিতীয়টি বিবেচনার দৃষ্টিতে ঃ

ক. আমর ইবনে হাজমের সাদকা ও দীয়ত পর্যায়ে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি এক বছর বয়সের বাছুর দিতে হবে। আর প্রতি চল্লিশটিতে একটি গরু। বাহু সংখ্যক ইমাম এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

হযরত মুআয বর্ণিত হাদীসেও প্রতি ত্রিশটি ও প্রতি চল্লিশটির উপর যাকাত ধার্য করা হয়েছে। এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

খ. বিবেচনার দৃষ্টিতে প্রশ্ন উঠে, শরীয়াতের হুকুম-আহ্কাম কারণের উপর ভিত্তিশীল। তার লক্ষ্য মানবতার কল্যাণ। এ দৃষ্টিতে এটাই স্বাভাবিক যে, সুবিচারক শরীয়াত প্রতি পাঁচটি উষ্ট্রে ও প্রতি চল্লিশটি ছাগলের উপর যাকাত ধার্য করবে এবং পাঁচটির কম গরুর উপর যাকাত ধার্য করবে না। কেননা তা ঠিক উটের মত না হলেও ছাগলের তুলনায় অধিক উপকারী ও কল্যাণদায়ক।

ইবনুল মুসায়্যিব ও জুহ্রীর মত

সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব জুহারী ও আবূ কালাবা প্রমুখ ইমাম মত প্রকাশ করেছেন যে, উষ্ট্রের নিসাবই গরুর নিসাব। গরুর যাকাত বাবদ তা-ই গ্রহণ করা হবে, যা উষ্ট্রের যাকাত বাবদ গ্রহণ করা হয়। তবে উষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেমন বয়সের শর্ত রয়েছে, তেমন কোন শর্ত এক্ষেত্রে নেই। এ কথাটি যাকাত পর্যায়ে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব লিখিত চিঠির বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, গরুর যাকাত বাবদ তা-ই গ্রহণ করা হবে, যা গ্রহণ করা হবে উষ্ট্রের যাকাত বাবদ। অন্যান্য মনীষীদেরও এ মতই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) বলেছেন ঃ প্রতি পাঁচটি গরুর যাকাত বাবদ একটি ছাগী দিতে হবে, প্রতি দশটিতে দুটি ছাগী, পনেরটিতে তিনটি ছাগী এবং বিশটিতে চারটি চাগী। জুহ্রীর মতে গরুর ফরয যাকাত উষ্ট্রের মতই। তবে তাতে বয়সের কোন শর্ত নেই। পঁচিশটি গরু হলে একটি গরু দিতে হবে । এ হিসাব পঁচাত্তরটি পর্যন্ত চলবে। তার অধিক হলে একশ বিশটি পর্যন্ত দুটি গাভী দিতে হবে। তার অধিক হলে প্রতি চল্লিশটিতে একটি গাভী দিতে হবে। একটি বর্ণনায় ইয়েমেনবাসীদের জন্যে পরিমাণ হালকা করে প্রতি ত্রিশটিতে একটি এক বছর বয়সের শাবক এবং প্রতি চল্লিশটিতে একটি গাভী দিতে হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইকরামা ইবনে খালিদ বলেছেন, আমাকে যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরে আমি যাকাত দাতাদের সাথে সাক্ষাত করি। এটা নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশার কথা। তারা আমাদের কাছে বিভিন্ন মত প্রকাশ করে। কেউ বলে, উষ্ট্রের যা, গরুর যাকাত তা-ই গ্রহণ করুন। কেউ বলে, প্রতি চল্লিশটি গরু বাবদ দুই বছরের একটি বাছুর গ্রহণ করুন। উমর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খালদাতাল্ আনসারী থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, গরুর যাকাত উষ্ট্রের যাকাতের মতই।

এই মতের দলীল

ক. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন ঃ নবী করীম (স) ও উমর ইবনুল খাত্তাব লিখিত যাকাত সংক্রান্ত চিঠিতে বলা হয়েছে ঃ গরুর যাকাত বাবদ তা-ই গ্রহণ করা হবে, যা গ্রহণ করা হয় উষ্ট্রের বাবদ। মা'মার থেকে বর্ণিতঃ সামাক ইবনুল ফযল আমাকে নবী করীম (স)-এর একটি চিঠি দিলেন যা মালিক ইবনে কুফলাসের কাছে লেখা হয়েছিল তাতে আমি পড়লাম ... গরুতে তা-ই, যা উষ্ট্রে ...।

খ. ইমাম জুহরী বলেছেন, এটাই রাসূলে করীম (স)-এর সর্বশেষ কথা। প্রথম কথা ছিল, প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটা এক বছরের বাছুর। এটা ইয়েমেনবাসীদের জন্যে সহজকৃত হার ছিল। এটি 'মুরসাল' হাদীস হলেও পূর্বোদ্ধৃত হাদীস ও সাহাবিগণের কথা এর সমর্থক। ইবনে হাজম বলেছেন, কারোর 'মুরসাল' হাদীস গ্রহণ করা হলে ইমাম জুহরীর 'মুরসাল' অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কেননা তিনি হাদীস সম্পর্কে বড়ই পারদর্শী। আরও এজন্যে যে, তিনি বহু সংখ্যক সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন।

গ. পূর্বে যে সাধারণ অর্থবোধক হাদীসটি আমরা উদ্ধৃত করেছি (যাতে বলা হয়েছে, 'যে গরু-মালিক যাকাত দেবে না, কিয়ামতের দিন তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে') তা প্রত্যেক গরু সম্পর্কেই বক্তব্য। তবে বিশেষ কোন দলীল কিংবা ইজমা যদি এর বিপরীত হয়, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা বলেছেন, অন্যেরা যদি অপর হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন তা হলে আমরা এ

হাদীসটিকে দলীল মনে করব। আর হাদীসে ত্রিশটির কম সংখ্যক গরুতে যাকাত না হওয়ার কথার উল্লেখ নেই। এ কথার কোন দলীলও নেই।

ঘ. গরুকে উষ্ট্রের মত গবাদিপশু মনে করা হলে উক্ত মত অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফিকাহ্‌বিদগণ বলেন, একটি উষ্ট্রে যেমন সাত জন লোকের কুরবানী চলে, তেমনি একটি গরুতেও চলে। যদিও অনেকে আমাদের সাথে একমত নয়। তাই উষ্ট্রের যাকাত যা, গরুর যাকাত তা-ই।

ইবনে হাজম এ মতের বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁর মতে এ পর্যায়ে রাসূল থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের সনদ তিনি পর্যন্ত পৌঁছেনি। এ কারণে তা দলীল হিসেবে গ্রহণীয় হতে পারে না।

সাধারণ অর্থবোধক যে হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে, তা হানাফী ও মালিকী মায্‌হাব অনুসারীদের জন্যে বাধ্যতামূলক। তা সব গরুর ক্ষেত্রেই সমান। আর ও দলীল এই যে, কুরআনের আয়াত—তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর' সাধারণ অর্থবোধক বিধায় মধুতেও যাকাত ফরয হয়। এ কারণে হানাফী মত-অনুসারীদের জন্যে তা বাধ্যতামূলক। কিন্তু তা আমাদের উপর বাধ্যতামূলক নয়। কেননা দলীলের সাধারণ বোধগম্য অর্থ স্বীকার করেও আমাদের মত হল, তা শরীয়াতের কোন বিধানরূপে স্বীকৃত হতে পারে না। কিন্তু পাঁচটি গরুতে যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) থেকে কোন সহীহ্ দলীল প্রমাণিত হয় না।

উষ্ট্রের যাকাত-নিসাব অনুরূপ গরুর যাকাত-নিসাব নির্ধারণ এই মতে বিশ্ববাসীদের জন্যেই বাধ্যতামূলক হতে পারে । কোন কিয়াস যদি 'সহীহ্ হয়ই, তা হলে এটাকে অবশ্যই সহীহ্ মানতে হবে। আর উষ্ট্র ও গরু সংক্রান্ত শরীয়াতী হুকুমে কোন সর্বসম্মত পার্থক্য আছে বলে আমরা জানতে পারিনি; ইবনে হাজম এতদূর বলেছেন যে, তাদের এ দলীল আমাদের উপর প্রযোজ্য থাকেনি। কেবলমাত্র হানাফী, মালিকী ও শাফেয়ী মাযহাবের লোকদের জন্যেই তা বাধ্যতামূলক।

মাযহাবপন্থী আলিমগণ এ মতের প্রতিবাদ করে বলেছেন, উপরিউক্ত মতে উষ্ট্রের উপর গরুকে 'কিয়াস' করা হয়েছে। কিন্তু নিসাব কখনও কিয়াসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যায় না। তা হবে অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে। কিন্তু তাঁরা কোন দলীলের উল্লেখ করতে পারেন নি বলে তা অপ্রমাণিত। ইবনে কুদামাহ্ বলেছেন এ কিয়াস গ্রহণের অযোগ্য। কেননা পঁয়ত্রিশটি ছাগল কুরবানীর ক্ষেত্রে পাঁচটি উষ্ট্রের সমান হয়। আর তাতে যাকাত নেই, যেমন মুআয সংক্রান্ত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

ভিন্নমত

ইবনে রুশ্‌দ ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। আর তা হল প্রতি দশটি গরুতে একটি ছাগী দিতে হবে। ত্রিশটি পর্যন্ত তাই চলবে। ত্রিশটিতে দিতে হবে একটি দুই বছরের বাছুর।

ইবনে আবূ শায়বা'র 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ প্রতি দশটি গরুতে একটি করে ছাগী, প্রতি বিশটি গরুতে দুটি ছাগী এবং প্রতি ত্রিশটিতে একটি দুই বছরের বাছুর দিতে হবে।

এ কথার অর্থ, দশটিই হল গরুর নিসাব পাঁচটি নয়। ইবনে আবূ শায়বা এ কথার পক্ষে কোন দলীলের উল্লেখ করেন নি।

আমি মনে করি, উক্ত কথার দলীলরূপে সেসব হাদীসই গণ্য করা যেতে পারে, যা দীয়তের পরিমাণ পর্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। আর তা হচ্ছে একশ'টি উষ্ট্র অথবা দুইশ'টি গরু।

হযরত উমরের কথা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীমের উক্তিরূপেই উদ্ধৃত হয়েছে যে, একটি উষ্ট্র দুটি গরুর সমান। তাই উষ্ট্রের যখন একটি ছাগী, তখন প্রতি দশটি গরুতে একটি ছাগী যাকাত বাবদ দিতে হবে।

প্রাসঙ্গিক কথা

উপরে উদ্ধৃত বিভিন্ন মতের প্রেক্ষিতে আমি মনে করি, জমহুর ফিকাহ্‌বিগণ যে ত্রিশ-চল্লিশ ও তদূর্ধ্ব সংখ্যার মত দিয়েছেন, উপরিউক্ত মতসমূহের মধ্যে তা-ই অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযোগী। এই পর্যায়ে দলীল হচ্ছে, হযরত মুআয ও আমর ইবনে হাজম বর্ণিত হাদীস। তবে ত্রিশের কম সংখ্যকের ব্যাপারে হাদীস দুটির পক্ষের বা বিপক্ষের কিছুই নেই। কেননা এ হাদীস দুটি আগেই বলে দিয়েছে ফরযের পরিমাণ ও তার পরিচয়। অতএব তা নিসাব—বর্ণনার অধিক।

আমর ইবনে হাজম বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, প্রতি চল্লিশ দীনারে এক দীনার যাকাত। কিন্তু তাই বলে জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ বিশ দীনারের যাকাত গ্রহণ করতে নিষেধ করেন নি। কেননা হাদীসটি পরিমাণের উল্লেখ করেছে, নিসাব নয়।

কাজেই ইবনুল মুসাইয়্যির, জুহ্‌রী ও তাঁদের সমর্থক অপরাপর তাবেয়ী ফিকাহ্‌বিদগণ পাঁচটি গরুর যে নিসাব নির্দিষ্ট করেছেন, তা গ্রহণ করার বড় সুযোগ রয়েছে।

বিশেষ করে তা হযরত উমর লিখিত যাকাত সংক্রান্ত চিঠিতে বর্ণিত হয়েছে। সহাবীদের মধ্যে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্‌ও রয়েছেন। বরং তাঁর সম্পর্ক রাসূলে করীম (স) -এর চিঠির সাথে।

যদিও আবূ উবাইদ বলেছেন যে, তা অসংরক্ষিত। লোকেরা তা জানে না। কিন্তু সাহাবী ও তাবেয়িগণ তা জানেন।

সর্বোপরি, উষ্ট্রের উপর ধারণা করে গরু সম্পর্কে নীতি গ্রহণ একটি পন্থা। এটাই ইবনে হাজমের কথা—'কিয়াস অগ্রহণযোগ্য—, তার কোন গুরুত্বই নেই'।

সুতরাং মুসলিম উম্মতের অধিকাংশ লোকের মতই ঠিক। তা হচ্ছে, 'সহীহ্ কিয়াস্ ইসলামী শরীয়াতে একটা মৌল ভিত্তিরূপে গ্রহণযোগ্য, তা ইসলামী আইন প্রণয়ণের উৎসেরও কাজ করে, যতক্ষণ তা কোন সহীহ্ দলীল বা প্রতিষ্ঠিত নিয়মের পরিপন্থী না হয়। তবে কোন কোন হাদীসে যেমন রয়েছে, একটি উষ্ট্রকে দুটি গরুর সমান মনে করা—যেমন দীয়তে করা হয়েছে—এর দরুন এই কিয়াসটি দুর্বল হয়ে যায়।

এই গ্রন্থকারের ধারণা, যাকাতের নিসাব ও তার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাসূলে করীম (স) ইচ্ছা করেই অনেক কথা অ-বলা রেখে গেছেন। তা অকাট্য ও সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করে যান নি। যেন মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালকদের পক্ষে নীতি নির্ধারণ সহজতর হয়। তাঁরা যেন স্থান, সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে জনগণের জন্যে সুবিধাজনক কোন নীতি নির্ধারণ করবার সুযোগ পান।

কেননা রাষ্ট্রনায়কগণ অনেক সময় অনেক দেশে উষ্ট্রের তুলনায় গরুর মূল্য বেশী দেখতে পান। কল্যাণ ও বংশবৃদ্ধির দিক দিয়েও তা অধিক উত্তম বলে মনে হয়। এ যুগে বিশ্বের অনেক দেশেই এরকম গরু দেখা যায়। অতএব এখানে পাঁচটির দ্বারা নিসাব ঠিক করা সম্ভব এবং তাতে একটি ছাগী, দশটিতে দুটি ছাগী এবং বিশটিতে চারটি ছাগী যাকাত বাবদ ফরয ধরা যেতে পারে। তার পর হযরত মুআয বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী কাজ করা যায়। আর যেখানেই এ ধরনের গরুর মালিকানা থাকবে সেখানেই এ মত অগ্রাধিকার পাবে—যেতে পারে।

কিন্তু যেখানে গরুর মূল্য নিম্নতম হবে, কল্যাণের দিক দিয়ে সামান্য হবে, যেখানে পাঁচ বা দশটির মালিকানায় কেউ ধনী গণ্য হবে না, সেখানে ত্রিশটিতে নিসাব নির্ধারণ করাই যুক্তিসঙ্গত। ইমাম জুহ্রীর ত্রিশটির নিসাব নির্ধারণ সংক্রান্ত মতের তাৎপর্য এভাবেই বোঝা যায়। তা ছিল ইয়েমেনবাসীদের জন্যে হালকা পরিমাণ। জুহরীর কথা যদি সহীহ্ই হয় তবু তা প্রচলিত অর্থে নাকেছকারী হয়নি। নবী করীম (স) তা করেছেন মুসলিম জনগণের নেতা ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে। তিনি তো পরিবর্তনশীল যুগ, অবস্থার সাথে সংগতি বিধানস্বরূপ এ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। আর কালের ও অবস্থার পরিবর্তনে আইনের পরিবর্তন হয়ে যায়, এটা সর্বাবাদীসম্মত। নবী করীম (স) মুসলিম নেতা হিসেবে যা বলেছেন বা করেছেন, তা নবী হিসেবে কথা বা কাজ থেকে ভিন্নতর। এ দু'য়ের মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

চতুর্থ আলোচনা

ছাগলের যাকাত

ছাগলের যাকাত ফরয। তা সুন্নাত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত। হাদীসের দলীলটি পূর্বোদ্ধৃত হযরত আবূ বকরের চিঠিতে উল্লিখিত হয়েছে, ছাগলের যাকাত হচ্ছে, যখন তার সংখ্যা চল্লিশটি হবে, তখন তার যাকাত দিতে হবে একটি ছাগী; একশ' বিশটি পর্যন্ত তা চলবে। তার অধিক হলে দুইশ'টি পর্যন্ত দুটি ছাগী দিতে হবে। তার উপর এক থেকে তিনশ'টি পর্যন্ত তিনটি ছাগী দিতে হবে। তিনশ'টির উর্ধ্বে হলে প্রতি একশ'তে একটি ছাগী। আর চল্লিশটির একটি কম হলেও যাকাত দিতে হবে না। তবে মালিক ইচ্ছা করে দিলে অন্য কথা। ইবনে উমর বর্ণিত ও অন্যান্য বহু হাদীসেই এরূপ কথা রয়েছে।

ছাগলের যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বোদ্ধৃত হাদীস অনুযায়ী যাকাত পরিমাণের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

হইতে	পর্যন্ত	ফরযের পরিমাণ
১	২৯	কিছুই নয়
৪০	১২০	একটি ছাগী
১২১	২০০	দুটি "
২০১	৩৯৯	তিনটি "
৪০০	৪৯৯	চারটি "
৫০০	৫৯৯	পাঁচটি "

অতঃপর প্রতি একশ'টিতে একটি ছাগী।

যাকাত বাবদ যে ছাগল গ্রহণ করা হবে তা স্ত্রী হবে, না পুরুষ? কি তার বয়স হওয়া উচিত? ভাল মন্দের দিক দিয়ে তার গুণাগুণ কি রকম হবে?

এই পর্যায়ে গবাদিপশুর যাকাত সংক্রান্ত আলোচনা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

বহু সংখ্যক ছাগলে যাকাত ফরয হয় কেন

লক্ষ্য করা যায়, যাকাত ফরয হওয়া ছাগল সংখ্যায় অনেক বেশী। তাতে মালিকের প্রতি অনেক সহজতর বিধান করা হয়েছে। কিন্তু অন্য কোন ক্ষেত্রে এরূপ সহজতা লক্ষ্য

করা যায় না। দেখা যায় একশ'তে একটি ফরয করা হয়েছে। যদিও মূলধনের প্রচলিত যাকাত হার হচ্ছে একশ'তে ২.৫ অর্থাৎ দশ-এর চারভাগের এক ভাগ। এর কারণ বা যৌক্তিকতা কি?

এ পর্যায়ের আলোচনাকারীদের মেধ্যে কেউ কেউ এ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন যে. এরূপ নীতি নির্ধারণ করে ইসলামী শরীয়াত জৈব-সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে উৎসহ প্রদান করতে চেয়েছে। এ কারণে যাকাতের পরিমাণ খুবই হালকা রাখা হয়েছে। আর তাতে চক্রবৃদ্ধি হারে করও ধার্য করা হয়েছে, যেন এই গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়।

কিন্তু এ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করা হয়েছে এই বলে যে, এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী কোন প্রকারের পশু সম্পদে গৃহীত হয়নি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, উষ্ট্র বেশী সংখ্যক হলে প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক দিতে হয়। অপরদিকে প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি এক বছর বয়সের বাছুর, আর প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি করে দুই বছরের বাছুর দিতে হয়—স্ত্রী কি পুরুষ অর্থাৎ দশের এক-চতুর্থাংশ, একশটিতে ২.৫ প্রায়। আর মূলধনের যাকাতের সাধারণ হারও হচ্ছে তাই।

এই কারণ ও যুক্তি প্রদর্শন যদি সহীহ্ হয়ে থাকে, তাহলে উষ্ট্র ও গরুতেও তা অবশ্য প্রকাশিত হবে। কিন্তু তা যখন হয়নি, তখন ছাগলের যাকাত সংক্রান্ত অপর একটি ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা আবশ্যক।

আমার দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা হচ্ছে, ছাগল বিপুল সংখ্যক হলে তাতে বহু সংখ্যক ছোট বয়সেরও থাকে। কেননা তা বছরে বহুবার জন্ম নেয়, একবারে একাধিক সংখ্যায় জন্মায়। এগুলোও মালিকের সম্পদরূপে গণ্য হয়, কিন্তু তা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয় না। পঞ্চম ও ষষ্ঠ আলোচনায় এ পর্যায়ে বিস্তারিত কথা বলা হবে।

ছাগলের ব্যাপারে এই কারণেই এই হালকা ব্যবস্থা অর্থাৎ যাকাতের চাপ খুবই কম রাখা হয়েছে। সুবিচার ও ন্যায় পরায়ণতার প্রতিষ্ঠাই এ ক্ষেত্রে শরীয়াতের লক্ষ্য—অন্যথায় প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে যাকাত ফরয হলে—যেমন গরু ও উষ্ট্রে রয়েছে—বহু সংখ্যক ছোট বয়সের ছাগল থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ না হলে—ছাগলের মালিকদের প্রতি খুবই অবিচার করা হয়। গরু ও উষ্ট মালিকদের তুলনায় তা হত অধিক।

প্রথম চল্লিশটিতে একটি ছাগী ফরয করা হয়েছে এ শর্তে যে, সেই সবগুলো বেশী বয়সের হবে।

এ প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যাকাত একটি প্রমাণিত আপেক্ষিক কর। তার হার না বৃদ্ধি পায়, না হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মালিকী মনীষী শায়খ জওরাক্ বলেছেন ঃ ধন-সম্পদ অধিক হলে তাৎসংক্রান্ত দায়-দায়িত্বও বেশী হয়ে থাকে; মনের উপরও একটা ভীতি ভয়ংকর হয়ে চাপে। এই কারণে যাকাত কম হয়। এটা মালিকের প্রতি একটা অনুকম্পা। এ কারণে নগদ অর্থ সম্পদের দশ ভাগের এক-চতুর্থাংশ দেয়া হয়।

কিন্তু শায়খ মালেকীর এই কারণ দর্শানোর তাৎপর্য আমি বুঝে উঠতে পারিনি। সাধারণ ধারণা এই যে, ধন-সম্পদ বেশী হলে ভাবনা-চিন্তা কম হয়, ব্যয়ভার হালকা হয়। এ কারণে বিভিন্ন প্রকারের গবাদিপশুর মালিকরা সব মিলিয়েই রাখে ও হিসাব করে থাকে। তাদের খরচাদি কম পড়ে। সেজন্য একই রাখাল ও তার একই থাকার স্থান যথেষ্ট হয়ে থাকে। বর্তমানে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ একটা সুনির্দিষ্ট ব্যাপর। এ একটা বিশেষ উৎপাদন পন্থাও বটে। উৎপাদন ব্যবস্থায় যতটা প্রশস্ততা আসবে প্রতিষ্ঠানগত কষ্ট ও ব্যয় ততই কম হবে। এ কারণে ছোটখাটো উৎপাদকরা বড় বড় উৎপাদকদের সাধারণত ভয় করে থাকে। ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটা ভীতি সব সময়ই বোধ করে; কেননা তাতে উৎপাদন ব্যয় খুবই কম হয়ে থাকে।

বস্তুত উপরে যে কারণ দর্শানো হয়েছে, তা যদি সঠিক হয় তাহলে তা সর্বপ্রকারের ও সর্ব সংখ্যক গবাদিপশুর ক্ষেত্রেই সঠিক বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা হয়নি।

বিপুল ধন-মালের ভয় মনে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারটিত অনুরূপ। যা সে ধন-মলের মালিকের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে বলে বলা হয়েছে, তাও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তা যদি সহীহ্ হত, তা হলে তা সকল প্রকার গবাদিপশু ও সাধারণ ধন-মাল সম্পর্কেই দেখা যেত। কেননা মিলিয়ন পরিমাণ ধন-মালের মালিক নিশ্চয়ই হাজার পরিমাণ ধন-মালের মালিকের সমান নয়। তাই তার ক্ষেত্রে ফরয ধার্যকরণে অধিক হালকা নীতি গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আসলে আমরা উপরে যে কারণের কথা বলেছি, তা-হচ্ছে সবদিক দিয়ে উত্তম।

পঞ্চম আলোচনা

ছোট গবাদিপশুর কি যাকাত দিতে হবে

ছোট উষ্ট্র, ছোট গরু ও ছোট ছাগলের কি যাকাত দিতে হবে? মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, সুয়াইদ ইবনে গাফলাতা বলেন, রাসুল (স)-এর পক্ষ থেকে যাকাত আদায়কারী এলে আমরা তার পার্শ্বে বসলাম। তখন তাকে বলতে শুনেছি, 'দুগ্ধপোষ্য শাবকের যাকাত গ্রহণ না করাই আমার দায়িত্ব।'

এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ছোট বয়সের পশু শাবকের যাকাত গ্রহণ করা হবে না। বেশ কয়জন ইমাম এই মতই পোষণ করেন। কিন্তু আসলে উপরিউক্ত হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বিভিন্ন কথা রয়েছে।

হযরত উমর তাঁর নিয়োজিত যাকাত আদায়কারী সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সাকাফীকে বলেছেনঃ 'রাখালেরা যেসব পশু শাবক হাতে ধরে লালন করে, তাও গণনা কর।' শাফেয়ী এবং আবু উবাইদও এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

এই উক্তিটি পূর্বোদ্ধৃত হাদীসের বিপরীত কথা প্রমাণ করে অর্থাৎ ছোট বয়সের পশুরও নিসাব গণনা করতে হবে এবং তা থেকে যাকাত নিতে হবে।' বেশ কয়েকজন ফকীহও এই মত পোষণ করেন। অন্যান্যরা হযরত উমর ও সুয়াইদ বর্ণিত হাদীসকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন এবং কেবলমাত্র ছোট বয়সের পশু শাবক হলে তার যাকাত গ্রহণ না করার মত দিয়েছেন। তবে সেগুলোর সাথে মায়েরা থাকলে সে সবকেও গণনা করার কথা বলেছেন।

কেউ কেউ শর্তারোপ করেছেন যে, মায়েদের সংখ্যা নিসাব পরিমাণ হতে হবে। নিসাবের অতিরিক্ত বাচ্চাদের গণনা করা হবে। তাদের সম্পূর্ণরূপে হিসাব থেকে বাদ দেয়া চলবে না। ইবনে হাজম প্রমুখ এই মত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ীও এই মতই সমর্থন করেছেন। সকল মতের মধ্যে এই মতটি আমার কাছেও অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী। যথার্থতা ও সুবিচারের দৃষ্টিতেও তা গ্রহণীয়।

কেননা অল্প মালের মালিকদের নিষ্কৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে শরীয়াতের যে যুক্তিপূর্ণ নীতি, তা প্রযোজ্য হবে যাকাত পরিমাণে কম হলে। তাই পাঁচটি উটের বাচ্চা বা চল্লিশটি ছাগল ছানা হলে তা থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে না। কেননা এই মালের মালিক কখনই ধনী গণ্য হতে পারে না। এমতাবস্থায় তার উপর যাকাত ধার্য হলে তার প্রতি জুলুম করা হবে। অতএব যাকাত পরিমাণের অতিরিক্ত হলে তাতে ছোটগুলোকেও গণ্য

করা হবে ও তা থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে। কেননা শরীয়াত পশুর মালিকের যাকাত দানের বোঝা অনেকটা হালকা করে দিয়েছে এবং তাদের খুব বেশী সুবিধা দান করেছে। এই কারণে নিসাব অধিক হলে সেই অধিকের হিসাব যাকাত ধার্য করেনি; বরং দুই নিসাব পরিমাণের মধ্যবর্তী সংখ্যার উপর যাকাত ধার্যকরণ রহিত করেছে। যেমন পাঁচটি উট হলে একটি ছাগল দেয়া ফরয, নয়টা হলেও একটি। পঁচিশটি হলে দুই বছরে উপনীতা একটি উষ্ট্রী শাবক—পঁয়ত্রিশটি পর্যন্ত তাই চলবে। ছত্রিশটি হতে পঁয়তাল্লিশটি পর্যন্ত তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক দিতে হবে। এ ভাবে দুই ফরয পরিমাণের মাঝখানের সংখ্যার উপর কোন যাকাত দিতে হবে না।

এই ক্ষমার তত্ত্ব হচ্ছে—যা আমার মনে আসে—বিপুল সংখ্যক ছোট ছোট বয়সের পশু থাকে বলেই এরূপ করা হয়েছে।

ছাগলের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি অধিকতর স্পষ্ট। কেননা ছাগল বছরে বহু সংখ্যক বাচ্চা দান করে থাকে। এই কারণে তাতে যাকাত মাফের ব্যাপারটিও বহু ব্যাপক। প্রথম চল্লিশটিতে একটি—একশ' বিশটি পর্যন্ত, তার অধিক হলে দুইটি ছাগল। আর তিন শতাধিক হলে প্রতি একশ'টিতে একটি দিতে হয়।

ষষ্ঠ আলোচনা

গবাদিপশুর যাকাত বাবদ কি গ্রহণ করা হবে

গবাদিপশুর মালিক যাকাত বাবদ যা দেবে এবং যাকাত আদায়কারী যা গ্রহণ করবে, তাতে নিম্নোক্ত দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

১. তা দোষত্রুটি মুক্ত হবে। কোনটি যেন রোগাক্রান্ত বা অঙ্গহীন না হয়। দাঁতপড়া বৃদ্ধও যেন না হয়। এমন না হয় যে, তারা দ্বারা কোন ফায়দাই হয় না, কোন কাজেই লাগে না, কোন দামেই বিক্রয় করা যায় না।

তার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ঃ

وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ- (البقره ٢٦٧)

তোমরা খারাপ জিনিসের উপর লক্ষ্য আরোপ করো না এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তা আল্লাহ্‌র জন্যে ব্যয় করবে।

নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

যাকাত বাবদ দাঁতপড়া বৃদ্ধ, কানা-খোড়া বা ফুরিয়ে যাওয়া জন্তু দেবে না—যাকাত গ্রহণকারী তা নিতে রাযী হলে ভিন্ন কথা।

কেননা এ ধরনের ত্রুটিযুক্ত জন্তু গ্রহণ করা হলে তাতে দরিদ্র লোকদেরই ক্ষতি। এ জন্যে যে, তা তো তাদেরই প্রাপ্য, অতএব তা যাকাত বাবদ দেয়া জায়েয নয়।

আর ত্রুটিযুক্ত বলতে বোঝায়, যা ক্রয়-বিক্রয়ে অচল। যার কুরবানীও চলে না।

কেবলমাত্র তখনই ত্রুটিযুক্ত গ্রহণ করা চলবে, যদি যাকাত দেয়ার সমস্ত মালই তেমন হয়, তখন আদায়কারী তা থেকেই গ্রহণ করবে।

২. স্ত্রী পশু হওয়া দরকার। এজন্যেই দুই বছরে উপনীতা, তিন বছরে উপনীতা বা চার বছরে উপনীতা উষ্ট্রী শাবকের কথা বলা হয়েছে। তবে কোথাও হাদীসে যদি পুরুষ পশুর কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে তা গ্রহণ করা চলবে। হানাফী মতে মূল্য ধারণের দিক দিয়ে পুরুষ পশুও গ্রহণ করা চলে। কেননা এ মতে যাকাত বাবদ দেয় জন্তুর মূল্যও আদায় করা যায়। গরুর যাকাত বাবদ প্রতি ত্রিশটিতে একটি 'তবী' বা তবীয়া (প্রথম বছরের বাছুর) গ্রহণের দলীল রয়েছে। এ পর্যায়ে কোন বিরোধ দেখা দেয়নি। পুরুষ পশু গ্রহণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে বটে। জমহুর ফিকাহবিদগণ

বলেছেন, তা জায়েয নয়। হানাফী মতের ফিকাহবিদগণ জায়েয বলেছেন। কেননা তাঁদেরর মতে পুরুষ ও স্ত্রী পশুর মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। তাঁদের দলীল হচ্ছে ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসঃ প্রতি ত্রিশটিতে একটি 'তবী' (এক বছরে বাছুর), প্রতি চল্লিশটিতে একটি দুই বছরের বাছুর—স্ত্রী বা পুরুষ। হানাফী মতে উভয়ই গ্রহণ করা চলে। কেননা এ দুইয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। শরীয়াতের বিধানদাতা একটি ছাগল দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তার অর্থ কেবল স্ত্রী ছাগল নয়, পুরুষ ছাগল মালিকী মাযহাবে ছাগলে দুই বছর বয়সের ছাগল ছানা (جذع) কিংব স্ত্রী-ছানা (جذعة) দিতে হবে। আর হাম্বলী মতে নিসাবে স্ত্রী পশু থাকলে পুরুষ পশু গ্রহণ করা জায়েয নয়।—যেমন উটের ক্ষেত্রে শরীয়াত নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন ঃ 'যাকাত আদায়কারী যদি মনে করে যে, পুরুষ পশু গ্রহণ করা অধিক লাভজনক, তাহলে তার পক্ষে তা গ্রহণ করা জায়েয। কেননা হাদীসে তাকে এ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

ইমাম নববী বলেছেন, পুরুষ পশু যাকাত বাবদ দেয়ার দুটি দিক। সর্বাধিক সহীহ্ দিক হল তা জায়েয। ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর সঙ্গিগণ এ মত প্রকাশ করেছেন। কুরবানীতে যেমন পুরুষ পশু যবেহ করা জায়েয, ঠিক তেমনি। তার দ্বিতীয় দিক হল, তা জায়েয নয়।

গরু ও ছাগলের ক্ষেত্রে হানাফী মতে পুরুষ ও স্ত্রী পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদিও উষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা রয়েছে। হাদীসে উষ্ট্র গ্রহণের কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গরীব ও যাকাত গ্রহণকারীদের পক্ষে কোন ক্ষতির কারণ হয় না, কোন দলীলেরও বিরোধীতা করতে হয় না।

আমরা যা বললাম, তা ছাগলের ও পঁচিশটির কম সংখ্যক উষ্ট্রের ক্ষেত্রে যে ছাগল যাকাত বাবদ দেয়া ফরয, সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩. বয়সের ব্যাপারে কথা হল হাদীসে সুনির্দিষ্ট বয়সের কথা বলে দেয়া হয়েছে, তাই এ তাকীদ অবশ্যই মানতে হবে। কেননা তার কম বয়সের জন্তু গ্রহণ করা হলে তাতে গরীবদেরই হক নষ্ট ও ক্ষতির কারণ ঘটে। আর তার অধিক বয়সের গ্রহণ করা হলে পশুর মালিকদের ক্ষতি সাধন করা হয়। সব মাযহাবেই এ কথা সমর্থিত।

ছাগলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম মালিক বলেছেনঃ ছাগী ছানা দুই বছরের ও তিন বছরে উপনীতা হলে চলবে। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে ঃ দুই বছর বয়সের বাচ্চাতেই আমাদের অধিকার। আর তা এ জন্যে যে, তা একই জাতির দুই প্রজাতি মাত্র। কাজেই যা এক ক্ষেত্রে যথেষ্ট তা অন্য ক্ষেত্রেও যথেষ্ট হবে।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, পুরুষ ও স্ত্রী পশু শাবক থেকেই দুই বছর বয়সের শাবক গ্রহণ করা হবে। কিন্তু শাফেয়ী মাযহাবের লোকেরা এ দুটির বয়স নির্ধারণের বিভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁদের কেউ কেউ হাম্বলী মত অনুযায়ী এক বছরের বাচ্চাকে সনী (ثنى) বলেছেন আর ছয় মাসের বাচ্চাকে ময়য (معز) বলেছেন। কেউ

কেউ বলেছেন (جذعة) 'জযয়া' বলতে বোঝায় সেই শাবক, যার বয়স এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। আর যে শাবক দুই বছরে পূর্ণ করে তৃতীয় বর্ষে উপনীত হয়েছে, তা হল ثنية। ইমাম নববীর উক্তি মতে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এ কথাটি অধিক সহীহ্।

ইবনে কুদামাহ্ হাম্বলী মতের সমর্থনে দুটি কথা বলেছেনঃ

(ক) সুয়াইদ ইবনে গাফলাতা বর্ণিত হাদীস হল প্রথম কথাঃ

আমাদের কাছে রাসূলের পক্ষ থেকে যাকাত আদায়কারী এসে বললো—আমাদেরকে গরুর যাকাত বাবদ দুই বছরের বাছুর এবং ছাগলের তৃতীয় বর্ষের ছানা গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। এ এক স্পষ্ট কথা।

(খ) দুই বছরের বাছুর কুরবানী দেয়া চলে; কিন্তু দুই বছরের ছাগল নয়। কেননা নবী করীম (স) আবূ বুরদা ইবনে দীনারকে বলেছিলেনঃ 'দুই বছরের ছাগল তোমার জন্যে কুরবানী করা জায়েয হবে। তোমার পর অন্য কারোর জন্যে তা জায়েয হবে না।'

ইবরাহীম হর্‌বী বলেছেন, দুই বছরের গরু কুরবানী জায়েয এ জন্যে যে, তা এ বয়সে যৌন ক্রিয়া করতে সক্ষম; কিন্তু ছাগল তৃতীয় বর্ষের না হওয়া পর্যন্ত তা হয় না।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ এ মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফার একটি কথা এই যে, তৃতীয় বর্ষের না হওয়া পর্যন্ত তা যাকাত বাবদ দেয়া জায়েয নয়। দুই বছরের হলে তার মূল্য যাকাত বাবদ দিয়ে দেয়া যেতে পারে।

এখানে একটি কথা থেকে যায়। তাহল, উষ্ট্রের প্রয়োজনীয় বয়স না হলে কি করা হবে, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইবনে রুশ্‌দের মতে মালিককে সেই বয়সের জন্তু কিনে দিতে বাধ্য করা হবে। অনেকের মত তার কাছে যে বয়সের জন্তু আছে, তাই দেবে এবং সেই সঙ্গে বিশ দিরহাম অতিরিক্ত দেবে—যদি কম বয়সের জন্তু হয়ে থাকে অথবা অতিরিক্ত দুটি ছাগী দেবে। আর বেশী বয়সের জন্তু হলে যাকাত আদায়কারী সেটি নিয়ে বিশ দিরহাম বা দুটি ছাগী তাকে ফেরত দেবে। ইবনে রুশ্‌দ বলেছেন, যাকাতের অধ্যায়ে এ কথাটি স্বপ্রমাণিত। অতএব এ নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন হয় না। সম্ভবত ইমাম মালিক এ হাদীসটি পান নি বলে তাঁর মত এর বিপরীত হয়েছে। অথচ ইমাম শাফেয়ী ও আবূ সওর উক্ত হাদীসের ভিত্তিতেই মত গঠন করেছেন।—ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, তার মূল্য দেয়া কর্তব্য।

অন্যান্য লোকেরা বলেছেন, বরং তার কাছে যে বয়সের জন্তু আছে, সে তা-ই দেবে অথবা দুয়ের মধ্যবর্তী মূল্য।

আমার মতে ইমাম আবূ হানীফা মূল্য দেয়ার মত দিয়ে হাদীস লংঘন করেন নি। কেননা নবী করীম (স) উষ্ট্রের ক্ষেত্রে বয়সের তারতম্যকে দুটি ছাগী বা বিশটি দিরহাম দ্বারা পরিমাপ করেছেন এ হিসেবে যে, তিনি ছিলেন মুসলিম জাতির নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান। আর এ ধরনের ব্যবস্থাপনা কখনই চিরস্থায়ী বা সর্বকালের জন্যে হয় না। বরং তা

পরিবর্তিত হয়। এ কারণে হযরত আলী থেকে দুটি ছাগী বা বিশটি দিরহাম দ্বারা এ তারতম্য পরিমাপ করার কথা যথার্থভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর আমলে ছাগল খুব সস্তা ছিল। আর নবী করীম (স) কর্তৃক নবী হিসেবে চালু করা কোন নিয়মের বিরোধিতা তিনি করেছেন বলে ধারণা করাও যায় না, তার কারণও কিছু নেই।

এ তত্ত্বটি অনুধাবন করা হলে অনেক জটিল বিষয়েরই সহজ মীমাংসা হয়ে যেতে পারে।

৪. আর একটি শর্ত হল, যাকাতের জন্তু মধ্যম মানের হওয়া উচিত। অতএব অতীব উত্তম জন্তু বাছাই করে নেয়া যাকাত আদায়কারীর পক্ষে যেমন জায়েয নয়, তেমনি জায়েয নয় নিতান্ত রদ্দী মাল গ্রহণ করা। তবে মালিক রাযী হলে মূল্য নির্ধারণ করে নেয়া যেতে পারে। নবী করীম (স) হযরত মুআযকে বলেছিলেন, 'তুমি অবশ্য উত্তম মাল থেকে বিরত থাকবে। আর অত্যাচারিতের ফরিয়াদকে সব সময় ভয় করবে। কেননা তার ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন অন্তরায় নেই।'

ইবনে আবূ শায়বা বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) যাকাত বাবদ আদায়কৃত উষ্ট্রের মধ্যে একটি খুবই উত্তম ও সুন্দর উষ্ট্র দেখতে পেলেন। তখন তিনি যাকাত আদায়কারীর প্রতি খুবই ক্রোধ প্রকাশ করলেন। বললেন, 'এটা কি?' সে বলল, 'আমি উষ্ট্র পালের মধ্য থেকে দুটি উষ্ট্রের বদলে এটা গ্রহণ করেছি।' বললেন, 'তা হলে দোষ নেই।'

আর যেহেতু যাকাতের ভিত্তি হচ্ছে দাতা-গ্রহীতা উভয় পক্ষের সম্মতির উপর। আর সে কারণেই মধ্যম মানের মাল গ্রহণের তাকীদ। কেননা অতীব উত্তম জন্তু গ্রহণে মালের মালিকের ক্ষতি, আর নিকৃষ্টতম মাল গ্রহণে গরীব লোকদের অধিকার হরণ। মধ্যম মানের মালে উভয় পক্ষের সম্মতি ও স্বার্থের সংরক্ষণ নিহিত।

নবী করীম (স) থেকে আবূ দাউদে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেছেন "তিনটি কাজ যে করল, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করল। প্রথম যে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র বন্দেগী করল—কেননা সেই এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ মাবুদ নেই। দ্বিতীয়, যে মালের যাকাত দিল মনের সন্তুষ্টি সহকারে প্রতি বছর নিয়মিত ও সুনির্দিষ্টভাবে—বেছে বেছে বুড়ো খুনখুনে জন্তুও দিল না, ময়লা আবর্জনা রোগীও দিল না; ছোট ছোট ও খারাপ খারাপ মালও দিল না, দিল মধ্যম মানের মাল। কেননা আল্লাহ্ তোমাদের সর্বোত্তম মালও চান না, আর নিকৃষ্ট মাল দিতেও বলেন না।"

যাকাত বাবদ গাভীন বা বাছুরকে দুধ খাওয়ায় এমন জন্তুও গ্রহণ করা চলবে না। যেসব জন্তু খেয়ে দেয়ে মোটা হওয়ার জন্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে বা যা না-খেয়ে মরণাপন্ন হয়েছে এবং খাসি—পুরুষ ছাগল তাও গ্রহণ করা হবে না।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ হযরত উমর (রা)

যাকাত বাবদ আদায় করা ছাগলের মধ্যে বড় পালান ও দুগ্ধ ভারাক্রান্ত ছাগী দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ছাগীটি কি রকম?' লোকেরা বলল, 'এটি যাকাত বাবদ আদায় করা ছাগী।' তখন তিনি বললেন, 'এর মালিক নিশ্চয়ই ইচ্ছা করে এ ছাগীটি দেয়নি, জবরদস্তি করে আনা হয়েছে। তোমরা মানুষকে বিপদে ফেলো না, আর মুসলমানদের বাছাই করা উত্তম মালসমূহও গ্রহণ করবে না।'

মধ্যম মানের মাল লওয়ার যৌক্তিকতা এ থেকেও প্রমাণিত হয়। ছোট বয়সের বাচ্চা মালিকদের কাছে ফেরত দেয়া হবে যদি সেগুলোর মায়েদের সংখ্যা নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেগুলো গ্রহণ করা হবে না, যেমন করে সর্বোত্তম ও বাছাই করা -পছন্দ করা মালসমূহ গ্রহণ করা হবে না। কেননা বিশেষ মর্যাদার কারণে সেগুলোর উপর লোকদের লোভ হয় থাকে বলে এ নিষেধাজ্ঞা।

এ কারণে হযরত উমর যখন সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সাকাফীকে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করে পাঠালেন, তখন তিনি আদায়কৃত ছোট বয়সের জন্তুগুলো লোকদের কাছে ফেরত দিচ্ছিলেন। লোকেরা বললো, 'ছোটগুলো ফেরত দিচ্ছেন, তা থেকে কিছুই গ্রহণ করছেন না কেন?' সুফিয়ান হযরত উমরকে এ কথা জানালেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ছোট বয়সের জন্তু ফেরতই দেয়া হবে। রাখাল যা পুষবে, তা গ্রহণ করবে না। অনুরূপভাবে খেয়ে মোটা হওয়ার জন্যে আলাদা করা, ছানাকে দুগ্ধ দানকারী গাভীন ও খাসি ছাগল গ্রহণ করবে না। গ্রহণ করবে দুই বছর বয়সের ছাগী।'

আহ্মদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ীর বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে, রাসূলের দুইজন যাকাত আদায়কারী বলেছেনঃ 'রাসূলে করীম (স) আমাদের গাভীন জন্তু নিতে নিষেধ করেছেন।'

সুয়াইদ বর্ণনা করেছেন, রাসূল প্রেরিত জনৈক যাকাত আদায়কারীকে বলতে শুনেছি, 'দুগ্ধদায়ী ছাগী গ্রহণ করতে রাসূলে করীম (স) আমাদের নিষেধ করেছেন।'

সপ্তম আলোচনা

যাকাতের জন্তুতে মিশ্রণের প্রভাব

গবাদিপশুর যাকাত পর্যায়ে নিসাব ও পরিসংখ্যান যা কিছু উপরে উল্লিখিত হয়েছে, তা স্পষ্ট এবং কার্যকর হবে যদি পশুর মালিক একজন হয় এবং সে নিসাব বা তার অধিক পরিমাণের মালিক হয়। কিন্তু সাধারণত লক্ষ্য করা যায়, পশু মালিকরা একত্রিত হয়ে তাদের গরু, ছাগল ও উষ্ট্র ইত্যাদি গৃহপালিত পশুগুলোকে একত্রিত ও সংমিশ্রিত করে রাখে, তাতে ব্যয় ও শ্রম অনেকটা কম হয় বলে। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিচিত্র ধরনের পশুর মালিকদেরকে কি একক মালিক মনে করা হবে? অথবা প্রত্যেক জাতীয় পশুর মালিকানা ভিন্ন ভিন্ন ধরা হবে এবং সেই অনুযায়ী তার কাছ থেকে যাকাত আদায় করা হবে? অন্য কথায়, এ সংমিশ্রণে যাকাতের নিসাব ও তার ফরয পরিমাণে কোন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে কি?

এ প্রশ্নের জবাব আলোচনার পূর্বে একটি কথার ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। যে সংমিশ্রণের কথা বলা হল, তা দু'প্রকারের। একটি হল শরীকানার সংমিশ্রণ আর অপরটি প্রতিবেশীমূলক সংমিশ্রণ।

প্রথমটির তাৎপর্য হচ্ছে, বেশ কয়জন মালিক মিলিত হয়ে পশু পালন করবে এমনভাবে যে, তাদের প্রত্যেকের মালিকানা সম্পদ আলাদা করে গণনা করা যায় না। যেমন বহু সংখ্যক লোক উত্তরাধিকারসূত্রে পশুপাল পেয়েছে বা ক্রয় করেছে। এরা সকলেই তাতে সমানভাবে শরীক রয়েছে। তাদের কারোরই মালিকানার পশুকে আলাদা করে গণনা করা সম্ভব হয় না।

আর দ্বিতীয় প্রকারের তাৎপর্য হল, মালিকদের সকলেরই এবং প্রত্যেকেরই মালিকানা সম্পদ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন, অপর থেকে সুনির্দিষ্ট, কারোর ত্রিশটি বা ষাটটি ছাগল চিহ্নিত ও স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত। কারোর অনুরূপ সংখ্যক কিংবা তার বেশী বা কম রয়েছে। কিন্তু তা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত। অথচ এ সব মালিক পরস্পরের প্রতিবেশী, আর পশুগুলো সংমিশ্রিত—যেন তা একজনের মালিকানাভুক্ত।

এখন প্রশ্ন হল প্রত্যেক সংমিশ্রণকারীর যাকাত পরিমাণ নির্ধারণে কি স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হবে? কিংবা শরীকানা মিশ্রিত বলে ধরা হবে, যা প্রতিবেশী-সূলভ সংমিশ্রণ নয়?

ইবনে রুশ্‌দ এ পর্যায়ে ফিকাহ্‌বিদদের মতামত খুবই উত্তমরূপে ও সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের দলীলও উল্লেখ করেছেন। বলেছেন ঃ

অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদই যাকাতের ফরয পরিমাণ নির্ধারণে এ সংমিশ্রণের প্রভাব কার্যকর হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে তা নিসাবের পরিমাণে হবে কিনা, সে বিষয়ে তাঁদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা কিন্তু এ প্রভাবের কথা অস্বীকার করেছেন। না ফরয পরিমাণে, না নিসাব পরিমাণে তিনি তা স্বীকার করেন।

ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও সমকালীন বহু সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন, এ সংমিশ্রণকারীরা একজন মালিকের ন্যায় যাকাত দেবে। তবে দুটি ব্যাপারে এদের মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে।

একটি হচ্ছে শরীকদের নিসাবের ক্ষেত্রে। শরীকদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকুক আর না-ই থাকুক, তারা কি সকলে একজন মালিক গণ্য হবে? কিংবা তারা সকলে মিলে একজন মালিক হিসেবে যাকাত দিয়ে দেবে—তাদের প্রত্যেকের আলাদা নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও?

দ্বিতীয়টি, যে সংমিশ্রণের প্রভাব যাকাতের নিসাব নির্ধারণের উপর প্রতিফলিত হয়, তার পরিচিতি।

এ পর্যায়ে মতভেদ হচ্ছে, নিসাব নির্ধারণে কি এ সংমিশ্রণে কোন প্রভাব আছে? ফরয পরিমাণ নির্ধারণে?.... কিংবা কোন প্রভাবই নেই? আসলে এ মত-পার্থক্যের কারণ হচ্ছে যাকাত গ্রহণ পর্যায়ে প্রমাণিত হাদীসের তাৎপর্য অনুধাবনে নিহিত পার্থক্য। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَانَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ-

বিচ্ছিন্ন জিনিসগুলো একত্রিত করা যাবে না, একত্রিত জিনিসগুলো বিচ্ছিন্ন করা যাবে না যাকাত দেয়ার ভয়ে। আর যে দুটো সংমিশ্রত, তা সমানভাবে প্রত্যাবর্তিত হবে।

উভয় পক্ষই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী হাদীসটির ব্যাখ্যা করেছেন। যাঁরা মনে করেছেন, নিসাব ও ফরয পরিমাণে অথবা শুধু ফরয পরিমাণে সংমিশ্রণের প্রভাব রয়েছে, তাঁরা বলেছেন, রাসূলের এ কথাটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, দুটো সংমিশ্রিত সম্পদে মালিকানা এক ব্যক্তির মালিকানার মতই। ফলে রাসূলের কথা ঃ 'পাঁচটির কম সংখ্যক উষ্ট্রের যাকাত নেই'-এর পরিসর সংকীর্ণ হয়ে গেছে। ইমাম মালিকের মতে যাকাতের ফরয পরিমাণে এবং যাকাত ও নিসাব উভয় ক্ষেত্রেই—শাফেয়ী ও তাঁর সঙ্গীদের মতে।

কিন্তু যাঁরা সংমিশ্রণে বিশ্বাসী নন, তাঁরা বলেছে, দুই শরীককে দুই সংমিশ্রণকারী বলা হয়। উপরিউক্ত হাদীসের যাকাত সংগ্রহকারীদের নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, এক ব্যক্তির মালিকানা যেন এমনভাবে বিভক্ত করা না হয়, যার দরুন তার উপর যাকাতের

অধিক বোঝা চেপে বসতে পারে। যেমন এক ব্যক্তির একশ' বিশটি ছাগী রয়েছে। তাকে তিন চল্লিশে বিভক্ত করা অথবা একজনের মালিকানা অন্যজনের মালিকানার সাথে একত্রিত করে দেয়া, যার ফলে অধিক যাকাত ধার্য হতে পারে। কাজেই এই (কাজ জায়েয নয়)।

তাঁরা বলেছেন, হাদীসটিতে যখন এর অবকাশ রয়েছে, তখন তার ভিত্তিতে প্রমাণিত মৌলনীতি যেন সংকুচিত করা না হয়। কেননা তা সর্বসম্মত। অর্থাৎ নিসাব ও ফরয পরিমাণ যাকাত একই ব্যক্তির মালিকানায় গণ্য হবে।

আর যারা সংমিশ্রণে বিশ্বাসী, তাঁরা বলেছেন, সংমিশ্রণ কথাটাই শরীকানায় অধিক সুস্পষ্ট। ব্যাপারটি যখন এই, তখন রাসূলের কথা 'দুটি সমানভাবে প্রত্যাবর্তিত হবে—এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ দুটোর উপর যে ফরয পরিমাণ ধার্য হবে, তা একই ব্যক্তির মত হবে। আর রাসূলের উক্ত কথাটি প্রমাণ করছে যে, দুই সংমিশ্রিত মালিকানা দুই শরীক নয়। কেননা দুই শরীকের মধ্যে পারস্পরিক প্রত্যাবর্তন ধারণা করা যায় না। কেননা যাকাত তো শরীকানার মাল থেকেই গ্রহীত হবে।

যে লোক এ তাৎপর্যকে চূড়ান্ত মনে করেছেন, তার উপর নিসাব ধারণা করেন নি। তিনি বলেছেন, দুই সংমিশ্রিত মালিকানা এক ব্যক্তির যাকাতের মতই যাকাত দেবে—যদি তাদের দুজনেরই আলাদাভাবে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থেকে থাকে। আর যিনি নিসাবকে ফরয পরিমাণ সংক্রান্ত হুকুমের অধীন মনে করেছেন, তিনি বলেছেন, তাদের দুজনের নিসাবই এক ব্যক্তির নিসাব। যেমন তাদের দুজনের যাকাত এক ব্যক্তির যাকাতের মত।

এদের প্রত্যেকেই রাসূলে করীম (স)-এর উপরিউক্ত হাদীসটির তাৎপর্য নিজ নিজ নীতি অনুযায়ী গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিক বলেছেন, 'সম্মিলিতকে ভিন্ন ভিন্ন গণ্য করবে না'। অর্থাৎ দুই সংমিশ্রিত মালিকানার অর্থ—দুজনের প্রত্যেকের জন্যে দু'শ দু'শ করে ছাগী হলে তাতে তিনটি ছাগী ধার্য হবে, আর তা ভিন্ন ভিন্নকরে দিলে দু'জনের প্রত্যেকের জন্যে একটি করে ছাগী ধার্য হবে। 'বিচ্ছিন্নকে একত্রিত করা যাবে' অর্থ—দুজনের প্রত্যেকের জন্যে চল্লিশটি ছাগী হবে। আর যখন তা একত্র করা হবে, তখন তাদের উপর একটি ছাগী যাকাত বাবদ ধার্য হবে। তার মতের দৃষ্টিতে সংমিশ্রণকারীদের প্রতিই নিষেধ নিবদ্ধ হয়েছে—যাদের প্রত্যেকেরই নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'একত্রিতকে ভিন্ন ভিন্ন করা যাবে না' অর্থ, দুজনের চল্লিশটি ছাগী রয়েছে। তাদের মালিকানা বিচ্ছিন্ন করা হলে তাদের কারোর উপরই যাকাত হবে না, যদি তার মতে সংমিশ্রণকারীদের নিসাব একক মালিকানার নিসাব অনুযায়ী হয়।

যাঁরা সংমিশ্রণকে গুরুত্ব দেন, তাঁরা যাকাতে কোন্ ধরনের সংমিশ্রণ প্রভাব রাখে এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সংমিশ্রণের জরুরী শর্ত

হচ্ছে জন্তুগুলোকে একত্রিত ও সংমিশ্রিত করতে হবে। একজনের জন্যেই চলবে, একজনের জন্যেই দুধ দেবে, একজনের জন্যেই বিহারে ছেড়ে দেয়া হবে, একসঙ্গে পানি পান করানো হবে। দুজনের বলদগুলো সংমিশ্রিত হবে। তাঁর মতে সংমিশ্রণ ও শরীকানার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এ কারণে দুই শরীকের কারোরই মালিকানা পূর্ণ নিসাব সমান গণ্য করা হয় না।

ইমাম মালিকের পানি তোলার পাত্র, কূপ, চাকি, রাখাল ও বলদ—এই সবে শরীক দুই ব্যক্তিই পরস্পর সংমিশ্রণকারী। এ সবের কোন কোনটি বা সব কয়টির ব্যাপারে তাঁর সঙ্গিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। আর 'সংমিশ্রণ' নামটির মধ্যে এই সব কয়টির তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। এই কারণে কেউ কেউ যাকাতের সংমিশ্রণের কোন প্রভাব আছে বলে মনে করেন না। ইবনে হাজমের মতও তা-ই।

যাঁরা মনে করেন সংমিশ্রণ যাকাতের প্রতিবন্ধক, ইবনে হাজম তাঁদের মত ভিত্তিহীন প্রমাণিত করেছেন। কেননা তাতে হাদীস অনুযায়ী নিসাব পরিমাণের কমে যাকাত না হওয়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণে যাকাত ধার্য হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। আর 'সংমিশ্রণের প্রভাব রয়েছে এই মতেরও তা পরিপন্থী আর প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের ও তার ধন-মালের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে দায়িত্বশীল, এই কথারও বিপরীত হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلاَّ عَلَيْهَا وَلَتُزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى-

প্রত্যেক ব্যক্তিই তার উপার্জনের জন্যে দায়ী, কোন বোঝা বহনকারীই অপরের বোঝা বহন করবে না।

সংমিশ্রণ যাকাতের প্রতিবন্ধক বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা একজনকে অপরের অধিকারের উপর উপার্জনকারী করে দেন। একজনের মালের উপর অপরের মালের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন। কিন্তু তা সত্য বিরোধী, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী।

যাকাত নির্ধারণে সংমিশ্রণের প্রভাব রয়েছে বলে যাঁরা মত দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম শাফেয়ীর মত অধিক প্রশস্ত। তিনি মনে করেন যে, কেবল জন্তুর মালিকানার ক্ষেত্রেই সংমিশ্রণের প্রভাব রয়েছে। বরং কৃষি ফসল ও ফল-ফাঁকড়া এবং দিরহাম-দীনারের ক্ষেত্রেও তা সম্প্রসারিত।

অংশভিত্তিক শরীকানা কারবারের মসলা নির্ধারণে এ কথাটি ভিত্তিরূপে গণ্য হতে পারে। অভিন্ন ব্যক্তিত্বের যাকাত কার্যকরণ পর্যায়ে তার প্রয়োজন দেখা দিলে তা করা যাবে। কেননা তাতে কার্যকরণ সুপ্রশস্ত হবে, কার্য সম্পাদন সহজতর হবে এবং শ্রম ও ব্যয়ও অনেক কম হবে।

অষ্টম আলোচনা

ঘোড়ার যাকাত

যানবাহন, বোঝা বহন ও জিহাদের ব্যবহৃত ঘোড়ার যাকাত নেই

এ বিষয়ে সারা দুনিয়ার মুসলমান একমত যে, যেসব ঘোড়া সওয়ারী, ভার বহন বা আল্লাহ্র পথে জিহাদের কাজে ব্যবহৃত হয়, সে সব ঘোড়ার কোন যাকাত দিতে হবে না। তা ছেড়ে দিয়ে পালিত হোক, কি তাকে কাটা ঘাস খাইয়ে পোষা হোক, উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা তা মালিকের প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত। আর যাকাত দিতে হয় বর্ধনশীল ও প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-মালে।

ব্যবসায়ের ঘোড়ার যাকাত দিতে হবে

অনুরূপভাবে যা ব্যবসায়ের জন্যে পোষা হয়, তার যাকাত দিতে হবে। এ ব্যাপারে জাহিরী মাযহাবের ফিকাহ্বিদ ছাড়া আর সকলেই সম্পূর্ণ একমত। কেননা ব্যবসায়ের জন্যে পালিত হওয়াটাই প্রমাণ করে যে, তা ক্রমবর্ধনশীল—ছেড়ে দিয়ে পোষা হোক, কি কাটা ঘাস খাইয়ে পোষা হোক। এরূপ অবস্থায় তা পণ্যদ্রব্য সমতুল্য, অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মতই তার হুকুম। যেসব জন্তু, গাছপালা, প্রস্তর আদি মুনাফা লাভের আশায় কেনা-বেচা হবে, তার সম্পর্কেও এই একই কথা।

ঘরে ঘাস খাওয়ানো ঘোড়ার যাকাত নেই

ফিকাহবিদগণ এ বিষয়েও একমত যে, যেসব ঘোড়াকে ঘরে রেখে সারাটি বছর কিংবা বছরের অধিকাংশ সময় ঘাস খাইয়ে পোষা হয়, তার যাকাত নেই। কেননা জমহুর ফিকাহবিদদের মতে যাকাত দিতে হবে শুধু সেসব ঘোড়ার, যা ছেড়ে দিয়ে ঘাস খাইয়ে পোষা হয়।

প্রবৃদ্ধি লাভ ও বংশ বৃদ্ধির জন্যে পোষা ঘোড়ার যাকাত দেয়া সম্পর্কে ফিকাহ্বিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এর জন্যে প্রথম শর্ত হচ্ছে. তা সবই পুরুষ ঘোড়া হবে না। যদি তা হয়, তাহলে তাতে যাকাত হবে না। কেননা পুরুষ ঘোড়ার বাচ্চা হওয়ার প্রশ্ন থাকে না। তবে যদি পুরুষ স্ত্রী মিশ্রিত হয় অথবা শুধু স্ত্রী ঘোড়া হয় এবং ছেড়ে দিয়ে পোষা হয়, তা হলে ইমাম আবূ হানীফার মতে তার যাকাত দিতে হবে। জম্হুর ফিকাহ্বিদগণ অবশ্য ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে কিছুই ফরয হবে না।

ঘোড়ার যাকাত না হওয়ার দলীল

১. প্রথমত হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ-

মুসলমানের ক্রীতদাস ও ঘোড়ার কোন যাকাত নেই।

এ পর্যায়ে সব ঘোড়াই শামিল, তা ছেড়ে দিয়ে পোষা হোক বা অন্যথা হোক, পুরুষ হোক কি স্ত্রী; কিংবা মিশ্রিত হোক, কি অমিশ্রিত।

২. দ্বিতীয় হযরত আলী নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَقَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا-

ঘোড়া ও ক্রীতদাসের যাকাত মাফ করে দিয়েছি। তবে নগদ টাকার যাকাত দিতে হবে প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম—তাই নিয়ে এসে।

৩. তৃতীয়ত, ঘোড়ার যাকাত গ্রহণের ব্যাপারে কোন বাস্তব সুন্নাত বর্ণিত হয়নি। অথচ গবাদিপশুর যাকাত গ্রহণের সুন্নাত অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

কুরআন মালের যাকাত গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে ঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ...

তাদের ধন-মালের যাকাত গ্রহণ করে তাদের পবিত্র কর।

রাসূলে করীম (স)-ই এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যাদাতা। তিনি তাঁর কাজ দ্বারা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, ঘোড়া এই ধন-মালের মধ্যে গণ্য নয়।

৪. চতুর্থ দলীল হচ্ছে যুক্তি। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব গবাদিপশুর মুনাফার উপর যাকাত ফরয করেছেন, তা ঘোড়ায় নেই। তাই ঘোড়াকে অন্যান্য গবাদিপশুর মত মনে করা ঠিক হয়। শরীয়াতের বিধানদাতা ঘোড়া পোষার বিশেষ উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যা অন্যান্য গবাদিপশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা ঘোড়া যেজন্যে পোষা হয়, উষ্ট্র সেজন্যে পোষা হয় না। উষ্ট্র পোষা হয় বংশ বৃদ্ধি, গোশ্ত খাওয়া, বোঝা বহন, ব্যবসা ও তার উপর সওয়ার হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত প্রভৃতি উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঘোড়া সৃষ্টিই করা হয়েছে দাপট-প্রতাপ, দৌড়-ঝাঁপ, দ্বীন কায়েম ও দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদ ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। শরীয়াতের বিধানদাতার তার সংরক্ষণ ও প্রতিপালনে ভিন্নতর

লক্ষ্য। এ কারণে তার যাকাত মাফ করে দেয়া হয়েছে, যেন সে দিকে মানুষের অধিক আগ্রহ জাগে এবং আল্লাহ্ ও রাসূল যে উদ্দেশ্যে তার লালন-সংরক্ষণ বিধিবদ্ধ করেছেন, সেই কাজে তা ব্যবহার করে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا سْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ-

শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তোমরা যথাসাধ্য শক্তি সংগ্রহ ও অশ্বপালন করে প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

এ আয়াতের দৃষ্টিতে অশ্বপালন যুদ্ধের সরঞ্জামের মধ্যে গণ্য। আর যুদ্ধের সরঞ্জামের উপর কোন যাকাত হতে পারে না, তা যতই বিপুল হোক না কেন; যতক্ষণ তা ব্যবসায়ের জন্যে না হবে।

ইমাম আবূ হানীফার মত

ইমাম আবূ হানীফার মতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে পোষা হলে তার যাকাত দিতে হবে। তার কয়েকটি দলীল রয়েছে ঃ

প্রথম—বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হযরত আবূ হুরায়রার বর্ণনা। নবী করীম (স) বলেছেনঃ

الْخَيْلُ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سَتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّ الَّذِىْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهِىَ لِذٰلِكَ اَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيَا وَتَعَفُّفَا ثُمَّ لَمْ يَنْسِ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُوْرِهَا فَهِىَ لِذلكَ سَتْرٌوَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَهِىَ عَلٰى ذٰلِكَ وِزْرٌ-

ঘোড়া কারোর জন্যে বড় সওয়াবের কারণ, কারোর জন্যে তা আবরণ, আর কারোর জন্যে তা দুর্বহ বোঝা। সওয়াবের কারণ হয় সেই ব্যক্তির ঘোড়া যে তা আল্লাহ্র জন্যে পোষে (জিহাদে তা ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে), তা তার জন্যে বড় সওয়াবের কারণ। আর যে ব্যক্তি তা পোষে সম্পদ বৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে, পরে সে তার গলায় ও পিঠে আল্লাহ্র হক্ ভুলে যায় না, তা তার জন্যে আবরণ। আর যে লোক তা গৌরব প্রকাশ ও লোক দেখানোর জন্যে এবং মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে পোষে তার ঘোড়া তার জন্যে গুনাহের কারণ হবে।

ঘোড়ার গলদেশে আল্লাহ্র হক্ হচ্ছে তার যাকাত দেয়া, আর ঠেকায় পড়া লোকদের তা ধার দেয়া—তাতে আরোহণের জন্যে তার পৃষ্ঠে আল্লাহ্র হক্।

গলদেশে আল্লাহ্র হক্ ধার্য হওয়া পর্যায়ে ভিন্ন মত হচ্ছে—তা যাকাত নয়, তাকে নিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করাই আল্লাহ্ হক। কেউ কেউ মনে করেন, তার অর্থ, তার

প্রতি দয়া প্রদর্শন, তার খাওয়া-দাওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থাকরণ। পৃষ্ঠদেশ যাকাত ধার্য হওয়ার স্থান নয়।

দ্বিতীয়, হযরত জাবির নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

فِيْ كُلِّ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ اَوْعَشَرَةُ دَرَاهِمَ-

প্রতিটি উন্মুক্ত ঘোড়ার যাকাত এক দ্বীনার অথবা দশ দিরহাম।

ইমাম দারেকুত্‌নী ও বায়হাকী এই হাদীসটিকে 'যয়ীফ' বলেছেন। এই কারণে জম্‌হুর ফিকাহবিদগণ মনে করেন, পূর্বে উদ্ধৃত ঘোড়ার যাকাত ফরয না হওয়া হাদীসটির প্রতিকূলে এই হাদীসটি দলীল হতে পারে না।

তৃতীয়—উষ্ট্রের ন্যায় ঘোড়ারও যাকাত ফরয হওয়া। এ দুটোই তো গবাদিপশুর মধ্যে গণ্য, বর্ধনশীল এবং কল্যাণকর। তাতে যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত মজুদ রয়েছে। আর তা হচ্ছে চিহ্নিত করে উন্মুক্ত করে দেয়া। এ দিক দিয়ে ঘোড়া ও অন্যান্য গবাদিপশুর মধ্যে পার্থক্য পর্যায়ে যা কিছু বলা হয়েছে, তা হিসাবের মধ্যে ধরার মত নয়। কেননা প্রত্যেক শ্রেণীর পশুরই একটা বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে, যার দরুন তা অন্য শ্রেণীর পশু থেকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। উট এবং ছাগলের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও উভয়ের উপরই যাকাত ধার্য হয়ে থাকে।

এ কারণে মনে করা হয়, ধন-মালে যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারটি বুদ্ধিভিত্তিক, ইবাদতমূলক নয়। আর প্রবৃদ্ধিশীলতাই হল তার যৌক্তিকতার কারণ। এটা যখন যাকাত ফরয হওয়ার কারণরূপে স্বীকৃত, তখন এই 'কারণ' যেখানে এবং যাতেই পাওয়া যাবে, তার উপরই যাকাত ফরয হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থ. সাহাবিগণের উক্তিসমূহ, যা বর্ণনায় পাওয়া গেছে, তা সবই উপরিউক্ত প্রত্যয়কে সমর্থন ও অধিক শক্তিশালী করে দেয়।

তাহাভী ও দারেকুত্‌নী সহীহ্ সনদে উদ্ধৃত করেছেন, খায়ের ইবনে ইয়াযীদ বলেছেন, 'আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি ঘোড়া পালতেন ও তার যাকাত উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।'

আবদুর রায্‌যাক ও বায়হাকী উদ্ধৃত করেছেন, ইয়ালী ইবনে উমাইয়্যা বলেছেন, আবদুর রহমান একজন ইয়েমেনবাসীর কাছ থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করলেন একশ'টি উষ্ট্রীর বিনিময়ে। পরে বিক্রেতা লজ্জিত হল ও উমরের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়ালী ও তার ভাইরা আমার একটি ঘোড়া অপহরণ করে নিয়ে গেছে। উমর (রা) ইয়ালীকে ডেকে পাঠালেন। ইয়ালী এলে তাঁকে সব কথা জানানো হল। বললেন, 'ঘোড়ার মূল্য কি তোমাদের কাছে এতদূর পৌঁছে যায়? আমি তো তা জানি না। আমরা তো প্রতি চল্লিশটি ছাগল থেকে একটি ছাগী যাকাত বাবদ নিয়ে থাকি অথচ ঘোড়া

থেকে কিছুই লই না। এক্ষণে প্রতিটি ঘোড়া থেকে এক দিনার করে গ্রহণ কর।' অতঃপর প্রতিটি ঘোড়ার উপর এক দীনার করে যাকাত ধার্য হয়ে গেল।

ইবনে হাজম উদ্ধৃত করেছেন, খায়ের ইবনে ইয়াযীদ জানিয়েছেন যে, তিনি উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে ঘোড়ার যাকাত নিয়ে উপস্থিত হতেন। ইবনে শিহাব বলেছেন, উসমান ইবনে আফ্‌ফানও ঘোড়ার যাকাত দিতেন।

আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) ঘোড়া থেকে দশ দিরহাম ও পাঁচ দিরহাম করে যাকাত গ্রহণ করতেন। যায়দ ইবনে সাবিত আনসারীও এই মত সমর্থন করতেন। মারওয়ান ইবনে হাকামের শাসনামলে আলিমগণ ছেড়ে দেয়া চিহ্নিত ঘোড়ার যাকাত সম্পর্কে বিতর্কে পড়ে যান। তাঁরা এ বিষয়ে মারওয়ানের সাথে পরামর্শ করেন। তখন হযরত আবূ হুরায়রা এই হাদীসটি বর্ণনা করেন ঃ 'ক্রীতদাস ও ঘোড়ার কোন যাকাত দিতে হবে না। মারওয়ান এজেন্যে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তখন হযরত আবূ হুরায়রা বলেন, 'আমি তো রাসূলের হাদীস বর্ণনা করছি আর আপনি তাতে বিস্ময় প্রকাশ করছেন? রাসূল (স) সত্যই বলেছেন। তিনি মুজাহিদদের ঘোড়ার যাকাত না নেয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু যদি কেউ ব্যবসা বা বংশবৃদ্ধির জন্যে ঘোড়া পোষে, তবে তাতে অবশ্যই যাকাত ধার্য হবে। কত? .. প্রতিটি ঘোড়ায় এক দিনার অথবা দশ দিরহাম।'

কিতাবুল আম্‌ওয়ালে উদ্ধৃত হয়েছে, তায়ূস হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে ঘোড়ার যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'জিহাদের ঘোড়ার কোন যাকাত নেই।' তার অর্থ, এছাড়া অন্য সব ঘোড়ারই যাকাত দিতে হবে।

ইবরাহীম নখ্য়ীও এই মত প্রকাশ করেছে। বলেছেন,·বংশ বৃদ্ধির উদেশ্যে পালিত ঘোড়ার যাকাত দিতে হবে। ইচ্ছে করলে প্রতিটি ঘোড়া বাবদ এক দীনার অথবা দশ দিরহাম দেবে। অথবা ঘোড়ার মূল্য ধরে প্রতি দুইশ' দিরহাম বাবদ দশ দিরহাম আদায় করবে।

আবূ হানীফার মতে যাকাতের নিসাব

ইমাম আবূ হানীফা ঘোড়ার যাকাতের কোন নিসাব নির্ধারণ করেন নি। প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁর কাছে কোন নির্দিষ্ট নিসাব আছে কি নেই? অধিক সহীহ কথা হচ্ছে, নেই। কেননা তিনি তা নির্ধারণই করেন নি। কিন্তু বলা হয়েছে তার নিসাব হচ্ছে, তিনটি, কেউ বলেছেন পাঁচটি। পাঁচটি হওয়াই অধিক সম্ভব। কেননা পাঁচটি উটের উপর যাকাত হয়। শরীয়াত পাঁচটির কম সংখ্যাকে খুব কম সংখ্যক ধরে। পাঁচটি উটের বা পাঁচ অসাকের কমে যাকাত ধরা হয়নি।

কিন্তু কতটা যাকাত ফরয? ইমাম আবূ হানীফার মত বলে কথিত হয়েছে, আরবদের ঘোড়ায় ইচ্ছা করলে প্রতিটি বাবদ এক দীনার অথবা তার মূল্য ধরে প্রতি দুইশ' দিরহামে পাঁচ দিরহাম দেয়া যেতে পারে। অন্যদের ঘোড়া হলে তার মূল্য ধরেই যাকাত দিতে হবে।

পর্যালোচনা

উপরে দুটি মাযহাবের অভিমত ও দলীল উল্লেখ করার পর আমার বক্তব্য হচ্ছে, ঘোড়ার যাকাত না লওয়া সম্পর্কে রাসূলে করীমের কোন সুস্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় না, যেমন স্পষ্ট ভাষায় তা ফরয বলে ঘোষণাও করেন নি। 'মুসলমানের ক্রীতদাস ও ঘোড়ার যাকাত নেই' হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত এ হাদীসটি শুধু এতটুকু বলে যে, মুসলমানদের যেসব ঘোড়া জিহাদ ও সাধারণ চলাচলে ব্যবহৃত হয় তার যাকাত দিতে হবে না। যায়দ ইবনে সাবিত ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও তা-ই বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসের 'ক্রীতদাস' বলতে বোঝায় ব্যক্তির খেদমতে নিয়োজিত দাস, তার চলাচল ও জিহাদে ব্যবহৃত ঘোড়া। আর জাহেরী ফিকাহবিদ ব্যতীত আর সকলেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, ব্যবসায়ের জন্যে যেসব ঘোড়া ও দাস সংগ্রহ করা হবে, তার যাকাত অবশ্যই দিতে হবে।

হযরত আবূ হুরায়রাও কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণেই আগ্রহী ছিলেন। তিনি যায়দ ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর ন্যায় ফিকাহ বিদ্যায় পারদর্শী রূপে খ্যাতি লাভ করেন নি।

হযরত আলী বর্ণিত হাদীস 'আমি তোমাদের ঘোড়া ও দাসের যাকাত মাফ করে দিয়েছি'—কথাটি তাঁর নিজের, রাসূলের নয়। ইমাম দারেকুত্‌নীর মতে এ হাদীসটিও মৌলিকভাবে তার উপর যাকাত ফরয হওয়ারই ইঙ্গিত বহন করে—যদিও তা মাফ করার কথা বলা হচ্ছে। সে মাফ করার অনেক কারণ থাকতে পারে। সে যুগে তো ঘোড়া বেশীর ভাগ জিহাদ ও পাহারাদারীর কাজেই প্রয়োজন হত। তা-ই ছিল সেকালের প্রধান প্রস্তুতি সামগ্রী। আর তখনকার আরবে সম্পদ এতটা বিস্তীর্ণও ছিল না।

সে যা-ই হোক, ঘোড়ার যাকাত দেয়া পর্যায়ে কোন সুস্পষ্ট কথার অভাব প্রমাণ করে না যে, তাতে যাকাত কখনই ধার্য করেছেন। স্বর্ণ সম্পর্কে তাঁর এ রকম কোন সুস্পষ্ট উক্তি নেই। কেননা সেকালের প্রধান নগদ মুদ্রা রৌপ্য নির্মিত ছিল। তাই সে বিষয়ে যাকাত ফরয হওয়ার কথা প্রমাণিত হওয়ায় রৌপ্যর উপরও তা ধার্য করা সহজ হয়েছে। কেননা এ দুয়ের কল্যাণ ও লক্ষ্য অভিন্ন।

উপরে উদ্ধৃত ইয়ালী ও হযরত উমর সংক্রান্ত কিস্‌সা যাকাত পর্যায়ে খুব বেশী গুরত্বের দাবি রাখে। তাতে দেখা যায়, হযরত উমর এ ব্যাপারে কিয়াসের আশ্রয় নিয়েছেন। আর তা প্রমাণ করে যে, ইজতিহাদ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। নবী করীম (স) যে যে মালের যাকাত নিয়েছেন, তা এই কথা প্রমাণ করে যে, অনুরূপ মাল-সম্পদের যাকাত গ্রহণে মূলত নিষেধ কিছুই নেই। আর যে মূল-সম্পদই বর্ধনশীল তা থেকে যাকাত গ্রহণ করাই আবশ্যক। তার পরিমাণ নির্ধারিত না থাকলে সেজন্যে ইজতিহাদ করতে হবে।

জমহুর ফিকাহবিদগণ বলেছেন যে, তা হযরত উমরের ইজতিহাদ বৈ কিছু নয়। অতএব তা অকাট্য দলীল হতে পারে না—এ কথার উপর যে, তিনি তাদেরকে তার

জন্যে আদেশ করেছিলেন তখন, যখন তারা ইচ্ছা করেই ঘোড়ার যাকাত দিতে চেয়েছিল। অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, সিরিয়াবাসী কিছু লোক এসে বলেছিল, 'আমরা কিছু ঘোড়া ও দাস পেয়ে গেছি। তাতে যাকাত ধার্য হওয়া আমরা পছন্দ করি।' তখন হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার পূর্ববর্তী দুইজন (রাসূলে করীম ও হযরত আবূ বকর) যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, আমি সেই অনুযায়ী কাজ করব।' তিনি অন্যান্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শও করলেন। হযরত আলী বললেন, 'তাই ভাল। কোন কোন জিযিয়া যদি প্রচলিত না থেকে থাকে, তবে আপনার পরে তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হতে থাকবে।'

আমি মনে করি, সিরিয়ার লোকদের সাথে উক্ত ঘটনা ইয়েমেনের লোকদের সাথে সংঘটিত ঘটনার পূর্বের ব্যাপার। হযরত উমর বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঘোড়ার খুব বেশী মূল্য হয়ে থাকে, তাই তা যাকাতমুক্ত হতে পারে না। সেই কারণে উক্তরূপ উক্তি করেছিলেন যা বর্ণিত ঘটনার শেষে বলা হয়েছে। অতএব যুক্তিসঙ্গত কথা হচ্ছে, উক্ত ঘটনার পর এই ঘটনা।

প্রথমত, তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এ জন্যে যে, যে কাজ রাসূলে করীম ও হযরত আবূ বকর করেন নি, তা তিনি কিভাবে করবেন? তাই তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। হযরত আলী সেই দিকে ইঙ্গিত করেই তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন। এতে কড়া সতর্কতা অবলম্বনের নীতি নিহিত রয়েছে।

কিন্তু এ শেষোক্ত ঘটনায় তিনি কারোর কাছেই পরামর্শ চান নি। তিনি যা দেখেছেন, তারই ভিত্তিতে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ইয়েমেনে নিযুক্ত গভর্ণরকে প্রতিটি ঘোড়া বাবদ এক দীনার গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আমি মনে করি, প্রতিটি ঘোড়া বাবদ এক দীনার গ্রহণ করা কোন বাধ্যতামূলক কাজ নয়। কেননা দীনারের ক্রয়ক্ষমতা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাই কোন দেশে একটি ঘোড়া বাবদ পাওয়া এক দীনার অনেক মুল্যবান, আবার অন্য দেশে খুব সামান্য।

আমাদের এ যুগে ইমাম নখয়ী ও আবূ হানীফার মত অনুযায়ী ঘোড়ার মূল্য ধরে তার দশ ভাগের এক ভাগের চার ভাগের এক ভাগ যাকাত বাবদ গ্রহণ করাই সমীচীন। শরীয়াত নগদ সম্পদ ও পণ্যদ্রব্যের যাকাতে এ হারই চালু করেছে। গবাদিপশুর যাকাত এ রকমই প্রায়। কেননা সেক্ষেত্রে প্রতি চল্লিশটি উষ্ট্রে একটি তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক, প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি করে চতুর্থ বছরে উপনীতা উষ্ট্রী, প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি করে এক বছর বয়সের বাছুর, আর প্রতি চল্লিশটিতে একটি দুই বছর বয়স্ক বাছুর ধার্য হয়েছে। কোন গবাদিপশুর পালে বিভিন্ন বয়সের ছোট ও বড় জন্তু থাকে। তাই দশ ভাগের এক ভাগের এক-চতুর্থাংশই শ্রেয়। তবে ছাগলের যাকাতে প্রতি একশটিতে একটি ছাগী ধার্য হয়েছে এজন্যে যে, তাতে ছোট ও বড় জন্তু থাকে। তাই দশ ভাগের এক ভাগের এক-চতুর্থাংশই শ্রেয়। তবে ছাগলের যাকাতে প্রতি একশটিতে একটি ছাগী

ধার্য হয়েছে এজন্যে যে, তাতে ছোট বয়সের ছাগল বেশী থাকাই স্বাভাবিক। সেগুলোও তো গণনা করা হবে; কিন্তু তার যাকাত নেয়া হবে না।

পূর্বে যেমন বলেছি, এ পর্যায়ে আমার মত হচ্ছে, নবী করীম (স) গরুর হিসাব সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করেন নি মুসলিম উম্মতকে কিছুটা সুবিধা দান ও রাষ্ট্রপ্রধানের বিবেচনা খাটানোর সুযোগ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। আর তিনি এ পর্যায়ের কথা বলেছিলেন মুসলমানদের নেতা হিসেবে। তা করার অধিকারও ছিল। তিনি আদেশও করবেন, নিষেধও করবেন। বাধ্য করবেন, আবার নিষ্কৃতিও দেবেন। গোটা জাতির সামষ্টিক কল্যাণের দৃষ্টিতে তাঁর সমস্ত কাজ আঞ্জাম পাবে। অনেক সময় ঘোড়ার যাকাত না লওয়াটাই সামষ্টিক কল্যাণের দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় ছিল।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রাসূলে করীম (স) নবী হিসেবে যা বলেছেন এবং যা বলেছেন মুসলিম জাতির রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে কি ভাবে?

সে পার্থক্য করা যাবে অবস্থার লক্ষণের দৃষ্টিতে। হাদীসের বিষয়বস্তু রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতি, সামরিক কিংবা প্রতিষ্ঠানগত কল্যাণ সম্পর্কিত হবে, যা থেকে বোঝা যাবে যে, রাসূলে করীম (স) সেই কথা রাষ্ট্রনেতা হিসেবে বলেছেন অথবা এমন দলীল হবে যা তার বিরোধী হবে কেবল স্থান, কাল ও অবস্থার বিরোধিতার কারণে; যা প্রমাণ করবে যে, তাতে সাময়িক ও আংশিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তাতে চিরস্থায়ীভাবে আইন প্রণয়ন লক্ষ্য নয়।

আর দৃষ্টান্ত হিসেবে ইমাম কিরাফীর গ্রন্থ 'আল-আহকাম'-এর উদ্ধৃত একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা যায়। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ-

যে লোক কোন লোককে জিহাদে হত্যা করল, নিহত ব্যক্তির সঙ্গের জিনিসপত্র সে-ই পাবে।

ইমাম মালিক বলেছেন, রাসূলের এ কথটি রাষ্ট্রনেতা হিসেবে বলা কথা। কাজেই যুদ্ধের পূর্বের রাষ্ট্রনেতার অনুমতি ছাড়া কোন মুজাহিদ যেন তার হাতে নিহত ব্যক্তির সঙ্গের জিনিসপত্র নিজের জন্যে খাস মনে করে নিয়ে নেবে না। রাসূলে করীম (স) থেকে তাই ঘটেছে। যে সব বিষয় ইমাম মালিকের এই মত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে, আল্লামা কাওয়াফীর মতে তা হচ্ছে ঃ

১. গনীমত বণ্টন সংক্রান্ত আয়াত ও এ হাদীসের সাথে তার বৈসাদৃশ্য,

২. মুজাহিদদের নিয়ত নষ্ট করা—যখন তা শুরুতেই ঘটবে।

৩. উক্ত হদীসে যেমন বলা হয়েছে, তা অবস্থার লক্ষণের ইঙ্গিত। যুদ্ধে উৎসাহ দানের জন্যেই তা বলা হয়েছিল।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী লিখেছেন ঃ

জানা উচিত, রাসূলে করীম (স) থেকে যা বর্ণিত এবং যা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে সঙ্কলিত, তা দুভাগে বিভক্ত। একটি ভাগের সেসব কথা, যা রিসালাতের দায়িত্ব পালন স্বরূপ তিনি বলেছেন। আল্লাহ্র আদেশ—যা রাসূল তোমাদের দেন তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তোমরা তা থেকে বিরত থাক'—এই পর্যায়ের কথা। এ ছাড়া পরকাল ও বিশ্বলোকের বিস্ময়কর জগত সম্পর্কিত তথ্যাবলীও এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।'

দ্বিতীয় যা রিসালতের দায়িত্ব পালন পর্যায়ে নয়। রাসূলের উক্তি—'আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি যখন তোমাদের দ্বীন সম্পর্কিত কোন বিষয়ে কিছু বলি, তখন তোমরা তা অবশ্যই গ্রহণ করবে। আর আমার নিজের অভিমত হিসেবে, যদি কিছু বলি, তা হলে মনে রাখবে আমি একজন মানুষ।' চিকিৎসা সংক্রান্ত কথাবার্তা এ পর্যায়ে গণ্য। তা রাসূলের অর্জিত অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। রাসূলে করীম (স) অভ্যাস-বশত যা করেছেন—ইবাদত হিসেবে নয়—তা-ও এ পর্যায়ে গণ্য হবে। ঘটনাবশত যা করেছেন, ঠিক ইচ্ছা করে করেন নি, তাও তাঁর মানুষ হিসেবে করা কাজ। তিনি তৎকালীন সাধারণ জনকল্যাণের অংশ হিসেবে যা কিছু বলেছেন, গোটা জাতির সকলের জন্যে তা বাধ্যতামূলক নয়, তাও এ পর্যায়ে গণ্য করতে হবে। সৈন্যবাহিনী সজ্জায়ন ও আচার-আচরণ নির্ধারণ .... এ ব্যাপারের দৃষ্টান্ত। এ পর্যায়ে বহু আদেশ-নির্দেশও উদ্ধৃত হয়েছে।

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ- (بخارى، مسلم)

যে মুজাহিদ কোন কাফিরকে যুদ্ধে হত্যা করল, তার সঙ্গের যাবতীয় জিনিস তারই হবে।

مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِىَ لَهُ-

যে লোক পতিত জমি চাষোপযোগী বানালো তা তারই মালিকানাভুক্ত হবে।

মালিকী মায্হাবের লোকেরা এ পর্যায়ে বলেছেন যে, হত্যাকারী কোন নিহত ব্যক্তির সঙ্গের জিনিসপত্র পাবে না, যদি যুদ্ধের পূর্বে নবী করীম (স)-এর ন্যায় রাষ্ট্রপ্রধান উক্তরূপ ঘোষণা প্রদান না করেন। হানাফীরাও বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন পতিত জমি চাষোপযোগী করতে চেষ্টা করা কারোর পক্ষেই জায়েয হবে না।

আমার মতে, ঘোড়ার যাকাত মাফ করে দেয়া সংক্রান্ত রাসূলের ঘোষণা যদি সহীহ্ প্রমাণিত হয়ও, তবু তা এপর্যায়েরই ঘোষণা হবে। তিনি তখন এরূপ করাকেই জনগণের জন্যে কল্যাণকর মনে করেছিলেন। তাতে লোকেরা ঘোড়া পালন করায়

—১৫

উৎসাহ পাবে, এ-ই ছিল তাঁর ধারণা। রাসূলের উক্তি 'আমি মাফ করে দিলাম' এই কথাই প্রমাণ করে। কেননা যা অবশ্য পালনীয়, তাতেই ক্ষমা করা বা মাফ করে দেয়ার সুযোগ থাকে। এ থেকে বোঝা যায়, ব্যাপারটি তাঁর বিবেচনার উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই পরবর্তী সমস্ত কালের রাষ্ট্রপ্রধানদের বিবেচনার উপর তা নির্ভর করবে। তারা যাকাত ধার্য করলে তা দিতে হবে, নতুবা নয়।

বস্তুত ঘোড়া যখন বিভিন্ন দেশে বংশবৃদ্ধি ও অর্থোপার্জনের সূত্র হিসেবে পালিত হয় এবং উষ্ট্রের তুলনায় অধিক বেশী মূল্যবান সম্পদরূপে গণ্য হয়, তখন তার যাকাত গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । তাতে সব ধনীদের প্রতিই সমতা রক্ষা করা হবে। অন্যথায় কোন কোন ধনী লোকদের কাছ থেকে তাদের ধন-মালের যাকাত গ্রহণ ও কোন কোন ধনীর কাছ থেকে যাকাত না গ্রহণ করার অবিচার অনুষ্ঠিত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হযরত উমর (রা) যে ঘোড়ার যাকাত ধার্য করেছিলেন, তাঁর এই কাজের এটাই হচ্ছে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা।

নবম আলোচনা

ঘোড়া ছাড়া অন্যান্য গবাদিপশু

এ পর্যায়ে আর একটি আলোচনা এখানে করে নিলে গবাদিপশুর যাকাত সংক্রান্ত আলোচনা সমাপ্ত হতে পারে।

এ আলোচনা একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হচ্ছে, লোকেরা যদি কোন অভিনব ধরনের পশু উদ্ভাবন করে, তার প্রবৃদ্ধির কার্যকর ব্যবস্থা নেয় এবং তা থেকে উপার্জনের পথ উন্মুক্ত হয়, তা হলে তার উপর যাকাত ধার্য করা হবে কিনা?

একালের ইসলামী অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ আবু জুহ্‌রা, আবদুল ওহাব খাল্লাফ ও আবদুর রহমান হাসান যাকাত সংক্রান্ত আলোচনায় এ পর্যায়ে কথা বলেছেন। তাঁরা হযরত উমর থেকে প্রমাণিত হাদীসের ভিত্তিতে এই মত গঠন করেছেন যে, যাকাতের ব্যাপারে 'কিয়াস' প্রয়োগ করা একালের বিশেষজ্ঞদের পক্ষেও জায়েয। এ পর্যায়ের দলীলসমূহ নিশ্চয়ই 'কারণ' সমন্বিত এবং সে 'কারণ' সংক্রমণশীলও বটে।

প্রবৃদ্ধির কারণ বর্তমান থাকার দরুন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ঘোড়ার যাকাত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা এ 'কিয়াস' কে যথার্থ মনে করে তার অনুসরণ করেছেন। যাঁরা এ 'কিয়াস' মেনে নেননি, ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্য করার পক্ষেও মত দেননি। তাঁরা যা সিদ্ধান্ত নেয়ার নিয়েছেন। কেননা তাঁরা যাকাত ফরয হওয়ার কারণ হিসেবে কেবলমাত্র প্রবৃদ্ধিকে গণ্য করেন নি, বরং তার সাথে খাদ্য হিসেবে বৈধতা ও তার বংশবৃদ্ধির কল্যাণকেও গণ্য করেছেন। 'আল-মুগ্‌নী গ্রন্থ প্রণেতা এ জন্যেই বলেছেন যে, ঘোড়াকে ছাগলের মত মনে করা ঠিক নয়। কেননা ছাগলের প্রবৃদ্ধি, বংশ কল্যাণ, দুগ্ধ ও গোশ্‌ত ভক্ষণ এবং কুরবানী করা জায়েয হওয়া ইত্যাদিও রয়েছে, যা অন্যত্র নেই।

তাঁরা বলেছেন, খলীফা উমর যখন প্রবৃদ্ধিকে 'কারণ' রূপে গণ্য করলেন এবং আবূ হানীফা তা অনুসরণ করলেন, তখন এ পদ্ধতিতে আমরা বলতে পারি, প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে জন্তুই পালন করা হবে এবং খোলা মাঠে ঘাস খাওয়ানো হবে, তার নিসাব সংখ্যা বিশ মিশকাল স্বর্ণ (84c gramms)-এর পরিমাণ হলেই তাতে দশ ভাগের এক-চতুর্থাংশ যাকাত ধার্য হবে।

স্বর্ণকে নিসাবের মান ধরা হয়েছে এজন্যে যে, উমর ফারুক (রা) ঘোড়ার যাকাত নির্ধারণে মূল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর এ কালে স্বর্ণের মানেই মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে সর্বত্র।

এ কথার সমর্থন রয়েছে। রাসূলে করীম (স) গাধার যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে স্পষ্ট ভাষায় 'না' বলেন নি। বরং বলেছেনঃ 'এ পর্যায়ে আমার কাছে আল্লাহ্ তা'আলা কিছুই নাযিল করেন নি।' শুধু এ ব্যাপক অর্থবোধক আয়াতটিই বলা যায়, যাতে বলা হয়েছে 'যে লোক এক বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে লোক বিন্দু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে. সেও তা দেখতে পাবে।

দশ ভাগের এক ভাগের এক-চতুর্থাংশ নির্ধারণের দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাসূলের উক্তিঃ 'প্রতি চল্লিশটি মুক্ত উষ্ট্রের একটি করে তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক।'

একশত বিশটির ঊর্ধ্ব সংখ্যক উটের যাকাত পর্যায়ে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতেও এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তখনও প্রতি চল্লিশটি উষ্ট্রে একটি করে তৃতীয় বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী শাবক, আর প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি তৃতীয় বর্ষে উপনীতা ও প্রতি ত্রিশটিতে একটি করে এক বছরের বাছুর দিতে হবে।

আমি বলব, প্রবৃদ্ধি সাধন, প্রতিপত্তি অর্জন ও অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে পালিত সমস্ত উম্মুক্ত চরায় পালিত পশুর যাকাত ফরয বলা একটি সহীহ্ ইজতিহাদ বটে। তা এমন 'কিয়াস' ভিত্তিক, যাকাতের ক্ষেত্র নির্ধারণে যার কার্যকারিতার প্রতি আমরা সকলেই বিশ্বাসী। যেন আমরা বিভিন্ন প্রবৃদ্ধিশীল সম্পদের উপর যাকাত ধার্যকরণে কোন তারতম্যের নীতি অনুসরণ না করি, এ জন্যে এই ব্যবস্থা। অতএব খচ্চর ও বন্য ছাগলও এর মধ্যে গণ্য হবে। এর মূল্য ধরে দশ ভাগের এক ভাগের এক-চতুর্থাংশ যাকাত আদায় করতে হবে।

অনেক মনীষীই সব জন্তুর যাকাতের নিসাব ধরেছেন নগদ সম্পদের হিসেবে—বিশ মিশকাল (84 c, gramms) স্বর্ণ। যখন পশু সম্পদের মূল্য এই পরিমাণ হবে, তখনই তাতে যাকাত ফরয হবে। কিন্তু আমি এ মতের বিপরীত মত পোষণ করি। অবশ্য স্বর্ণ মানে নিসাব নির্ধারণে আমার কিছুই বক্তব্য নেই। কিন্তু পশুর যাকাতের নিসাব নগদ সম্পদের যাকাতের নিসাবের সমান মনে করায় আমার ভীষণ আপত্তি। এরূপ নিসাব নির্ধারণে বলা হয়েছে ৫টি উট ও ৪০টি ছাগল দুইশত দিরহামের সমান। অথচ আমরা দেখেছি, ইবনুল হুম্মাম ও ইবনে নাজীম দুটি ছাগীর মূল্য ২০ দিরহাম ধরেছেন। তাহলে ৪০টি ছাগী ৪০০দিরহামের সমান হয় অর্থাৎ নগদ সম্পদের দ্বিগুণ।

এক্ষণে নগদ সম্পদের নিসাবকে যদি এক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণই করতে হয়, তাহলে পশুর নিসাবের হিসাব নগদ সম্পদের নিসাবের দ্বিগুণ হতে হবে। কেননা নগদ সম্পদ মানুষকে পশু ইত্যাদির মালিকানার তুলনায় অধিক শক্তিশালী বানিয়ে দেয়। এ কারণে শরীয়াতের বিধানদাতা নগদ সম্পদের নিসাব খুব কম পরিমাণকে বানিয়েছেন, যতটা কম মুক্ত পশুর নিসাব ধরেন নি।

আমরা এখানে বর্ধনশীল পশুর যাকাতের নিসাব দুটো ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে পারিঃ

১. তার সংখ্যা পাঁচটির কম হবে না। কেননা আমরা লক্ষ্য করছি, শরীয়াতে পাঁচ অসাকের কমেও কোন যাকাত নেই। নগদ রৌপ্য সম্পদের পাঁচ আউন্সের (Ounce) কমেও কোন যাকাত দিতে হবে না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে পাঁচ হচ্ছে কম-সে কম সংখ্যা।

২. তার মূল্য পাঁচটি উষ্ট্র অথবা চল্লিশটি ছাগলের মূল্যের কম হবে না—দেশের সাধারণ বাজার মূল্যের দৃষ্টিতে মূল্য নির্ধারণে নগদ সম্পদের মূল্যের তুলনায় পাঁচটি উষ্ট্র বা চল্লিশটি ছাগলের মূল্যকে ভিত্তিরূপে গণ্য করা দুটো কারণে উত্তমঃ

ক—নগদ সম্পদের মূল্য ক্রয়শক্তির নিত্য পরিবর্তনশীলতার দরুন স্থিতিশীল হয় না। কেননা অর্থনৈতিক অবস্থাও সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে। যেমন বিশ মিশকাল একটি জন্তু বা তার অর্ধেকেও সমান হয় না।

খ—এক ধরনের পশুর মূল্য অন্য ধরনের পশুর মূল্যের দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা বিধিসম্মত। অপর জাতীয় সম্পদের মূল্যের দৃষ্টিতে কিয়াস করা অপেক্ষা এটা অনেক উত্তম।

দশম আলোচনা

প্রাথমিক কথা

পশু সম্পদের যাকাত পর্যায়ে আমাদের আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে। অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন যে, এ বিষয়ে এতটা দীর্ঘ আলোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না। বিশেষ করে এ জন্যে যে, রাসূলে করীম (স) ও খিলাফতের আমলে যেমন পশু সম্পদকে অর্থনীতির স্তম্ভ বা ভিত্তি মনে করা হত, বর্তমানে তা মনে করা হয় না।

কিন্তু দুটো কারণে আমরা এ আলোচনা দীর্ঘ করেছিঃ

প্রথম, শরীয়াতের বিধানেই পশুর যাকাত সংক্রান্ত আলোচনা দীর্ঘ করা হয়েছে তাতে বহু আইন-বিধানেরও উল্লেখ করা হয়েছে, যা অন্যান্য ব্যাপারে করা হয়নি।

দ্বিতীয়, এই দীর্ঘ আলোচনা আমাদের সম্মুখে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ মৌলনীতি উপস্থাপিত করেছে। তার ভিত্তিতে আমরা যাকাতের তত্ত্ব ও প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত করতে সমর্থ হতে পারি। তার নিয়ম-বিধানসমূহও জানতে পারা সম্ভব হচ্ছে। এ পর্যায়ে কতগুলো বিষয়ের উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

১. যাকাত একটি ইবাদতের কাজ হলেও তা একটি সরকারী ব্যবস্থাপনা বিশেষ। ইসলামী রাষ্ট্রই তা বাস্তবায়িত করার অধিকারী। যাকাত আদায়কারী প্রেরণ ও মালিকের কাছ থেকে সম্পদের যাকাত গ্রহণ করানো তার অন্যতম দায়িত্ব।

২. যাকাত ফরয করা হয়েছে এক হিসেবে গরীব লোকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, অপর হিসেবে সম্পদ-মালিকদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে। এই কারণে স্বল্প পরিমাণের সম্পদকে যাকাত থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে এবং শরীয়াতের নির্দেশ হচ্ছে মধ্যম মানের মাল গ্রহণ ও ত্রুটিপূর্ণ মাল গ্রহণ করতে অস্বীকার করা।

৩. পশু পালনে যে কত কষ্ট ও ব্যয় হয়, যাকাত অব্যাহতি কিংবা হালকা-করণের ব্যাপারটি তার উপর নির্ভরশীল। এ কারণে জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ সারা বছর ধরে ঘাস খাওয়াতে হয়—এমন পশুকুলের যাকাত নাকচ করে দিয়েছেন। কেননা অধিক কষ্ট স্বীকারের কারণে তার প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৪. বর্ধনশীল মাল প্রবৃদ্ধির দিক থেকে ব্যক্তিগত ব্যবহার ও ভোগের দিকে ফিরিয়ে দিলে তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। গরু ও উষ্ট্র সাধারণত কৃষি, পানি উত্তোলন ও ভার বহন ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, বংশ বৃদ্ধি ও দুগ্ধ আহরণে নয়। তাই এর উপর যাকাত হবে না।

৫. একাধিক লোকের শরীকানা কারবারকে শরীয়াতে তাৎপর্যগতভাবে এক 'অখণ্ড ব্যক্তিত্ব' মনে করা হয়েছে, তার শরীক ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র সত্তার দিকে লক্ষ্য দেয়া হয়নি। আর এভাবেই তার উপর যাকাত ধার্য করার নীতি গৃহীত হয়েছে। যৌথ পশু খামার পর্যায়ে জম্হুর ফিকাহ্বিদদের এই মত। আর শাফেয়ী মতের লোকদের এটাই অভিমত সমস্ত প্রকারের মালের যৌথ মালিকানায়।

৬. ফরয থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে যেসব কৌশল অবলম্বিত হয়—যেমন হারাম জিনিসকে মুবাহ্ মনে করা—শরীয়াত তা বাতিল ঘোষণা করেছে। এ কারণে নবী করীম (স) যাকাত দেয়ার ভয়ে মাল একত্রিত বা বিচ্ছিন্নকরণ করতে নিষেধ করেছেন।

৭. যাকাতের মাসয়ালা-মাসায়েলে 'কিয়াস' প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। কেননা এতদ্সংক্রান্ত সমস্ত হুকুম-আহ্কাম কারণভিত্তিক। আর 'কারণ' সংক্রমণ প্রকৃতি সম্পন্ন। এ কারণে হযরত উমর ফারূক (রা) ঘোড়ার যাকাত আদায় করেছেন। এ প্রেক্ষিতেই আমরা মুক্তভাবে পালিত জন্তুগুলোর যাকাত গ্রহণের কথা বলেছি। যদিও নবী করীম (স) ও খিলাফত আমলে তা করা হয়নি। যাকাত ফরয হওয়ার 'কারণ' এখানে বিদ্যমান বলেই আমরা এ মত গ্রহণ করছি।

৮. নবী করীম (স) যেসব বিধান প্রর্বতন করেছেন, তা তিনি করেছেন মুসলিম উম্মতের ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। একথা অনুধাবন ও উপলব্ধি করা আবশ্যক। এ কারণে তাঁর প্রদত্ত বিধানাবলীর মধ্যে পার্থক্যকরণেরও প্রয়োজন। এ দৃষ্টিতে নবী করীম (স)-এর লিখিত ও তাঁর খলীফাগণের লেখনের মধ্যকার কোন কোন হালকা ধরনের পার্থক্যের ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি।

৯. যাকাতে পশু সম্পদের যাকাত নগদ সম্পদের দ্বিগুণ। এ কারণে দুটি ছাগীর মূল্য পরিমাণ ধরা হয়েছে বিশ দিরহাম। তাহলে চল্লিশটি ছাগীর মূল্য পরিমাণ হয় ৪০০ দিরহাম। অথচ দিরহামের নিসাব হয় সর্বসম্মতিক্রমে ২০০ দিরহামে।

১০. যাকাত পশু সম্পদেও একটা আপেক্ষিক কর মাত্র, তা বিপরীত দিক দিয়ে উর্ধ্বমুখী হয় না, যেমন কেউ কেউ মনে করেন। ছাগলের যাকাতে এ হার খুবই হালকা ধরা হয়েছে এক বিশেষ যৌক্তিকতার কারণে; যার ব্যাখ্যা পূর্বে দেয়া হয়েছে।

১১. পশুসম্পদের যাকাতের ফরয পরিমাণ প্রায় দশ ভাগের এক-চতুর্থাংশ, তাই উষ্ট্র ও গরুতেও সুস্পষ্ট। ছাগলের যাকাত কম গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের দেয়া ব্যাখ্যার আলোকে তাই বোঝায়। এভাবে পশুর যাকাত এবং পণ্যদ্রব্য ও নগদ সম্পদের যাকাতের পরিমাণ সমান হয়। এভাবে যে, এ সব থেকে যা গ্রহণ করা হবে তা শতকরা ২.৫ অংশ। মূলধনের যাকাত তাই।

এ সব তথ্যই পশু সম্পদের যাকাত সংক্রান্ত এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে পাওয়া গেছে। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে তা আমাদের অনেক উপকার দেবে ইনশাআল্লাহ্।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত

স্বর্ণ ও রৌপ্য দুটি উত্তম খনিজ সম্পদ। আল্লাহ্ তা'আলা এ দুটির মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন, যা অপরাপর খনিজ সম্পদে লক্ষ্য করা যায় না। এ দুটি সম্পদের অপ্রতুলতা ও উত্তমতার কারণে প্রাচীনকাল থেকেই বহু জাতি এ দুটি ধাতুর দ্বারা নগদ সম্পদ বা মুদ্রা বানিয়েছে ও দ্রব্যমূল্যের মান হিসাবে গ্রহণ করেছে।

এ কারণে ইসলামী শরীয়াত এ দুটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। এ দুটি স্বতঃই বর্ধনশীল সম্পদরূপে গণ্য হয়ে এসেছে। তাই শরীয়াত তার উপর যাকাত ফরয করেছে, তা নগদ সম্পদ হয়ে থাকুক, কিংবা খনিজ দ্রব্য হয়েই থাকুক। তা দিয়ে পাত্র, উপঢৌকন, প্রতিমূর্তি কিংবা পুরুষের ব্যবহার্য অলংকার বানানো হলেও তাতে যাকাত ধার্য হবে।

তবে মহিলাদের অলংকাররূপে ব্যবহৃত হলে সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত হবে। সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত সম্পর্কে আমরা দুটি পর্যায়ে আলোচনা পেশ করছি।

প্রথম আলোচনা ঃ নগদ সম্পদের যাকাতও এ পর্যায়ে গণ্য শর্তাবলী। দ্বিতীয় আলোচনা ঃ অলংকারাদি, উপঢৌকনাদির যাকাত এবং এ বিষয়ের মতভেদ ইত্যাদি।

প্রথম আলোচনা

নগদ সম্পদের যাকাত

নগদ সম্পদের ভূমিকা ও পর্যায়সমূহ

প্রাথমিক কালের মানুষ নগদ সম্পদ বলতে কিছুই জানতো না। তখনকার মানুষ পণ্যদ্রব্য অনুমানের ভিত্তিতে পারস্পরিক বিনিময় করে নিত। প্রত্যেক উৎপাদনকারী স্বীয় প্রয়োজনাতিরিক্ত পণ্য অপরকে দিয়ে তার কাছ থেকে স্বীয় প্রয়োজনীয় পণ্য গ্রহণ করত।

তবে আনুমানিকভাবে পণ্য বিনিময়ের এই কাজটি সীমাবদ্ধ সমাজেই সম্ভবপর হচ্ছিল। তাতে কার্য সম্পাদনে খুবই বিলম্ব হত এবং সময় ও শ্রমের অপচয় অনিবার্য হয়ে দাঁড়াত। তাতে বহু শর্ত কড়া বাধ্যবাধকতাও আরোপিত হত, তার পরই কার্য সম্পাদিত হয়েছে বলে মনে করা যেত। তাছাড়া তাতে দ্রব্যমূল্যে চরম অনিশ্চয়তা ও বিভিন্নতাও দেখা দিত। আর তার কারণ ছিল শুধু এই যে, পারস্পরিক পণ্য বিনিময়ের কোন সুপরিচিত মানদণ্ড ছিল না। উত্তরকালে আল্লাহ্‌র দেয়া জ্ঞানের আলোকে মানুষ পণ্য বিনিময়ে নগদ অর্থ ব্যবহার করতে শিখল। আর তাই হল পারস্পরিক পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম ও সর্বজনস্বীকৃত মান। তার ভিত্তিতেই দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা হত, মুনাফার হিসাব করা হত, শ্রমের মূল্য ধরা হত—এতে করে জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় কার্য খুবই সহজতর হয়ে উঠল।

এই সম্পদ ব্যবহার শুরু হওয়ার পর তা বহু স্তর পার হয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত এই উত্তম খনিজ সম্পদের পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ পর্যায়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশেষ পদার্থ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বস্তুত এ দুটি পদার্থে আল্লাহ্ তা'আলা বহু বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব ও প্রকৃতিগতভাবে বহু গুরুত্ব রেখেছেন, যা অন্য কোন পদার্থে পাওয়া যায় না।

রাসূলে করীমের যুগে প্রচলিত নগদ অর্থ

যে সময় নবী করীম (স) প্রেরিত হলেন, তখনকার সমাজ এ দুটি নগদ মুদ্রার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় সমাধা করত। স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত হত 'দীনার', আর রৌপ্য দিয়ে 'দিরহাম'। প্রতিবেশী অনেকগুলো রাষ্ট্র থেকেও তাদের কাছে এ দুই মদ্রাই চলে আসত। বাইজেন্টাইন রোমান সাম্রাজ্যে প্রধানত 'দীনার' প্রচলিত ছিল। আর পারস্যে ছিল রৌপ্য নির্মিত 'দিরহাম'। কিন্তু দিরহাম বিভিন্ন ওজনের হত—ছোটও হত, বড়ও হত, কম ওজনের হত, হত ভারী ওজনেরও। এ কারণে জাহিলিয়াতের যুগে

মক্কার লোকেরা তাকে গণনার ভিত্তিতে ব্যবহার করত না, করত ওজনের ভিত্তিতে। তা টুকরা হয়ে থাকত, তার উপর কোন ছাপ মুদ্রিত হত না।

আর তাদের মধ্যে কতগুলো ওজন স্বীকৃতভাবে প্রচলিত ছিল। তার একটা ছিল 'তরল'—১২ 'আউকিয়া' (আউন্স) এবং এক 'আউকিয়া'য় চল্লিশ দিরহাম। আর 'নশ্' হচ্ছে বিশ দিরহামের সমান অর্থাৎ এক আউকিয়া'র অর্ধেক। আর পাঁচ দিরহাম হচ্ছে এক 'নওয়াত'।

নবী করীম (স) মক্কাবাসীদের এসব ব্যবস্থাপনা পরাপুরিভাবে বহাল রেখেছিলেন, এতে কোনরূপ পরিবর্তন আনেন নি। বলেছিলেন, 'মক্কাবাসীদের পাল্লাই সঠিক পাল্লা' এবং ধন-মালের যাকাত 'দিরহাম' ও 'দীনারের হিসাবে চালু করলেন। এই কারণে স্বর্ণ ও রৌপ্যকে শরীয়াতসম্মত নগদ সম্পদরূপে গণ্য করা হল এবং তিনি তার উপর বহুবিধ আইন-কানুন কার্যকর করে দিলেন। তার অনেকগুলো ব্যবসায়ী ও সামাজিক ধরনের আইন; যেমন সুদ ও ব্যয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান। আর কতগুলো ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন মোহরানা। অনেকগুলো দণ্ডবিধিও রয়েছে। যেমন কত পরিমাণ মাল চুরিতে হাত কাটা নির্দেশ কার্যকর হবে। অর্থনৈতিক বিধি-বিধানও অনেক রয়েছে, বিশেষ করে যাকাত সংক্রান্ত আইন।

নগদ সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার দলীল

নগদ সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার কথা কুরআন-হাদীস ও ইজ্‌মা দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত।

কুরআনের আয়াত ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ- يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

যারাই স্বর্ণ ও রৌপ্য একীভূত ও পুঁজি করে রাখবে, তা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করবে না, তাদের তীব্র উৎপীড়ক আযাবের সুসংবাদ দাও—যে দিন সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, পরে তার দ্বারা তাদের কপোল-পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দাগ দেয়া হবে। বলা হবে, এ তা-ই, যা তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্যে পুঁজি করে রেখেছিলে। অতএব এক্ষণে তোমরা স্বাদ আস্বাদন কর সেই জিনিসের, যা তোমরা পুঁজি করে রেখেছিলে।

এই আয়াতদ্বয়ে কঠিন আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে শুধু এজন্যে যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যে মোটামুটিভাবে আল্লাহ্‌র হক রয়েছে। তা খরচ করবে না বলে ইঙ্গিতে নগদ সম্পদের

কথাই বলা হয়েছে। কেননা তাই ব্যয় করা সম্ভব, প্রচলিত ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমই। এ পর্যায়ে সে দুটি ব্যয় করবে না বলে বলা হয়েছে ঃ তা ব্যয় করবে না। তার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, এ দুটি ধাতব পদার্থ দিয়ে নগদ সম্পদ যাই বানানো হবে, তাই ব্যয় করতে হবে।

আয়াতটিতে দুটি কাজের জন্যে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে ঃ একটি তা পুঁজি করে রাখা, এবং দ্বিতীয় তা আল্লাহ্র পথে খরচ না করা। অতএব যে লোক যাকাত দেয় না, সে-ই তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না।

সুন্নাতের দলীল হচ্ছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–র বর্ণনা; নবী করীম (স) বলেছেনঃ

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَايُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا الاَّ اذَاكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُعِلَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنَ نَّارٍ فَأُحْمِىْ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰى بِهَاجَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ - خَمْسِيْنَ الْفُ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ امَّا الَى الْجَنَّةِ وَامَّا الَى النَّارِ

(تخاری ، مسلم)

যে স্বর্ণ রৌপ্যের মালিকই তার হক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের এক পাশ তার জন্যে প্রস্তুত করা হবে, পরে তা জাহান্নামে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তার পার্শ্ব, কপাল ও পৃষ্টদেশে দাগ দেয়া হবে। তা যখনই শীতল হয়ে যাবে, পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। এসব করা হবে সেই দিন যার পরিধি পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। সেদিন শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হবে। অতঃপর তারা তাদের পথ—হয় জান্নাতের দিকে দেখবে, নতুবা দেখবে জাহান্নামের দিকে। এসব আযাব ভীতি স্বর্ণ রৌপ্যের যাকাত না দেয়ার জন্যে ঘোষিত হয়েছে।

উপরিউক্ত হাদীসে যে 'হক' বলা হয়েছে, অপর এক বর্ণনায় তার তাৎপর্য বলা হয়েছে 'যাকাত'। যেমন একটি বর্ণনার স্পষ্ট ভাষা হল ঃ

مَامِنْ صَاحِبِ كَنْزِلَايُؤَدِّى زَكٰوتَهُ الاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ-

যে লোকই তার পুঁজিকৃত নগদ সম্পদের যাকাত আদায় করবে না তা-ই জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে...

পূর্বে উদ্ধৃত হযরত আনাস বর্ণিত হাদীসে রাসূলের ফরয করা যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ই রাসূলকে তা করতে বলেছেন। পরে, হযরত আবূ বকর (রা) যখন

তাঁকে বাহ্‌রাইনে পাঠিয়ে দিলেন, তখন তাঁকে যা লিখে দিয়েছিলেন, তাতে এ-ও রয়েছেঃ 'নগদ সম্পদের যাকাতের হিসাব হচ্ছে প্রতি দুইশ' দিরহামের দশ ভাগের এক ভাগের এক-চতুর্থাংশ, যদি সম্পদের পরিমাণ একশ' নব্বই হয়, তবে তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। তবে মালিক দিতে চাইলে ....

আর ইজমার দলীল হচ্ছে, ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়েই নগদ সম্পদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মত সম্পূর্ণ একমত রয়েছে। এক্ষেত্রে আদৌ কোন মতভেদ কখনই দেখা দেয়নি।

নগদ সম্পদে ধার্য হওয়ার যৌক্তিকতা

নগদ সম্পদের প্রকৃতি হচ্ছে চলাচল ও আবর্তিত হওয়া। ফলে যারাই এর সাথে সম্পর্কিত হয়, তারাই তা থেকে ফায়দা পেতে পারে। তা যদি পুঁজি করে আটকে রাখা হয়, তাহলে সর্বস্তরে এক চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, বেকারত্ব ব্যাপক হয়ে উঠে, হাট-বাজার অচল হয়ে দাঁড়ায়। আর সাধারণভাবেই অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও মন্দাভাব দেখা দেয়।

এ কারণে যে নগদ মূলধনই যাকাত পরিমাণ হবে, এক বছর অতীত হওয়ার পরই তার যাকাত দেয়া ফরয হবে। মালিক তা কোন উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করুক, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। নগদ সম্পদকে আটকে রাখার প্রবণতার উপর এটা একটা চাবুক আঘাত বিশেষ। অর্থনীতিবিদগণ পুঁজিকরণ ব্যাধির প্রতিষেধক বা চিকিৎসা স্বরূপ এ ব্যবস্থার কার্যকরতা স্বীকার করেছেন। এমন কি তাদের কেউ কেউ নগদ সম্পদকে পুঁজি-অযোগ্য বানানোর জন্যে তার উৎপাদন তারিখ লিখে দেয়ারও প্রস্তাব কারেছেন, যেন নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর তা অচল হয়ে যায়। তখন তা পুঁজি করা অসম্ভব বা অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদরা একটা নতুন চিন্তা বাস্তবায়িত করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাহল, প্রতিটি নগদ মুদ্রার উপর মাসিক চিহ্ন অংকিত করে দেয়া, যেন যে-ই তা পাবে সে-ই যেন সেই মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই তার হাত থেকে অন্য লোকের হাতে পৌঁছিয়ে দেয়। ফলে বিনিময় তৎপরতা অব্যাহত থাকবে, আবর্তনের গতি প্রশস্ততর হবে এবং সাধারণভাবেই অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে।

এই যে পন্থা ও উপায়ের প্রস্তাব করা হয়েছে—যা কার্যত চালুও হয়েছে—বাস্তবায়িত করা বড়ই দুষ্কর ও কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও—যে অবস্থায়ই হোক, তা নগদ সম্পদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিকোণেরই সমর্থন করে। তা অধিক ব্যাপকভাবে পুঁজিকরণ প্রতিরুদ্ধ করে। আর তা হচ্ছে প্রতি একশ'তে ২.৫ ভাগ বার্ষিক হিসাবে তার উপর দেয় ফরয করে দেয়া। এ কারণে মালিক তার অবশিষ্ট সম্পদকে অধিক উৎপাদনের কাজে বিনিয়োগ করতে পারে। অন্যথায় যাকাত সেই অবশিষ্টকেও কালের অগ্রগতির সাথে নিঃশেষে খেয়ে ফেলবে।

এ কারণেই ইয়াতীমের মাল-সম্পদ নিয়ে ব্যবসা করার জন্যে হাদীসে উৎসাহ দেয়া হয়েছে, যেন যাকাত দিতে দিতে তা নিঃশেষ হয়ে না যায়।

ইয়াতীমের মূলধন নিয়ে ব্যবসা করার জন্যে বিশেষভাবে উৎসাহ দেয়া হয়েছে এ উদ্দেশ্যে, যেন কোন লোক নিজের মূলধনকে বেকার ফেলে না রাখে, তাহলে তা স্বতঃ প্রবৃদ্ধি লাভ করতে থাকবে। অন্তর্নিহিত এ ক্ষয় প্রতিরোধ ব্যবস্থার ঐকান্তিক দাবিই হচ্ছে তাই। ইয়াতীমের মাল তো মুতাওয়াল্লীর হাতে থাকে। সে ইচ্ছা করেই সে মাল বেকার ফেলে রাখতে পারে, অবসাদগ্রস্ততা তার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ কারণেই নবী করীমের নির্দেশ হচ্ছে, এ মালের প্রবৃদ্ধি চাওয়া, যেন তা বিনাস ও নিঃশেষ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

নগদ সম্পদের যাকাতের পরিমাণ

নগদ সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত মুসলমান যেমন একমত, তেমনি তার ফরয পরিমাণেও কোন দ্বিমত নেই। আল-মুগনী গ্রন্থে লিখিত হয়েছে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত পরিমাণ হচ্ছে দশভাগের এক-চতুর্থাংশ, এতে কোন মতভেদ নেই, নবী করীমের উক্তি في الرقة ربع العشر 'নগদ সম্পদে দশ ভাগের এক ভাগের এক-চতুর্থাংশ যাকাত' এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে।

এ পরিমাণ খুবই কম। দশ ভাগের এক ভাগ কিংবা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ধার্য করা হয়নি, যেমন ফসলের যাকাতে তা ধরা হয়েছে। তার কারণ, জমির অনুপাতে ফসল ও ফলাদি হচ্ছে মূলধনের মুনাফার মত। এ কারণে তাতে মুনাফার উপর কর ধরা হয়েছে—তাতে যে শ্রম ও ব্যয় হয় এর প্রতি লক্ষ্য রেখে। কিন্তু নগদ মূলধনের যাকাত সেরূপ নয়। সেখানে তো আসল মূলধনের সমস্তটার উপরই যাকাত ধার্য হয়েছে। তা প্রবৃদ্ধি লাভ করুক আর না-ই করুক, মুনাফা অর্জনে সক্ষম হোক, আর না-ই হোক।

এ কালে এ পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় কি

এ কালে কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদ ইসলামী বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন না করেই বলতে শুরু করেছেন যে, যাকাতের প্রচলিত পরিমাণ এ কালের সমাজের প্রয়োজন পূরণে মোটেই সক্ষম বা যথেষ্ট নয়। কেননা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক বিবর্তন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ফলে এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। সরকার যেন প্রয়োজন ও ক্ষেত্রের দৃষ্টিতে তার পরিমাণ বাড়াতে পারে, তার সুযোগ থাকা আবশ্যক।

কিন্তু এ মত কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়; বরং প্রত্যাহারযোগ্য সর্বতোভাবে। তার প্রমাণসমূহ এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

১. এ মত শরীয়াতের সুস্পষ্ট অকাট্য দলীলের পরিপন্থী, যে দলীল রাসূলে করীম (স) ও তারপর খুলাফায়ে রাশেদূনের সুন্নাত থেকে প্রমাণিত; অথচ রাসূলে করীম (স) এ

সুন্নাত আঁকড়ে ধরা ও পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করার জন্যে সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার বিরোধিতা করার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

ইরশাদ করেছেন ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

সেসব লোক যেন সতর্ক হয়ে যায়, যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করে। কেননা ভয় রয়েছে তাদের উপর একটি কঠিন বিপদ আসার অথবা এক তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার।

২. এ মত গোটা মুসলিম উম্মতের ইজ্মা'র সম্পূর্ণ পরিপন্থী, বিগত চৌদ্দশ বছরের মুসলিম জাতির ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত ও আমলের সম্পূর্ণ খেলাফ। এ সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন ও বিবর্তন সাধিত হয়েছে, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অবস্থাও কখনও অপরিবর্তিত থাকেনি। খলীফা ও প্রশাসকবৃন্দ অনেক সময় কঠিন প্রয়োজনে বায়তুলমাল শূন্য করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলিমগণ কখনই যাকাতের হার বৃদ্ধি করার পক্ষে কোন মত প্রকাশ করেন নি।

৩. এ ইজমা যে অবিসংবাদিত, তার প্রমাণ হচ্ছে, মানুষের ধন-মালের উপর যাকাত ছাড়াও জনগণের হক আছে কিনা, তা নিয়ে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যাকাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যদি সম্ভবই হত তা হলে এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়ার কোন কারণ থাকে না। এ মতবিরোধই প্রমাণ করে যে, যাকাতের পরিমাণ উভয় পক্ষের লোকদের মতে সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। মতবিরোধ ছিল এই ব্যাপারে যে, প্রয়োজনকালে যাকাত ছাড়াও আর কোন হক ধনশালী লোকদের ধন-মালে আছে কিনা এবং তা নেয়া যাবে কিনা?

৪. ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে 'কিয়াস' প্রয়োগে সর্বাধিক ব্যাপকতা ও প্রশস্ততা দেখিয়েছেন হানাফী মতের ফকীহগণ। কিন্তু তাঁরাও মনে করেন, যাকাতের হার নির্ধারণে 'কিয়াস'-এর কোন স্থান নেই। কেননা এ নির্ধারণের নিরঙ্কুশ অধিকার হচ্ছে শরীয়াতদাতার। তিনি তা চূড়ান্তভাবেই করে গেছেন। এমতাবস্থায় শরীয়াতের অকাট্য দলীল ও ইজমার দ্বারা প্রমাণিত পরিমাণ কিয়াস দ্বারা কেমন করে পরির্বতন করা যাবে?

৫. যাকাত হচ্ছে দ্বীনি ফরয, সবকিছুর উর্ধ্বে তার স্থান। আর এ হচ্ছে স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় ফরয। কেননা তা ইসলামের অন্যতম রুক্‌ন। মহান ইজ্মার ভিত্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত। এ হার বৃদ্ধি করা হলে তা পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামষ্টিক অবস্থার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে—স্থিতিশীলতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হবে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে তার হার বিভিন্ন হতে বাধ্য হবে। এক-এক সরকার এক-এক রকমের হার ইচ্ছামত নির্ধারণ করবে। কেউ শতকরা বিশ ভাগ, কেউ ত্রিশ

ভাগ নির্ধারণ করবে। কেউ তা ক্রমবর্ধনশীল হারের কম বলে মনে করবে। তা হলে শরীয়াতদাতা এই হার নির্ধারিত করে বিভিন্ন দেশ ও অবস্থার মধ্যে জীবন যাপনকারী মুসলিম উম্মতকে শরীয়াতের ফরয ও রুকন পালনে যে ঐক্যবদ্ধ ও অভিন্ন করতে চেয়েছিলেন, তা কোথায় থাকবে—তার অবস্থা কি দাঁড়াবে?

৬. তাছাড়া যে হার একবার বৃদ্ধি করা হবে, তা একবার হ্রাসও তো করা হতে পারে। আর যে নির্দিষ্ট হার একবার হ্রাস করা হবে, তা কখনো সম্পর্ণ বাতিলও করা হবে না, এমন নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? কেননা কখনও যদি ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রাচুর্যে ভরপুর হয়ে যায়, সরকার নানা অর্থনৈতিক উপকরণে বিপুলভাবে ধনশালী হয়ে পড়ে, তখন তো বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাকাতের কোন প্রয়োজনই লক্ষ্য করা যাবে না। এরূপ অবস্থায় যাকাত একটা ইবাদত হিসেবে তার সমস্ত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে, ইসলামের শাশ্বত বিধান পদদলিত ও উপেক্ষিত হবে। তা রাষ্ট্র কর্তাদের হাতের খেলনায় পরিণত হবে এবং তারা নিজেদের ইচ্ছামত কখনও হ্রাস আর কখনো বৃদ্ধি করতে থাকবে।

৭. যাকাতের হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বার একবার উন্মুক্ত করা হলে ইসলামী শরীয়াতের পবিত্রতা বিনষ্ট হওয়া অবধারিত। তখন তা আর শুধু যাকাতের হার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না, ইসলামের গোটা বিধান ও ব্যবস্থাকেও চরমভাবে আঘাত হানতে দ্বিধা করবে না। তবে আজকের সমাজের প্রয়োজন পূরণ ও রাষ্ট্রীয় অভাব দূরীকরণের জন্যে 'কর' ধার্য করায় তো কোন বাধা নেই। তখন তা যাকাতের বাইরের ব্যবস্থা হবে, প্রয়োজনও অপূরণীয় থাকবে না।

নগদ সম্পদের নিসাব

বুখারী-মুসলিমে উদ্ধৃত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

মুদ্রিত মুদ্রার পাঁচ আওকিয়ার (ounce) কমে কোন যাকাত নেই।

কুরআন মজীদে আসহাবে কাহ্ফের কিস্সায় বলা হয়েছে ঃ

فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ اِلَى الْمَدِيْنَةِ

তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে এ মুদ্রাসহ শহরের দিকে পাঠিয়ে দাও।

ورق অর্থ নগদ মুদ্রা। যে রৌপ্য মুদ্রার ছাপ পড়েনি তা নগদ মুদ্রা নয়, তাকে ورق ও বলা হয় না। 'কামুস' ও 'লিসানুল আরব' প্রভৃতি অভিধান গ্রন্থে তা-ই লিখা হয়েছে। প্রাচীন আরব কাব্য ও রাসূলের হাদীস থেকেও এ অর্থ সমর্থিত। আবূ উবাইদও

এ মতই প্রকাশ করেছেন। বলেছেন ঃ আউকিয়া বলতে চল্লিশ দিরহাম বোঝায়। তাই পাঁচ আউকিয়া অর্থ দুইশ দিরহাম।'

জানা যায়, নবী করীমের সময়ে নগদ রৌপ্য মুদ্রা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ছিল। এ কারণে হাদীসে তার বিপুল উল্লেখ বিদ্যমান, আর তারই ভিত্তিতে ফরয যাকাতের নিসাবও নির্ধারিত হয়েছে। দিরহামের নিসাব যেমন স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, তাতে কত দিতে হবে, তাও পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। আর জানা গেছে যে, রৌপ্যের নিসাব হচ্ছে দুইশ দিরহাম। এ ব্যাপারে কারোরই কোন দ্বিমত নেই।

আর নগদ স্বর্ণ মুদ্রা—দীনার-এর নিসাব নির্ধারণে সে রকম শক্তিশালী কোন হাদীস উদ্ধৃত হয়নি, যতটা রৌপ্যমুদ্রার ক্ষেত্রে হয়েছে। এ কারণে রৌপ্যের ন্যায় স্বর্ণ মুদ্রার নিসাবে ঐকমত্য অর্জিত হয়নি যদিও বিপুল সংখ্যক ফিকাহবিদ বলেছেন যে, তার নিসাব হচ্ছে বিশ দীনার।

হাসান বসরীর মত হচ্ছে দীনারের নিসাব চল্লিশ দীনার। এটা অনেকের মত বলে বর্ণিতও হয়েছে। স্বর্ণের নিসাব স্বর্ণই গ্রহণীয়। অবশ্য তাউস ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি স্বর্ণের নিসাব নির্ধারণে রৌপ্যের নিসাবকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। তাই যে পরিমাণ স্বর্ণের মূল্য দুইশ দিরহাম তাতেই যাকাত ফরয হবে। আতা, জুহরী, সুলায়মান ইবনে হারব, আইয়ুব ও সখতিয়ানীও এ মত পোষণ করতেন।

জমহুর ফিকাহবিদদের মতের সমর্থন নিম্নলিখিত বিষয় থেকে পাওয়া যায় ঃ

১. বহু মরফূ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে বটে, সে সবের সনদ সমালোচনার উর্ধ্বে থাকেনি; কিন্তু তার কতক অপর কতককে শক্তিশালী করে তোলে।

ক. ইবনে মাজা ও দারেকুতনী হযরত ইবনে উমর ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর ভাষা হলঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا نِصْفَ دِيْنَارٍ-

নবী করীম (স) প্রতি বিশ দীনারের যাকাত বাবদ অর্ধ দীনার গ্রহণ করতেন।

খ. দারেকুত্‌নী আমর ইবনে শুয়াইব—তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

لَيْسَ فِيْ اَقَلَّ مِّنْ عِشْرِيْن مِثْقَا لاَمِّنَ الذَّهَبِ وَلَا فِىْ اَقَلَّ مِنْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ-

বিশ বিশকাল (Ounce) স্বর্ণের কমে এবং দুইশ দিরহামের কম পরিমাণে কোন যাকাত নেই।

গ. আবূ উবাইদ আবদুর রহমান আনসারী তাবেয়ী থেকে হাদীস উদ্ধৃত করছেন ঃ

রাসূলের ও হযরত উমরের যাকাত সংক্রান্ত চিঠিতে লিখিত আছে ঃ

স্বর্ণ বিশ দীনার না হওয়া পর্যন্ত তা থেকে কিছুই গ্রহণ করা হবে না। বিশ দীনার হলে তা থেকে অর্ধ দীনার গ্রহণ করা হবে।

ঘ. আবূ দাউদ আলী ইবনে আবূ তালিব থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ- يَعنى فِىْ الذَّهَبِ حَتّٰى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَاذَا كَانَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ-

তোমার যখন দুইশ দিরহাম হবে ও তার উপর একটি বছর অতিবাহিত হবে, তখন তা থেকে পাঁচ দিরহাম দিতে হবে। আর স্বর্ণে বিশ দীনার না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে কিছুই দিতে হবে না। যখন বিশ দীনার হবে ও তার উপর একটি বছর অতিবাহিত হবে, তখন তা থেকে অর্ধ দীনার দিতে হবে।

হাদীসের হাফিযগণ এই হাদীসটি 'সহীহ্' বলে অভিহিত করেছে। দারে-কুত্নী বলেছেন, আসলে হাদীসটি হযরত আলীর উক্তি।

১. যাকাতের পরিমাণে যখন কোন কিয়াস চলে না, এই কথায় বিশ্বাসী হানাফিগণ তখন—হযরত আলী থেকে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসকে—যাতে বলা হয়েছে যে, স্বর্ণের নিসাব হচ্ছে বিশ দীনার—রাসূলের উক্তি বলেই মনে করতে হবে।

২. এই ঐতিহাসিক সত্যও উক্ত কথার সমর্থন দেয় যে, সেকালে এক দীনার দশ দিরহাম দিয়ে ভাঙানো যেত।

৩. সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তীকালে লোকদের আমলও ঐ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে এর উপর ইজমা হয়েছে মনে করতে হবে।

৪. হযরত আনাস (রা) বলেছেন, হযরত উমর আমাকে যাকাত আদায় করার দায়িত্বশীল বানিয়েছিলেন। তিনি আমাকে প্রতি বিশ দীনারে অর্ধ দীনার আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার বেশী চার দীনার হলে সেজন্যে অর্ধ দিরহাম নিতে বলেছিলেন।

৫. হযরত আলী থেকে বর্ণিত, 'বিশ দীনারের কমে কোন যাকাত নেই। আর বিশ দীনারে অর্ধ দীনার, চল্লিশ দীনারে এক দীনার—এই হাদীসটিকে অনেকেই রাসূলে করীমের উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

৬. ইবরাহীম নখয়ী বলেছেন, 'ইবনে মাসউদের স্ত্রীর বিশ মিশকাল ওজন স্বর্ণের একটা হার ছিল। তিনি তাঁকে তার যাকাত স্বরূপ পাঁচ দিরহাম দিতে বলেছিলেন'।

—১৬

৭. শা'বী, ইবনে সিরীন, ইবরাহীম, হাসান হিকাম ইবনে উতায়বা ও উমর ইবনে আবদুল আযীয প্রমুখ তাবেয়ী ইমামের মত হচ্ছে, 'বিশ দীনারে অর্ধ দীনার যাকাত।'

৮. আবূ উবাইদ ও ইবনে হাজম বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয লিখেছিলেন ঃ 'যে মুসলিমই তোমার কাছে আসবে তার প্রতি নজর দাও। তার বাহ্যিক ধন-মাল থেকে যাকাত আদায় কর, যা ব্যবসা ইত্যাদিতে আবর্তিত হয়। প্রতি চল্লিশ দীনারে এক দীনার আর তার কম হলে সেই নিসাব অনুযায়ী বিশ দীনার পর্যন্ত পৌছলে যাকাত হবে। এক-তৃতীয়াংশ দীনার ও তার থেকে কম হলে তা ছেড়ে দাও।'

এই পরিমাণটাই শেষ পর্যন্ত স্থির হয়ে গেছে। লোকেরা এই অনুযায়ীই আমল করেছে উমর ইবনে আবদুল আযীয পর্যন্ত। এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন মতবিরোধই দেখা দেয়নি। ফলে এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মতের কার্যত ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করতে হবে।

ইমাম মালিক গোটা উম্মতের—বিশেষ করে মদীনাবাসীর এই আমলকে চূড়ান্ত ফয়সালা বলে ধরে নিয়েছেন। তাই তিনি তাঁর 'আল-মুয়াত্তা গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'আমার মতে মতপার্থক্যমুক্ত সুন্নাত হচ্ছে, বিশ দীনার স্বর্ণমুদ্রার যাকাত ফরয হবে, যেমন দুশ' দিরহামে যাকাত ফরয হয়।

ইমাম শাফেয়ী 'কিতাবুল উম্ম'-এ বলেছেনঃ 'স্বর্ণের পরিমাণ বিশ (মিশকাল) পর্যন্ত না পৌছলে তাতে কোন যাকাত নেই। বিশ মিশকাল হলে তাতে যাকাত ফরয হবে—এই কথায় কোন মতবিরোধ আছে বলে আমার জানা নেই।'

আবূ উবাইদ তাঁর 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ 'স্বর্ণের নিসাব ২০ মিশকাল।' পরে বলেছেন, এই ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কোন লোক যদি বছরের শুরুতে যাকাত ফরয হওয়া পরিমাণ দুশ' দিরহাম কিংবা বিশ দীনার মালের মালিক হয় অথবা পাঁচটি উষ্ট্র বা ত্রিশটি গরু কিংবা চল্লিশটি ছাগলের বা এর কোন একটি প্রকারের মালিক হয় ও তা বছরের শেষ পর্যন্ত থাকে, তাহলে তার উপর বিশেষজ্ঞদের কথানুযায়ী অবশ্যই যাকাত ফরয হবে।

অনেক সংখ্যক ইমাম বলেছেন, হাদীসটির সনদে যা-ই থাক, গোটা মুসলিম উম্মত তা কবুল করে নিয়েছে। যেমন মেনে নিয়েছে হাদীস ঃ 'উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন ওসীয়াত হয় না।' এ পর্যায়ে ইমাম শাফেয়ী, ইবনে আবদুল বার, ইবনুল হুম্মাম, ইবনে হাজার, ইবনুল কাইয়্যেম প্রমুখ ইমাম ও হাফিয উল্লেখ্য। এই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইমাম তিরমিযী একটি হাদীস উদ্ধৃত করে তাকে যয়ীফ ও অপরিচিত অভিহিত করার পরও লিখেছেন ঃ 'আলিমগণের আমল কিন্তু এই হাদীস অনুযায়ী'। ইবনে আবদুল বার বলেন, হাদীসটি আমার মতে সহীহ্। কেননা আলিমগণ সেটি কবুল করে নিয়েছেন।

কথাটি সাধারণভাবে গ্রহণীয় নয়। আমরা লক্ষ্য করছি, একটি হাদীস যদি সনদের

দিক দিয়ে যয়ীফও হয়, আর শেষের দিকের লোকদের নয়; বরং সাহাবী ও পূর্বকালের লোকদের আমল তদনুযায়ী হয়ে থাকে, আর কোন গ্রহণীয় ও শরীয়াত-সম্মত বাধা তার বিরুদ্ধে না থাকে, তাহলে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। বিশ দীনারে যাকাত ফরয হওয়া পর্যায়ে ইতিপূর্বে আমরা যে হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করেছি, সে বিষয়েও এই একই কথা। কেননা তাতে এ সব দিকই বর্তমান রয়েছে।

এ সব হাদীসের সনদসমূহ গ্রহণীয় প্রায় এবং পূর্বকালের লোকদের আমলও সে অনুযায়ীই রয়েছে। তার বিরোধী কিছুই পাওয়া যায়নি; বরং অনুকূল কথাই পাওয়া গেছে। আর তার নিসাব হচ্ছে , বিশ দীনার বা দুইশ' দিরহামের সমান।

সংশয় ও তার অপনোদন

হাসান বসরী চল্লিশ দীনার নিসাবের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। এর দলীল হিসেবে আমর ইবনে হাজমকে লিখিত রাসূলের চিঠির কথা বলেছেন। অনেকে তাতে রৌপ্যের নিসাব উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ প্রতি চল্লিশ দীনারে এক দীনার।

আমার মতে হাদীসটিকে সহীহ্ মেনে নিলেও বলা যায়, চল্লিশের কম দীনারে যাকাত ধার্য হবে না এমন কোন কথা হাদীসে নেই। কেননা তা ফরয পরিমাণের অকাট্য দলীল; কিন্তু তাতে নিসাব বর্ণনা করা হয়নি। অতএব এই হাদীসের কথাঃ 'চল্লিশ দীনারে এক দীনার'—আমাদের প্রতি একশ'তে আড়াই অথবা প্রতি হাজারে পাঁচশ-এর মতই কথা। তাতে হার বলা হয়েছে মাত্র; কিন্তু নিসাব কত তা জানা যাবে রৌপ্যের নিসাব থেকে। সে দৃষ্টিতে বলা যায়, দুশ' দিরহাম হলে তা বিশ দীনারে পরিবর্তিত করা যাবে।

জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মত এভাবেই আপত্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

শরীয়াতসম্মত 'দিরহাম' ও দীনারের পরিমাণ

আমরা জানতে পেরেছি, রৌপ্যের নিসাব দুইশ' দিরহাম এবং স্বর্ণের নিসাব বিশ দীনার। এক্ষণে দিরহাম ও দীনারের ও এ দুটির পরিমাণের নিগূঢ় তত্ত্ব জানাটা বাকি রয়ে গেছে। তাহলেই আমরা জানতে পারব, এ যুগে তার সমান নিসাব পরিমাণটা কি দাঁড়ায়।

পূর্ববর্তী ও শেষের দিকের বহু মনীষী এ আলোচনার অবতারণা করেছেন। আবূ উবাইদের 'কিতাবুল আমওয়াল', বালাযুরীর 'ফতুহুল বুলদান', খাত্তাবীর 'মায়ালিমুস সূনান', মা-ওয়ার্দীর 'আল-আহকামুস্ সুলতানীয়া', ইমাম নববীর 'আল-মাজমু', মুকরেযীর 'আল-নাহদুল-কাদীমাতুল ইসলামিয়া' এবং ইবনে খালদূনের 'আল-মুকাদ্দামাহ' প্রভৃতি গ্রন্থে এ পর্যায়ে যথেষ্ট আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ সকল মনীষীর কথা থেকে যে সারমর্ম জানা যায়, তা ইবনে খালদুনের ভাষায় নেইঃ

জেনে রাখো, ইজমা সংগঠিত হয়েছে ইসলামের শুরু সাহাবী ও তাবেয়ীনের যুগ থেকেই। তা হচ্ছে শর'ঈ দিরহাম তাই, যা সাত মিশকাল স্বর্ণ দ্বারা দশ ওজন করা হয় এবং আউকিয়া ওজন করা হয় চল্লিশ দিরহাম দ্বারা, এ হিসেবে তা দীনারের দশ ভাগের সাত ভাগ। আর খালেস স্বর্ণে মিশকালের ওজন হচ্ছে মধ্যম আকারের যবের ৭২ দানা। অতএব দিরহাম—যা দশ ভাগের সাত ভাগ—পঞ্চাশ ও পাঁচ দানা। এসব ওজনই ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

তবে দীনারে—তার মিশকালে—জাহিলিয়াত ও ইসলামের যুগে কোন পরিবর্তন হয়নি বলেই সকলের জানা। আর এও সর্বসম্মত কথা যে, আরবী ইসলামী যুগের নগদ সম্পদ এ ওজন হিসেবে সর্ববাদীসম্মত—এর উপর ইজমা হয়েছে। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসন আমলে তা সর্বত্র সাধারণভাবে বিস্তার লাভ করে। সে সময় দিরহামগুলো ছিল আট দন্‌ক (দিরহামের এক-ষষ্ঠাংশ)-এর বড় ও চার দন্‌ক-এর ছোট, এ দুজনের মধ্যবর্তী ওজনের। পরে এ দুটিকে একত্রিত করে বড়টির বেশী ও ছোটটির কমের উপর ধারণ করা হল এবং দুটিকে সমান মাত্রার দিরহাম বানিয়ে দিল। তাদের প্রত্যেকটির ওজন দাঁড়াল পূর্ণাঙ্গ ছয় দন্‌ক। এভাবে মিশকালের হিসাব করা হল। এক্ষণে তা চিরকালের হয়ে গেল, তার জন্যে কোন সীমাবদ্ধ সময় নির্দিষ্ট থাকল না। এখন প্রতি দশ দিরহাম—যা ছয় দন্‌ক ওজনের হয়—তা সাত মিশকাল এবং তা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে।

অতঃপর আলিম ও ইতিহাসবিদ্‌গণ প্রমাণীত করেছেন যে, আবদুল মালিকের শাসনামলে দিরহাম ও দীনারের যে রূপ ও ধরনের উপর ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, উত্তরকালে তা আসল রূপে অপরিবর্তিত থাকেনি। বরং ওজন ও মানের দিক দিয়ে তাতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। দেশে দেশে পার্থক্য হয়ে গেছে। এক যুগ থেকে অন্য যুগে পৌঁছে তা পরিবর্তিত হয়েছে এবং লোকেরা মানসিকভাবে সে দুটির প্রচলিত ওজনকেই শরীয়াতসম্মত মনে করে রেখেছে। ফলে প্রত্যেক দেশের লোকেরা তাদের নগদ সম্পদ থেকে শরীয়াতের হক্‌ বের করেছে সেই প্রচলিত ওজনের হিসেবে। তাহলে এক্ষণে শরীয়াতে ব্যবহৃত দিরহাম-দীনারের ওজন জানবার কি উপায় হতে পারে? .... এ প্রেক্ষিতে যে, তাতে কারসাজি ও ওজনের পরিবর্তন ঘটে গেছে?

নবী করীম (স) তাঁর উম্মতকে এক মহাকল্যাণময় তত্ত্বের সন্ধান দিয়ে গেছেন। শেষের দিকের সংস্কৃতিসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহ তার গুরুত্ব স্বীকার করেছে এবং তার ব্যাপকতা বিধানের জন্যে কার্যকর ভূমিকাও পালন করেছে। আর তা হচ্ছে, গোটা জাতির 'কায়ল' (measure) ও ওজন (weight)-কে অভিন্ন ও একীভূত রাখতে হবে। কেবল তাতেই সমস্ত লোকের পারস্পরিক লেন-দেন ও কেনা-বেচা ইনসাফপূর্ণ হতে পারে এবং তাদের মধ্যে এ নিয়ে কোন বাকবিতণ্ডা বা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হওয়ারও কোন অবকাশ থাকবে না। বস্তুত রাসূলে করীম (স)-এর হাদীসে ঠিক সে কথাই ঘোষিত হয়েছে ঃ

اَلْمِيْزَانُ مِيْزَانُ اَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ-

ওজন চলবে মক্কাবাসীদের অনুযায়ী ওজন এবং পরিমাপ চলবে মদীনাবাসীদের পরিমাপ অনুযায়ী।

এরূপ ঘোষণার কারণ হচ্ছে, মক্কাবাসীরা ছিল ব্যবসায়ী। তারা মিশকাল, দিরহাম ও 'আউকিয়া' প্রভৃতি ওজনে পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করত। আর এ ব্যাপারে তারা ছিল খুব সুদৃঢ় ও সূক্ষ্মদর্শী। পক্ষান্তরে মদীনাবাসীরা ছিল কৃষিজীবী, ফসল ও ফল ফলানোই ছিল তাদের পেশা। তারা অসাক্, ছা', মদ্ প্রভৃতি মাপে কার্য সম্পাদন করত। আর তাতে তারা ছিল খুবই সতর্ক ও দক্ষ। রাসূলে করীম (স) এ কারণে লোকদের যে ব্যাপারে যারা অধিক পারদর্শী সে ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করতে বলেছেন।

ইসলামের সেই সমসাময়িক যুগে অন্যান্য দেশগুলোও এ মহান নগরদ্বয়ে প্রচলিত 'ওজন' ও 'কায়ল'-কে অনুসরণ করে চলেছে। কেননা রাসূলে করীম (স) নিজেই তাকে বহাল ও চালু রেখেছেন। ফলে প্রতিটি ইসলামী দেশে একই ওজন ও পরিমাণের দিরহাম গৃহীত হয়েছিল। মিশকাল, আউকিয়া , রতন প্রভৃতি ওজন এবং ছা', মদ্ প্রভৃতি কায়ল সর্বত্র প্রচলিত হয়ে গেল। কোথাও এর ব্যতিক্রম থাকল না। আর শরীয়াতী অধিকারসমূহের ওজন পরিমাপেও তাই অনুসরণ করা হল। তাতে কোনরূপ মন্থরতা কোথাও থাকল না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজ রাসূলে করীম (স)-এর এই পথ-নির্দেশের গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হয়নি। তাকে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ গুরুত্বও তারা দিতে ব্যর্থ হল। প্রয়োজন ছিল মক্কাবাসীদের মানদণ্ডের সুদৃঢ় ও সূক্ষ্ম ব্যবস্থার সংরক্ষণ। বিশেষ করে মক্কাবাসীদের 'কায়ল'—মিশকাল ও দিরহামের ওজন এবং মদীনাবাসীদের ছা' ও মদ্-এর মান। তা হলে আজকের দিনে যাকাত বিধানে শরীয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ খুবই সহজ হয়ে দাঁড়াত।

ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের কর্তব্য ছিল এসব মান (Standard)-কে পারস্পরিক মুয়ামিলা, লেন-দেন ও ক্রয়-বিক্রয় বিনিময়ে মৌল মান হিসেবে অনুসরণ করা। ব্যক্তিদের পরস্পরেও যেমন, রাষ্ট্রসমূহের পরস্পরেও তেমনি। তা হলে তার ভিত্তিতে শরীয়াতের বিধানাবলী সহজে পালন করা সম্ভব হত।

কিন্তু বাস্তবে সর্বত্র এর বিপরীত ঘটেছে। 'দিরহাম', 'আউকিয়া', 'রতল' ইত্যাদি সব ওজন ও 'কায়ল' চরমভাবে বিভিন্ন ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। একটি দেশের সাথে অন্য দেশের কোন মিল নেই। এ ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে এবং এ মতবিরোধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

অতঃপর আমরা পড়তে, শুনতে ও দেখতে পেলাম, বাগদাদী 'রতল' মাদানী 'রতল' মিসরীয় 'রতল' (রতল-Pound)। পড়তে লাগলাম, 'দিরহাম' কি ১২ 'কিরাত' (inch), না ১৫ কিরাত, না ১৬ কিরাত' অথবা তার কম বেশী। আর তাতে যবের বা গমের কত দানা?....... 'মিশকাল' (84c. gramms) কি? তা কি মূল দীনার না অন্য কিছু, তাতে কত কীরাত বা কত দানা হবে? ...ইত্যাদি ইত্যাদি ধরনের অর্থহীন কথাবার্তা।

এগুলো এমন সব প্রশ্ন, যে বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আর চরম মতভেদেরও অবতারণা করেছেন এক্ষেত্রে। কেননা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রয়োজন

রয়েছে, বিভিন্ন সময়ে তা বিভিন্ন রূপও ধারণ করেছে। ফলে কোন কোন হানাফী ফিকাহ্‌বিদ বলতে শুরু করলেন ঃ

يُفْتى فِىْ كُلِّ بَلَدٍ بِوَزْنِهِمْ-

প্রত্যেক দেশে সেই দেশে প্রচলিত ওজন হিসাবে ফতোয়া দিতে হবে।[১]

ইবনে হুবাইব আল-আন্দালুসীও তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন ঃ

اِنَّ اَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ يَتَعَا مَلُوْنَ بِدَرَاهِمِهِمْ-

প্রত্যেক দেশের লোকেরা সে দেশে প্রচলিত দিরহামের হিসাবে পারস্পরিক লেন-দেন করবে।

তাঁরা এ-ও বলেছেন যে, এ কথা তাঁর একার। কেননা যাকাতের নিসাব দুশ' দিরহাম হওয়ার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউই মত প্রকাশ করেন নি। এই দু'শ' দিরহাম একশ' চল্লিশ মিশকাল সমান। এমন কি, এই কথায় তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, দিরহাম হবে $\frac{৭}{১০}$ মিশকাল (প্রতি সাত মিশকাল দশ দিরহাম)।

এক্ষণে শরীয়াতে কথিত দিরহাম ও দীনার সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। কেননা শরীয়াতে এ দুটির ভিত্তিতে যাকাতের নিসাব নির্ধারিত হয়েছে।

মনে হচ্ছে, এ দুটির একটির পরিমাণ জানতে পারলে অপরটির পরিমাণও জানা যাবে। কেননা দিরহাম ও দীনারের পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বজন পরিচিত। এ দুটির হার ৭ঃ১০। আর দিরহাম $\frac{৭}{১০}$ মিশকাল।

তবে আমাদের সম্মুখে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষদ্র ইউনিট বা এককের উল্লেখ করা হয়েছে, যা দিরহাম ও দীনারের ভগ্নাংশরূপে গণ্য হয়েছে, তা আয়ত্ত করা খুবই দুঃসাধ্য। কেননা তা আদৌ সুসংবদ্ধ নয়। যুগ, স্থান ও প্রকারভেদে তা বিভিন্ন হয়ে থাকে। আর তা যব গম ও সর্ষপ বীজ। আমি নিজে কায়রো শহরে বিভিন্ন আকৃতি ও রূপে তার পরীক্ষা করে দেখেছি এবং তা বিভিন্ন রকম ও পরিমাণে দেখতে পেয়েছি। নিম্নে তার বিবরণ দেয়া হল।

(ক) তাঁরা বলেছেন, শরীয়াতের হিসাব মতে এক দিরহাম ছয় দন্‌ক (এক দিরহামের ছয় ভাগের এক ভাগ হল এক দন্‌ক) এবং দুই ও দুই-তৃতীয়াংশ সর্ষপ দানায় এক দন্‌ক। তা হলে এক দিরহাম হবে ১৬ সর্ষপ দানায়। কিন্তু সর্ষপ দানার ওজন জানব কি করে? ডঃ আবদুর রহমান ফহমী তাঁর منج السكة فى فجر الاسلام নামক গ্রন্থে বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে লিখেছেন, মধ্যম ওজনের সর্ষপ দানায় ১৯৪ গ্রাম হয়। তাহলে এক দিরহামে ১৬×১৯৪-=৩,১০৪ গ্রাম।

১. ইবনে আবেদীন।

তার অর্থ শরীয়াতে কথিত দিরহাম প্রায় প্রচলিত দিরহামের সমান। তবে তা ১৬০.০ গ্রাম। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যে, দিরহামের পরিমাণ ছয় দন্‌ক ও ১৬ কীরাত নির্ধারণ সর্ববাদীসম্মত নয়। যেমন সর্ববাদীসম্মত নয় 'কীরাত'-এর পরিমাণ।

ইবনে আবেদীন হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের পক্ষে শরীয়াতে কথিত দিরহামের পরিমাণ নির্ধারণে এবং এর ও প্রচলিত দিরহামের পরিমাণ নির্ধারণে অনেক কথাই বলেছেন। তাতে তাঁদের ব্যাপক মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। কেউ বলেছেন, প্রচলিত দিরহাম বড়, কেউ বলেছেন ছোট। আরও বলেছেন, পরিভাষায় পার্থক্যের দরুন কীরাত ও দিরহামের পরিমাণ নির্ধারণে অসংখ্য রকমের কথা উদ্ধৃত হয়েছে।

(খ) কোন কোন আলোচনাকারী ভিন্ন পথে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আল-মুকরেযী উল্লেখ করেছেন, দিরহাম ও দীনারের ওজন নির্ধারণকারী প্রাচীন গ্রীক সর্ষপ দানার সাহায্যে দিরহাম দীনারের ওজন ঠিক করেছে। কেননা তার আয়তন (Size) খুবই ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম এবং স্থান-কালের পার্থক্যের দরুন তাতে পার্থক্য দেখা দেয় না। তাঁরা বলেছেন এক দিরহামে ৪,২০০ সর্ষপ দানা। আর এক দীনারে ৬.০০০ দানা। বিগত শতকে যাহ্‌বী শাফেয়ী একখানি কিতাব লিখে জানালেন, তাঁর সময়ে যে দিরহাম প্রচলিত ছিল, তা শরীয়াতে কথিত দিরহাম। তিনি সর্ষপ দানার সাহায্যে তার পরীক্ষা করে দেখেছেন। বলেছেন, এ থেকেই 'রতল' হয়। মিসরে ১৪৪ দিরহামে এক 'রতল', আর বাগদাদী প্রচলনে ১২৮ $\frac{৪}{৭}$ দিরহাম।

তার অর্থ, সেই দিরহাম আমাদের এ সময়ই প্রচলিত। কেননা এখনকার মিসরীয় রতল ১৪৪ দিরহাম, আর দিরহাম ৩১২ গ্রামের (gramms) সমান। তাই তার ওজনও পূর্বে চলা ওজনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ১৬০.০ গ্রাম। আর তা খুব সামান্যই।

কিন্তু কথা হল, দিরহামের ওজন নির্ধারণে সর্ষপ দানার উপর ভিত্তি করা যথেষ্ট নয়। কেননা এ দানাগুলোও অবস্থা, কাল ও পরিবেশের পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন ওজনের হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত পরস্পরে এমন একটা পার্থক্য হয়ে যায় যা অবশ্যই গণনার মত। আমি নিজে 'খারুব' দানা পরীক্ষা করে এ ধারণা লাভ করেছি।

মুক্‌রেযীর কথায় বিচেনার বিষয় হল, যে দিরহামের ওজন ৪২০০ সর্ষপ দানার সমান ধরা হয়েছে, তা হচ্ছে, 'রতলে'র দিরহাম। তাহলে নগদ দিরহামও কি তাই?

মনে হচ্ছে, নগদ দিরহাম ও মিশকাল ছাড়াও অন্যান্য রকমের দিরহাম ও মিশকাল প্রচলিত ছিল। আল--মুক্‌রেযী খাত্তবী থেকে উদ্ধৃত করেছেন; যে দিরহামের ওজন ৭—১০; তা ছাড়াও পরিমাপ করার দিরহাম ভিন্নতর ছিল এবং ইসলামী দুনিয়ায় তা ব্যবহৃত হত। যেমন আলী মুবারক বলেছেন যে, দিরহামের ওজন ৩.১২ গ্রাম। তাই বহুল ব্যবহৃত ছিল।

অবশ্য দিরহাম ও মিশকালের পরিমাণ নির্ধারণে বিভিন্ন লোকের মত পার্থক্যের দরুন বহু বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে।

রাজা কাইতাবাইর দিরহামে কমবেশী হওয়াটা অসম্ভব নয়। পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং ঐতিহাসিকগণও প্রমাণ করেছেন, নগদ টাকা শরীয়াতের ওজনমত ঠিক থাকেনি। তাহলে কাইতাবাইর দিরহাম অপরিবর্তিত শরীয়াতী দিরহাম ছিল—এ কথা আমাদের কে বলে দিতে পারে?

(গ) শরীয়াতী দিরহাম ও দীনারের পরিমাণ জানার জন্যে আমাদের সম্মুখে আর একটি পন্থা আছে। তা হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পন্থা অর্থাৎ আরব ও পাশ্চাত্য দেশের ঘরসমূহে সংরক্ষিত নগদ মুদ্রার ওজন—বিশেষ করে দীনার ও মিশকালের ওজন যাচাই-পরীক্ষা করে দেখা। কেননা এ কথা স্বীকৃত যে, জাহিলিয়াত ও ইসলামের যুগে তার ওজনে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আর তারা যখন দিরহাম বানাতো, তার দশ ভাগের এক ভাগ ছয় মিশকাল ওজনের হত। ফলে 'মিশকাল' এমন একটা মৌল যার উপর নির্ভর করা চলে। তাই মিশকালের ওজনটা জানতে পারলে স্বর্ণ-রৌপ্যের নগদ মুদ্রার নিসাবটাও আমরা সহজে জানতে পারব।

কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকারও এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। মিসরীয় গ্রন্থকার আলী পাশা মুবারক তাদের অনুসরণ করেছেন। তিনি লণ্ডন, প্যারিস, মাদ্রিদ ও বার্লিনের সংরক্ষিত ইসলামী নগদ মুদ্রাসমূহ সন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, খলীফা আবদুল মালিকের সময়ে প্রচলিত দীনার ৪.২৫ গ্রাম ওজনের হত। ইসলামী বিশ্বেকোষেও তাই বলা হয়েছে। তা-ই আসল বাইজান্টাইন দীনারের ওজন। তাহলে দিরহাম হবে $\frac{৭ \times ৪.২৫}{১০}$ —২.৯৭৫। সমকালীন বহু আরব প্রত্নতত্ত্ব আলোচনাকারীও এটাকেই সমর্থন দিয়েছেন। প্রাচ্যবিদ জম্বাওরও এই কথা ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লেখ করেছেন। তাতে 'দিরহাম' শীর্ষক আলোচনায় বলা হয়েছে ঃ

> আইন সঙ্গত দিরহামের পরিমাণ নির্ধারণে ঐতিহাসিকগণ খুব বেশী মতবিরোধের মধ্যে পড়ে গেছেন। তবে এ ব্যাপারে তাঁরা একমত যে, দিরহামের ওজন মিশকালের তুলনায় ৭ঃ১০—আর মিশকাল কয়েকটি অর্থ দেয়। তাই এ সমভার (Counterballance) করা সহীহ্ হতে পারে কেবল তখনই, যদি মিশকাল আইসঙ্গত (Legal) দীনারের সমান হয় অর্থাৎ মক্কী মিশকাল—যার ওজন ৪.২৫ গ্রাম। এর সারকথা এই দাঁড়ায় যে, দিরহামের ওজনের নিকটবর্তী সম্ভাব্য ওজন হল ২.৯৭ গ্রাম। এ ওজনটা অবশিষ্ট অক্ষয়িষ্ণু মুদ্রার সঙ্গে মিলে যায়। যেমন মিলে যায় খলীফা মুক্তাদিরের আমল (২৯৫—৩২০হিঃ) নির্মিত মুদ্রার ওজন।

সম্ভবত সর্বপ্রথম হযরত ওমর (রা)-ই দিরহামের আইনসঙ্গত ওজন ২৯৭ গ্রাম নির্দিষ্ট করেছেন। খলীফা আবদুল মালিক নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, দিরহাম এ ওজনেরই হতে হবে, অন্যথা নয়। আর তাই হবে সঠিক রৌপ্য মুদ্রা।

'দীনার' পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

খলীফা আবদুল মালিক ৭৭ হিজরী সনে মুদ্রার উপর যে সংশোধনী জারী করেছেন, তা প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা (Currency) মানকে স্পর্শ করেনি। এটা সম্ভব যে, আমরা

সহসাই এ প্রচলিত মুদ্রার সুদৃঢ় ওজনের ব্যাপারে স্থিতি গ্রহণ করব, সংশোধনী প্রভাবিত দীনারের পূর্ববর্তী মুদ্রা নির্মাণে যে চরম মাত্রার সূক্ষ্মতা অবলম্বিত হয়েছে, তা থেকে বাঁচার জন্যে। তাহলে আমরা দেখব, দীনার ৪.২৫ গ্রাম (৬৬ দানা) সম্বলিত। এ ওজনটা বাইজান্টানী সোলডায়িস প্রচলিত ওজনের সাথে পুরাপুরিভাবে সামঞ্জস্যশীল। পরে লিখেছেন, শরীয়াত সব সময়ই এ মর্মে দলীল পেশ করছে যে, প্রচলিত দীনারের ওজন ৪.২৫ গ্রাম (৬৬ দানা) হবে।

সম্ভবত শরীয়াতী দিরহাম ও দীনারের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে এটাই অধিক উত্তম ও আদর্শ পন্থা। এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। এটা বিজ্ঞানসম্মত পন্থার খুব নিকটবর্তীও। কেননা তা ঐতিহাসিক নগদ মুদ্রার বাস্তব অনুসন্ধানের উপর ভিত্তিশীল। এর সত্যতা ও যথার্থতায় কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আশংকা নেই। এটা পূর্ববর্তী পন্থাসমূহে থেকে খানিকটা ভিন্নতর পরিণতিতেই পৌঁছায়। দিরহাম ও দীনার সাম্যই কম। সম্ভবত এই পন্থা যাকাতের ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতাপূর্ণও। আর আল্লাহ্ তা'আলা যে গরীব-মিসকীনের কল্যাণ সাধানের উদ্দেশ্যে যাকাত ফরয করেছেন, সে দৃষ্টিতেও এটা অধিক সুবিচারপূর্ণ হবে।

এক্ষণে রৌপ্যের নিসাব দাঁড়াল আধুনিক ওজন অনুযায়ী ২.৯৭৫×২০০=৫৯৫ গ্রাম। আর স্বর্ণের নিসাব হবে ৪.২৫×২০—৮৫ গ্রাম।

অতএব যে লোক খালেস বা খাঁটি স্বর্ণের নগদ বা ছাঁচ—৫৯৫ গ্রাম পরিমাণের মালিক হবে, তাকে যাকাত দিতে হবে প্রতি একশ'তে ২.৫। কেননা রৌপ্যের নিসাবকেই প্রচলিত নিয়েমে ভিত্তি করা হয়েছে।

আমরা জেনেছি, মিসরীয় রিয়াল ১৪ গ্রাম ওজনের সমান বিনিময় হার বিশিষ্ট। আর তাতে রৌপ্যের হার ৭২০.০, তাতে খাঁটি রৌপ্যের হার ৮০.১০ গ্রাম। অতএব এ দৃষ্টিতে মিসরীয় রিয়ালে নগদ রৌপ্যের নিসাব হবে ৫০.০২=১০.০৮÷৫৯৫ রিয়াল অথ্যাৎ = ১১৮০.৪ করশ।

হানাফী মাযহাবের আলিমগণ নগদ মুদ্রায় ধাতু খাদমুক্ত হওয়ার শর্ত করেন না। তাঁরা খাঁটির ন্যায় প্রচলিত হলে খাদমুক্ত মুদ্রাও গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তাহলে রিয়ালের নিসাব ৪২.৫=১৪÷৫৯৫ রিয়াল হবে অর্থাৎ ৮৫০ করশ।

কিন্তু প্রথম মতটি ফিকাহ্‌বিদদের। আর তাই দলীলসমূহের বাহ্যিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা রৌপ্যের নিসাব নির্ধারিত হয়েছে দু'শ' দিরহাম।

এ থেকেই আমরা জানতে পারি যে, রৌপ্যের নিসাব ২২ $\frac{২}{৭}$ মিসরীয় রিয়াল। অথবা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ২৭ রিয়াল। এরূপ বলা এখনকার প্রচলিত মুদ্রার রৌপ্য ওজনের নিকটবর্তী ও তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কাজেই এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক এবং এখনকার ওজন ৫৯৫ গ্রাম-এ ফিরে যাওয়া প্রয়োজন।

স্বর্ণের নিসাব নির্ধারণ করা যাবে এভাবে যে, তার ওজন হবে ৮৫ গ্রাম। কেননা বর্তমান সময়ে অভ্যন্তরীণ লেনদেনে স্বর্ণমুদ্রা প্রায় অব্যবহৃত হয়ে আছে। কাজেই

যে-লোক স্বর্ণের দলা বা ছাঁচের মালিক হবে অথবা ৮৫ গ্রাম সমান নগদ টাকার অধিকারী হবে তাতে শতকরা ২.৫ যাকাত বাবদ দিতে হবে।

সমকালীন চিন্তাবিদদের একটা বড় ভুল

যাকাত সম্পর্কে লেখাপড়া করেছেন, সমকালীন এমন চিন্তাবিদগণ একটা বড় ভুলের মধ্যে ডুবে আছেন। বিশেষ করে তাঁরা যখন নগদ সম্পদের নিসাব নির্ধারণ পর্যায়ে কথা বলেন, সাধারণত তখনই এই ভুলটা হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ الفقه على المذاهب الاربعه। নামক ফিকাহ্ গ্রন্থটির উল্লেখ করা যায়। গ্রন্থখানি মিসরের ওয়াকফ বিভাগীয় মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় চারও মাযহাবের আলিমগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক রচিত হয়েছে।

তাতে বলা হয়েছে, স্বর্ণের যাকাত-নিসাব মিসরীয় মুদ্রায় ১১ মিসরীয় 'জনীহ', তার অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ ও এক-অষ্টমাংশ (১১৮৭.৫ করশ)। আর রৌপ্যের নিসাব ৫২৯$\frac{২}{৩}$ করশ সমান।

প্রায় সব কিতাব ও পত্র-পত্রিকায় এ পরিমাণটাই ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে। যারা ফতোয়া দেন, তাঁদের মুখেও এ কথা উচ্চারিত।

এখানে দুটি দিকের ভুল লক্ষ্য করা যায় ঃ

প্রথম, প্রাচীন ওজন অনুযায়ী মিসরীয় স্বর্ণ ১১$\frac{৭}{৮}$ জনীহ্ নিসাব নির্ধারণ, যার ওজন হয় ৮.৫ গ্রাম তা ১১৮৭.৫ এর সমান হয় না। জনীহ্ হিসাবে নিসাব নির্ধারণ করা হলে তা যথার্থ হতে পারে। তা হবে কাগজী মুদ্রার ভিত্তিতে। কিন্তু স্বর্ণ নির্মিত 'জনীহ্' কাগজী মুদ্রার হিসাবে ৮০ জনীহ্ থেকে বেশী হয়ে থাকে। তার কারণ হচ্ছে, স্বর্ণ নির্মিত জনীহ্র প্রকৃত মূল্য ও নামের মূল্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এক্ষণে (১৯৬৯ সনে) কাগজী মুদ্রায় ৭ জনীহ্ পরিমাণ হবে প্রায়।

দ্বিতীয়, এই কথার অর্থ হচ্ছে, নগদ সম্পদের যাকাতের নিসাব—এখানে দুটি এবং এ দুটির মধ্যে বড় পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামী শরীয়াতের আদালত কি এ বিরাট ব্যবধানকে কবুল করে নিতে প্রস্তুত, যাতে দুটি নিসাবের একটি অপরটির তেরোবারেরও অধিক গুণ বেশী হয়ে যায়? এই কঠিন পার্থক্যের সম্মুখে আমরা মুসলিম জনগণকে ছেড়ে দেব দিশাহারা অবস্থায়, তা কি কোন অবস্থায়ই সমর্থনযোগ্য হবে? যে লোকই পাঁচ 'জনীহ'র মালিক, তাকেই আমরা বলব যে, তুমি রৌপ্যের নিসাব অনুযায়ী ধনী ব্যক্তি, আর যে পঞ্চাশ জনীহ্র অধিকারী হয়েছে, তাকে বলব, স্বর্ণের নিসাবের দৃষ্টিতে তুমি একজন দরিদ্র ব্যক্তি, বিবেক-বুদ্ধি বা শরীয়াতের দৃষ্টিতে তা কি কোনরূপ যুক্তিসংগত কথা হবে? .. না, তা অবৈধ এবং অসংগত, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। যে সব হাদীস নগদ সম্পদে দু'শ দিরহাম রৌপ্যে এবং বিশ দীনার স্বর্ণে যাকাতের নিসাব নির্ধারণ করেছে, তার মানে তো এ নয় যে, তার দ্বারা দুটির পরস্পর

বিরোধী নিসাব নির্ধারণ করা হবে? আসলে এ একটা অভিন্ন নিসাব, যে লোকই তার মালিক হবে, তাকে 'ধনী' করা হবে এবং তার উপর যাকাত ফরয হবে। মূলত এ নিসাব দুটি বিকল্প প্রান্তিক মানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, হয় দু'শ' দিরহাম, না হয় বিশ দীনার। আসলে এটা এক ও অভিন্ন দর বা মান বিশেষ। কেননা বিপুল সংখ্যক অকাট্য দলীল প্রমাণ করেছে যে, রাসূলে করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগে এক দীনার দশ দিরহামে ভাঙানো যেত। আর তাই যাকাতে প্রচলিত হয়েছে, চুরির 'হদ্দ' জিযিয়া ও দিয়ত প্রভৃতিতেও এ দরই স্বীকৃত ও চালু হয়ে গেছে।

এ প্রেক্ষিতে নগদ সম্পদের যাকাতের নিসাব এক ও অভিন্ন নির্দিষ্ট করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের একই মান, একই মূল্য হবে তার মুদ্রা ছাপ যত বিভিন্ন হোক-না কেন।

এ যুগে নিসাব নির্ধারণ কিসে হবে

সন্দেহ নেই, এ কালে নগদ স্বর্ণ মুদ্রার জন্যে একটা নিসাব নির্ধারণ করা এবং রৌপ্যের জন্যে আর একটা নির্ধারণ সম্ভব নয়। এ কালে তো কাগজী নোটই জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়-মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে ও ব্যাপকভাবে চলছে। কোন ধাতব মুদ্রা—বিশেষ করে স্বর্ণ দেখতে পাওয়ারও কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে করা যায় না। কাজেই ফকীহ্গণ এ পর্যায়ে যত আলোচনা ও বিতর্কের অবতারণা করেছেন, এ কালে তার কোন প্রয়োজন বা অবকাশ আছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এক্ষণে দুটি নগদ মুদ্রার একটি অপরটির সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে, কি হবে না? কেননা মিলিয়ে দেয়া একটা অতীব জরুরী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিতর্ক এক্ষণে সম্পূর্ণ অবান্তর।

তবে জরুরীভাবে আলোচনা করতে হবে এ বিষয়ে যে, আমরা দুটির কোন্ নগদ সম্পদটিকে ভিত্তি করে নিসাব নির্ধারণ করব? যাকাত ফরয হওয়ার নিম্নতম সম্পদ পরিমাণ কি হবে? কেননা শরীয়াত প্রতিটির জন্যে অপরটির বিপরীত নিসাব নির্ধারণ করেছে। এক্ষণে আমরা কি তা রৌপ্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করব?

এ কালের আলিমগণের মধ্যে বিপুল সংখ্যকের ধারণা তাই এবং তা দুটি কারণে ঃ

প্রথম—রৌপ্যের নিসাব সর্ববাদীসম্মত। সহীহ্ মশহুর হাদীস ও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত।

দ্বিতীয়—রৌপ্যের ভিত্তিতে নিসাব নির্ধারণ করা হলে দরিদ্র লোকদের ফায়দা বেশী হবে। কেননা এ হিসাবে অধিকাংশ মুসলিম জনগণের উপর যাকাত ফরয হবে। এ কারণে মিসরে বিশ ও তার উপরে কয়েকটি রিয়াল ধরে নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সউদী রাষ্ট্রে প্রায় পঞ্চাশ রিয়ালকে নিসাব ধরা হয়েছে। আরব আমীরাতেও তাই। আর পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে পঞ্চাশ বা ষাট টাকাতে নিম্নতম নিসাব ধরা হয়েছে।

অপরাপর আলিমদের মত হচ্ছে, স্বর্ণের ভিত্তিতে নিসাব নির্ধারণ করতে হবে। কেননা নবী করীম (স)-এর পরে রৌপ্যের মূল্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে।[১] যেমন কালের পরিবর্তনে অন্যান্য সমস্ত জিনিসেরই মূল্যে পরিবর্তন ঘটেছে। তবে স্বর্ণের মূল্য মোটামুটিভাবে একটি নির্দিষ্ট দূরবর্তী সীমায় এসে ঠেকেছে। কালের পার্থক্যের দরুন স্বর্ণ মুদ্রার মূল্যে তেমন একটা পার্থক্য ঘটেনি। কেননা তা সর্বকালের নির্ধারণ একক। আল্লামা আবূ জুহরা, খাল্লাফ ও হাসান প্রমুখ একালের মনীষীগণ যাকাত সংক্রান্ত আলোচনায় এ মত ব্যক্ত করেছেন।

আমার মনে হয়, এ মতটি সর্বতোভাবে সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ। যাকাতের মালসমূহের উল্লিখিত নিসাবসমূহের মধ্যে—যেমন পাঁচটি উষ্ট্র ও চল্লিশটি ছাগল, অথবা পাঁচ অসাক্ কিশমিশ বা খেজুর—তুলনামূলক আলোচনা করা হলে আমরা দেখতে পাব যে, একালের উপযোগী হবে স্বর্ণের নিসাব, রৌপ্যের নিসাব নয়।

পাঁচটি উষ্ট্র বা চল্লিশটি ছাগীর মূল্য প্রায় চারশ দীনার বা জনীহ্র সমান হয়; কিংবা কিছুটা বেশী। তাহলে যে লোক চারটি উষ্ট্রের কিংবা উনত্রিশটি ছাগলের মালিক, সে শরীয়াতের দৃষ্টিতে দরিদ্র ব্যক্তি গণ্য হবে কি করে? অথচ যে ব্যক্তি এমন পরিমাণ নগদ সম্পদের মালিক যা দিয়ে সে একটি ছাগীও খরিদ করতে পারে না, তার উপর যাকাত ফরয হবে কি করে? যে লোক এই সামান্য পরিমাণ মালের মালিক সে কি ধনী বিবেচিত হতে পারে?

আল্লামা ওলীউল্লাহ্ দেহ্লভী তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'রৌপ্যের নিসাব পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ 'আউকিয়া'। কেননা এ পরিমাণটা একটি পরিবারের এক বছর কালের ব্যয়ের জন্যে যথেষ্ট, যখন দ্রব্যমূল্য সমগ্র দেশে সমমানের হবে। আর ভারসাম্যপূর্ণ দেশসমূহে সস্তাকাল ও উর্ধ্বমূল্যের কালের নিয়ম অধ্যয়ন করলে তুমি তাই দেখতে পাবে।

বর্তমানে আমরা ইসলামী দেশগুলোতে কি দেখতে পাচ্ছি? মিসরীয়, সউদী, কাতারী রিয়াল বা পাক-ভারতীয় রুপিয়ার পঞ্চাশ বা অনুরূপ পরিমাণ একটি পরিবারের প্রয়োজন পূরণের জন্যে একটি পূর্ণ বছরের, একটি মাসের, এমনকি একটি সপ্তাহের জন্যেও যথেষ্ট হয় বলে মনে করতে পারি কি?

যে সব দেশে জীবন-যাত্রার মান অনেক উঁচু হয়ে গেছে—বিশেষ করে পেট্রোলের দেশে—এ পরিমাণ নগদ অর্থ একটি মধ্যম পরিবারের পক্ষে একটি দিনের জন্যেও যথেষ্ট হয় না। তাহলে যে তার মালিক হল, তাকে শরীয়াতের দৃষ্টিতে ধনী ব্যক্তি মনে করা যায় কিভাবে? সে তো বড় অসম্ভব ব্যাপার।

অতএব এ কালে স্বর্ণভিত্তিক নিসাব নির্ধারণ করাই আমাদের জন্যে বাঞ্ছনীয়, যদিও রৌপ্য ভিত্তিক নিসাব ফকীর-মিসকীনদের জন্যে অধিকতর কল্যাণকর। কিন্তু

১. ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, প্রাথমিক যুগে এক দীনার দশ দিরহামের সমান হয়েছিল। উমাইয়া শাসনের দ্বিতীয়ার্ধে বারো দিরহামের সমান এবং আব্বাসী যুগে ১৫ দিরহাম সমান হয়েছিল।

ধন-মালের মালিকদের জন্যে তা খুবই অবিচারপূর্ণ হবে। কেননা এ ধন-মালের মালিকরা কোন বড় মূলধনের মালিক নয়। তারা জাতির সাধারণ জন-মানুষও বটে।

নগদ সম্পদের কোন স্থির মান নির্ধারণ কি সম্ভব

ইতিহাস ও অর্থনীতি পাঠকদের ভালভাবেই জানা আছে যে, নগদ অর্থের মূল্য অস্থিতিশীল। তা নিত্য পরিবর্তিত হচ্ছে। উঠছে ও নামছে, এক সময় থেকে অন্য সময়ে বিরাট পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে। নগদ সম্পদের প্রকৃত মূল্য তো প্রতিফলিত হয় তার ক্রয়শক্তির মাধ্যমে।[১] বিশেষ করে আমাদের এ যুগে কাগজী নোটের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। মানুষ তো আর নগদ সম্পদ খায় না, পরেও না। বরং তা দিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে মাত্র।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, রৌপ্য মুদ্রার মূল্য এমনভাবে নীচে পড়ে গেছে যে, এর শরীয়াতের নিসাব কোন উল্লেখ্য জিনিসের সমান হয় না অন্যান্য স্বর্ণভিত্তিক শরীয়াতী নিসাবের, কিংবা গবদিপশু ভিত্তিক নিসাবের।

কিন্তু স্বর্ণমূল্যও যদি নিম্নগামী হয় এবং বিশ দীনার হয়ে দাঁড়ায় অন্য কথায়, ৮৫ গ্রাম বা অন্যান্য নিসাবের কাছাকাছি না হয়—তাহলে সমস্যার সমাধান হবে কিভাবে?

ইসলাম শরীয়াতসম্মত যে ধন-মালকে যাকাত ফরয হওয়ার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছে, তার জন্যে কোন স্থায়ী মান নির্ধারণ করা কি সম্ভব? ..... যেন কেবলমাত্র যে ধন-মালের উপর যাকাত ফরয হয়।

যে-কোন যুগে নগদ মুদ্রার মূল্য যখনই উচ্চ উর্ধ্বগামী হবে এবং তার ক্রয়শক্তি এক অযৌক্তিক সীমা পর্যন্ত বর্ধিত হবে, তখনই এ প্রশ্ন তীব্র হয়ে দেখা দেবে।

অন্যান্য নিসাব পরিমাণ নির্ধারণ

এখানেই আমরা নগদ সম্পদের নিসাব অন্যান্য দলীল প্রমাণিত নিসাবের দৃষ্টিতে নির্ধারণের যৌক্তিকতা দেখতে পাই—যা নগদ মুদ্রার মূল্য পরিবর্তনের দরুন পরিবর্তিত হবে না, কেননা তার একটা নিজস্ব ও স্থায়ী মূল্যমান থাকবে, তার নগদ মূল্য অন্যান্য শহরে ও সময়ে যতই ভিন্নতর হোক-না কেন। পাঁচটি উষ্ট্রের বা চল্লিশটি ছাগলের অথবা পাঁচ অসাক আটা বা গমের মুল্য নিয়ে কেউ বিতর্ক করে না, তা খুব বেশী পরিবর্তিতও হয় না। কেননা তা মানুষের জন্যে খুব বেশী প্রয়োজনীয়।

শস্য ও ফল-ফসলে নিসাব অনুযায়ী নির্ধারণ কি সম্ভব

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, (পাঁচ অসাক) শস্যমূল্য অনেক সময় গবাদিপশুর নিসাব মূল্যের তুলনায় অনেক কম হয়ে পড়ে। সম্ভবত শরীয়াতদাতা বিশেষ কয়েকটি কারণে এই নিসাব পরিমাণ কম রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

---

১. আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স)-এর যুগে দিয়ত বাবদ দেয় ছিল ৮০ দীনার বা ৮.০০০ দিরহাম আর হযরত উমরের যুগে—তিনি বললেন, উষ্ট্রের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। অতএব স্বর্ণের মালিকদের প্রতি ১০০০ দীনার ধার্য কর এবং কাগজী মুদ্রার উপর ১২০০ দিরহাম।

কারণসমূহ এই;

১. ফসল উৎপাদনে আল্লাহ্‌র নিয়ামত দান অন্য যে-কোন জিনিসের তুলনায় অধিকতর প্রকাশমান এবং অপরাপর ধন-ঐশ্বর্যের তুলনায় এক্ষেত্রে মানুষের শ্রম ও কষ্ট অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম। যেমন আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ-

যেন তারা ভোগ করে তার ফল ও ফসল এবং তাদের হাত যা কিছু উৎপাদন করেছে। তারা কি সেজন্যে শোকর করবে না?

২. জমি যা উৎপাদন করে তা থেকে মানুষ মুখাপেক্ষীহীন থাকতে পারে না, যদিও গবাদিপশু না হলেও মানুষের চলতে পারে। এ কারণে জমির উৎপাদনে নিসাব পরিমাণ খুবই কম রাখার প্রয়োজন মনে করেছেন শরীয়াতদাতা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা জমি থেকে যা কিছু উৎপাদন করেন—বিশেষ করে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ফসল—তার জন্যে লোকদের ঠেকা খুব বেশী।

৩. যেসব দানা ও ফলে যাকাত ফরয হয়, তা জমিরই ফল ও ফসল। তা মুলধনের মুনাফার মত। কিন্তু উষ্ট্র, গরু ও ছাগলের ব্যাপার ভিন্নতর। তার মূল ও প্রবৃদ্ধি উভয়ের উপরেই যাকাত ফরয হয়ে থাকে। অন্য কথায় মুলধন ও মুনাফা উভয় থেকেই যাকাত দিতে হয়। এ কারণে শরীয়াতে দানা ও ফলে কম পরিমাণের নিসাব ধার্য করা হচ্ছে, কেননা তা সবটাই তো প্রবৃদ্ধি, মুনাফ ও নবতর রিযিক। তার ফরয পরিমাণও বাড়িয়ে ধরা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, দশ ভাগের এক ভাগ ও বিশভাগের একভাগ।

গবাদিপশুর নিসাবের দৃষ্টিতে নিসাব নির্ধারণ কি সম্ভব

এসব কারণে ফসল ও ফলাদির নিসাব অনুযায়ী নিসাব নির্ধারণ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়াই কর্তব্য বিবেচিত হচ্ছে। ফলে উষ্ট্র, গরু ও ছাগল প্রভৃতি গবাদিপশুর নিসাব মান অনুযায়ী নিসাব নির্ধারণ ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না।

গরুর নিসাব বিভিন্ন ধরা হয়েছে। পাঁচটি থেকে ত্রিশ-পঞ্চাশটি পর্যন্ত। এসব পার্থক্যের কারণে তাকে একটা মান বা ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে অন্য কিছুর নিসাব নির্ধারণ সম্ভব নয়।

থেকে যায় উষ্ট্র ও ছাগলের নিসাব। এ দুটি শরীয়াতের অকাট্য দলীল ও ইজমা উভয় দ্বারাই প্রমাণিত। উষ্ট্রের নিসাব পাঁচটি, আর ছাগলের নিসাব চল্লিশটি।

তাহলে আমরা কেবল বলতে পারি যে, নগদ সম্পদের নিসাব তাই, যা পাঁচটি উষ্ট্রের অথবা চল্লিশটি ছাগলের মূল্যের সমান?

এই প্রশ্নের জবাব ইতিবাচক। তবে তা নির্ভর করে এ সব নিসাবের শরীয়াত কথিত নগদ সম্পদের নিসাব—নবী যুগের ২০০ দিরহাম-এর সমান হওয়ার উপর। তাই পাঁচটি

উষ্ট্র বা চল্লিশটি ছাগলের মূল্য সে যুগে যখন দু'শ' দিরহামের সমান হবে, তখন তার আলোকে আমরা নগদ সম্পদের নিসাব-পরিমাণটা বের করতে পারি, সে নিসাব হচ্ছে সেই পরিমাণ নগদ অর্থ, যা পাঁচটি উষ্ট্রের বা চল্লিশটি ছাগলের মূল্যের সমান হবে।

শামসুল আইম্মা আস-সরখ্‌শী তাঁর 'আল-মব্‌সূত' গ্রন্থে যা লিখেছেন, তাতে আমাদের উপরিউক্ত কথার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন পশু সম্পদের যাকাতে আমরা উল্লেখ করেছি—পরিমাণ গ্রহণে মূল্যের হিসাব গণ্য করতে হবে। কেননা দ্বিতীয় বর্ষে উপনীতা একটি উষ্ট্রী শাবকের—এই হচ্ছে যাকাত ফরয হওয়ার নিম্নতম বয়স—যার মূল্য প্রায় চল্লিশ দিরহাম হয়, আর একটা ছাগীর মূল্য হয় পাঁচ দিরহাম। অতএব পাঁচটি উষ্ট্রে যাকাত ফরয হওয়া দু'শ' রৌপ্য দিরহামের উপর যাকাত ফরয হওয়ার সমান।

আল-মবসূত-এর কথায় নগদ সম্পদের নিসাব উষ্ট্র বা ছাগলের নিসাবের দৃষ্টিতে নির্ধারণের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু আমরা সেখানেই বলেছি, ইবনুল হুমাম ও ইবনে নজীম এ দুজন প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিদ মব্‌সূতের উক্ত কথার সমালোচনা করেছেন। কেননা বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

> কারুর উপর বিশেষ বয়সের উষ্ট্র যাকাত বাবদ ফরয হলে আর তার কাছে তা পাওয়া না গেলে তখন ছাগীর বদলে দশ দিরহাম পেশ করবে—ছাগী বর্তমান না থাকলে।

এই কথা 'সারখশী' উদ্ধৃত কথার সুস্পষ্ট বিরোধী।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, 'যার মালিকানায় উষ্ট্রের যাকাত হবে দুই বছরের ছাগী বাচ্চা, আর তার কাছে থাকে চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী বাচ্চা তবে তার কাছ থেকে তাই গ্রহণ করা হবে। আর সেই সঙ্গে নিতে হবে দুটি ছাগী—যদি তার পক্ষে তা সহজ হয়, অথবা বিশ দিরহাম। আর যার উপর চতুর্থ বর্ষে উপনীতা উষ্ট্রী বাচ্চা যাকাত ধার্য হবে তার কাছে যদি তা না থাকে; বরং তার কাছে থাকে দুই বছরের ছাগীর বাচ্চা, তাহলে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে। আর যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম কিংবা দুটি ছাগী দিয়ে দেবে ....

এই সহীহ্ হাদীসটির আলোকে আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, চল্লিশটি ছাগী—যা ছাগলের নিসাব—নবী করীম (স)-এর যুগে চারশত দিরহামের সমান হত (১০×৪০)। তার অর্থ তা নগদ সম্পদের নিসাবের (২০০ দিরহাম) দ্বিগুণ।

সম্ভবত নগদ সম্পদের নিসাব গবাদিপশুর যাকাতের নিসাবের তুলনায় কম রাখা শরীয়াতদাতার লক্ষ্য। কেননা নগদ সম্পদের মালিকত্ব ব্যক্তিকে তার বহু ও বিপুল অর্থনৈতিক প্রয়োজন পরিপূরণে সমর্থ বানিয়ে দেয়। সে অতি দ্রুত এবং সহজেই সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে সক্ষম হয় কিন্তু উষ্ট্রের ও অন্যান্য পশু সম্পদের মালিকের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। তাই যার কাছে এটা রয়েছে, তার প্রয়োজন হয় খাদ্য,

পোশাক বা ঔষধ ক্রয়ের। কিন্তু সে নগদ টাকার বিনিময়ে উষ্ট্রী বিক্রয় করা ছাড়া তা ক্রয় করতে পারে না। অথচ এ বিক্রিটাও সব সময় সহজ হয় না, সম্ভবপর হয় না। আর যথার্থ মূল্যও সব সময় পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু নগদ সম্পদের মালিকের এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় না। কেননা এ নগদ সম্পদই তো বিনিময়ের প্রত্যক্ষ মাধ্যম। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের সার্থক হাতিয়ার বিশেষ। নিসাব পরিমাণ নগদ সম্পদের মালিকানা যেমন প্রাচুর্য নিয়ে আসে, পুঁজি করে রাখার সুযোগও তাতে কম থাকে না। বিশেষ করে একটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার যে শর্ত করা হয়, তা তাতে সহজেই কার্যকর হতে পারে। জম্হুর ফিকাহ্বিদ্দের মত তাই।

হানাফী ফিকাহ্বিদ্দের শর্ত হচ্ছে, নগদ সম্পদের পরিমাণ মালিকের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। যেন যাকাত দিয়ে দেয়ার পর তার মৌল প্রয়োজন পরিপূরণে সে পরমুখাপেক্ষী হয়ে না পড়ে।

এ প্রেক্ষিতে উষ্ট্র বা ছাগল—এ গবাদিপশুর যাকাতের নিসাবের অর্থের নগদ সম্পদের যাকাতের নিসাব নির্ধারণে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক বা বিস্ময়ের কিছুই নেই।

নগদ সম্পদের নিসাবে গ্রহণযোগ্য মান

এই আলোচনা ভিত্তিতে নগদ সম্পদের নিসাবের জন্যে একটা স্থায়ী মান নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে খুবই সম্ভব। নগদ অর্থের ক্রয় ক্ষমতা যদি কখনও খুব সাংঘাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে তখন তার আশ্রয় গ্রহণ সম্বব হবে। সে অবস্থায় ধন-মালের মালিকের উপর অবিচার করা হয়, নয় দরিদ্র যাকাত প্রাপকদের উপর উক্ত মানটি পাঁচটি উষ্ট্রের বা চল্লিশটি ছাগলের মূল্যের অর্ধেকের সমান হবে, গড় শহর মূল্যের বিচারে।

গড় শহর মূল্যের কথা বলা হল এজন্যে যে, অনেক দেশে অস্বাভাবিকভাবে পশু সম্পদের অভাব দেখা দেয় ও তার মূল্য চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। আবার অনেক দেশে তার সংখ্যা বিপুল হয়ে দাঁড়ায় এবং খুব সস্তায় ক্রয় বিক্রয় হতে থাকে। এমতাবস্থায় মধ্যম বা গড়টাই সুবিচারপূর্ণ হবে। তখন এই পরিমাণ নির্ধারণের দায়িত্ব ওয়াকিফহাল ও সমঝদার সুধীদের উপর অর্পিত হবে।

নগদ কাগজী মুদ্রা ও তার বিচিত্রতা

কাগজী নোট বিশেষ ধরনের কাগজের টুকরা দিয়ে তৈরী হয় এবং বিশেষ চিত্র-দৃশ্য কারুকার্য সহকারে মুদ্রিত হয়। তাতে সুষ্ঠু ক্রমিক নম্বরও দেয়া হয়। তা সাধারণত আইনসম্মতভাবে একটা দাতব পরিমাণের বিকল্প ও প্রতিভূ হয়ে থাকে। তা সরকার বা সরকারের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশ করা হয়। জনগণ তারই বিনিময়ে নিজেদের মধ্যে যাবতীয় লেন-দেনের কার্য সমাধা করে থাকে।

এই ধরনের নগদ মুদ্রা উপস্থাপন বর্তমান কালে একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় সব রাষ্ট্রই এই ধরনের নোট প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে। বৈদেশিক ও

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে লেন-দেনের সুবিধা ও ব্যাপকতার কারণে তা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কেননা কেবল মাত্র ধাতব মুদ্রাই যথেষ্ট হতে পারে না এই প্রয়োজন পূরণের জন্যে। অর্থনৈতিক গতিধারা অব্যাহত রাখার জন্যে এছাড়া কোন গতি নেই।

নগদ কাগজী নোট ধাতব মুদ্রার সমান মর্যাদার গণ্য হয়ে থাকে। কেননা এ দুটিই সমভাবে বিনিময় মাধ্যম হওয়ার যোগ্য। তা সত্ত্বেও কাগজী নোট মূল ও আসল মুদ্রা দেয়ার একটা প্রতিশ্রুতি মাত্র। তা ঋণ পরিশোধের কাজে ধাতব মুদ্রার ন্যায় কাজ দিতে সক্ষম। মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা তার ভিত্তিতে খুবই সহজও বটে।

নগদ কাগজী মুদ্রা তিন প্রকারের হয়ে থাকেঃ স্থিরীকৃত (fixed), দলীলপত্র স্বরূপ (documentary) এবং বাধ্যতামূলক (obligatory)।

১. স্থিরীকৃত যে সব চেক্ বা স্বর্ণ বা রৌপ্যের একটা পরিমাণের প্রতিভূ হয়। একটিা নির্দিষ্ট বিনিময় ক্ষেত্রে আমানতকৃত নগদরূপে কিংবা পিণ্ডরূপে (Ingot) যার খনিজ ধাতুব মূল্য চাওয়া মাত্র ভাঙ্গানো যোগ্য চেকের মূল্যের বিকল্প হবে। বলা যাবে যে, এই সব খনিজ ধাতুর নগদ মুদ্রা এই কাগজী চেকরূপে প্রকাশমান, যেন তা বহন করা ও স্থানান্তরিত করা সহজসাধ্য হয় এবং ক্ষয়ক্ষতি বা অবক্ষয়ের সম্মুখীন না হয়।

২. নগদ দলীল-পত্র রূপ। তা এমন চেক্ যা তার উপর সংকিত অংকের প্রতিশ্রুতি বহন করে যে, তার বাহক চাওয়া মাত্রই সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেয়ে যাবে। সরকারের অনুমতিক্রমে ব্যাংকসমূহ যেসব ব্যাংক নোট প্রকাশ করে সে সব নগদ ভাঙানোযোগ্য কাগজী নোট এই পর্যায়ের। তার জন্যে খনিজ ধাতুর অবশিষ্ট (Balance) মজুদ থাকে, যা ব্যাংক সংরক্ষণ করে এবং সে এর লাভ করতে চায় যা দেশীয় আইন উভয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেয়। এর ফলে এই নগদ মুদ্রাটা নিরাপত্তাপূর্ণ ও দায়িত্ব গৃহীত (secured) হয়। সব বিনিময় ক্ষেত্র, জনগণ এবং সাধারণ অর্থনীতি তাতে বিপুলভাবে উপকৃত হয়।

৩. বাধ্যতামূলক কাগজী নগদ, যাতে স্বর্ণ বা রৌপ্য ভাঙানোযোগ্য হয় না। তা দু'প্রকারেরঃ

(ক) সরকারী কাগজী নগদ। সরকার তা বিভিন্ন অনিয়মিত সময়ে প্রকাশ করে থাকে এবং তাকে প্রধান ও শীর্ষস্থানীয় নগদরূপে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু তা আসল খনিজ ধাতুর সাথে বিনিময় হয় না। কোন ধাতব অবশিষ্টও তার মুকাবিলায় থাকে না।

(খ) ভাঙানোযোগ্য কাগজী নগদ (ব্যাংক নোট)। কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যাংক তা আইনের ভিত্তিতে প্রকাশ করে ও আসল ধাতুতে ভাঙাতে বাধ্য থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দুনিয়ার বড় বড় রাষ্ট্র ও বাধ্যতামূলক ভাঙানোযোগ্য নগদের ব্যবস্থা অনুসরণ করে চলেছে। স্থানীয়ভাবে সর্বপ্রকার বিনিময় প্রয়োজনের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন হচ্ছে। আর বৈদেশিক বিনিময়ের জন্যে অথবা উৎপাদনে বিনিয়োগের জন্য প্রচুর বিশুদ্ধ ধাতু সংরক্ষণ করা হয়।

এ সব বাধ্যতামূলক নগদের মূল্য নির্ধারিত হয় বিধিদাতার ইচ্ছানুযায়ী। তার নিজের থেকে নয়। কেননা তা কোন পণ্যমূল্য বহন করে না। তার ভিত্তিতে বিনিময় অবলুপ্ত করে দেয়া হলে তা তার মূল্য হারিয়ে ফেলে কিন্তু যে নগদ মুদ্রা খনিজ সম্পদের বিনিময়ে ভাঙানো যায়, তাতে তার আইনগত মূল্য ও পণ্যমূল্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়।

নগদ কাগজী সম্পদের যাকাত সংক্রান্ত শরীয়াতী হুকুম জানার আগে তার প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে—ভূমিকা স্বরূপ এ সব কথা জানা জরুরী ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, ধাতব নগদের বিরোধী কোন হুকুম কি তার জন্যে রয়েছে? থাকলে তা কি?

কাগজী নগদের যাকাত

কাগজী নগদ মুদ্রার প্রচলন সম্পূর্ণ এ যুগের ব্যাপার। এর পূর্বে এর প্রচলন কখনই ছিল না। ফলে আগের কালের আলিমগণ এ পর্যায়ে কোন অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন, আমরা তা আশা করতে পারি না। এ ক্ষেত্রে যা কিছু রয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, এ কালের বহু মনীষী প্রাচীনকালের লোকদের মতামতের উপর ভিত্তি করে নিজেদের ফতোয়া রচনার চাতুরী করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ এসব নগদ, মুদ্রার উপর নিতান্ত আক্ষরিক বাহ্যিকভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন। ফলে তাঁরা একে নগদ সম্পদই মনে করতে পারেন নি। কেননা তাঁদের মতে শরীয়াতী নগদ সম্পদ হচ্ছে রৌপ্য ও স্বর্ণ। অতএব (তাঁদের মতে) কাগজী নোটের উপর যাকাত ধার্য হয় না।

মিসরের মালিকী মাযহাবপন্থী শায়খ আলীশ তাঁর সময়ে এ বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁর কাছে বাদশাহর সিলযুক্ত কাগজের বিষয়ে—যা দিরহাম—দীনারের মত পারস্পরিক বিনিময়ে ব্যবহৃত হচ্ছে—ফতোয়া চাওয়া হয়েছিল। তিনি একবাক্যে ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, তাতে যাকাত ফরয নয়।

কোন শাফেয়ী আলিমও তাতে যাকাত নেই বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তবে তার মূল্য বাবদ রৌপ্য বা স্বর্ণ হাতে পেলেও একটি বছর অতীত হলে তখন তার উপর যাকাত ধার্য হবে। তা এ জন্যে যে, এ কাগজী লেনদেন শরীয়াতের বিচারে জায়েয নয়। কেননা তাতে কোন অর্পণ ও গ্রহণের শব্দ লিখিত নেই।

'আল-ফিক্হ আলাল-মাযহাবিল আরবায়া' গ্রন্থে লিখিত হয়েছেঃ

১. শাফেয়ী মাযহাবের আলিমগণ বলেছেন ঃ নগদী কাগজ (বা কাগজ নগদ)-এর ভিত্তিতে পারস্পরিক লেন-দেন ও মুয়ামিলা করা তার মূল্য দেয়ার জন্যে ব্যাংকের উপর দায়িত্ব অর্পণ পর্যায়ের কাজ। তাই ব্যাংকের উপর ঋণ হিসেবে তার মূল্যের মালিক হওয়া যাবে। ব্যাংক তা দিতে সদা প্রস্তুত। আর কোন ঋণগ্রস্ত (Debtor) ব্যক্তি এই পরিচিতির হলে তখনকার অবস্থার দৃষ্টিতে তার উপর যাকাত ফরয হবে। আর হাওয়ালায় গ্রহণের শব্দদ্বয় না থাকলেও যা থাকাই স্বাভাবিক—তা বাতিল হবে না।

তবে কোন শাফেয়ী আলিম বলেছেন, অর্পণ ও গ্রহণ বলতে বোঝায় সেই সব কথা বা কাজ, যার দ্বারা উভয়ের রাযী থাকার কথা জানা যাবে। আর এই উভয়ের রাযী থাকার প্রয়োজন সুস্পষ্ট।

২. হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ ধন-সম্পর্কিত কাগজ বা ব্যাংক নোট শক্তিশালী ঋণপত্রের মধ্যে গণ্য। তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে রৌপ্যের বিনিময়ে ভাঙানো যায়। অতএব তাতে যাকাত ফরয হবে।

৩. মালিকী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ ব্যাংকের নোট যদিও ঋণের সনদ বিশেষ, কিন্তু তা তাৎক্ষণিকভাবে রৌপ্যে ভাঙানো যায়। আর পারস্পরিক লেন-দেনে তা স্বর্ণের মূল্যাভিষিক্ত গণ্য হবে। অতএব তার উপর যাকাত ফরয হবে তার শর্তাবলীসহ।

৪. হাম্বলী মাযহাবের লোকেরা বলেছেন ঃ কাগজী নগদে যাকাত ফরয নয়; যতক্ষণ তা স্বর্ণ বা রৌপ্যে ভাঙানো না যাবে এবং তাতে যাকাতের শর্তাবলী পাওয়া না যাবে।

বিভিন্ন মাযহাবের এসব মতামতের ভিত্তি হচ্ছে, তা প্রমাণকারী ব্যাংকের উপর ঋণ প্রমাণকারী এসব সনদরূপে গণ্য এবং তাৎক্ষণিকভাবে রৌপ্য দ্বারা তার মূল্য ভাঙানো যেতে পারে। অতএব তার উপর তখনই যাকাত ফরয হবে—তিন মাযহাবের মত তা-ই। আর হাম্বলী মতে তা কার্যত ভাঙানো হলেই যাকাত ফরয হবে। আর আমরা জানি, আইন ব্যাংক নোটকে স্বর্ণ বা রৌপ্যে ভাঙানোর বাধ্যবাধকতা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। এ থেকেই বের হয়ে আসে সেই ভিত্তি, যার দরুন এসব কাগজী নোটের উপর যাকাত ফরয হওয়া প্রমাণিত হয়।

এ সব কাগজী নোট জনগণের পারস্পরিক মুয়ামিলা সম্পন্ন করার ভিত্তি। জনগণ কখনই রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা চোখে দেখতে পারে না। সম্পদ ও পারস্পরিক লেন-দেন বিনিময়ের ভিত্তিই হচ্ছে এ কাগজী মুদ্রা।

এবং কাগজী নোট শরীয়াতসম্মত কর্তৃত্বের আস্থাক্রমে ও পারস্পরিক মুয়ামিলারই ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় বলে তা-ই দ্রব্যের মূল্য ও মূলধন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রয় ও বিক্রয় তার দ্বারা সাধিত হয়। মজুরী, মাসিক বেতন ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদিও তাতেই দেয়া হয়। তার যতটা পরিমাণেই কেউ মালিক হলে ধনীরূপে গণ্য হতে পারে। প্রয়োজন পূরণে স্বর্ণ ও রৌপ্যের শক্তিলাভ তার হাতে আসে। সে সহজেই বিনিময় কার্য সম্পন্ন করতে পারে। উপার্জনও করতে পারে, মুনাফাও লাভ করতে পারে। এ দিক দিয়ে তা ক্রমবৃদ্ধিশীল সম্পদ বটে, অন্তত তার দ্বারা প্রবৃদ্ধি সাধিত হতে পারে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই তা স্বর্ণ ও রৌপ্যের মর্যাদাসম্পন্ন।

এটাই সত্য যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অর্থগত মর্যাদা তার নিজস্ব। কেননা তা প্রকৃত ধাতব ও খনিজ দ্রব্য। তা নগদ মুদ্রা হিসেবে কখনো অকেজো হয়ে গেলেও তার ধাতুগত মূল্য তো কোন দিনেই হারিয়ে যাবে না। কিন্তু শরীয়াতের যে মৌল ভাবধারা ও তৎসংক্রান্ত যেসব অকাট্য দলীল তাতে বোঝা যায় যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাত

ফরয হয় শুধু সে দুটোর অর্থনৈতিক সারবত্তার কারণে। কেননা সব মালেই তো আর যাকাত ফরয হয় না। হয় কেবল সেই ধন-মালে যা প্রবৃদ্ধি প্রবণ। আর স্বর্ণ ও রৌপ্যকে প্রবৃদ্ধি-প্রবণরূপে শরীয়াতে গণ্য করা হয়েছে এ দৃষ্টিতে যে, সে দুটো দ্রব্যের মূল্য বিশেষ। তাহলে বলা যায়, এ দুটোর অর্থনৈতিক গুরুত্বের সাথে সাথে সে দুটোর মূল্যত্বও বিবেচিত হয়েছে। এ কারণে বহু সংখ্যক কিতাবে স্বর্ণ রৌপ্যের যাকাত পর্যায়ের আলোচনার শিরোনাম দেয়া হয়েছে; 'মূল্যসমূহের যাকাত' কিংবা 'দুই নগদ সম্পদের যাকাত।'

এই কারণে এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, কোন কোন মাযহাবের লোকেরা এ সব কাগজী নোটের যাকাত দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। আর সেজন্যে হাম্বলী বা মালিকী কিংবা শাফেয়ী ইত্যাদি মাযহাবের নাম করা হবে। আসলে এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অভিনব। মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফলে কিয়াস করার মত কোন ভিত্তিই সেখানে নেই।

এই কারণে বলতে হবে যে, এ ব্যাপারে আমাদেরকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। করতে হবে এ যুগের অবস্থা, পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে।

শায়খ মুহাম্মাদ হাসনাইন মখলুফ তার পুস্তিকা التبيان فى الزكوة الأثمان-এ যা লিখেছেন; যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণে তা এখানে উল্লেখ করতে চাই। কাগজী সম্পদের যাকাত দেয়া এই চিন্তা করে যে, তা ঋণের যাকাত—যা প্রাচীন ফিকাহ্‌বিদগণ জানতেন—তিনি তার সমর্থন করেছেন এবং এ কাগজী নোটকে ঋণের বস্তুরূপে গণ্য করেছেন; বলেছেন, তার উপর যাকাত ফরয হয় শুধু তাদের মতে, যারা বলেন যে, সেই ঋণের যাকাত তার হাতে দিয়ে দেয়াকে শর্ত করা যায় না যদি তা কোন স্বীকারকারীর প্রতি নির্দেশমূলক হয়। এ কথা সুস্পষ্ট যে, ঋণের যাকাতের ভিত্তিতে এই কাগজী নোটের যাকাত দেয়া—তাতে গরীবদের উপর অবিচার হলেও—এসব কাগজে মুদ্রিত মূল্যের হিসেবে একটি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যিম্মায় থাকা প্রকৃত ঋণের মতই এবং এসব কাগজী নোট প্রকৃত ঋণের মতই মনে করতে হবে।

তা সত্ত্বেও এসব কাগজী নোটের ও তাতে যে মূল্য মুদ্রিত আছে এবং প্রকৃত ঋণ—এ দুয়ের মাঝে বড় পার্থক্য রয়েছে। কেননা ঋণের টাকা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন উপকার ও লাভ করতে পারে না। কেননা তা উপস্থিত নগদ ও প্রবৃদ্ধিশীল সম্পদ নয়। কিন্তু এ সব কাগজী নোটের মূল্য সেরূপ নয়, তা তো ক্রমবর্ধনশীল, তা ব্যবহার করা চলে। যেমন উপস্থিত সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়ে থাকে। তাহলে কেমন করে বলা যেতে পারে যে, এই নোটগুলো ঋণের বস্তু বা সনদের মত? ঋণের সনদ তো তা-ই, যা ঋণীকে দায়ী করার জন্যেও ক্ষয়ের ভয়ে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ঋণীর যিম্মায় ঋণ বৃদ্ধিসাধনের উদ্দেশ্যে নয়। তা দিয়ে কায়-কারবার করার উদ্দেশ্যেও নয়। এ কথাই বলা যেতে পারে কি ভাবে যে, তার বিকল্প স্বর্ণ বা রৌপ্য হাতে না লওয়া পর্যন্ত তার উপর

যাকাত ধার্য হবে না? অথচ ঋণের টাকায় যাকাত না হওয়া তো এজন্যে যে, তা প্রবৃদ্ধিশীল নয় এবং ঋণী ব্যক্তির ভাণ্ডারে তা যথাযথভাবে সংরক্ষিতও নেই।

ফিকাহ্‌বিদগণ ঋণের যাকাত না দেয়ার কথা বলেছেন যতক্ষণ তা ঋণীর হাতে থাকবে, তা মালিকের হাতে ফিরে না আসবে, তা তো এই কারণে। শাফেয়ী মাযহাবে সচ্ছল অবস্থার লোকের চলতি ঋণকে যাকাতের ক্ষেত্র থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। কেননা সে তো গচ্ছিত ধনের ন্যায় হাতে আসার পূর্বেই যাকাত দিয়ে থাকে। একথা মনে করে যে, তা তার হাতেই রয়েছে এবং ক্রমবৃদ্ধির উপযুক্ত ও প্রস্তুত। যদি তা প্রবৃদ্ধি ধরে নেয়া হয়—যেমন কাগজী নোটের বিকল্প রয়েছে—তা হলে তাতে তা হাতে আসার পূর্ব পর্যন্ত যাকাত মওকুফ হওয়ার কোন কারণ থাকে না, কোন আলিমও তার পক্ষে মত দিতে পারেন না।

সত্যি কথা হচ্ছে , এ এক ভিন্ন ধরনের ঋণ, সম্পূর্ণ নতুন। প্রকৃত ঋণের সাথে তা খাপ খায় না। ফকীহদের পরিচিত শর্তাবলীও তাতে চলে না। ঋণের যাকাতে যে মতবিরোধ রয়েছে, তা-ও এ ক্ষেত্রে নিতান্তই অবাস্তব। বরং যাকাত ফরয হওয়াটা সর্ববাদীসম্মত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শেষ পর্যন্ত বলেছেন, যদি মনে করা হয় যে, ব্যাংকে নগদ সম্পদ কিছুই নেই এবং শুধু এসব কাগজী নোট দেখতে পাওয়া গেল তার বিকল্প থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে, তার উপর লিখিত প্রতিশ্রুতির বাধ্যবাধকতার প্রতি নজর না দিয়ে তা সরকার প্রকাশ করেছেন শুধু এতটুক গণ্য করে এবং তার প্রচলিত মূল্যের কারণটা গণ্য করে তবুও তার যাকাত দেয়া ফরয হবে। কেননা তার শুধু মূল্যত্বের কারণেই স্বর্ণ-রৌপ্য দুই নগদ সম্পদের যাকাত ফরয হয়েই থাকে—তা সৃষ্টিগতভাবে না হলেও। যেমন পূর্বে পয়সা, চামড়া ও কাগজের উপর যাকাত ফরয হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল, অর্থ সংক্রান্ত কাগজী নোটের উপরও যাকাত হবে চারটি কারণে ঃ

প্রথম, অর্থের হিসেবে—ব্যাংকের যিম্মায় যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সেই হিসেবে। আর তা পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত, হস্তগত। যদিও সব দিক দিয়ে তা ফিকাহ্‌বিদদের কাছে পরিচিত ঋণ নয়।

দ্বিতীয়, তার যাকাত হবে ব্যাংকের ভাণ্ডারে রক্ষিত মাল হিসেবে। আর এ দুটি দিক দিয়ে তাতে যাকাত ফরয সর্ববাদীসম্মতরূপে।

তৃতীয়, তার যাকাত হবে ব্যাংকের যিম্মায় অর্পিত ঋণ হিসেবে। অতএব নির্দেশ হিসেবে উপস্থিত ঋণের যাকাত মনে করে যাকাত দিতে হবে।

চতুর্থ, তার যাকাত হবে তার প্রচলিত মূল্য হিসেবে, যা পারস্পরিক মুয়ামিলা তার ভিত্তিতে চলাকালে স্বীকৃত হয়, আর মূল্য হিসেবে তা গ্রহণকরণ জনগণের ঐকমত্যের কারণে। অতএব তাতে যাকাত হওয়াটা কিয়াসের ভিত্তিতে প্রমাণিত, যেমন পয়সা ও তামার যাকাত হয়।

আমি বলব, এই শেষোক্ত বিবেচনায় বাধ্যতামূলক কাগজী নগদের ক্ষেত্রে যা এক্ষণে সর্বোত্তম বিনিময় ও মুয়ামিলা-মাধ্যম এবং যার মুকাবিলায় ব্যাংকে ধাতব অবশিষ্ট সংরক্ষণের শর্ত করা হয়নি; ব্যাংক তা রৌপ্য ও স্বর্ণে ভাঙাতে বাধ্য হয় না—ফিরে যাওয়া কর্তব্য।

এ সব কাগজী নোট গ্রহণ করে প্রথম ব্যবহারকালে যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে ভিন্ন মত রয়েছে। কেননা জনগণের তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস অর্জিত হয় না, যা প্রত্যেকটি নতুনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এক্ষণে যদিও অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে।

এ সব কাগজী নোট নগদ টাকা হিসেবে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই প্রচলিত হয়ে পড়েছে, যেমন ধাতব নগদ অর্থ প্রচলিত হয়েছে। সমাজ দুটোকে একই দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

তা মোহরানা হিসেবে দেয়া যেতে পারে। কোন প্রকার আপত্তি ছাড়াই তার ভিত্তিতে বিয়ে শুদ্ধ ও সংঘটিত হবে।

মূল্য হিসেবেও তা দেয়া চলবে। কোনরূপ চুক্তি ব্যতিরেকেই তা দিয়ে পণ্য গ্রহণ করা যাবে।

শ্রমের মজুরী হিসেবেও তা দেয়া যাবে। কর্মের পারিশ্রমিক হিসেবে তা গ্রহণ করতে কোন শ্রমিক বা চাকুরে দ্বিধাবোধ করবে না।

'ভুলবশত হত্যাকাণ্ডের' রক্তমূল্য হিসেবেও তা দেয়া যাবে। প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যার রক্তমূল্যও তা-ই। তার ফলে হত্যাকারী নিষ্কৃতি পেতে পারবে। নিহতের অভিভাবক তা পেয়ে রাযীও হবে। তা চুরি করলে চুরির শাস্তি ভোগ করতে হবে। কোনরূপ সন্দেহ ছাড়াই।

তা সঞ্চয় করা যাবে, তার মালিক হওয়াও সংগত হবে। যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে কেউ ধনী গণ্য হতে পারে, তা এ সম্পদের মালিকানায়ও কার্যকর হবে তা কারোর কাছে বেশী পরিমাণ জমা হলে সে তার নিজের কাছেও এবং সমাজের কাছেও মালদার ব্যক্তিরূপে গণ্য হবে।

এসব কথার তাৎপর্য হল, এ কাগজী নোটের শরীয়াতসম্মত নগদ হওয়ার ভূমিকা রয়েছে। তার গুরুত্ব স্বীকৃতব্য। সমাজ সমষ্টিরও এ দৃষ্টি রয়েছে তার উপর। তা হলে এসব নগদ মুদ্রার ফায়দা গ্রহণ ও তার বহুমুখী ভূমিকা পালন থেকে গরীব-মিসকীন ও অন্যান্য সমস্ত পাওনাদারদের বঞ্চিত রাখা যাবে কি করে? সমস্ত মানুষ কি নির্বিশেষে তা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করছে না? তার মালিক কি তাকে এমন নিয়ামত মনে করে না, যার শোকর করা ফরয হয়? ফকীর-মিসকীনরা কি তার প্রতি করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে না? তা পাওয়ার জন্যে কি তাদের মনে ইচ্ছা বা লোভ জেগে উঠে না? তার সামান্য কিছুও তাদের দিলে তারা কি খুশীতে নেচে উঠবে না? .. হ্যাঁ নিশ্চয়ই তা হয়।

এ আলোচনার উপসংহারে এসে আমি কতিপয় অর্থনীতিবিদের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করতে চাই। বলা যায়, এ নগদ কাগজী নোট সমূহ সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয় মূল্যের

ধারণায়, বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে, সঞ্চয়ের সম্পদরূপে, তাহলে কোন্ জিনিসটি একে নগদের ভূমিকা পালনের উপযুক্ত করে দিল? যে জিনিস দিয়ে তা তৈরী এবং তার বিনিময়ের মাধ্যম হওয়ার অবস্থা থেকেই দৃষ্টি ফিরিয়েই একথার জবাব ঠিক করতে হবে। কাজেই যতক্ষণ তাতে এমন বস্তুত্ব থাকবে যার দরুন তা সমাজের উৎপাদনকারীরা গ্রহণ করবে তারা যা বিক্রয় করে তার বিকল্প হিসেবে। অতএব এ বস্তুই হচ্ছে নগদ সম্পদ।

নগদ সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

শরীয়াত নগদ সম্পদের সকল পরিমাণের উপর যাকাত ফরয করেনি। তা কম হোক, কি বেশী। সব সময়ও তা ফরয নয়—সে সময় দীর্ঘ হোক কি সংক্ষিপ্ত। সকল মালিকের উপরও—তার পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে—ফরয করা হয়নি। বরঞ্চ নগদ সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার কতগুলো সুনির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। সে শর্তসমূহের গুরুত্ব ঠিক তা-ই, যা যাকাত ফরয হওয়া সব ধনমালেই রয়েছে।

১. নিসাব পরিমাণ হওয়া

তার জন্যে প্রথম শর্ত হচ্ছে, এ নগদ সম্পদ নিসাব পরিমাণ হতে হবে। আর নিসাব তো শরীয়াতে ধনীর জন্যে ধনের নিম্নতম পরিমাণের মালিকানা। তার কম হলে তা সামান্য মাল গণ্য হবে। তার উপর যাকাত ফরয হবে না। তার মালিকও এ মালিকানার দরুন ধনী গণ্য হবে না।

ইতিপূর্বেকার আলোচনা থেকে প্রচলিত মুদ্রার নগদ সম্পদের নিসাবের পরিমাণটা ভালভাবেই জানা গেছে। আমরা দেখিয়ে দিয়েছি নগদ সম্পদের নিসাব সে পরিমাণ যা ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্যের সমান। আর তা-ই দীনারের সমান, যার সমর্থনে হাদীসের উদ্ধৃতি হয়েছে এবং ব্যাপারটি চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয়ে গেছে।

নিসাব পরিমাণের একক মালিক হওয়া কি শর্ত?

অনেক কয়েকজন লোকের শরীকানাভুক্ত মাল সমষ্টিগতভাবে যদি নিসাব পরিমাণ হয়, কিন্তু শরীকদের প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা মালিকানার সমষ্টি নিসাব পরিমাণ না হয়, তাহলে সেই শরীকানা সম্পদের সামষ্টিক পরিমাণের উপর যাকাত ফরয ও ধার্য হবে কি?

এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা ও মালিক (র) মত দিয়েছেন যে, শরীকদ্বয়ের কারোর উপরই যাকাত ফরয হবে না, যতক্ষণ না তাদের প্রত্যেকের উপর আলাদা-আলাদাভাবে যাকাত ফরয হচ্ছে।

ইমাম শাফেয়ীর মত হল সম্মিলিত সামষ্টিক সম্পদ এক ব্যক্তির মালিকানা সম্পদের মতই। নিসাব হলে তাতে যাকাত ধরা হবে।

এই মতবিরোধের কারণও রয়েছে। ইবনে রুশ্দ উল্লেখ করেছেন, খোদ নবী করীম (স)-এর কথায়ই অস্পষ্টতা রয়েছে। তাঁর বাণী হলঃ 'পাঁচ আউকিয়ার কম পরিমাণে যাকাত নেই।' হতে পারে তিনি এ পরিমাণটার কথা বলেছেন একক মালিকানা সম্পদের ক্ষেত্রে। হতে পারে, এ হুকুমটি তিনি একক মালিকানা ও একাধিক মালিকানা উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্যরূপে বলেছেন। তবে এ নিসাব নির্দিষ্ট করার মূলে যেহেতু দয়া প্রদর্শনই মৌল ভাবধারা, তাই এ শর্তটি একক মালিকানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর সেটাই অধিক যুক্তিসংগত।

ইমাম শাফেয়ীর মতটি গবাদিপশুর ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের মধ্যেই এ শরীকী মালিকানাকে মনে করেছেন। কিন্তু সংমিশ্রণের প্রভাব ক্রিয়া সর্ববাদীসম্মত নয়?

তবে জম্হুর ফিকাহ্বিদদের মত হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে আপেক্ষিক ব্যক্তি-স্বতন্ত্র কিংবা তাৎপর্যগত শরীকানা গণনার যোগ্য নয়। কেননা এই শরীকানার অংগ-সমূহ—সদস্যগণ গরীবদের অংশের সমষ্টির ভাগীদার। আর যাকাত ধনী লোকদের কাছ থেকে এ জন্যেই নেয়া হয়, যেন তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করা যায়। কাজেই এক্ষণের ঐসব লোক তো সেই পর্যায়ের, যাদের মধ্যে যাকাত বন্টন করা হবে, সেই লোকদের মধ্যে গণ্য নয় যাদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে। বেশ কয়েকজন লোকের নিসাব পরিমাণ সম্পদের অংশীদারিত্বে একত্রিত হওয়াটায় তাদের মধ্যকার গরীবরা তো আর ধনী হয়ে যাবে না।

তবে সংগতি সাধনে ইমাম শাফেয়ীর মতটির ভূমিকা খুব কার্যকর। এ কালের রাষ্ট্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলে তা-ই মনে হয়। এটা সম্ভব যে, ঋণগ্রস্তরা যাকাতের একটা নির্দিষ্ট হার কোম্পানীর জন্যে ছেড়ে দেবে, যেন তা গরীব অংশীদারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তাতে একই সঙ্গে দুটি নেক কাজের সমন্বয় হবে।

২. একটি বছরকাল অতিবাহিত হওয়া

নগদ সম্পদের নিসাব পরিমাণ হওয়ার পর এ পর্যায়ের দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে তার মালিকানার একটি বছর অতিবাহিত হতে হবে। এ কথাটি সর্ববাদীসম্মত অব্যবহৃত সম্পদের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ নগদ সম্পদের যাকাত বছর মাত্র একবারই ফরয হবে। তাই যে-মালেরই যাকাত একবার দেয়া হল, তার উপর একটি পূর্ণ বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তার যাকাত পুনরায় দিতে হবে না।

হানাফী ফিকাহ্বিদদের মতে বছরের শুরু ও শেষ উভয় কালেই পূর্ণ মাত্রার নিসাব বর্তমান থাকা যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত। বছরের শুরুতে ধার্য হবে আর বছরের শেষে দিয়ে দেয়া ফরয হবে। মাঝখানে কম হয়ে গেলে কোন ক্ষতি হবে না—যাকাত থেকে নিসাব পাওয়া যাবে না, তবে বছরের মাঝখানে সম্পূর্ণ সম্পদ ধ্বংস বা বিনষ্ট হয়ে গেলে সে বছর গণনা পরিত্যক্ত হবে। পরে নতুনভাবে সম্পদের মালিকানা শুরু হলে তখন থেকে আবার বছর গণনা শুরু হবে।

তিনজন ইমাম সারাটি বছরকাল ধরে নিসাব-মাত্রা পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকার কথা বলেছেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে এই হাদীসঃ

لَا زَكٰوةَ فِىْ مَالٍ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ-

একটি পূর্ণ বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মালের উপর যাকাত ফরয হবে না।

এ হাদীসের দাবি হচ্ছে সারাটি বছর সমানভাবে নিসাব পরিমাণ বর্তমান ও অক্ষুন্ন থাকা। এ দাবিও রয়েছে যে, বছরের শুরু ও শেষে যা গণ্য হবে মাঝখানেও তা গণ্য হতে হবে। আর তা হচ্ছে মালিকত্ব এবং মুসলিম হওয়া।

আর যে সব নগদ সম্পদ ব্যবহৃত হচ্ছে—যেমন বেতন, মজুরী, ক্ষতিপূরণ, কাফ্ফারা, স্বাধীন পেশাধারী—চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী প্রভৃতিকে দেয় অথবা ফলপ্রসূ বাসোপযোগী দালান-কোঠা, শিল্পকারখানা, হোটেল-রেস্তোঁরা প্রভৃতি স্থায়ী কাজে এবং গাড়ি ও উড়োজাহাজ প্রভৃতি অস্থায়ী কাজে মুলধন বিনিয়োগ—এই সব ক্ষেত্রেই জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মত হচ্ছে সারাটি বছর নিসাবমান অক্ষুণ্ন থাকা। ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন ঃ কাজে বিনিয়োগকৃত সম্পদ নগদ সম্পদের সাথে যোগ করে বছরান্তে হিসাব করে সমস্তটাই যাকাত দিতে হবে উক্ত মালের বছর হিসেবে। তবে বিনিয়োজিত মাল যাকাত দেয়া মালের বিকল্প হলে অন্য কথা।

কোন কোন সাহাবী থেকে এর বিপরীত মত পাওয়া গেছে। তাঁরা বিনিয়োগকৃত মালের যাকাত দেয়ার কথা বলেছেন যখনই তা হাতে ফিরে আসবে তখন। বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্তে নয়।

পরে এ পর্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

৩. ঋণমুক্তি

যে নিসাব পরিমাণ নগদ সম্পদের উপর যাকাত ফরয হবে, সে জন্যে শর্ত হচ্ছে যে, তাকে অবশ্য ঋণমুক্ত হতে হবে। যেন ঋণ গোটা নিসাব পরিমাণকে গ্রাস বা হ্রাস করতে না পারে। এ পর্যায়ে এ অধ্যায়ে এ প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করে এসেছি। এর পক্ষের দলীলাদিও তথায় উল্লেখ করেছি।

হানাফীদের মতে যে ঋণ যাকাত ফরয হওয়ার প্রতিবন্ধক, তা হচ্ছে সেই ঋণ যার জন্যে নানাবিধ দাবি প্রবল হয়ে আছে, তা আল্লাহ্‌র দিক থেকে হোক—যেমন যাকাত, খারাজ কিংবা জনগণের দিক থেকে—যেমন সাধারণ দায়-দেনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এতে কোন পার্থক্য হবে না। তবে মানত, কাফ্ফারা, হজ্জ ইত্যাদির ঋণের কথা এখানে প্রযোজ্য নয়। কেননা এগুলোর জন্যে জনগণের দিক থেকে কোন দাবির চাপ নেই।

দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তা যাকাতের প্রতিবন্ধক হবে কি না, তাতে আলিমগণ একমত নন।

ইমাম নববীর কথানুযায়ী শাফেয়ীর মত হচ্ছে, আমরা যখন বলি যে, ঋণ যাকাতের প্রতিবন্ধক, তখন এ কথাই বুঝি যে, সে ঋণ আল্লাহ্র হোক বা মানুষের, তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

৪. মৌল প্রয়োজনের বাড়তি হওয়া

হানাফী ফিকাহ্বিদদের মধ্যকার বিশেষজ্ঞগণ এ পর্যায়ে শর্ত আরোপ করেছেন যে, নগদ সম্পদের নিসাব হতে হবে মালিকের মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের। 'মৌল প্রয়োজন' কি, তার ব্যাখ্যায় ইমাম মালিকের মত আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। তা হচ্ছে, যা মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, তা-ই মৌল প্রয়োজন। যেমন দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ব্যয়, বসবাসের বাড়ি-ঘর, যুদ্ধের অস্ত্রাদি, শীত গ্রীষ্মের প্রয়োজনীয় পোশাক এবং ঋণ। ঋণও মৌল প্রয়োজনের মধ্যে শামিল এ জন্যে যে, তা দিতে সে বাধ্য। হাতে রক্ষিত নিসাব পরিমাণ সম্পদ থেকে হলেও। অন্যথায় সে ঋণদাতার মামলা ও তজ্জনিত কারাবরণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। আর কারাবরণ তো ধ্বংসেরই শামিল। পেশার কাজের যন্ত্রপাতি ও ঘরের সরঞ্জামাদি এবং যানবাহন ও পড়ার বইও এর মধ্যে গণ্য। কেননা তাঁদের মতে মূর্খতা ধ্বংস বিশেষ। কারো কাছে যদি এ পরিমাণ পয়সা থাকে, যা এসব প্রয়োজন পূরণে ব্যয় হয়ে যাবে, তাহলে তার কিছুই নেই মনে করতে হবে। যেমন পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি থাকলে তা নেই মনে করেই ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা তার জন্যে জায়েয।

তাই যে মুসলমান যাকাতের নিসাব পরিমাণ নগদ সম্পদের মালিক হবে; কিন্তু তার পরিবারবর্গের শীত বা গ্রীষ্মের প্রয়োজনীয় কাপড় ক্রয়ে তা ব্যয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়বে অথবা প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি খরিদে ব্যয় হয়ে যাবে। কিংবা ঋণ শোধে—যার দুশ্চিন্তায় সে দিন রাত অস্থির—তা ব্যয় হয়ে যাবে অথবা অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে লেগে যাবে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না।

এতটুকু পরিমাণ মূলধনের মালিক কখনও এমন ধনী বলে গণ্য হবে না, যাতে তার উপর যাকাত ফরয হতে পারে। কেননা হাদীস অনুযায়ী যাকাত তো কেবল ধনীদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা হবে। সে তো উপরিউক্ত ধরনের বহুবিধ প্রয়োজন পূরণে নিতান্তই নাজেহাল। এগুলো তার জীবনের মৌল প্রয়োজন। আর রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ 'যাকাত হবে শুধু প্রকাশমান ধনের উপর।'* যেমন বলেছেন ঃ 'তুমি শুরু কর তোমার পরিবারবর্গ থেকে।

দ্বিতীয় আলোচনা

অলংকারাদি, তৈজসপত্র ও স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত উপঢৌকনাদির যাকাত

স্বর্ণ-রৌপ্যর যাকাত পর্যায়ের শেষ আলোচনায় ব্যবহার্য পাত্রাদি ও সৌন্দর্য জাঁকজমক বিধানের উপঢৌকনাদি, মানুষ বা জীব ইত্যাদির প্রতিমূর্তি অথবা নারী-পুরুষের অলংকারাদিতে ব্যবহৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন জরুরী। প্রশ্ন হচ্ছে, এসবে ব্যবহৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত ফরয হবে কি? না তার কোন-কোনটিতে ফরয হবে, আর কোন-কোনটিতে হবে না।

স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত পাত্রাদি ও উপঢৌকনাদির যাকাত

যে সব জিনিস ব্যবহার হারাম, তা স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা নির্মাণ করা হলে তাতে যাকাত ফরয হবে। এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।

যেসব পাত্র ব্যবহার হাদীসে হারাম ঘোষিত হয়েছে এবং সে জন্যে কঠিন আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে, যা জাঁকজমক ও বিলাসিতার প্রতীক, তার উপর যাকাত ফরয হবে। কেননা তা এক্ষণে সঞ্চিত নগদ সম্পদ ও অপ্রয়োজনে আটকে রাখা ঐশ্বর্য মনে করতে হবে। তন্মধ্যে যে সব পাত্র নিত্যকার পানাহারে ব্যবহৃত হবে, আর যা শুধু চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের জন্যে ব্যবহৃত হবে, তা সবই সমান হবে। কেননা এ উভয়টাই নিন্দিত বিলাসিতার মধ্যে গণ্য। 'আল্-মুগনী' গ্রন্থে লিখিত হয়েছে, যা ব্যবহার করা হারাম, ব্যবহার্য দ্রব্যের অকারে তা গ্রহণ করাও হারাম। তাতে নারী ও পুরুষ অভিন্ন। কেননা হারাম হওয়ার মূল কারণটা উভয়ের মধ্যে কার্যকর। তা হচ্ছে অপচয়, বেহুদা খরচ ও বড় মানুষী, বাহাদুরী, অহংকার প্রকাশ এবং তার ফলে গরীব লোকদের মনে আঘাত হানা। অতএব উভয়ের জন্যে তা সমানভাবে হারাম হবে। তবে স্ত্রীলোকের জন্যে অলংকার ব্যবহার জায়েয করা হয়েছে তাদের বিশেষ প্রয়োজনে। স্বামীর জন্যে সাজসজ্জা করা স্ত্রীর কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। কিন্তু তা তৈজসপত্র বা অন্যান্য পাত্রাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অতএব তা হারামই থেকে যাবে।

প্রতিকৃতি নির্মাণও হারাম, তা ব্রোঞ্জ বা তাম্র নির্মিত হলেও। কিন্তু তা যদি রৌপ্য বা স্বর্ণের হয়, তাহলে হারামের মাত্রা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যাবে।

ইবনে কুদামাহ বলেছেন, এসবে যাকাত ফরয হবে এ কথা যখন প্রমাণিত হয়ে গেল এবং তাতে কোনরূপ মতভেদ থাকার কথা জানা গেল না এবং জানা গেল যে, ওজনের

দৃষ্টিতে নিসাব পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত হবে না, তখন তার কাছে রক্ষিত অন্যান্য জিনিস যোগ করায় নিসাব পরিমাণ হলেও অবশ্যই তাতে যাকাত ধার্য হবে।

যদিও একটি মতে ওজন নয়, নিসাব নির্ধারণের জন্যে মূল্যের নিসাব লাগাতে হবে—কোন কোন হাম্বলী মতের আলিম এ মত দিয়েছেন। কেননা শৈল্পিক কারুকার্য, উন্নতমানের গঠন সৌষ্ঠব, শিল্প-নৈপুণ্য ইত্যাদির কারণে তার মূল্য অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে যায়—ওজন, তার যত কম হোক। তাই মূল্যের হিসাব করাই বাঞ্ছনীয়। তাতে গরীবরা, পাওনাদাররা যাকাতের পরিমাণটা বেশীই পেয়ে যাবে। সে সঙ্গে আল্লাহ্র হারাম করা জিনিস ব্যবহারকারী বিলাসী লোকদের উপর একটা কঠোর চাপ সৃষ্টি হবে।

পুরুষের ব্যবহৃত হারাম অলংকারাদিতেও যাকাত ফরয

যে সব পাত্র ও উপঢৌকন দ্রব্যাদি স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত, পুরুষ ও নারী উভয়ই ব্যবহার করে এবং পুরুষেরা যেসব হারাম অলংকার ব্যবহার করে, এ সব কিছুতেই যাকাত ফরয হবে।

কেননা অলংকার পুরুষের জন্যে প্রয়োজনীয় নয়। তার প্রকৃতির সাথেও সংগতিসম্পন্ন নয়। এ কারণে তাদের জন্যে স্বর্ণ নির্মিত অলংকার ব্যবহার ইসলামী শরীয়াতে হারাম ঘোষিত হয়েছে। তাদের পক্ষে রৌপ্য নির্মিত অঙ্গুরীর ব্যবহার করা জায়েয বটে। কেননা সাধারণত তার ওজন নিসাব পরিমাণ হয় না।

তাই কোন পুরুষ যদি স্বর্ণ নির্মিত অলংকার—অঙ্গুরীয়, হার, চেইন ইত্যাদি—কিছু ব্যবহার করে এবং তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় অথবা তার কাছে রক্ষিত অন্যান্য মালের মূল্য মিলিয়ে নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। কেননা তা বেকার ফেলে রাখা সম্পদ। অথচ তা প্রবৃদ্ধির কাজে বা সাধারণ উপকারে ব্যবহার করা অথবা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের স্বর্ণ ভাণ্ডারে তা জমা করাও যেতে পারে। এ সম্পদ ফেলে রাখা স্বাভাবিক নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়। তাতে আল্লাহ্র নির্দিষ্ট করা সীমাও লংঘিত হয়। এ জন্যে তার উপর যাকাত ধার্য করে পুরুষদের এ কাজ থেকে বিরত রাখা একান্তই আবশ্যক। তাতে তাদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে যে, এ সম্পদ বাড়তি; উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির কাজে বিনিয়োগযোগ্য। তাতে তা বিনিময়-মাধ্যম হওয়ার ও আবর্তনশীলতার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারত।

পুরুষদের পক্ষে সাধারণভাবে স্বর্ণ ব্যবহার হারাম। তবে নিতান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তা অবশ্য ব্যবহার করা যাবে। যেমন কারোর নাক কাটা গেলে সে তার জন্যে ব্যবহার করতে পারবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আরফাজাতা ইবনে মায়াদের নাক কাটা গিয়েছিল। পরে তিনি কাগজ দিয়ে একটি নাক বানিয়ে নেন। তাতে দুর্গন্ধ হলে নবী করীম (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি স্বর্ণ দিয়ে একটি নাক বানিয়ে নিয়েছিলেন (আবূ দাউদ)।

ইমাম আহমদ বলেছেন, পড়ে যাওয়ার ভয়ে স্বর্ণ দ্বারা দন্তসমূহ জুড়ে দেয়া হলে তা জায়েয হবে; কেননা এটাও একটা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত অন্যভাবে স্বর্ণ ব্যবহৃত হলে তার যাকাত দিতে হবে। সেক্ষেত্রে মূল্যটাই নিসাব গণনায় হিসেব করতে হবে, ওজন নয়। কেননা এগুলো সামগ্রী বিশেষ। তার মুল্য ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ মূল্য পরিমাণ হলেই—তার ওজন যত কমই হোক—যাকাত দিতে হবে।

স্ত্রীলোকদের মুক্তা ও মণি নির্মিত অলংকারের যাকাত

স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া অন্যান্য মূল্যবান পাথর—যেমন মণি, মুক্তা, মুঙ্গা (ঈষৎ পীতবর্ণের প্রস্তর বিশেষ—chrysolite), পারা প্রভৃতি—নির্মিত অলংকার ব্যবহার করা হলে সেজন্যে কোন যাকাত দিতে হবে না। কেননা তা অপ্রবৃদ্ধিশীল সামাগ্রী। তা অলংকার বিশেষ, নারীদের জন্যে আল্লাহ্‌র মুবাহ করা জিনিস।

তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

وَتَسْتَخْرِجُوْنَ مِنْهُ حُلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا-

তোমরা সমুদ্র থেকে অলংকার সামগ্রী বের করে আনো, যা তোমরা ব্যবহার কর।

কেবল মাত্র শিয়া মতের কতিপয় ইমাম ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন নি। তাঁরা বলেছেন, মূল্যবান পাথরের মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দেয়া কর্তব্য। কেননা তা খুবই মুল্যবান জিনিস এবং তা আল্লাহ্‌র বাণী—'ধনীদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর'—এই সাধারণ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতে ব্যবহৃত اموالهم। বহু বচনে বলা হয়েছে। তার অর্থ, 'তাদের প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা মাল-সামগ্রী থেকে যাকাত গ্রহণ কর।' মুল্যবান পাথরের সমন্বিত সর্বপ্রকারের অলংকারই এই সাধারণ নির্দেশের মধ্যে গণ্য।

জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ এর জবাবে বলেছেন, আয়াতে সাধারণভাবে সর্ব প্রকারের ধন-মাল থেকেই যাকাত গ্রহণের নির্দেশ হয়েছে এ কথা সত্য; কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলে করীমের কথা ও কাজের সুন্নাতে এই সাধারণত্বকে সংকুচিত করে কেবলমাত্র ক্রমবৃদ্ধিশীল ও প্রবৃদ্ধি উপযোগী ধন-মালেই যাকাত ফরয করা হয়েছে। তাহলে যাকাত ফরয হওয়ার 'ইল্লাত' বা কারণ হল প্রকৃত প্রবৃদ্ধি প্রবণতা। মহামূল্য হওয়াটা যাকাত ফরয হওয়ার 'কারণ' নয়। এসব পাথর অলংকার হিসেবে ব্যক্তিগত ফায়দার জন্যে ব্যবহৃত হয়, প্রবৃদ্ধির জন্যে নয়। তা পুঁজিও করা হয় না, যুক্তিসঙ্গত সীমাও লংঘিত হয় না তাতে।

স্ত্রীলোকদের স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারের যাকাত সম্পর্কে বিভিন্ন মত

স্ত্রীলোকদের স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত অলংকারাদির যাকাত পর্যায়ে নবী করীম (স)-এর যাকাত সংক্রান্ত পত্রাদিতে কোন কথাই বলা হয়নি। তাতে যাকাত ফরয হওয়া বা না

হওয়া পর্যায়ে কোন সুস্পষ্ট অকাট্য দলীলই উদ্ধৃত হয়নি। তবে এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত উদ্ধৃত হয়েছে, তার যথার্থতা নিয়েও যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে এবং তার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে কম মতবৈষম্য নেই।

এই মতবৈষম্যের কারণ হচ্ছে, কিছু লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে অলংকার নির্মাণের সামগ্রী বা বস্তুর উপর। তাঁরা বলেছেন, এটা আসল খনিজ পদার্থ, নগদ সম্পদ হওয়ার জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দ্বারা লোকদের পরস্পরিক বিনিময় কার্য সম্পাদিত হবে এ-ও তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর সেজন্যেই তার উপর সর্বসম্মতিক্রমে যাকাত ফরয হবে।

অপর লোকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে শিল্প কর্ম ও কারুকার্য খচিত অলংকারের উপর। তার কারণে তাতে আর নগদ সম্পদ হওয়ার যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকেনি। বরং তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্যে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি পর্যায়ে পড়ে গেছে। এখন তা ঘরের আসবাবপত্রের মতই যার কোন যাকাত হয় না বলে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেননা আমরা রাসূলে করীম (স)-এর হিদায়ত থেকে যা জানতে পেরেছি, সে দৃষ্টিতে কেবলমাত্র বর্ধনশীল বা বর্ধন উপযোগী কিংবা উৎপাদনশীল দ্রব্যাদিতে যাকাত ফরয হয়। এই কারণে তাঁরা বলেছেন যে, অলংকারাদিতে যাকাত নেই। এ সব মতবৈষম্য কিন্তু অলংকার সম্পর্কে জায়েয। কেননা ইসলামে হারাম এমন অলংকারের যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে পূর্ণ ইজমা রয়েছে।

অতএব সংক্ষেপে বলা যায়—

১. কিছু লোক বলেছেন, অলংকারের যাকাত দিতে হবে, যেমন সাধারণভাবে নগদ সম্পদের যাকাত দিতে হয়। আর তা হচ্ছে প্রতি বছর দশ ভাগের এক ভাগের এক-চতুর্থাংশ।

২. অন্য লোকেরা তা মনে করেন না। তাঁদের মতে তাতে যাকাত ফরয নয়। অথবা বড়জোর জীবনে একবার মাত্র যাকাত দেয়াই যথেষ্ট। তবে কতগুলো নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে তা দেয়া ফরয বলা যেতে পারে।

অলংকারের যাকাত ফরয হওয়ার দলীল

বায়হাকী প্রমুখ হযরত আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী তাঁকে তাঁর অলংকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, দুইশ' দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছলে তার যাকাত দিতে হবে। জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আমি সে যাকাত আমার ক্রোড়ে পালিত আমার ভাইয়ের বংশধরদের দেব?' বললেন, 'হ্যাঁ, দিতে পারেন।' বায়হাকী বলেছেন, হাদীসটি রাসূলের কথা হিসেবে বর্ণিত হলেও আসলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

শুয়াইব ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত, উমর (রা) আবূ মূসার প্রতি ফরমান লিখে পাঠালেন যে, তোমার পক্ষ থেকে মুসলিম মহিলাদের তাদের অলংকারাদির যাকাত দিয়ে দিতে নির্দেশ দাও।

কিন্তু আসলে এ কথাটি হযরত উমর থেকেই সপ্রমাণিত হয়নি। এ কারণে ইবনে আবূ শায়বা হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ 'কোন্ খলীফা অলংকারের যাকাত দিতে হবে বলেছেন, তা আমাদের জানা নেই।'

বায়হাকী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ 'অলংকারের যাকাত দেয়া হলে তা ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই।

কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) থেকে এর বিপরীত কথা বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর কোষাধ্যক্ষ সালেমকে লিখেছিলেন, তিনি যেন তাঁর কন্যাদের অলংকারের যাকাত প্রতি বছর আদায় করে দেয়। আবূ উবাইদ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ছয় হাজার দীনার দিয়ে তাঁর তিনটি কন্যার অলংকার গড়ে দিয়েছিলেন এবং অতঃপর তিনি তাঁর মুক্ত গোলামের মাধ্যমে এর যাকাত প্রতি বছর আদায় করে দিতেন।

এই সব বর্ণনার সনদ আপত্তিপূর্ণ। এ কারণে আবূ উবাইদ বলেছেন, ইবনে মাস্‌উদ (রা) ছাড়া অন্য কোন সাহাবী থেকেই অলংকারের যাকাত দেয়া সম্পর্কে কোন কথাই আমাদের দৃষ্টিতে সপ্রমাণিত নয়। যদিও ইবনে হাজম দাবি করেছেন যে, তা আমার কাছে চূড়ান্তভাবে সহীহ।

অলংকারের যাকাত দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সাঈদ ইবনে যুবায়র, আতা, মুজাহিদ, আবদুল্লাহ ইবনে সাদ্দাদ, জাবির ইবনে যায়দ, ইবনে সাবরামাতা, মায়মুন ইবনে মাহ্‌রান জুহ্‌রী ও সওরী প্রমুখ তাবেয়ী ফিকাহবিদগণ থেকে। ইমাম আবূ হানীফা, তাঁর সঙ্গীগণ, আওযায়ী ও নোমান ইবনে হাইরও এ মত।

এ কথার দলীল

১. অলংকারের যাকাত ফরয বলে যাঁরা মত দিয়েছেন, তাঁদের প্রথম দলীল হচ্ছে, কুরআনের সাধারণ অর্থসম্পন্ন আয়াতঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ-

যারাই স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, তাদের পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

আয়াতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উল্লেখে তা দিয়ে নির্মিত অলংকারাদিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেমন নগদ এবং স্বর্ণপিণ্ডও এর মধ্যে শামিল। অতএব তার যাকাত না দিলে তা পুঁজি করা হবে এবং কিয়ামতের দিন দাগ দেয়ার আযাব ভোগ করতে হবে।

২. রাসূলের কথার সাধারণত্বের উপর তাঁরা নির্ভর করেছেন।

কথাটি হল ঃ

فِيْ الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ-

নগদ সম্পদে দশ ভাগের এক ভাগের এক-চতুর্থাংশ যাকাত। আর পাঁচ আউকিয়ার কম পরিমাণে কোন যাকাত নেই।

তার অর্থ, 'পাঁচ আউকিয়া' পরিমাণ হলেই তার যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণের যাকাত পর্যায়ে আরও অনেক অনেক তাৎপর্যপূর্ণ কথা উদ্ধৃত হয়েছে। যেমনঃ

مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ لاَيُؤَدِّيْ زَكٰوتَهُ.......

স্বর্ণের যে মালিকই তার যাকাত দেবে না ....

৩. তৃতীয় পর্যায়ের দলীল হল বিশেষভাবে অলংকারের যাকাত পর্যায়ে উদ্ধৃত হাদীসসমূহ। বহু ইমামই সে সব হাদীসকে সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। যেমনঃ

(ক) আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন, একটি স্ত্রীলোক রাসূলে করীম (স)- এর কাছে উপস্থিত হল। তার সঙ্গে ছিল তার কন্যা। আর তার কন্যার হাতে ছিল দুটি ভারী স্বর্ণের কাঁকণ। রাসূলে করীম (স) তাকে বললেন , তোমরা কি এ জিনিসের যাকাত দিয়ে থাক? বলল না,। বললেন, তুমি কি খুশি হবে যদি আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন এ দুটির বদলে দুটি আগুনের কাঁকন পরিয়ে দেন? বর্ণনাকারী বলেছেন, অতঃপর স্ত্রীলোকটি কাঁকন দুটি খুলে নবী করীম(স) -এর দিকে ফেলে দিল এবং বলল, এ দুটি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্যে উৎসর্গীকৃত।

(খ) আবূ দাউদ , দারে কুত্নী, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন হযরত আয়েশা(রা) থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) আমার ঘরে উপস্থিত হলেন, তিনি আমার হাতে স্বর্ণের বড় অঙ্গুরীয় পরিহিত দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা, এটা কি? বললাম, এ অলংকার আমি বানিয়েছি আপনার জন্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হে রাসূল। বললেন, তুমি কি এর যাকাত দিয়ে থাক? বললেম, না। কিংবা আল্লাহ্ যা চাহেন। বললেন, তোমার জাহান্নামের জন্য এটাই যথেষ্ট।

(গ) আবু দাউদ প্রমুখ উম্মে সালমা থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি স্বর্ণের অলংকার ব্যবহার করতাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসূল। এতে কি পুঁজিকরণ হবে? তিনি বললেন, তুমি যদি যাকাত পরিমাণ হলে তার যাকাত দিয়ে দাও, তাহলে পুঁজিকরণ হবে না।

মুহাদ্দিস আল-মুন্যেরী বলেছেন, এ হাদীসটির সনদে বর্ণনাকারী হিসেবে ইতাব ইবনে বুশাইর ও আবুল হাসান আল-হুররানী রয়েছেন। ইমাম বুখারীও এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু বেশ কয়েকজন হাদীসবিদ উক্ত বর্ণনাকারীদ্বয়ের বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন।

অলংকারের যাকাত ফরয না হওয়ার পক্ষে মত

ইবনে হাজম তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুহাল্লা'য় লিখেছেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে উমর বলেছেন, অলংকারের যাকাত দিতে হবে না। আসমা বিনতে আবূ বকরও এ মত দিয়েছেন। হযরত আয়েশা থেকেও এ মতই বর্ণিত হয়েছে এবং তা সহীহ্। শা'বী উমরাতা বিনতে আবদুর রহমান, আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী, তায়ুস, হাসান ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকেও এ মত প্রকাশিত হয়েছে। সুফিয়ানা সওরী কখনও বলেছেন, তাতে যাকাত দিতে হবে, কখনও বলেছেন, দিতে হবে না।

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদও এ মতে প্রকাশ করেছেন। মালিক ইবনে আনাস, আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াই এ মতই দিয়েছেন। আবূ উবাইদ এ মত সমর্থন করেছেন।

এই মতের দলীল

এ মতের সমর্থনে উদ্ধৃত দলীলসমূহের সারনির্যাস এই—

প্রথম, মূল ও আসল কথা হচ্ছে সমস্ত মানুষই সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত, যতক্ষণ না কোন বিষয়ে কোন স্পষ্ট দলীল উপস্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু অলংকারের যাকাত পর্যায়ে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। না কোন অকাট্য দলীল, না কোন দলীল- ভিত্তিক কিয়াস।

দ্বিতীয়, যাকাত তো ক্রমবৃদ্ধিশীল বা বর্ধন-উপযোগী সম্পদের উপর ফরয হয়ে থাকে। আর কোন অলংকারই এ পর্যায়ের নয়। কেননা তাকে অলংকাররূপে নির্মাণ ও ব্যবহার করা এবং এ হিসাবে তার দ্বারা ফায়দা লাভ তাকে প্রবৃদ্ধির যোগ্যতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। অতএব তাতে যাকাত হবে না। উষ্ট্র ও গরুর যাকাত পর্যায়েও আমরা এ কথা বলে এসেছি।

তৃতীয়, কয়েকজন সাহাবী থেকে যে সব উক্তি সহীহ্ভাবে উদ্ধৃত হয়েছে তাও উপরিউক্ত মতের সমর্থন করে। আর তা হচ্ছে অলংকারে যাকাত ফরয হয় না।

ইমাম মালিক 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (হযরত আয়েশার ভ্রাতষ্পুত্র এবং মদীনার সাতজন প্রখ্যাত ফিকাহ্বিদদের অন্যতম) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা—নবী করীম (স)-এর বেগম—তাঁর ভাইয়ের কয়েকটি ইয়াতীম বালিকা লালন করতেন, তারা অলংকার ব্যবহার করত। তারা তাদের অলংকারের যাকাত দিত না।

নাফে থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর তাঁর কন্যাদের ও ক্রীতদাসীদের স্বর্ণালঙ্কার পরাতেন; কিন্তু তিনি সে সবের কোন যাকাত দিতেন না।

ইবনে আবূ শায়বা কাসেম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদের ধন-মাল হযরত আয়েশার কাছে গচ্ছিত ছিল। তিনি অলংকারাদি ছাড়া আর সব কিছুর যাকাত দিয়ে দিতেন।

উমরাতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা হযরত আয়েশার ক্রোড়ে পালিতা ইয়াতীম ছিলাম। আমাদের অলংকারও ছিল; কিন্তু তিনি (আয়েশা) তার যাকাত দিতেন না।

আবূ শায়বা ও আবূ উবাইদ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ ও আসমা বিনতে আবূ বকর থেকে এরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা ও ইবনে উমরের কথাও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, অলংকারের যাকাত নেই। আমি বললাম, তা তো প্রায় হাজার দীনারের সম্পদ হবে, বললেন, নিজে ব্যবহার করবে, অন্যকে প্রয়োজন হলে ধার দেবে। তাতেই যাকাতের কাজ হয়ে যাবে। অপর একটি বর্ণনার অতিরিক্ত কথা—'এটাই বেশী'।

হযরত আসমা যাকাত দিতেন না বলে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালিক থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, অলংকারের যাকাত নেই।

কাযী আবদুল অলীদ আল-বাজী মুয়াত্তার শরাহ্ গ্রন্থে বলেছেন, 'অলংকারে যাকাত না হওয়ার মতটি সাহাবীদের কাছেও সুপরিচিত। এঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা এ বিষয়ে অধিক জানাশোনা লোক। তিনি স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর বেগম ছিলেন। তাঁর কাছে এ বিষয়ে কোন কিছুই অজানা থাকতে পারে না।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর এ পর্যায়ের লোক। তাঁর বোন হযরত হাফ্সা (রা) রাসূলে করীম (স)-এর বেগম ছিলেন। তাঁর অলংকারের ব্যাপারটি নবী করীম (স)-এর কাছে গোপন থাকতে পারে না, তিনি নিজেও অজ্ঞাত থাকতে পারেন না এ সংক্রান্ত শরীয়াতী হুকুম সম্পর্কে।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বলেছেন, এ ব্যাপারটি সাহাবী ও তাবেয়ীনের কাছে খুবই পরিচিত ও সর্বজনজ্ঞাত ছিল। তা এ কথা থেকে প্রমাণিত যে, আমি উম্রাতাকে অলংকারের যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ 'আমি কাউকেই তার যাকাত দিতে দেখিনি।'

হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, অলংকারের যাকাত দিতে কোন সাহাবী বলেন বলে আমার জানা নেই।

চতুর্থ, ইবনে জাওযী নবী করীম (স) থেকে হযরত জাবির সূত্রে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, 'অলংকারের যাকাত নেই।'

বায়হাকী বলেছেন, উক্ত বর্ণনার একজন বর্ণনাকারী 'আফিয়া'। সে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। কিন্তু ইবনুল জাওযী বলেছেন, তার কোন দোষ আছে বলে আমার জানা নেই। শায়খ তাকীউদ্দীন ইবনে দকীক বলেছেন, শায়খ মুনযেরী এক চিঠিতে লিখেছেন, আফিয়া ইবনে আইউব যয়ীফ বর্ণনাকারী বলে কোন কথাই আমা পর্যন্ত পৌছেনি।

পঞ্চম, নবী করীম (স)-এর একটি ভাষণ ছিল এই ঃ

'হে নারী সমাজ। তোমরা যাকাত দাও—তোমাদের অলংকারের হলেও।' বুখারী ও তিরমিযী প্রমুখ লিখেছেন, ইবনুল আরাবী বলেছেন, এ হাদীস বাহ্যত এই প্রমাণ করে যে, অলংকারের কোন যাকাত নেই। রাসূলে করীম (স) যে নারী সমাজকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'তোমাদের অলংকারের হলেও যাকাত দাও' বস্তুত অলংকারের যাকাত ফরয হলে এ ধরনের কথা বলতেন না, যেমন বলা হয় সাধারণ নফল কাজ সম্পর্কে।

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার দান

এই ফিক্‌হী বিতর্কমূলক আলোচনার পর আমার বক্তব্য হল, যাঁরা অলংকারের যাকাত দিতে হয় না বলে মত দিয়েছেন, তাঁদের কথাই অধিকতর শক্তিশালী ও উত্তম। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে পেশ করা যাচ্ছে ঃ

অলংকারের যাকাত ফরয না হওয়ার কথাটি যাকাতের ক্ষেত্র সংক্রান্ত প্রাথমিক সাধারণ নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ। তার একটা প্রতিষ্ঠিত ও অপ্রতিহত মতাদর্শ গড়ে উঠেছে। তার তা হল, যে ধন-মাল কার্যত বর্ধনশীল অথবা যা বর্ধনশীল হতে পারে—হওয়ার যোগ্যতা আছে, তাতেই যাকাত হয়। বরং যা ক্রমবর্ধনশীল কাজে লাগানো কর্তব্য, পুঁজি করে রাখা অনুচিত—পুঁজি করে রাখলে মালিক সে জন্যে আযাব ভোগ করতে বাধ্য হবে, তাতেই যাকাত ফরয হয়। কিন্তু মেয়েদের জন্যে স্বভাবতই যে অলংকার বৈধ, যা ব্যক্তিগত সামগ্রী ও সৌন্দর্য বর্ধক, যা নারীর স্বভাবে নিহিত ও সংরক্ষিত প্রয়োজন পূরণে বিনিয়োজিত, তার অবস্থা ভিন্নতর। ইসলাম এই প্রয়োজনীয় পূরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ কারণে পুরুষদের জন্যে স্বর্ণ ও রেশম হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্যে তা মুবাহ্ করা হয়েছে।

এক্ষণে অলংকারাদি মেয়েদের ক্ষেত্রে পোশাক-পরিচ্ছদ তুল্য। ঘরের গৌরব প্রকাশ সরঞ্জামাদি, সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের বর্ণালী ও জাঁকজমকপূর্ণ সামগ্রীর মধ্যে এই অলংকারাদিও পণ্য। তাই স্ত্রীলোকদের জন্যে তা হারাম নয়।

বরং তাদের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকারাদি মণি-মুক্তা-হীরা প্রভৃতি মূল্যবান পাথরের পর্যায়ে গণ্য হবে। যা তারা ব্যবহার করে থাকে এবং আল্লাহ্ কুরআনী দলীল দ্বারা তাদের জন্যে তা হালাল ও মুবাহ্ করে দিয়েছেন।

আর এসব মহামূল্য পাথর, কাপড় ও দ্রব্য-সামগ্রীর উপর যাকাত ফরয না হওয়া সম্পর্কে ইমামগণের ইজ্‌মা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও তা মহামূল্য ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রী।

কিন্তু নবী করীম (স) উপস্থাপিত হিদায়েত থেকে আমরা জানতে পেরেছি, সর্বপ্রকারের ধন-মালেই যাকাত ফরয হয় না। হয় শুধু ক্রমবৃদ্ধিশীল বা ক্রমবর্ধনযোগ্য ধন-মালে। তাও এ জন্যে যে, আসল ও মূল যেন অক্ষত থাকে। বৃদ্ধি ও বাড়তি থেকেই

যাকাত গ্রহণ করা হবে। সেজন্যে গবাদিপশুর ক্ষেত্রে তাতে যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে মুক্ত হয়ে ঘাস খাওয়ার শর্ত আরোপিত হয়েছে। মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও বর্ধণশীলতার শর্তও রয়েছে। ঘর-বাড়ি, যানবাহনরূপে ব্যবহৃত ও সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্যাদির যাকাত মাফ করে দেয়া হয়েছে।

হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ অলংকারের যাকাত দেয়া কর্তব্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে যাকাত ফরয হওয়ার কারণ হচ্ছে, তা এমন মালিকানা, যা ক্রমবর্ধনশীলতার জন্যে প্রস্তুত, তা মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং বাড়তি সম্পদও বটে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ কথাটি স্ত্রীলোকদের অলংকারের উপর কি খাটে? অথচ প্রকৃতপক্ষে তা বর্ধনশীলতার ক্ষেত্রে নয়, বাড়তি বা প্রয়োজনাতিরিক্তও নয়—যতক্ষণ তা স্বাভাবিক পরিমাণের মধ্য থেকে ব্যবহৃত হতে থাকবে।

হানাফী মতে কৃষি, পানি টানা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত গবাদিপশুর যাকাত দিতে হয় না। কেননা তা প্রবৃদ্ধির কাজের পরিবর্তে অন্য কাজে নিয়োজিত। অথচ তারই মত যেসব গবাদিপশু বংশ বৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত তাতে যাকাত ফরয হবে। তাহলে তাঁরা কাজে নিয়োজিত গবাদিপশুর যাকাত হয় না বলে মত দিলেন কেন? অথচ অনুরূপ অবস্থায় পড়া ব্যবহার্য অলংকারাদির যাকাত ফরয বলে রায় দিচ্ছেন? এ দুটির মধ্য মৌলিক পার্থক্য তো কিছুই নেই?

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শরীয়াত দুটি সমান অবস্থার জিনিসের মধ্যে যাকাত ফরয হওয়া-না-হওয়ার পার্থক্য করতে প্রস্তুত নয়। তবু এ পার্থক্য দেখানো হচ্ছে বলে আমাদের মনে করতে হবে যে, এ ভুলটা আসলে আমাদের ধারণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে রয়েছে। এ কারণে আবূ উবাইদ অভিযোগ তুলেছেন, যাঁরা অলংকারের যাকাত দিতে বলেন ও কর্মে নিয়োজিত গবাদিপশুর যাকাত না দিতে বলেন, তাঁরা দুটি সমান অবস্থার জিনিসের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেন।

সর্বোপরি মণি, মুক্তা ও মহামূল্য পাথর (Stone)—যার একটির মূল্যই হয় কয়েক হাজার দীনার এবং কেবল বিরাট সম্পদ-সম্পত্তির মালিক মহিলারাই যা অলংকার হিসেবে ব্যবহার করে—তার যাকাত মাফ করে দেয়া হবে, আর স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার—যা বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র স্ত্রীলোকেরাই ব্যবহার করে থাকে—তার উপর যাকাত ফরয হবে, সুবিচারকারী ইসলামী শরীয়াতের প্রতি এমন ধারণা করা যায় না।

এই শ্রেণীর মেয়েলোকেরা শরীয়াতের অনুমতিক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার ব্যবহারের সুখ ভোগ করবে, আর তারপর তাকে প্রতি বছর তার এক-দশমাংশের এক চতুর্থাংশ দিয়ে দিতে বাধ্য করা হবে, মহান ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে এ কথা কল্পনাও করা যায় না—বিশেষ করে এমতাবস্থায় যখন মনি, মুক্তা, হীরা ইত্যাদি মহামূল্য পাথরের অলংকারে যাকাত হবে না।

আমরা মনে করি, এ সব অলংকারে যাকাত মাফ হয়ে গেছে। কেননা এসব অলংকারই ব্যক্তিগত সামগ্রী। তা ক্রমবর্ধন-উপযোগীও নয়।

যায়দীয়া মতের ফিকাহ্‌বিদ ইমামুল হাদী বলেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা, হীরা প্রভৃতি সর্বপ্রকারের অলংকারেরই যাকাত দিতে হবে। কেননা এ দুইয়ের মাঝে গণনার যোগ্য কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত নয়। কেননা এ দুইয়ের এক প্রকারের যাকাত মাফ করা হলে সর্বপ্রকার অলংকারের যাকাতই মাফ করা উচিত। তা না করে এক প্রকারের উপর যাকাত ফরয ধরা ও অন্য প্রকারকে তা থেকে অব্যাহতি দেয়া ইসলামী শরীয়াতের কারণভিত্তিক বিধান সম্পর্কে অকল্পনীয়।

কেননা মূলত দুই প্রকারের মধ্যে কোনই পার্থক্য কল্পনা করা যায় না। এ মতের লোকেরাই উম্মতের মধ্যে অধিক।

এই কথা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে এ বিচারে যে, সর্বপ্রকারের মালের যাকাত সেই আসলের অংশ থেকেই গ্রহণের নিয়ম। আসল থেকে এবং বাড়তি বা প্রবৃদ্ধি থেকেই একই সঙ্গে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ও নিয়ম লংঘন করা উচিত নয়। যেমন উষ্ট্রের যাকাত বাবদ ছাগী গ্রহণ করা হয়—যদি উষ্ট্রের সংখ্যা পঁচিশটির কম হয়। উষ্ট্রের যাকাত সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা তার ব্যাখ্যা দিয়েছি।

কোন নারীর যদি অলংকার ছাড়া আর কোন সম্পদ না থাকে, তাহলে সে তার যাকাত কিভাবে আয় করবে? অধিকাংশ মেয়েলোকেরই এ অবস্থা। তখন তার অলংকার বা অন্য কোন জরুরী জিনিস বিক্রয় করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, যাকাত পর্যায়ে ইসলামী শরীয়াত কি এমন কোন বিধান উপস্থাপিত করেছে—উষ্ট্র ও ছাগীর উপরিউক্ত বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া? যাকাতদাতাকে তার যাকাতের মাল ছাড়া অন্য মাল থেকে যাকাত আদায় করার কোন বিধান শরীয়াতে দেয়া হয়েছে কি? অন্য মাল বিক্রয় করে অপর কোন মালের যাকাত আদায় করার বিধানও কি ইসলামী শরীয়াতে আছে?

না, আমাদের জানামতে শরীয়াতে তেমন কোন বিধান আসেনি। তা হলে অলংকারের ক্ষেত্রেই বা তা করা হবে কেন?

এসব কথা ও মতামতই প্রমাণ করে যে, ক্রমবৃদ্ধিশীল মাল থেকেই যাকাত গ্রহণ করতে হবে তার বাড়তি অংশ থেকে। যেন আসলটা সুরক্ষিত থাকে এবং নিত্য নতুন অর্জিত সম্পদ থেকে যাকাত বের হয়ে যায়।

অবর্ধনশীল অলংকারের যাকাত ফরয হলে যাকাত দেয়ার বছরগুলোতে তার গোটা মূল্যটাই খেয়ে ফেলা হবে। মায়মুন ইবনে মাহ্‌রান বলেছেন, আমার একটা 'হার' ছিল, আমি তার যাকাত দিতাম। শেষ পর্যন্ত তার গোটা মূল্যই যাকাত বাবদ দিয়ে দেয়া হল। তাই আমি মনে করি, যাকাতের মৌল ভাবধারা এটাকে অস্বীকার করে।

যাকাত যখন সর্বসম্মতভাবে কেবল প্রবৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশ থেকেই গ্রহণ করতে হবে, তখন ইবনুল আরাবীর কথাটাই আমাদের কাছে অত্যন্ত সত্য বলে প্রতীতি জন্মে। তিনি 'আহ্কামুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন, জিনিসপত্র যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে নয়, তার শুধু-বাড়তি ও প্রবৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশ থেকেই যাকাত নেয়া বিধেয়। ঠিক অনুরূপভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকলে তার যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারটি নাকচ হয়ে যাবে। এটা হল ফরয হওয়া জিনিসকে ফরয না হওয়ার কারণ দেখা দেয়ায় প্রত্যাহার করার ব্যাপার। যা সাধারণভাবে প্রযোজ্য তা থেকে বিশেষ করে একটাকে গ্রহণ।

তবে যে সব দলীলে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে, তাতে সে দুটির মূল্যত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এ কারণে রৌপ্যকে নগদ সম্পদ রৌপ্য নগদ এবং স্বর্ণকে স্বর্ণমুদ্রা দীনার বা স্বর্ণ নগদ বলে তার ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। এমনকি কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতকে—যারা স্বর্ণ ও রৌপ্যকে পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না—এতে পুঁজি ও 'ব্যয়' করার কথা বলা হয়েছে, তাতেও স্বর্ণ ও রৌপ্যকে নগদ সম্পদ ধরা হয়েছে। কেননা নগদ সম্পদ হলেই তা তার পুঁজি করার ও ব্যয় করার কথা উঠে। কিন্তু অভ্যাস-বশত যে অলংকার ব্যবহার করা হয় তাকে পুঁজি গণ্য করা যায় না, আর তা স্বভাবতই ব্যয় হওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকে না।

এখানে আমরা যা বললাম, ফিকাহ্‌বিদ আবূ উবাইদও তাঁর 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে সে কথাই সমর্থন দিয়েছেন। তাঁর কথাই এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

> নবী করীম (স) বলেছেন ঃ নগদ সম্পদ পাঁচ আউকিয়া হলে তাতে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ দিতে হবে অর্থাৎ নবী করীম (স) রৌপ্যের নগদকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর তা ছাড়া যা আছে তার উল্লেখ করেননি। একথা বলেন নি যে, রৌপ্য এ পরিমাণ হলে এই করতে হবে। তার 'নগদ' হওয়ার শর্ত করেছেন। আর আরবদের কাছে এ কথাটি লোকদের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রিত রৌপ্য মুদ্রা ছাড়া আর কিছু বুঝায় বলে আমরা জানি না।

অনুরূপভাবে 'আউকিয়া'র অর্থ দিরহাম ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতিটি আউকিয়ায় চল্লিশ দিরহাম হয়। পরে মুসলমানগণ একমত হয়ে বলেছেন যে, মুদ্রা হিসেবে গ্রহীত দীনারে দিরহামের মতই যাকাত দিতে হবে। কোন কোন মরফূ'[১] হাদীসে দীনারের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহলে এ ব্যাপারে মুসলিম জনগণের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই মনে করতে হবে। কিন্তু অলংকারের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেননা তা সৌন্দর্য বৃদ্ধির সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত। আর নগদ স্বর্ণ ও নগদ রৌপ্য জিনিসের মূল্য ছাড়া আর কিছু হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তা ব্যয় করা হলেই তাতে অধিকতর ফায়দা লাভ সম্ভব। এ কারণে সৌন্দর্য সামগ্রীরূপে ব্যবহৃত অলংকার থেকে তার ভিন্নতর মূল্য হওয়াই স্বাভাবিক। অলংকারগুলো ঘরের অন্যান্য দ্রব্য-সরঞ্জামের মত হয়ে গেল। আর এ কারণে তার উপর থেকে যাকাত বাতিল ও প্রত্যাহৃত হয়ে গেল।

এ কারণে ইরাকবাসীরা বলেছেন, কার্যরত উষ্ট্র ও গরুর যাকাত হয় না। কেননা তা ক্রীতদাস ও দ্রব্য-সামগ্রীর মত হয়ে গেছে। অথচ তাঁরাই অলংকারের উপর যাকাত ধার্য করে বসেছেন।

আর হিজাজবাসীরা কার্যরত উষ্ট্র ও গরুর উপর যাকাত ধার্য করেছেন, কিন্তু অলংকার থেকে তা প্রত্যাহার করেছেন অথচ এ উভয় মতের লোকদের এ দুটিকে একই রকম গণ্য করা উচিত ছিল। হয় উভয় থেকেই যাকাত প্রত্যাহার করা হত, না হয় উভয়ের উপর যাকাত ধার্য করা আবশ্যক ছিল।

তাই আমাদের মতে এ দুটি একই, উভয় সম্পর্কে একই মত ও সিদ্ধান্ত। উভয়ের উপর যাকাত ফরয হবে না। কারণ আমরা পূর্বেই বিবৃত করেছি। তবে এ আলোচনার শুরুতে আমরা যে মরফূ হাদীস উদ্ধৃত করেছি, যাতে স্বর্ণের অলংকার পরিহিতা একজন ইয়েমেনী মহিলাকে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ 'তুমি কি এর যাকাত দাও?,—তা মাত্র একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে বলে আমরা জানি এবং সে সূত্রটি সম্পর্কে পূর্বে ও পরবর্তীকালের হাদীসবিদ্‌দের আপত্তি উঠেছে। যেভাবে বর্ণিত হয়েছে—ব্যাপার যদি তাই হয় এবং তা ঠিক রাসূলের বাণী হিসেবেই সুরক্ষিত হয় থাকে, তাহলে তার ব্যাখ্যা আমরা এই করতে পারি যে, রাসূলে করীম (স) প্রয়োজনশীল লোকদের অলংকার ধার দেয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। কেননা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, শা'বী, হাসান ও কাতাদাহ্ প্রমুখ মনীষী তাই বলেছেন ঃ 'অলংকারের যাকাত হচ্ছে তা অন্যকে ব্যবহারের জন্যে ধার দেয়া।

'আর অলংকারে যদি বাস্তবিকই যাকাত ফরয হত, যেমন নগদ মুদ্রার যাকাত ফরয, তাহলে নবী করীম (স) একজন মাত্র মহিলার হাতে অলংকার দেখেই এ কথাটি বলে ক্ষান্ত থাকতে পারতেন না, তিনি তা সাধারণভাবেই লোকদের মধ্যে প্রচার করে দিতেন। তাহলে এ কথাটি সর্বত্র প্রচারিতও হত এবং তাঁর সুন্নাতরূপে গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধও হত। তাঁর পরবর্তী মুসলিম নেতৃবৃন্দ অদ্যাবধি তদনুযায়ী আমলও করতেন। অথচ এ দীর্ঘ কাল ধরে অলংকার সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তার যাকাত দেয়া সম্পর্কে আমরা কোথাও কিছু শুনিনি।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস—অলংকার ব্যবহারে দোষ নেই যদি তার যাকাত দেয়া হয়—এর অর্থও ধার বাবদ অন্যকে ব্যবহার করতে দেয়া ছাড়া আমরা আর কিছু বুঝি না। কেননা কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ—যিনি হযরত আয়েশার ভ্রাতুষ্পুত্র—হযরত আয়েশা তাঁর ভাইয়ের কন্যাদের বা অন্য কোন মেয়েলোককে অলংকারের যাকাত দিতে আদেশ করেছেন—এমন কথাকে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেছেন। আর আমাদের জানামতে কেবল মাত্র হযরত মাস্‌উদ ভিন্ন অন্য কোন সাহাবীই অলংকারের যাকাত দিতেন বলে সে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, এর সম্বন্ধেও তেমনি আপত্তি উঠেছে যেমন আপত্তি উঠেছে উপরিউক্ত মরফূ হাদীসে।

---

১. কোন সাহাবী কর্তৃক রাসূলের কথা বর্ণিত হলে সেটি মরফূ হাদীস।

দ্বিতীয় মতটি হযরত আয়েশা, ইবনে উমর, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ ও আনাস ইবনে মালিক এবং যেসব তাবেয়ী তাঁদের সমর্থন করেছেন তাঁদের। তা সত্ত্বেও নবীর সুন্নাতের যে ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি তা চিন্তাবিবেচনায় তাঁদের মতই সমর্থন করে।

আবূ উবাইদের এ দীর্ঘ উদ্ধৃতির পর অলংকারের যাকাত দেওয়ার পক্ষের যে সব দলীল উল্লেখ করা হয়েছে সেই বিষয়ে আমার কতিপয় বিবেচনাযোগ্য কথা এখানে বলতে ইচ্ছা করি।

অলংকারের যাকাত ফরয হওয়ার দলীল ভুল

১. অলংকারের যাকাত ফরয হওয়ার পক্ষে প্রথম দলীলরূপে পেশ করা হয়েছে কুরআনের আয়াত—যাতে বলা হয়েছে; যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁজি করে তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না—এর ভিত্তিতে বলতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, অলংকার তো পুঁজির শামিল।

আমি বলব সাধারণত ব্যবহারের জন্যে যে অলংকার বানানো হয় তাকে এ আয়াত অনুযায়ী পুঁজি গণ্য করা অযৌক্তিক। কেননা আয়াতে সেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের কথা বলা হয়েছে যা ব্যয়যোগ্য। কারণ এর পরই বলা হয়েছে, 'তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না ....' এ ব্যয় করার কাজটা নগদ মুদ্রা দ্বারাই তো সম্ভব। সৌন্দর্য সামগ্রীরূপে গ্রহীত অলংকার তো আর ব্যয় করা যায় না। কেননা নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন মুবাহ অলংকার গরীবকে দিয়ে দিতে হবে এমন কথা কেউ বলেনি।

২. অলংকারের যাকাত ফরয হওয়ার সমর্থনে যে সব হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে এ যাকাতের অমান্যকারীদের দুই ধরনের বক্তব্য রয়েছে; হাদীসমূহের সপ্রমাণিত হওয়ার দিক দিয়ে আপত্তি, আর হাদীসমূহ থেকে যা বোঝানো হচ্ছে, সে সম্পর্কে আপত্তি।

(ক) এই পর্যায়ে প্রথম হাদীসটির যথার্থতা ও শুদ্ধতা সর্ববাদী সমর্থিত। তা হল নগদ সম্পদে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ—এ নগদ সম্পদ বলতে তো দিরহাম বোঝায়, যা মুদ্রারূপে প্রচলিত। নির্মিত অলংকার বোঝায় না।

(খ) অন্যান্য হাদীসের কয়েকটি সনদের দিক দিয়ে অগ্রহণযোগ্য। যেমন ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করেছেন; এ বিষয়ে কোন কিছুই সহীহ্রূপে পাওয়া যায়নি।

এমনি ইবনে হাজমও। তিনি অলংকারে যাকাত ফরয—এ মত দেয়া সত্ত্বেও এসব হাদীসের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। বরং যে কেউ তাকে দলীল হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন, তাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মন্তব্য হল, অলংকারে যাকাত ফরয প্রমাণ করতে গিয়ে যেসব সাহাবীর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, নেহায়েত বাজে। তা গ্রহণ করার ও মেনে নেয়ার কোন যুক্তি নেই। তবে ইবনে হাজম তাঁর মতের জন্যে স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত সংক্রান্ত সাধারণ দলীলাদির উপর নির্ভর করেছেন।

এখানে এসব হাদীসের সনদ সম্পর্কে খানিকটা দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

আমর ইবনে শুয়াইব বর্ণিত হাদীসটি ইমাম নাসায়ী মুরসালরূপে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি তাকে অগ্রাধিকারও দিয়েছেন। ইমাম মুনযেরী বলেছেন, 'তার মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ রয়েছে।' ইমাম আবূ উবাইদ এই হাদীস সম্পর্কে যা বলেছেন, তা পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটির সনদে ইয়াহিয়া 'ইবনে আইউব আল-গাফেকী রয়েছেন। বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন, তিনি সত্য বর্ণনাকারী। আর ইমাম যাহবী বলেছেন, 'ইবনে মুয়ীন তাঁকে সঠিক বর্ণনাকারী বলে সমর্থন করেছেন।' ইমাম আহমদ বলেছেন, 'তাঁর স্মরণশক্তি খারাপ।' ইবনুল কাতান ও আবূ হাতিম বলেন, 'তাঁর বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য। নাসায়ী বলেছেন, 'শক্তিশালী নয়।' দারে কুত্নী বলেছে, তাঁর কোন কোন বর্ণনায় 'আউল-ঝাউল' (اضطراب) রয়েছে; তাঁর আরো কয়েকটি গ্রহণঅযোগ্য হাদীসও এমনিই।

হাদীস সমালোচক ইমামগণের দৃষ্টিতে যে বর্ণনাকারীর অবস্থা এই, তাঁর বর্ণনা কোন বিতর্কিত বিষয়ে দললীরূপে উপস্থিত করা যায় না। বিশেষ করে হযরত আয়েশার আমলে তাঁর সম্পর্কিত বর্ণনার বিপরীত।

হযরত উম্মে সালমার বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম মুনযেরীর উক্তি আমরা ইতিপূর্বে শুনেছি। এর সনদে রয়েছেন ইজাব ইবনে বশীর। বুখারী তাঁর বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তবে তাঁর সনদের উপর যথেষ্ট আপত্তি উঠেছে।

ইমাম যাহবী 'আল-মিযান' গ্রন্থে তাঁর জীবন কাহিনীতে লিখেছেন ঃ ইমাম আহমদ বলেছেন, 'আশা করি তার কোন দোষ হবে না। যদিও খচীফ থেকে অনেক গ্রহণ-অযোগ্য বর্ণনা পেশ করেছেন। মনে করি সেগুলো খচীফের থেকে এসেছে।' নাসায়ী বলেছেন, 'হাদীসে এমন কথা নেই।' ইবনুল মাদীনী বলেছেন, 'আমার সঙ্গীরা তাঁকে যয়ীফ-ই মনে করেন।' ইবনে মুয়ীন বলেছেন, 'তিনি সিকাহ-বিশ্বাস্য।' মুর্‌রা বলেছেন, 'যয়ীফ।' আলী বলেছেন, 'তাঁর বর্ণিত হাদীসের উপর আমরা আঘাত দিয়েছি (দোষ বের করেছি)।' ইবনে আদী বলেছেন, 'আমি আশা করি তার দোষ নেই' তার অর্থ উপরিউক্ত ইমামগণের একজনও তাঁর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়শীল নন। বরং কেউ কেউ দৃঢ়তার সাথেই তাঁকে যয়ীফ বলেছেন।

ইমাম বুখারী তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন দেখে কারোরই ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, 'বুখারীতে তাঁর বর্ণিত মাত্র দুটো হাদীস রয়েছে। একটির পর তার সমর্থনে আর একটি হাদীস আনা হয়েছে এবং অপর একটি অন্য একটি হাদীসের সঙ্গে মিলিয়ে উদ্ধৃত করেছেন।'

হাফেয জায়লায়ী বলেছেন ঃ 'বুখারী-মুসলিমের গ্রন্থকারদ্বয় যদি আপত্তিকর কোন ব্যক্তির হাদীস উদ্ধৃত করেনও, তবুও তার পরে উদ্ধৃত হাদীস দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেন। তার সাক্ষ্য-সাবুদও তাঁরা পেশ করেন। তাতে জানা যায় যে, তার একটা ভিত্তি

আছে। তিনি এককভাবে কিছু বর্ণনা করে থাকলে তা তাঁরা গ্রহণ করেন না। বিশেষ করে যদি তা সিকাহ্ বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হয়।

বায়হাকী যেমন বলেছেন, ইজাব ইবনে বশীর সাবিত ইবনে আজলান থেকে এ হাদীসটি এককভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সাবিত থেকে বর্ণিত হাদীসটি বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হলেও তার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। অবশ্য ইবনে মুয়ীন তাকে সিকাহ্ বলেছেন। আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, 'আমি তার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করছি।' আবূ হাতিম বলেছেন, 'লোক ভাল।' ইবনে আদীও একথা বলেছেন। তিনি তাঁর থেকে বর্ণিত তিনটি অপরিচিত হাদীস নিয়েছেন। হাফেয আবদুল হক বলেছেন, সাবিত বর্ণিত হাদীস দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। আবুল হাসান ইবনে কাতান তাঁর এ কথার বিরোধিতা করেছেন। বলেছেন, উকাইলীর কথায়ও তাঁর প্রতি সহনশীলতা রয়েছে। বলেছেন, যে লোক 'সিকাহ' কি আদৌ জানে না, সে-ই এ কথা নিয়ে চলতে পারে। যে তা জানে তার কাছে তার এককত্ব ক্ষতিকর নয়। তবে তার বেশী হলে স্বতন্ত্র কথা। যাহাবী ইবনে কাতানের কথার প্রতিবাদ করে বলেছেন, যে সিকাহ কি তা জানে তার কথা বুঝলাম। কিন্তু যার সম্পর্কে ইমাম আহমদের ন্যায় লোকও নীরবতা পোষণ করেন, আর আবূ হাতিমের মত লোক বলেন; 'সালিহুল হাদীস' তাকে যে 'সিকাহ' গণ্য করে তখন আমরা সিকাহর তেমন মর্যাদা মেনে নিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় এককত্ব অগ্রাহ্য হওয়ার শামিল। তাই উকাইলী ও আবদুল হকের কথা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

ইমাম বুখারী সাবিত বর্ণিত একটি মাত্র হাদীস কিতাবুযযাবায়েহ-তে উদ্ধৃত করেছেন। 'তাহারাত' অধ্যায়ে তার আসল হাদীস রয়েছে। যেমন ইবনে হাজার বলেছেন, আমরা যেমন জানি, এটা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের নিয়ম বটে; কিন্তু তার দ্বারা কাউকে নিরংকুশভাবে সিকাহ বানানো হয় না। কাজেই বলা যায়, উক্ত ইমামদ্বয়ের কেউই এ হাদীসটি বা কোন হাদীসই অলংকারে যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে নিয়ে আসেননি।

হযরত উম্মে সালমা'র হাদীস যেহেতু সাবিত ইবনে আজুলান ও ইজাব ইবনে বশীরের উপর আবর্তিত—সমালোচকদের দৃষ্টিতে এ দুজনের অবস্থা কি, তা দেখিয়েছি,—তাই এ ধরনের হাদীস বিতর্কিত বিষয়ে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না। কেননা এতে দলীলসমূহ পরস্পর বিপরীত ও সাংঘর্ষিক। বিশেষ করে অলংকারের যাকাত ফরয হওয়া পর্যায়ে এ অবস্থা, তখন তাতে তো এ হাদীস দলীলরূপে গৃহীতই হতে পারে না।

আমার মতে এসব হাদীসের সহীহ্ হওয়ার ব্যাপার সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার বড় কারণ হল, এগুলো সাহাবীদের মধ্যে পরিচিত হয়নি। বরং তার বিপরীত। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে এত মতবৈষম্য হয়েছে, যা প্রায় সব কয়টি পরিবারকেই প্রভাবিত করেছে এবং এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। এ সব হাদীস যদি

সাহাবীদের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করত, তাহলে বিরোধ দূর হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি।

এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এসব হাদীস কি মনসুখ হয়ে গেছে? কিংবা তা সবই গায়রে সহীহ্ বলা হবে? অন্যথায় সাহাবীদের মধ্যে এ নিয়ে মতবৈষম্য ঘটবে, আর তাঁরা রাসূলের কাছ থেকে শোনা কথা পরস্পরের কাছে পেশ করবেন না, তা কল্পনা করা যায় না। কেননা অন্যান্য যেসব ব্যাপারে এ ধরনের মতবৈষম্য ঘটেছে, সর্বত্র তাঁরা এ নীতিতেই কাজ করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে অতীব সহীহ্ সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বটে; কিন্তু তিনি নিজে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসেরই বিপরীত আমল করেছেন; তা কিভাবে সম্ভব হল?

এ কারণে বায়হাকী বলেছেন—নববী ও মুন্যেরীও তা সমর্থন করেছেন যে, কাসেম ও ইবনে আবূ মুলাইকা হযরত আয়েশা থেকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীদের অলংকারের যাকাত না দেয়ার যে বর্ণনা এনেছেন—অথচ ইয়াতীমের মালের যাকাত দেয়াই তার মাযহাব—এবং এসব মারফূ' হাদীসের ব্যাপারে বড়ই সন্দেহ জাগিয়ে দেয়। কেননা তিনি তো নবী করীম (স)-এর বা তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা করেন নি, যা তিনি বর্ণনা করেছেন তাতে। তবে কোন কিছুর মনসূখ হয়ে গেছে একথা জানতে পারার পরই তা তিনি করতে পারেন, তার পূর্বে নয়।

(গ) এমন বহু সংখ্যক হাদীস বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, যাঁরা এসব হাদীসকে সহীহ্ মেনে নিয়েও তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বলে যে, স্বর্ণালংকার ব্যবহার যখন হারাম ছিল, তখনই অলংকারের যাকাত ফরয করা হয়েছিল। পরে তা যখন স্ত্রীলোকদের জন্যে 'মুবাহ্' হয়ে গেল, তখন তা ব্যবহারের দরুন তার উপর যাকাত প্রত্যাহার করা হল, যেমন কাজে নিয়োজিত গবাদিপশুর যাকাত প্রত্যাহৃত হয়েছে। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, আমাদের অনেক সঙ্গীই এ কথা মনে করেন। এরপর তিনি এমন কিছু হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যা স্বর্ণালংকার ব্যবহার হারাম প্রমাণ করে। আর স্ত্রীলোকদের জন্যে তা 'মুবাহ্ হওয়ার মতে ইজমা' অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বিশেষভাবে তাদের জন্যে তা হারাম হওয়ার দলীলসমূহ বাতিল হয়ে গেছে।

কিন্তু এ ব্যাখ্যার বিপরীত কথা হচ্ছে, হযরত আয়েশার হাদীস ছিল রৌপ্যালংকার সম্পর্কে। কিন্তু রৌপ্যালংকার কখনও হারাম ছিল, পরে তা মুবাহ হয়েছে, এমন কথা কেউ বলেন নি। হযরত উম্মে সালমার হাদীসে তা ব্যবহার করার স্বীকৃতি রয়েছে।

(খ) হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের—যদি তা সহীহ্ই হয়ে থাকে—অপর একটি ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে। তা হচ্ছে, নবী করীম (স) তাঁর বেগমদের এবং আহ্লে বায়তের মহিলাদের ব্যাপারে একটা স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর নীতি প্রয়োগ করেছেন। তা হল অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রার কৃচ্ছ্রতা গ্রহণ। বাহ্যিক সাজসজ্জা, জাঁকজমক ও বিলাসিতা পরিহার করার জন্যে তাঁর বিশেষ তাগিদ ছিল তাঁদের প্রতি।

কেননা গোটা উম্মতের মহিলাদের জন্যে তাঁরাই নেতৃত্বের ও আদর্শের আসনে আসীন ছিলেন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরই সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ-

হে নবীর ঘরের মহিলারা। তোমরা সাধারণ মহিলাদের একজন নও।

يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَا حِشَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ-

হে নবীর মহিলাগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ সুস্পষ্ট প্রকাশ্য লজ্জাকর কাজ করলে তাকে সেজন্য দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে।

তাই বলা যায়, সম্ভবত অলংকারের যাকাত দেয়ার নির্দেশ কেবলমাত্র তাঁদের জন্যেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই কারণে তাঁদের কেউ কেউ সাধারণ মহিলাদেরও যাকাত দিবার আদেশ করেছেন—এমন কথা কারো কাছ থেকেই বর্ণিত হয়নি। আর এই কারণে হযরত আয়েশা (রা) তাঁর ক্রোড়ে লালিতা তাঁর ভাইয়ের কন্যাদের অলংকারেরও যাকাত দেন নি। অথচ তিনি তাঁদের অন্যান্য সব মালেরই যাকাত দিয়ে দিতেন। এ সম্পর্কে সহীহ্ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

(ঙ) অপরাপর বিশেষজ্ঞগণ এ সব হাদীস 'সহীহ' মেনে নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, আসলে নবী করীম (স) অলংকারাদির ব্যবহারকে অপচয় মনে করেছেন এবং এর অভ্যস্ততাকে সীমালংঘন বলে ধরে নিয়েছিলেন। এ কারণে তারা কাফ্ফার স্বরূপ ও তাদের পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে তার উপর যাকাত ধার্য করেছিলেন।

একজন মহিলার কন্যার হাতে খুব মোটা কাঁকন দেখে নবী করীম (স) তার যাকাত দেয়ার কথা বলেছিলেন এজন্যেই যে, তাঁর দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। এই ব্যাখ্যা উপরিউক্ত ব্যাখ্যাকে অধিক শক্তিশালী বানিয়ে দেয়। তাতে হারাম বা মক্রূহ অলংকারের যাকাত দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় মাত্র।

(চ) কয়েকজন সাহাবী অলংকারের যাকাত দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন কিন্তু তাঁরা বলেছেন, মাত্র একবার যাকাত দেয়াই ফরয। ফলে প্রতি বছর যাকাত দেয়ার প্রশ্ন থাকে না। হযরত আনাস (রা) থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে।

(ছ) কয়েকজন সাহাবী ও তাবেয়ীন অলংকারের যাকাতের ভিন্নতর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে তা নগদ সম্পদের ন্যায় এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ যাকাত নয়। বরং তা হচ্ছে বিবাহাদির ন্যায় উৎসবকালে তা অন্যদের ধারস্বরূপ দেয়াই তার যাকাত। এটাকে তাঁরা ফরয মনে করেন। বায়হাকী এই কথা ইবনে উমর ও ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন।

উপরে উল্লিখিত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় এসব সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে। ফলে এসব হাদীসকে কোন কিছু অকাট্যভাবে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে দলীল হিসেবে পেশ করা যায়

না। কেননা নিয়মের কথা হচ্ছে ঃ 'কোন দলীল যদি বিভিন্ন সম্ভাব্যতার মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে তার কোন কিছুর দলীল হওয়ার যোগ্যতা বাতিল হয়ে যায়।'

আর এ সব কথাই বলা হচ্ছে উপরিউক্ত হাদীসসমূহকে 'সহীহ' মেনে নেয়ার পর। কিন্তু সেসব হাদীস যদি 'যয়ীফ' হয়ে থাকে, তা'হলে তদ্দারা কি প্রমাণ করা যেতে পারে?

এই ব্যাপারে সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যাঁদের বলা হয় যে, তাঁরা হাদীসকে অনুসরণ করেন না—নিজেদের বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে শরীয়াতের রায় নির্ধারণ করেন, তাঁরা তাদের রায় দিয়েছেন হাদীসের ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে হাদীস-অনুসরণকারী হওয়ার দাবিদার যাঁরা, তাঁরা এ ক্ষেত্রে মত দিয়েছেন নিজেদের চিন্তা-বিবেচনার ভিত্তিতে।

হযরত ইবনে মাস্‌উদ ও ইবনে আমর, ইবনুল আ'স প্রমুখ কয়েকজন সাহাবী থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা সেই বিষয়ে জনগণকে কোন ফতোয়া দেন নি। তাঁরা তা করার জন্যে সকলকে বাধ্য করার উদ্দেশ্যেও কোন কথা বলেন নি।

আর তাঁরা নিজেদের ক্ষেত্রে যে কাজগুলো করেছেন—যেমন হযরত ইবনে মাস্‌উদের স্ত্রী তাঁকে তাঁর স্বর্ণ-হার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ 'তুমি কি এর যাকাত দাও?' জবাবে তিনি 'হ্যাঁ' বলেছিলেন। —এরূপ জিজ্ঞাসা করায় বোঝা যায় যে, অলংকারের যাকাত দেয়ার ব্যাপারটি তাঁদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল না। আর ইবনে উমর (রা) তাঁর কন্যাদের অলংকারের যাকাত প্রত্যেক বছরই দিয়ে দিতেন, তা তো তাঁর ব্যক্তিগত দানশীলতার ব্যাপারও ছিল না বা নিজের জন্যে কোন সতর্কতামূলক কাজও ছিল না। এমন বিষয়ে, যা রাসূলের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন নি।

একটি বর্ণনা এ সবের বাইরে থেকে যায়। তা হচ্ছে, হযরত উমর হযরত আবূ মূসা আশ্‌য়ারীকে লিখেছিলেন, মহিলাদের তাদের অলংকারের যাকাত আদায় করার আদেশ করার জন্যে। কিন্তু এ বর্ণনাটির সত্যতা সপ্রমাণিত হয়নি। কোন একজন সাহাবীও অলংকারের যাকাত দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন, হাসান এ কথা মানতেই রাযী নন।

যে অলংকার পুঁজি বানানো হবে, তারই যাকাত দিতে হবে

অলংকারের যাকাত দিতে হবে না বলে আমরা যে মত প্রকাশ করছি, তা শুধু সেই অলংকারাদি সম্পর্কে, যা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। কেননা তা ব্যক্তিগত সৌন্দর্য সামগ্রীরূপে গণ্য। কিন্তু যে অলংকার পুঁজি করা হবে, সঞ্চয় করে রাখা হবে তা সঞ্চিত নগদ টাকারূপে গণ্য করা হবে, তার যাকাত দেয়া অবশ্যই ফরয হবে।

এই কারণে সাঈদ ইবনুর মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ অলংকারাদি যখন ব্যবহৃত হবে—তার ব্যবহারিক ফায়দা নেয়া হবে, তখন তার যাকাত দিতে হবে না। আর যখন তা ব্যবহার করা হবে না, তার ফায়দাটাও কাজে লাগানো হবে না; তার যাকাত দিতে হবে।

ইমাম মালিক বলেছেন, যার কাছে স্বর্ণ বা রৌপ্যের পিণ্ড ও অলংকার মজুদ থাকবে এবং তা ব্যবহারের ফায়দা নেয়া হবে না, প্রতিবছর তার যাকাত দিতে হবে। তা ওজন করতে হবে এবং মোট সম্পদের এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ যাকাত বাবদ দিতে হবে, অবশ্য আসল বিশ দীনার কিংবা দুইশ' দিরহামের কম মূল্যের হলে তার যাকাত দিতে হবে না। এ সম্পদের যাকাত এ জন্যে দিতে হবে যে, জিনিসগুলো ব্যবহার না করে আটকে—বসিয়ে রাখা হয়েছে। তবে ভাঙ্গা অলংকারও খনিজ স্বর্ণ-রৌপ্য—যা মালিক মেরামতের জন্যে ও মেরামতের পর ব্যবহার করার ইচ্ছায় রেখে দিয়েছে, তা প্রত্যেক ঘরে রক্ষিত দ্রব্য সামগ্রীর ন্যায়। তাই তার যাকাত দেয়া ফরয হবে না।

ইমাম নববী বলেছেন, অলংকার বানানো হলেও তার ব্যবহার করার ইচ্ছা না থাকলে—সে ব্যবহার হারাম-মকরূহ-মুবাহ যা-ই হোক—তা পুঁজি হিসেবে রেখে দেয়াই ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত হবে, সর্বসম্মত এই যে, তার যাকাত অবশ্যই দিতে হবে।

লাইস ইবনে সাদ এ মতের সমর্থনে বলেছেন, ব্যবহার্য ও প্রয়োজনে লোকদের দেয়া অলংকারের কোন যাকাত নেই। কিন্তু যা পুঁজি করে রাখার জন্যে বানানো হবে, তার যাকাত অবশ্যই দিতে হবে। কেননা যাকাত না দিয়ে পারার (যা যাকাত ফাঁকি দেয়ার) উদ্দেশ্যেই তা বানানো হতে পারে।

ইবনে হাজম লাইসের মতের প্রতিবাদ করে বলেছেন, যদি প্রকৃতপক্ষে তা-ই হত তাহলে লোক নগদ টাকা দিয়ে কোন ঘর-বাড়ি বা জায়গা-জমি ক্রয় করলে টাকার যাকাত দেয়ার দায়িত্ব থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে, তাকেও যাকাত দিতে হবে। আমরা বলব, এসব কলা-কৌশল শরীয়াতের মৌল ভাবধারার পরিপন্থী এবং কৌশলকারীর কাজ-কর্ম তার কৌশল-পরিপন্থী ব্যবস্থাপনার দ্বারাই খতম করা যেতে পারে।

হাম্বলী মাযহাবের লোকেরা তাই বলেছেন, যাকাত দেয়ার দায়িত্ব থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কৌশল স্বরূপ অলংকারাদি বানিয়ে রাখা হলে যাকাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। কোন পুরুষের মালিকানার অলংকার যদি তার পরিবারবর্গ ব্যবহার করে এবং প্রযোজনে লোকদের ধার দেয় তাদের ব্যবহারের জন্যে তাহলে তা ঠিক সেই অলংকারের মতই, যার মালিক সেই স্ত্রীলোক। কেননা তা প্রবর্ধনমূলক কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, তা ব্যবহারভুক্ত আছে।

সাধারণ অভ্যাস-বহির্ভূত অলংকারের যাকাত দিতে হবে

যে সব অলংকার সাধারণ অভ্যাস-বহির্ভূত অপচয় পর্যায়ের, তার যাকাত দিতে হবে। অলংকারের উপর থেকে যাকাত প্রত্যাহারের কারণ হল, শরীয়াত নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। ফলে তা ঘরের কাপড় ও দ্রব্য-সামগ্রীর পর্যায়ে গণ্য রয়েছে।

কিন্তু যা স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, তা হারাম বা মাকরূহ। শরীয়াত তার ব্যবহার বৈধ করেনি। এজন্যে শাফেয়ী মাযহাবের লোকেরা বলেছেন,

স্ত্রীলোকদের জন্যে সেই অলংকার ব্যবহার জায়েয করা হয়েছে, যাতে বাহ্যত অপচয়ের চিহ্ন নেই। কিন্তু যদি দুইশ' দীনার দিয়ে মল তৈরী করা হয়, তা'হলে তার হারাম হওয়াই বিধেয়।

হাম্বলী মাযহাবের ইবনে হামেদ বলেছেন, এক হাজার মিশকালের কম ওজনের অলংকারাদি মুবাহ্। যদি এ পরিমাণ ওজনের হয়, তাহলে তা হারাম হবে এবং তার যাকাত দিতে হবে। আমর ইবনে দীনার বলেছেন, হযরত জাবির (রা)-কে অলংকারের যাকাত দিতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'না'। বলা হল, যদি তার মূল্য হাজার দীনার হয়, তাহলে? বললেন, এ তো অনেক বেশী। আর তাতে যেমন অপচয় হয়, তেমনি অহংকার ও গৌরব প্রকাশের মাধ্যমও হয়। এ পরিমাণ ওজনের অলংকার সাধারণত ব্যবহারে আসে না।

এরূপ যুক্তি অবশ্য মজবুত বটে, কিন্তু ইবনে কুদামাহ লিখেছেন, কোনরূপ শর্ত-সীমা ছাড়াই অলংকার ব্যবহার হালাল ঘোষিত হয়েছে। অতএব তার উপর কোন শর্ত-সীমার কয়েদ চাপানো জায়েয নয়। কেননা তা করা হবে শুধু বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে' শরীয়াতের দলীলের ভিত্তিতে তা করা যাবে না।

কিন্তু শায়খ ইবনে" কুদামাহ ভুলে গেছেন যে, শরীয়াতে ঘোষিত মুবাহ জিনিসের ব্যবহারও দুটি শর্তের অধীন; একটি হচ্ছে তাতে অপচয় হতে পারবে না, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তাতে অহংকার ও গৌরব-বাহাদুরীর প্রকাশ হওয়া চলবে না।

এ পর্যায়ের দলীল নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَالْبَسُوْا مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَّلَا مَخِيْلَةٍ-

তোমরা খাও, পান কর ও পরিধান কর—কোনরূপ অপচয়, বেহুদা খরচ এবং অহংকার গৌরব প্রশ্ন ছাড়াই।

হাদীসে যে ইয়েমেনী মহিলার হাতে স্বর্ণের দুটি ভারী ওজনের কাঁকন দেখে তাকে যাকাত দেয়ার নির্দেশ দেয়ার কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তা এজন্যেই যে, তাতে সীমা লংঘনকারী পরিমাণ ছিল, আর তা ছিল অপচয় পর্যায়ের। বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞই এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর যাকাত তো প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণের উপরই ফরয করা হয়েছে। একারণেই সম্ভবত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) তাঁর কন্যাদের অলংকারের যাকাত দিতেন। বর্ণিত হয়েছে, তিনজন কন্যার ছয় হাজার দীনার মূল্যের অলংকার ছিল। আর এটা খুবই বড় ও সীমালংঘনকারী পরিমাণ। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু অতিরিক্ত পরিমাণের যাকাত দিতে হবে, না সমস্ত অলংকারেরই? উপরে উদ্ধৃত হাদীসসমূহের তাৎপর্য হচ্ছে, সমস্ত সম্পদেরই যাকাত দিতে হবে। আর তা হবে বাড়াবাড়িমূলক পরিমাণ ব্যবহার করা অপরাধের কাফ্ফারা স্বরূপ।

সর্ব প্রকার অলংকার নিঃশর্তে মুবাহ এবং তার উপর যাকাত ফরয নয়, এই মতে চুড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হলে জাতির বিরাট সম্পদ মূল্যবান অলংকাররূপে অনুৎপাদক

হয়ে পড়ে থাকবে। বছরের পর বছর অতিবাহিত হবে; কিন্তু কেউ তা ব্যবহার করবে না—বিশেষ করে এজন্যে যে, চুরি ডাকাতির ভয়ে এই মূল্যবান সম্পদ লোহার সিন্দুকে কিংবা ব্যাংকের কাস্টডিতে জমা করে রাখবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অপচয়ের সীমাটা কি? কত পরিমাণের হলে অপচয় হয় বলে ধরতে হবে?

আমি মনে করি ব্যক্তি ও পরিস্থিতি পরিবেশের অবস্থার পার্থক্যের দৃষ্টিতে অপচয়ের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। কেননা আমেরিকার মত বিরাট ধনী দেশের কোন ধনী পরিবারের ধনী মহিলার জন্যে এক হাজার দীনার মূল্যের অলংকারও খুব বেশী বলে মনে করা যায় না।

অবস্থান্তরে যে দেশে মানুষ পেট ভরে খেতে পায় না, সেখানে তার অর্ধেক বা এক-চুতুর্থাংশ মূল্যের অলংকারও বাহুল্য হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই অপচয়ের মাত্রাও বৈধ-মুবাহ্ পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে যেমন ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা দেখতে হবে, তেমনি দেখতে হবে জাতির আর্থিক অবস্থাও।

যদি হারাম বা মাক্রূহ মাত্রার নাও হয়, অলংকারাদি বৈধ পরিমাণের মধ্য থেকেও তা পুঁজি হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে—অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে, তাহলে মনে করতে হবে, স্বাভাবিক সীমা লংঘন করা হয়েছে।

এ কালের লোক নগদ টাকা খরচ হয়ে যাবে—এ ভয়ে অলংকারাদি বানিয়ে রাখে, এ কথা কারোরই অজানা নেই।

তাই এসবকে মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত ও মহামূল্য পাথর মনে করতে হবে। এসবের মধ্যে যা যা অলংকার ও সৌন্দর্যরূপে ব্যবহারের জন্যে বানানো হবে এবং অপচয়ের মাত্রা পর্যন্ত তার পরিমাণ পৌঁছবে না, তাতে যাকাত দিতে হবে না। আর যা এ সীমা সুস্পষ্টভাবে লংঘন করবে, তা হারাম ও অপচয়ের মধ্যে গণ্য হবে। তার যাকাত মাফ করা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। অনুরূপভাবে যা শুধু পুঁজি করে রাখার উদ্দেশ্যে বানানো হবে, তারও যাকাত দিতে হবে। অন্যথায় এ জাতীয় সম্পদ পুঁজি করে রাখায় ব্যক্তির সম্পদে বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত লোকদের যে হক রয়েছে তা থেকে তাদের বঞ্চিতই রাখা হবে। অবশ্য নিয়ত হবে ফয়সালার মানদণ্ড। সাধারণ ও স্বভাবগত মাত্রা অতিক্রম করা হলেই বোঝা যাবে যে, নিশ্চয়ই তা অলংকার হিসেবে ব্যবহারের জন্যে বানানো হয়নি।

স্বাভাবিক ও সাধারণ অভ্যাসের সীমা লংঘন যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে একটা স্থানীয় মানদণ্ড হয়ে থাকবে। কেননা অতটুকু পরিমাণের অলংকার যাকাত মাফ পেতে পারে।

সারনির্যাস

উপরের বিস্তারিত ও দীর্ঘ আলোচনার সারনির্যাস এভাবে তুলে ধরা যেতে পারে ঃ

ক. যে লোক কোন স্বর্ণ বা রৌপ্যালংকারের মালিক হবে তার ব্যাপারটি বিবেচনা করা হবে। সে যদি তা পুঁজিকরণ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বানিয়ে থাকে তাবে তার যাকাত দিতে হবে। কেননা তা আসলে প্রবৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্য সম্পদ। তখন তা নগদ ও অন্যান্য মুদ্রার সমতুল্য।

খ. যদি তা ব্যক্তিগত কল্যাণ লাভ ও ব্যবহারের জন্যে হয়ে থাকে, তাহলে তার ব্যবহার স্বরূপটা বিবেচনা করতে হবে। যদি তা হারাম হয়—যেমন স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রাদি, প্রতিকৃতি ও উপঢৌকনের জিনিস-পত্র অথবা কোন পুরুষের নিজের জন্যে বানানো স্বর্ণ চেইন, আঙ্গুরীয় ইত্যাদি হয় তাহলে তাতে যাকাত ফরয হবে। কেননা তা মুবাহ নয়, তা বানিয়ে তার আসল নীতি-বহির্ভূত কাজ করা হয়েছে। কাজেই তার মূল্যের বিচারেই তার উপর যাকাত দিতে হবে।

গ. স্ত্রীলোকদের জন্যে নির্মিত অলংকারে যদি দৃশ্যমান ব্যয় বাহুল্য করা হয়, তবে তার ব্যবহার হারাম হবে। তার মত একজন স্ত্রীলোকের তার পরিবেশ ও সামাজিক, আর্থিক অবস্থার দৃষ্টিতে সেই পরিমাণের অলংকার শোভন কিনা, সেই দৃষ্টিতেই তার মাত্রা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. যদি কোনরূপ অপচয়ের ইচ্ছা ব্যতিরেকেই ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মেয়েলোকের জন্যে অলংকার বানানো হয়—পুরুষের জন্যে রূপার অঙ্গুরীয় লওয়া হয়, তাহলে তাতে যাকাত ফরয হবে না। কেননা এ তো মুবাহ।

ঙ. কোন জায়েয অলংকার—তা কোন স্ত্রীলোকের ব্যবহার বা ধার দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে কিংবা তা কোন পুরুষের মালিকানা হয়, যার ঘরের মেয়েরা তা ব্যবহার করে বা ধার দেয়, তার মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না।

চ. অলংকার, পাত্র বা মূল্যবান উপঢৌকন—যারই যাকাত দেয়া হবে, তা দিতে হবে নগদ সম্পদের ন্যায়। অর্থাৎ এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ—শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে।

ছ. এ সবের পরও শর্ত হচ্ছে, সম্পদ নিসাব পরিমাণের হতে হবে; শুধু সেই জিনিস দিয়ে হোক কিংবা তার অন্যান্য মাল-সম্পদ মিলিয়ে হোক। আর স্বর্ণের নিসাব হচ্ছে ৮৫ গ্রাম।

মূল্যের হিসাব ধরা হবে, ওজনের নয়। কেননা ওজন কম হলেও তার কারুকার্য ও শিল্পকর্মের জন্যে তার মূল্য অধিক বৃদ্ধি পেতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যবসায়ী সম্পদের যাকাত

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের জন্যে ব্যবসায়ের কাজে অংশগ্রহণ এবং তার মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন জায়েয করে দিয়েছেন। তবে সেজন্যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, কোন হারাম পণ্যের ব্যবসা করা চলবে না এবং ব্যবসায়ী কার্যকলাপে ইসলামী নৈতিকতার বিধি-বিধান লংঘন করা চলবে না। আমানতদারী, সততা ও কল্যাণ দৃষ্টি সর্বতোভাবে রক্ষা করতে হবে। উপরন্তু ব্যবসায়ী ব্যস্ততা ও উপার্জন তৎপরতা যেন মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ ও তাঁর হক আদায় থেকে কখনই গাফিল করে না দেয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা থেকে নগদ সম্পদের মালিকদের উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত ফরয হওয়ার বিষয় আমরা সবিস্তারে জানতে পেরেছি। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা, সেই সাথে তাদের ধন-মালকেও পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা। এ যাকাত ফরয হওয়ার যৌক্তিকতাও জানতে পেরেছি বিগত আলোচনা থেকে। শরীয়াত প্রদাতা এ যাকাতকে একটা শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে দাঁড় করে দিয়েছেন। ফলে নগদ-সম্পদের মালিকগণ সর্বপ্রকার হালাল পন্থায় নিজেদের ধন-মালের প্রবৃদ্ধি সাধন করতে সক্ষম হতে পারে। শরীয়াত-সম্মতভাবে উপার্জন করে তারা পারে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে। যাকাত আদায় করে তারা সেই অপরাধ থেকেও রক্ষা পেয়ে যেতে পারে, যা নগদ সম্পদকে আবর্তন থেকে আটকে রাখা ও উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখার দরুণ হয়ে যেতে পারে। সেই সাথে বার্ষিক হিসেবে যাকাত দেয়ার দরুন তাদের মুলধন নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার গ্রাস থেকে তাদের ধন-মালকে রক্ষা করে তার প্রবৃদ্ধি সাধন করবে।

বৈধ ও শরীয়াতসম্মত অর্থোপার্জনের বহুবিধ পন্থার মধ্যে ব্যবসা অন্যতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কারণে আমরা রাসূলে করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরামের উক্তি দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছি যে, ইয়াতীমের মাল-সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন বার্ষিক যাকাত তাদের মূলধনকে নিঃশেষ করে না দেয়।

তাই জাতীয় সম্পদের বিরাট অংশ ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। বহু প্রকারের ব্যবসায়ের সুযোগ রয়েছে এবং তাতে অংশ গ্রহণ করে বিপুল পরিমাণ উপার্জন করা ও নিজেদের ধন-মালের প্রবৃদ্ধি সাধন খুবই সম্ভবপর। আর এই ব,বসায়ীদের মধ্যে এমন বহু লোক থাকাও সম্ভব, যাদের কাছে হাজারও মিলিয়ন পরিমাণ পণ্যদ্রব্য মজুদ রয়েছে।

ফলে ইসলাম যদি এই সব সম্পদের উপর এবং ব্যবসায়লব্ধ মুনাফার উপর যাকাত ফরয করে থাকে তবে তাও বিস্ময়ের কিছু নয়। এই যাকাত হবে নগদ সম্পদের উপর যাকাতের মত। এভাবে আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকর আদায় করা যেমন সম্ভবপর, তেমনি তাঁর অভাবগ্রস্ত বান্দাদের অধিকার আদায় এবং দ্বীন, রাষ্ট্র ও জনগণের সার্বিক কল্যাণে অংশ গ্রহণও সম্ভবপর। কেননা যাকাতের বিশেষত্বই হচ্ছে তাই।

এ কারণেই ইসলামী ফিকাহ্ যাকাতের বিস্তারিত আইন-বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। যেন ব্যবসায়ীরা স্পষ্টভাবে জানতে পারে যে, তাদের কোন্ সব ধন-মালে কি হিসেবে যাকাত ফরয করা হয়েছে এবং কোন ধরণ বা পরিমাণের মাল-সম্পদের যাকাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে।

ফিকাহ্ শাস্ত্রে ব্যবসায়ীদের এ পর্যায়ের সম্পদকে ব্যবসায়ী সরঞ্জাম বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার অর্থ ব্যবসায়ে নিযুক্ত নগদ সম্পদ ছাড়া আর যে সব পণ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, কাপড়, খাদ্য, অলংকারাদি, মূল্যবান পাথর, গাছপালা, জমি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ-সম্পত্তি রয়েছে তা।

ব্যবসায়ী সামগ্রী বা সাজ-সরঞ্জাম বলতে কেউ মনে করেন, মুনাফার জন্যে যা-ই ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য, তা-ই পন্যদ্রব্যের মধ্যে শামিল।

অতএব যে লোকই এই ব্যবসায়ী জিনিসের মালিক হবে, তার এই মালিকানার উপর একটি বছর অতিবাহিত হবে এবং বছরের শেষ পর্যন্ত তার মূল্য নগদ হিসেবে নিসাব পর্যন্ত পৌঁছালে তার যাকাত দেয়া কর্তব্য হবে। আর তা হচ্ছে, মোট মূল্যের এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ। তা মূলধনের উপর ধার্য কর বিশেষ। কেবলমাত্র লভ্যাংশ বা মুনাফা বাবদ অর্জিত ধনের উপরই নয়; মূল সম্পদের উপরও যাকাত ধার্য হবে।

পরবর্তী আলোচনাসমূহে এ পর্যায়ে যাবতীয় বিধি-বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করা হবে।

প্রথম আলোচনা, ব্যবসায়ে যাকাত ফরয হওয়ার দলীল;

দ্বিতীয় আলোচনা জাহেরী ও ইমামীয়া ফিকাহ্‌বিদদের সৃষ্ট সংশয় ও তার জবাব;

তৃতীয় আলোচনা ব্যবসায়ের যাকাতের শর্তাবলী;

চতুর্থ আলোচনা ব্যবসায়ী তার ব্যবসা সম্পদের যাকাত কিভাবে দেবে?

প্রথম আলোচনা

ব্যবসায়ে যাকাত ফরয হওয়ার দলীল

ব্যবসায়ের দ্রব্যাদিতে যাকাত ফরয হওয়ার দলীলসমূহ এখানে পর্যায়ক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

প্রথম. কুরআনের আয়াত

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ-

হে ঈমানদার লোকেরা। তোমরা তোমাদের পবিত্র উপার্জনসমূহ থেকে এবং যা তোমাদের জন্যে জমি থেকে উৎপাদন করেছি তা থেকে ব্যয় কর।

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ বুখারীর 'কিতাবুয যাকাত'-এ 'উপার্জন ব্যবসায়ের যাকাতের অধ্যায়' দাঁড় করেছেন উপরিউক্ত আয়াতের ভিত্তিতে। অর্থাৎ আয়াতটিতে যে ব্যয় করার নির্দেশ, তা উপার্জন ও ব্যবসায়ের আয় থেকে করতে হবে।

ইমাম তাবারী উপরিউক্ত আয়াতের ভিত্তিতে লিখেছেন, 'আয়াতটিতে বলা হয়েছে; তোমরা তোমাদের চেষ্টা-সাধনায় যা উপার্জন কর—তা ব্যবসা হোক, শিল্প হোক, স্বর্ণ-রৌপ্য ভিত্তিক কারবার হোক—তা থেকে যাকাত দাও।'

'তোমাদের পবিত্র উপার্জন বলতে মুজাহিদ থেকে কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী বোঝানো হয়েছে ব্যবসা।'

ইমাম জাসসাস তাঁর 'আল-আহ্কামুল কুরআন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পূর্ববর্তী লোকদের থেকে জানা গেছে, আল্লাহ্র বাণী ঃ 'তোমরা তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে ব্যয় কর' বলে বোঝানো হয়েছে, ব্যবসায়ের কথা—তা-ই পবিত্র উপার্জনের মাধ্যম। আর এ আয়াতের এই সাধারণ হুকুম সমস্ত ধন-মালেই যাকাত ফরয করে দিয়েছে। 'তোমাদের উপার্জন' বা 'তোমরা যা উপার্জন কর' কথাটি এ সব কিছুকে শামিল করে।

ইবনুল আরাবী বলেছেন, 'তোমরা উপার্জন কর' বলে আল্লাহ তা'আলা ব্যবসা বুঝিয়েছেন এবং 'যা আমরা জমি থেকে উৎপাদন করি' বলে গাছ-পালা, শস্য ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

এ কথার তত্ত্ব হচ্ছে 'উপার্জন' দুই প্রকারের। এক প্রকার, যা জমির গর্ভ থেকে পাওয়া যায়। জমির উপর উদ্ভুত সব জিনিসই তার মধ্যে গণ্য। আর দ্বিতীয় প্রকার, জমির উপরিভাগে সাধনা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যা কিছু পাওয়া যায়। যেমন ব্যবসা, উৎপাদন, শত্রুদেশে অস্ত্র চালানোর মাধ্যমে এবং শিকারের মাধ্যমে যা হাতে আসে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর 'নশালী বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছে, আল্লাহ্ তাদের যা দিয়েছেন তা থেকে যেন তারা গরীবদের দান করে—যেমন রাসূলে করীম (স) বলেছেন।

ইমাম রাযী বলেছেন, বাহ্যত আয়াতটি মানুষের উপার্জিত সর্বপ্রকার মাল-সম্পদের যাকাত ফরয করে দিয়েছে। অতএব ব্যবসায়ের স্বর্ণ-রৌপ্য ও গবাদিপশুর যাকাতও তার অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ সবই উপার্জন।

এর সমর্থনে আল্লাহ্র সেই কথাটি এসেছে, যা তিনি আবূ লাহাব সম্পর্কে বলেছেন ঃ مَـاأغْنَى عَنْهُ مَـالُهُ وَمَـا كَسَبَ– তার 'ধন-মাল' ও যা কিছু সে উপার্জন করেছে তাকে রক্ষা করতে পারেনি।' এখানে ধন-মাল বলে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মাল বুঝিয়েছেন এবং যা কিছু সে উপার্জন করেছেন, বলে সে ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যমে যা সঞ্চয় করেছে, তা-ই বোঝানো হয়েছে।

শুধু এ দুটি আয়াতই নয়; আরও বহু আয়াতই সর্বপ্রকার মালে যাকাত ফরয প্রমাণ করেছে।

যেমন ঃ وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ– তাদের ধন-মালে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের জন্য হক রয়েছে।

وَالَّذِيْنَ فِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ–

আর সেই লোক, যাদের ধন-মালে অভাবগ্রস্ত প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্যে নির্দিষ্ট হক রয়েছে।

خُذْمِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا–

তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করে পবিত্র কর তাদের ও পরিচ্ছন্ন কর তাদের এর দ্বারা।

কুরআন ও সুন্নাতের এমন কোন দলীলের উল্লেখ করা যেতে পারে না, যদ্দারা প্রমাণ করা যাবে যে, মুসলিম ব্যবসায়ীদের ধন-মালে এ সুনির্দিষ্ট হক্ আদায় করার—যা তাদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে দেবে—দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে।

ইবনুল আরাবী বলেছেন, 'তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত লও'—আল্লাহ্র এ নির্দেশ সর্বপ্রকারের ধন-মাল—তা যত প্রকারেরই হোক—সে সবের নাম যত বিভিন্ন ও বিচিত্রই

হোক তা থেকে যাকাত গ্রহণ করা ফরয করে দিয়েছে। এ থেকে কোন কিছু বাদ দেয়াতে হলে তার জন্যে অকাট্য দলীল প্রয়োজন।

হযরত আবূ হুরায়ার গোত্র ছিল 'দওস'। তাঁদের বক্তব্য হল, কাপড়-চোপড়, দ্রব্যসামগ্রী, সরঞ্জামাদি ও পণ্যদ্রব্য সবই মাল-এর মধ্যে শামিল। কেবল অস্থাবর জিনিসই মাল নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও তাই প্রমাণ করে। তিনি বলেছেনঃ

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبَ وَلَا وَرَقًا اِلاَّ الْاَمْوَالَ الثِّيَابُ وَالْمَتَاعُ-

আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সাথে খয়বর যুদ্ধের বছর বের হলাম; কিন্তু গণীমত হিসেবে স্বর্ণ-রৌপ্য পেলাম না, পেলাম শুধু মাল—কাপড় ও দ্রব্যসামগ্রী।

দ্বিতীয়. সুন্নাত

আবূ দাউদে হযরত সামুরাতা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُنَا اَنْ نُّخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعِدُ لِلْبَيْعِ-

আমরা যা কিছু বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত করি তার যাকাত দেয়ার জন্যে রাসূলে করীম (স) আমাদের আদেশ দিয়েছিলেন।

আরবী নিয়মে 'আদেশ' ফরয প্রমাণ করে।

'দারেকুতনী' হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ الْاِبِلِ صَدَقَتُهُ وَفِىْ الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِىْ الْبَزِّ صَدَقَتُهَا-

রাসূলে করীম (স)-কে আমি বলতে শুনেছি; উষ্ট্রে যাকাত আছে, ছাগলে যাকাত আছে, আর ঘরের দ্রব্যাদি—কাপড়-চোপড়, সামগ্রী ইত্যাদিতেও যাকাত আছে।

এ হাদীসে ঘরের আসবাব পত্র, ফার্নিচার, দ্রব্যসামগ্রী, পাত্র, ছোট-খাটো পণ্য-দ্রব্যাদি (Haberdashery) প্রভৃতির উপর যাকাত ফরয করে। কিন্তু এ জিনিসগুলো যদি ঘরে ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবহৃত হতে থাকে, তা দিয়ে

ব্যবহার-ফায়দা লাভ হতে থাকে, তাহলে তাতে যে যাকাত হবে না, তা সর্ববাদীসম্মত কথা। তাই এ সব জিনিস যদি ব্যবসার ও অর্থাগমের কাজে নিয়োজিত হয়, তাহলে অবশ্যই তার মূল্য ধরে যাকাত দিতে হবে।

সমস্ত মালের উপর যাকাত ফরয করার আর একটি হাদীস হচ্ছে ঃ

اَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ

তোমরা তোমাদের ধন-মালের যাকাত আদায় কর।

এ হাদীসে বিভিন্ন ধরনের মালের মধ্যে কোন তারতম্য করা হয়নি।

আর ব্যবসায়ের মালপত্র সাধারণ ধন-মালের মধ্যেই গণ্য। কেননা গবাদিপশু শস্য জাতীয় দানা- বীজ, ফল-ফাঁকড়া, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যসামগ্রী—যারই ব্যবসা করা হবে, তা সবই এ 'ব্যবসায়ের মালপত্র' -এর মধ্যে গণ্য। অতএব এ সব সাধারণ যাকাত ফরযকারী নির্দেশ অনুযায়ী এ সবের উপরও যাকাত ফরয হবে।

তৃতীয়. সাহাবী তাবেয়ীন ও প্রাচীন বিশেষজ্ঞদের ইজমা

সাহাবিগণের কাছ থেকে পথ-নির্দেশ পর্যায়ে আবূ উবাইদ বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ্য। বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ

> হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের খিলাফত আমলে আমি বায়তুলমাল-এর দায়িত্বশীল ছিলাম। আতা, যখন বের হতেন, ব্যবসায়ের মাল জমা করে হিসাব করতেন—উপস্থিত ও অনুপস্থিত সব । পরে উপস্থিত মাল থেকেই উপস্থিত-অনুপস্থিত উভয় প্রকার মালের যাকাত গ্রহণ করতেন। ইবনে হাজম বলেছেন, এ বর্ণনার সনদ সহীহ্।

হামাম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, হযরত উমর আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন,হে হামাম! তুমি তোমার মালের যাকাত দিয়ে দাও। আমি বললাম, তূণীর (Quiver) ও চামড়া ছাড়া আর তো কোন মাল আমার নেই। তখন তিনি বললেন, এ সবের মূল্য ধর ও তার যাকাত দাও।

'আল-মুগনী' গ্রন্থে এ খবর সম্পের্কে বলা হয়েছে, এঘটনাটি সর্বজনবিদিত। কোন একজন সাহাবীও এর বিপরীত মত দেন নি বা এ মতের প্রতিবাদ করেন নি। অতএব এর উপর ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ক্রীতদাস ও কাপড়-চোপড় যার দ্বারা ব্যবসা করা উদ্দেশ্য হবে, তাতে যাকাত ধার্য হবে।

বায়হাকী ও ইবনে হাজম একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন,যাতে বলা হয়েছে দ্রব্যসামগ্রী ব্যবসায়ের জন্যে হলে তাতে যাকাত দিতে হবে। ইবনে হাজমের মতে এ কথাটি সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও ব্যবসা দ্রব্যাদিতে যাকাত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

উপরে উদ্ধৃত এসব কথার বিপরীত কোন কথা কোন একজন সাহাবী থেকেও বর্ণিত হয়নি। বরং তাবেয়ীনের যুগ পর্যন্ত সমস্ত কাজ ও ফতওয়া এর অনুকূলেই হয়েছে, কোনরূপে মতপার্থক্য ব্যতীতই। ইতিপূর্বে স্বর্ণের নিসাব পর্যায়ে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি,যাতে বলা হয়েছে,তিনি তাঁর একজন কর্মচারীকে লিখে পাঠিয়েছিলেনঃ

তোমার সামনে যে মুসলমানই আসবে তার ব্যবসায়ে ব্যবহৃত ও আবর্তিত সব প্রকাশমান মাল সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর। প্রতি চল্লিশ দীনারে এক দীনার! কম হলে ঐ হিসাবমত—বিশ দীনার হওয়া পর্যন্ত।

পরবর্তী সব ফিকাহ্‌বিদই এ মতে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ ব্যবসায়ের মালসামগ্রীর উপর যাকাত ফরয হওয়ায় কোনই মতভেদ নেই।

এ মতে 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে ইবনুল মুন্‌যির ও আবূ উবাইদ দাবি করেছেন।

ইবনুল মুন্‌যির বলেছেন ঃ যে সব জিনিস দিয়ে ব্যবসা উদ্দেশ্য, তার সব কিছুর উপর—বছর পূর্ণ হওয়ার পর—যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে সমস্ত শরীয়াত অভিজ্ঞ লোক সম্পূর্ণ একমত। হযরত উমর, তাঁর পুত্র, ইবনে আব্বাস, সাতজন প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিদ—হাসান,জাবির ইবনে যায়দ, মায়মুন ইবনে মাহরান, তায়ূস, নখয়ী, আওযায়ী, আবূ উবাইদ ,ইসহাক, ইমাম আবূ হানীফা ও তার সঙ্গিগণ, ইমাম মালিক ও আহমদ—সকলেই এ মত প্রকাশ করেছেন।

ব্যবসায়ের পণ্য সম্পর্কে আবূ উবাইদ বলেছেন, মুসলমানগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে তাতে যাকাত ফরয।

কাজী ইবনুল আরাবী বলেছেন, চারটি দলীলের ভিত্তিতে ব্যবসায়ের পণ্যে যাকাত ফরয।

প্রথম, আল্লাহ্‌র নির্দেশ—তাদের 'ধন-মাল থেকে যাকাত লও'। এ এক সাধারণ নির্দেশ সব মাল সম্পর্কেই।

দ্বিতীয়, উমর ইবনে আবদুল আযীয ব্যবসার পণ্যে যাকাত গ্রহণের জন্যে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ ছিল গোটা উম্মতের উপর নির্দেশ। অতএব এ পর্যায়ে আর কোন ভিন্নমত থাকেনি।

তৃতীয়, হযরত উমর পূর্বেই এ যাকাত গ্রহণ করেছিলেন। এটা সহীহরূপে বর্ণিত ঃ

চতুর্থ, আবূ দাউদ হযরত সামুরাতা ইবনে জুন্‌দুব থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُرُنَا اَنْ نُّخْرِجَ الزَّكٰوةَ مِمَّا نُعِدُّ لِلْبَيْعِ-

নবী করীম (স) ব্যবসায়ের জন্যে প্রস্তুত সব জিনিস থেকে যাকাত দেয়ার জন্যে আদেশ করতেন।

এই ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের থেকে ভিন্ন কথা সহীহ্‌রূপে বর্ণিত হয়নি।

খাত্তাবী বলেছেন ঃ শেষের দিকে কিছু আলিম মনে করেছেন যে, ব্যবসা পণ্যে যাকাত হবে না। কিন্তু এ মত ইজমার পরের কথা এবং তার বিপরীত। অতএব গ্রহণ অযোগ্য।

চতুর্থ. কিয়াস-বিবেচনা

ইবনে রুশ্‌দ উল্লেখ করেছেন, ব্যবসায়ের জন্যে গৃহীত জিনিসপত্র প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই গ্রহীত হয়। ফলে তা যাকাত ফরয হয় এমন অপরাপর তিনটি জিনিসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। সে তিনটি জিনিস হচ্ছে ক্ষেতের ফসল, গবাদিপশু ও স্বর্ণ-রৌপ্য।

বিচার-বিবেচনার ব্যাপারটি ইসলামের নিয়মাদি ও তার সাধারণ ভাবধারার উপর নির্ভরশীল। কেননা অর্থোৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রহীত দ্রব্যাদি তাৎপর্যগতভাবে নগদ সম্পদ সমতুল্য। দিরহাম, দীনার বা সেগুলোর মূল্য—এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে নিসাবের পরিবর্তনশীলতা ও মূল্যের বিবর্তনতার প্রতি অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে। মূল্যের বিনিময়ে যে দ্রবাদি পাওয়া যায়, তা-ও। কাজেই ব্যবসায়ে যদি যাকাত ফরয না-ই হত তাহলে সমস্ত ধনী বা অধিকাংশ লোকদের পক্ষে তাদের নগদ সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করা সম্ভব হত। এবং দুই নগদ সম্পদের নিসাব এক বছরকাল অতিবাহিত না হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে পারত। এ কারণে তাদের মতে যাকাত অকেজো হয়ে যেত।

এ যুগের ব্যবসায়ীরা যাকাত না-দিয়ে পারার কৌশল ব্যতীতই এমনভাবে নগদ সম্পদ সংরক্ষণ করে না যার উপর একটি বছর অতিবাহিত হতে পারে। বর্তমানে বেশীর ভাগ ব্যবসায়ী কার্যক্রম পণ্যদ্রব্য মূল্য হাতে নেয়া ছাড়াই চেক ইত্যাদির মাধ্যম ছাড়াও সুসম্পন্ন হচ্ছে।

আলোচ্য বিষয়ে আসল বিবেচ্য হচ্ছে—যেমন আল্লামা রশীদ রেজা লিখেছেন—আল্লাহ্ তা'আলা ধনীদের মালে যাকাত ফরয করেছেন গরীবদের সাহায্য-সহানুভূতির জন্য, দ্বীন-ইসলাম ও গোটা জাতির সামাষ্টিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। শেষ পর্যন্ত তার ফায়দাটাও ধনী লোকেরাই পেয়ে যায়। কার্পণ্যের হীনতা-নীচতা থেকে তারা পবিত্রতা লাভ করতে পারে, গরীবদের প্রতি দয়া-অনুকম্পার উত্তম নৈতিকতায় দীক্ষিত হতে পারে। অভাবগ্রস্ত লোকেরাও পারে সে কল্যাণের অংশ লাভ করতে। সামষ্টিক কল্যাণ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও সমগ্র জাতিরও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কালের উত্থান-পতন বিপর্যয়ে দরিদ্র সমাজের ফায়দার ব্যবস্থায় সকল বিপর্যয়ের পথও বন্ধ হওয়ার ব্যবস্থা নিহিত। এই ব্যবস্থা সামষ্টিক সম্পদ বৃদ্ধি ও স্ফীত করে। তখন তা অল্প সংখ্যক লোকদের মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকে না; গোটা জাতির মধ্যে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে। 'ফাই' সম্পদ বন্টনের কল্যাণ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ، بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ-

যেন ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র ধনী শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ও কুক্ষিগত হয়ে না যায়।

ধনী ব্যবসায়ীদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায় জাতির বেশীর ভাগ সম্পদ। শরীয়াতের উক্ত মহান লক্ষ্য থেকে এই ব্যবসায়ীদের দূরে সরিয়ে রাখার—তাদের উপর যাকাত ধার্য না হওয়ার কোন—যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় কি?

আমি বলতে চাই, সমাজের ব্যবসায়ীদের দিল পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হওয়া অন্যদের তুলনায় অধিক প্রয়োজন। কেননা তাদের উপার্জনের বিচিত্র ধরনের উপায় ও পন্থা সংশয়-সন্দেহ থেকে কোনক্রমেই মুক্ত হতে পারে না। আর তাতে যে ক্লেদ পুঞ্জীভূত হতে পারে, তা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় তাক্ওয়া ও সততা, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। খুব কম লোকই—বিশেষ করে আধুনিক কালে—এ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

হাদীসে বলা হয়েছেঃ

اِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ-

ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন অপরাধী গুনাহ্গার হিসেবে পুনরুত্থিত হবে। তা থেকে রক্ষা পাবে শুধু তারা, যারা আল্লাহ্কে ভয় করেছে, নেক পন্থা অবলম্বন করেছে ও সততার আশ্রয় নিয়েছে।

রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ 'ব্যবসায়ীরা গুনাহ্গার।' সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় হালাল করে দেন নি?' বললেন, 'হ্যাঁ, তা দিয়েছেন, কিন্তু তারা তো মিছামিছি কিরা-কসম খায়, মিথ্যা কথাবার্তা বলে।'

আমি আরও বলব, ব্যবসায়ীর মন-মানস ও তার মাল-সম্পদ অন্য যে কোন মালদারের তুলনায় পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের অধিক মুখাপেক্ষী।

এ পর্যায়ে আবূ দাউদ উদ্ধৃত ও হযরত কাইস ইবনে আবূ গাজারাতা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ্য। তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। ক্রয়-বিক্রয়ে অনেক বেহুদা কথা ও কিরা কসম করা হয়ে থাকে। অতএব তোমরা তা যাকাত দিয়ে 'পরিচ্ছন্ন করে নাও।'

এখানে যে যাকাত বা দানের কথা বলা হয়েছে, তা এক বছর অতিবাহিত হওয়ার, নিসাব সমান ও পরিমাণ মত হওয়ার কোন শর্ত নেই। কিন্তু উক্ত হাদীসটি ব্যবসায়ীর স্থায়ী পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে ব্যবসায়ী পংকিলতা ও শোবাহ-সন্দেহ থেকে। তাহলে ইবনে হাজম যেমন বলেছেন, ব্যবসায়ীর উপর ফরযরূপে ধার্য যাকাত কাফ্ফারা হয়ে থাকে ক্রয়-বিক্রয় ক্লেদ থেকে, তাহলে মুসলিম জনগণের উপর ধার্য যাকাত থেকে তারা নিষ্কৃতি পেতে পারে কিভাবে?

দ্বিতীয় আলোচনা

বিরুদ্ধবাদীদের শোবাহ্-সন্দেহ

ক. ব্যবসা পণ্য সম্পর্কে জাহিরী ফিকাহ্‌র মত

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামায়াতের সব কয়টি মাযহাবই ব্যবসা পণ্যে যাকাত ফরয হওয়ার পক্ষে রয়েছে। জাহিরী মাযহাবের শেষের দিকের কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন নি। যেমন খাত্তাবী বলেছেন, তাদের মতটা গড়ে উঠেছে, ইবনে হাজম এই মতের প্রবল সমর্থন দিয়েছেন। শেষ জামানার আরও কতিপয় প্রখ্যাত মনীষী যাকাত ফরয মনে করার খুবই সংকীর্ণতার নীতি অবলম্বন করেছেন। ইমাম শাওকানী ও নওয়াব সিদ্দিক হাসান এই পর্যায়ে উল্লেখ্য। তাঁরাও এই মতের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন এবং তার সমর্থন দিয়েছেন। আমরা পরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করব।

১. এরা দলীলস্বরূপ পেশ করেছেন রাসূলে করমী (স)-এর এই হাদীসঃ

لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ فِيْ عَبْدِه وَلَا فَرَسِه صَدَقَةٌ-

মুসলিম ব্যক্তির ক্রীতদাস ও ঘোড়ার কোন যাকাত নেই।

বাহ্যত মনে হয়, কোন অবস্থাতেই এই যাকাত হবে না, তা ব্যবসার জন্যে হোক, কি অন্য কোন কাজের জন্যে। জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ এর জবাবে বলেছেন, হাদীসটির মূল বক্তব্য চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায়, ব্যক্তির খেদমতে নিযুক্ত ও ব্যক্তির যানবাহন হিসেবে ব্যবহৃত দাস ও ঘোড়ার যাকাত দিতে হবে না। কেননা এই দুটি ক্ষেত্রই মানুষের মৌল প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য। আর তার যাকাত যে মাফ করে দেয়া হয়েছে, তা সর্বসম্মত।

২. তাদের বক্তব্য, মূলত মুসলমানের মাল লওয়া হারাম। যেমন প্রতিটি ব্যক্তিই দায়িত্ব মুক্ত—কোন আদেশ, বিধান পালন করতে বাধ্য নয়। কাজেই তাদের ধন-মালের উপর আমরা যাকাত ধার্য করব—অথচ আল্লাহ্ তা করেন নি, না কুরআনে, না সুন্নাহ্‌তে—এটা কখনই উচিত হতে পারে না।

খোদ নবী করীমের যুগেও বহুশত প্রকারের জিনিসের ব্যবসা চলত। কিন্তু তাঁর থেকে ব্যবসা পণ্যে যাকাত ফরয হওয়ার মত কোন দলীল পাওয়া যায়নি। হযরত সামুরাতা ও আবূ যর থেকে বর্ণিত হাদীসদ্বয় যেহেতু যয়ীফ, তাই তা দলীল হিসেবে

গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে যে-মত সর্ব সাধারণের একটা চাপের তলে তা তো প্রমাণিতই হতে পারে না।

আমাদের জবাব হচ্ছে,—তাঁরা একটা কথার ভিত্তিতে যা বলেছেন, তার দ্বারা অপর একটি মৌলনীতি লংঘন করেছেন। সে মৌলনীতি হচ্ছে, সাধারণভাবে সকল প্রকার মালে যাকাত ফরয করা হয়েছে, তাতে গরীবের হক ধার্য করা হয়েছে। তা স্বীকার করা না হলে কুরআন ও সুন্নাতের অপরাপর দলীলেরও বিরোধিতা হয়, আমরা নিশ্চিত বলে জানি। সাহাবীদের মত সর্বজনমান্য মনীষীদের ইজমারও বিরোধিতা হয়ে যায়।

হযরত সামুরা'র হাদীস সম্পর্কে আবূ দাউদ ও মুনযেরী কোন মন্তব্য করেন নি। তার অর্থ, তাঁরা দুজনই হাদীসটি পছন্দ ও গ্রহণ করেছেন। ইবনে আবদুল বারও তাই করেছে। শায়খ আহমদ শাকের ইবনে হাজমের কথার জবাব স্বরূপ বলেছেন, হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ সুপরিচিত। ইবনে হাব্বান তাদের 'সিকাহ' গণ্য করেছেন।

মুহাদ্দিস হাকেম আবূ যর বর্ণিত হাদীসটিকে 'সহীহ' বলে উল্লেখ করেছেন। হাফেয ইবনুল হাজার তার কতিপয় যয়ীফ সূত্রের কথা বলেছেন, আর একটা সূত্র সম্পর্কে বলেছেন, এ সূত্রে কোন আপত্তি নেই।

হাদীস দুটির সমর্থন রয়েছে সে দুটির সাধারণত্ব ও ব্যাপকতার মধ্যে, সাহাবীদের আমলে, পূর্বের লোকদের ইজমায়, সহীহ মনে করা ও সুস্থ কিয়াসের মাধ্যমেও এর পশ্চাতে সমর্থন ও শক্তি সংগ্রহীত হয়েছে।

৩. ইমাম আবূ উবাইদ একটা তৃতীয় সংশয়ের উল্লেখ করেছেন, ফিকাহ ক্ষেত্রে কথা বলার যোগ্যতা রাখেন এমন ব্যক্তির উত্থাপিত এ সংশয়। বলেছেন, ব্যবসায়ের পণ্যে ও মাল-সামানে কোন যাকাত নেই। কেননা তাতে যাকাত ধার্য করা হয়েছে তার মূল্য হিসেব করে অথচ যাকাত তো প্রতিটি জিনিসের মূল্য থেকেই দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু মূল্য দিতে গেলে তা তো সে মাল-সামানের বাইরের জিনিস হয়ে গেল। কাজেই এ অর্থে ব্যবসায়ের দ্রব্যাদিতে যাকাত নেই।

আবূ উবাইদ বলেছেন, এরূপ ব্যাখ্যা ভুল, তা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা রাসূলে করীম (স) থেকেই আমরা সুন্নাত লাভ করেছি যে, কোন মালে যাকাত ফরয হয়, পরে দাতার পক্ষে মূল্যের তুলনায় অন্য জিনিস থেকে আদায় করে দেয়া সহজ হয় বলে তা সেই দিকেই ফিরে যায়। নবী করীম (স) ইয়েমেনে জিযিয়া সম্পর্কে হযরত মুআযের নামে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাতেই লিখিত আছে ঃ

إِنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً أَوْعَدْلَهُ مِنَ الْمُعَافِرِ

প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির উপর ইয়েমেনী কাপড় বাবদ এক দীনার অথবা তার মূল্য ধার্য হবে।

এ কথায় নবী করীম (স) একটা জিনিসের আসলের পরিবর্তে তার নগদ অর্থ মূল্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন বলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। নাজরানবাসীদের প্রতি লিখিত

পত্রেও বলা হয়েছিল ঃ তাদের প্রতি বছর দুই হাজার পোশাক (Garments) অথবা তার বিনিময়ে দিরহার (নগদ অর্থ) দিতে হবে। এতেও দেখা যায়, মূল্য—যার উপর যাকাত ফরয—এর পরিবর্তে তার মূল্য গ্রহণ করার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

'জিযিয়া' বাবদ স্বর্ণ-রৌপ্য নগদ অর্থ মূলত গ্রহণীয়। কিন্তু হযরত উমর (রা) তার পরিবর্তে উট গ্রহণ করতেন। হযরত আলী (রা) জিযিয়া বাবদ বিভিন্ন জিনিস গ্রহণ করেছেন স্বর্ণ ও নগদ অর্থের পরিবর্তে। বর্ণিত হয়েছে, হযরত মুআয মূল যাকাতেই নগদ অর্থের বদলে জিনিস গ্রহণ করেছেন। তাঁর কথা ছিল ঃ 'হ্যাঁ তোমরা আমাকে কাপড় দিয়ে দাও, তা যাকাতের অর্থ বাবদ আমি নিয়ে নেব। কেননা তোমাদের পক্ষেও তা-ই সহজ। আর মদীনায় উপস্থিত মুহাজিরদের জন্যেও তা অধিক উপকারী।' হযরত ইবনে মাস্‌উদের স্ত্রী তাঁকে বলেছিলেন ঃ 'আমার বিশ মিশকাল ওজনের একটা হার আছে।' (তার যাকাত কিভাবে দেয়া হবে?) তিনি বলেছেন, 'তার যাকাত বাবদ পাঁচ দিরহাম দিয়ে দাও।' অথচ প্রতি দশ দিরহামের মূল্য এক মিশকাল সমান ছিল। আবূ উবাইদ বলেছেন, এ সব জিনিসই হক্ আদায়স্বরূপ গৃহীত হয়েছে যে মালে তা ধার্য ও ফরয হয়েছে, তার পরিবর্তে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এ কথা বলা যায় না যে, তার যাকাত প্রত্যাহার করা হয়েছে। কেননা তা তো বাধ্যতামূলকভাবে দেয় হক্। কোন জিনিসই তা প্রত্যাহার করতে পারে না। তবে সে মালের মূল্য বাবদ অন্য জিনিস দেয়া হয়েছে এই যা। কেননা তা দাতার পক্ষে সহজ ছিল। ব্যবসায়ের মাল-সরঞ্জামের ক্ষেত্রেও তাই হবে। মূলত সেই জিনিসই যাকাত বাবদ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়; কিন্তু তা দাতাদের পক্ষে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত তা কোটা কাটা বা অংশ বের করার জন্যে। এ কারণে তার মূল্য দিয়ে দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে মাত্র। তা হলে কথা দাঁড়াল, ব্যবসা দ্রব্যাদিতে যাকাত ফরয, এ ব্যাপারে সব মুসলমান সম্পূর্ণ একমত। এর বিপরীত বা অন্য কোন কথা বিশেষজ্ঞদের কথা নয়। স্মরণীয়, দ্রব্যসামগ্রী ও ক্রীতদাসে যাকাত হবে যদি তা ব্যবসায়ের জন্যে সংগ্রহীত হয়ে থাকে। অন্য কারণে হলে যাকাত ফরয হবে না। ব্যক্তিগত ব্যবহার ও কাজেকর্মে খেদমত লওয়ার জন্যে দাস রাখা হলে তার যাকাত দিতে হবে না। কার্যরত গরু বা উটেরও যাকাত দিতে হয় না। আর ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি তো প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়ে থাকে, তার মুনাফা লাভই লক্ষ্য। এ দিক দিয়ে তা মুক্ত করে পালিত গবাদিপশুর মত—যা বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালা হয়। আর এ কারণে তাতে অবশ্যই যাকাত ফরয হবে। তবে কথা হচ্ছে, এর প্রতিটি জিনিসের যাকাত তার সুন্নাত অনুযায়ী দেয়া হবে। ব্যবসায়ের দ্রব্যাদির যাকাত মূল্যের ভিত্তিতে দেয়া হবে। আর গবাদিপশুর যাকাত দিতে হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ বা পরিসংখ্যান হিসেবে। তাহলে যাকাত ফরয হওয়ার মূল কথায় আমরা একমত হলাম। পরে প্রত্যেকটি জিনিসের যাকাত তার জন্যে নির্দিষ্ট নিয়মে আদায় হওয়ার সাব্যস্ত হল।

এ কারণে আমরা মনে করি, জমহুর মুসলমানের কথাই যথার্থ ও সঠিক। ব্যবসায়ের দ্রব্যাদিতে যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে ফরয। বিরুদ্ধ মতের লোকদের কোন কথাই জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের যুক্তি-প্রমাণ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের ইজমার সম্মুখে টিকতে পারে না।

খ. ইমামীয়া মতের ফিকাহ্‌বিদগণ মত দিয়েছেন যে, ব্যবসায়ের পণ্যাদিতে যাকাত ফরয নয়, মুস্তাহাব মাত্র।

তবে ব্যবসায়ের মুনাফার ব্যাপারে তাদের অপর একটি মত রয়েছে, তা হল, মুনাফার এক-পঞ্চমাংশ দিয়ে দেয়া ফরয (মূলধন থেকে নয়, মুনাফা থেকে দিতে হবে)। তাদের দলীল হল, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ-

জেনে রাখো, তোমরা গনীমত বাবদ যে মালই পাবে, তার এক-পঞ্চমাংশ দেবে আল্লাহ্, রাসূল, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্যে।

এ আয়াতের ভিত্তিতে তাঁরা বলেছেন, মানুষ তার উপার্জন, ব্যবসায়ের মুনাফা ও গনীমত ইত্যাদি থেকে যা-ই পায়, পরিভাষার দিক দিয়েই তাকে 'গনীমতের মাল' বলা যায়। আর মুনাফার এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে সারা বছরের সাংসারিক খরচপত্র করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা থেকে। 'জাওয়াহিরুল কালাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

যেসব জিনিসের এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ধার্য হয়েছে, তা দিতে হবে সারা বছরের যাবতীয় ব্যয়-ভার বহনের পর ব্যবসায়ের মুনাফা, শিল্প কার্য ও কৃষিকার্যের যা অবশিষ্ট থাকবে তা থেকে। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

আহ্‌লে সুন্নাহ্ বলেছেন, 'তোমরা যে জিনিস গনীমত স্বরূপ পাও—এই কথার অর্থ তা-ই হবে, যা রাসূলে করীম (স) বলেছেন। আর তা হচ্ছে, যুদ্ধের পরে পাওয়া গনীমতের মাল। 'গনীমত' বলে অভিহিত হতে পারে—এমন সব জিনিস থেকে তা দিতে হবে না। আয়াতটির পূর্ববর্তী আলোচনা থেকেও এ কথাই প্রমাণিত হয়। যদি এ আয়াতটিকে একটা সাধারণ নির্দেশ গণ্য করা হয় এবং তা সব কিছুতেই প্রযোজ্য ধরা হয় তাহলে মীরাস বাবদ প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকেও এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে বলে মনে করতে হবে, কিন্তু তা ঐকমত্যের (ইজমা'র) সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। আর যে কথা অপর একটি বাতিল কথাকে বাধ্যতামূলক করে, নীতি হিসেবে তা-ও বাতিল মনে করতে হবে।

তৃতীয় আলোচনা

ব্যবসা-পণ্যে যাকাতের শর্ত

ফিকাহ্‌বিদ্‌দের দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী মালের বিনিময়ে মাল উপার্জন করাই ব্যবসা বলে অভিহিত। আর ক্রয়-বিক্রয়ের সূত্রে যা কিছু উপার্জনের জন্যে তৈরী করা হয়, তাই ব্যবসায়ের মাল—পণ্যদ্রব্য।

কেউ কেউ বলেছেন, মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যে যা-ই প্রস্তুত করা হয়, তা-ই ব্যবসায়ের মাল—পণ্যদ্রব্য। অতএব মানুষ যে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে, তা সবই ব্যবসায়ের মাল নয়। কেননা মানুষ নিজের পরিধানের জন্যে কাপড় খরিদ করে, ঘরের আসবাবপত্র ক্রয় করে, যানবাহনের জন্যে ঘোড়া বা গাড়ি ক্রয় করে। এর কোনটিই পণ্যদ্রব্যরূপে গণ্য হবে না। তবে যা বিক্রয় করে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় তা-ই পণ্যরূপে গণ্য।

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যবসায়ের জন্যে প্রস্তুতকরণের দুটি অংশ। একটি কার্যত আর অপরটি নিয়ত পর্যায়ের। কার্যত হচ্ছে ক্রয় ও বিক্রয়ের কাজটি । আর নিয়ত হচ্ছে, মুনাফা অর্জনের ইচ্ছা ও বাসনা। কাজেই কোন ক্ষেত্রে এ দুটির মাত্র একটি অংশের অবস্থিতিতে তা ব্যবসা বলে হবে না, কেবল মুনাফা লাভের ইচ্ছা ও নিয়ত হলেও তা ব্যবসা বলা যাবে না—কার্যত ব্যবসায়ের কাজটি অনুষ্ঠিত না হলে। আর ইচ্ছা ও নিয়ত ছাড়া কেবল ক্রয় বা বিক্রয় কাজটি হলেও তা ব্যবসা নামে অভিহিত হবে না।

কেউ যদি সম্পত্তি হিসেবে কোন জিনিস ক্রয় করে—যেমন কেউ গাড়ি কিনলো তাতে আরোহণ ও চলাচল করার উদ্দেশ্যে, সেই সাথে মনে মনে এ সংকল্পও নিল যে, মুনাফা পেলে সে তা বিক্রয় করে দেবে, এতেই সেটি ব্যবসায়ের মাল বা পণ্য গণ্য হতে পারে না। কিন্তু যদি ব্যবসা করে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে কেউ অনেক কয়টি গাড়ী ক্রয় করে, আর তার কোন একটিতে যদি সে চলাচলও করে ও নিজের জন্যে ব্যবহারও করে এবং কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ মুনাফা পেয়ে সে তা কোন এক সময়ে বিক্রয় করে দয়ে, তাহলে তা অবশ্যই ব্যবসা হবে। এই ব্যক্তিগত ব্যবহারে তার ব্যবসা হওয়াটা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে আসল নিয়ত ব্যক্তিগত ব্যবহার নয়, মুনাফা লাভই আসল লক্ষ্য। যেমন যে জিনিস মূলত সংরক্ষণ ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হবে, তাতে মুনাফা পাওয়া গেলে তা বিক্রয় করে দেয়ার শুধু নিয়ত থাকলেই তার 'ব্যবসা' হওয়া বিনষ্ট বা ক্ষুণ্ন হয় না। আর সেখানে মূলত বিক্রয় করা ও ব্যবসা করা লক্ষ্য, শুধু ব্যক্তিগত ব্যবহারেই তা বিনষ্ট হয়ে যায় না— । তবে কোন ব্যবসা পণ্যক যদি

ব্যক্তিগত ব্যবহারে নিয়ে আসা হয়, তাহলে জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মতে এই ইচ্ছাটুকুই সেই জিনিসকে ব্যবসায়ী জিনিস থেকে বের করে এনে ব্যক্তিগত অপ্রবৃদ্ধিশীল জিনিসে পরিণত করে দেবে।

কেউ কেউ এখানে আরও একটি শর্তের উল্লেখ করেছেন। তা হল, বছরে দুইবার একই জিনিসের যাকাত গ্রহণের পথে কোন প্রতিবন্ধকের অনুপস্থিতি। ইবনে কুদামাহ বলেছেন, একই কারণে একই বছরে ও একই জিনিসের দুইবার যাকাত ফরয করার পথে বাধা না থাকাও একটা শর্ত হবে। হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে' لاثنى فى الصدقة 'যাকাতে দ্বৈততা—দুইবার গ্রহণের অবকাশ নেই।'

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, কেউ যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কোন কৃষিজমি ক্রয় করে, পরে তাতে সে চাষাবাদ করে ও এমন ফসল ফলায়, যাতে 'ওশর' ফরয হয়, তাহলে এই ফসলের 'ওশর' দিয়ে দিলেই সেই ব্যবসায়ের জন্যে খরিদ করা জমি-পণ্যের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। সে জমি পণ্যে যাকাত আলাদাভাবে দেয়ার কোন প্রয়োজন হবে না। কেননা একই মাল থেকে একাধিকবার যাকাত গ্রহণ জায়েয নয়। কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ এর বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে ব্যবসায়ের যাকাতটাই প্রধান দেয় হবে। কেউ কেউ দুইবার যাকাত দেয়ার কথাও বলেছেন। কেননা একবার যাকাতের যে কারণ, দ্বিতীয়বার যাকাত দেয়ার কারণ তা থেকে ভিন্নতর ও স্বতন্ত্র। অতএব তাকে 'দ্বৈত' বলা চলে না। পরে এ বিষয়ে আরও কথা বলা হবে। পণ্যদ্রব্য কি, কি নয় সে বিষয়ে আলোচনার পর তা যাকাত-এর শর্ত পর্যায়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

ব্যবসায়ীর মূলধন, হয় নগদ টাকা হবে, না হয় হবে পণ্যদ্রব্য—যার মূল্য নগদ টাকায় হিসেব করা হবে। যদি নগদ সম্পদ হিসেবে থাকে, তাহলে সে বিষয়ে কোন কথার প্রয়োজন নেই। যদি দ্রব্যসামগ্রী হয়, তাহলে নগদ সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে যা শর্ত, এ ক্ষেত্রেও সেই শর্ত ধার্য হবে অর্থাৎ মালিকানায় একটি বছর পূর্ণ হওয়া, নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা, সর্বপ্রকার ঋণমুক্ত হওয়া এবং মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া। আমরা পূর্বেই বলেছি, এ কালে নগদ সম্পদের যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে নিসাবের পরিমাণ হচ্ছে যা ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের সমান মূল্যের হবে।

—কিন্তু নিসাবের পূর্ণত্ব কখন ধরা যাবে?

—কেবল বছর শেষেই কি গণনা করা হবে?

—অথবা নিসাবের পূর্ণ পরিমাণ সম্পদ সারা বছর (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত) মজুদ থাকতে হবে?

—অথবা শুধু বছরের শুরুকালে ও শেষকালে তা থাকলে চলবে—মাঝখানের কোন হিসাব না করেই?

এর জবাবে ফিকাহ্‌বিদদের তিনটি কথা আছে ঃ

প্রথম, ইমাম মালিকের কথা এবং ইমাম শাফেয়ীর উদ্ধৃতি। তা এই যে, শুধু বছরের শেষের হিসাবটাকেই ধরা হবে। তখনকার মূল্যটাই বিবেচ্য বিষয় হবে। কেননা সব

সময় মূল্যের হিসাব করা কঠিন। তাই যে সময় যাকাত ফরয হচ্ছে, সেই সময়ের মূল্যটা গণ্য করা হবে। আর তা হচ্ছে বছরের শেষ সময়। অন্যান্য যাকাতের জিনিসের অবস্থা এ থেকে ভিন্ন। কেননা তার নিসাব তো সেই মূল জিনিস থেকেই নেয়া হয়। কাজেই তার নিসাব ও গণনা কঠিন নয়।

দ্বিতীয় কথা, সারাটি বছরের নিসাব গণ্য করতে হবে। কখনও নিসাবের কম হয়ে গেলে বছর গণনা সেখানে ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা এই মালের হিসাবে পূর্ণ বছরটাকে ধরা হয়। কাজেই যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে সারা বছর নিসাব পরিমাণ অক্ষুণ্নভাবে বর্তমান থাকা আবশ্যক। ইমাম সওরী , আহমদ, ইসহাক, আবূ উবাইদ, আবূ সওর ও আবুল মুনযির প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদও এ কথাই বলেছেন।

তৃতীয় কথা, নিসাবের অবস্থা বছরের শুরুতে ও শেষে বর্তমান থাকাটাই গণ্য ও যথেষ্ট। মাঝাখানে তা না থাকলেও যাকাত ফরয হওয়া কোন বাঁধা নেই। বছরের এ দুই তরফে নিসাব পরিমাণ থাকলেই যাকাত ধার্য হবে। মাঝখানে তা কম হয়ে গেলে কোন অসুবিধা হবে না। ইমাম আবূ হানীফা তাঁর সঙ্গিগণ এ মত পোষণ করেন। এঁদের দলীল প্রথমোক্ত কথার যে দলীল, তা-ই। অর্থাৎ সারাটি বছর মূল্য হিসাব করা কঠিন বিধায় শুধু বছরের শুরু ও শেষের হিসাবই যথেষ্ট। কেননা পণ্যের মূল্য জানার উদ্দেশ্য হচ্ছে তা নিসাব পরিমাণ হয় কি না, তা জানা। আর তা প্রতি মুহূর্তে জানতে পারা যেমন কঠিন, তেমনি খুবই অসুবিধাজনকও। ফলে তা মাফ করে দেয়া হয়েছে এবং শুধু বছরের শুরু ও শেষকেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

কেউ যদি এমন পণ্যের মালিক হয়, যা নিসাব পরিমাণের কম এবং তার উপর অর্ধেক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। পরে তার প্রবৃদ্ধির মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে গেল অথবা মূল্য পরিবর্তিত হয়ে তা নিসাব পরিমাণ হয়ে গেল কিংবা তা বিক্রয় করল নিসাব পরিমাণ মূল্যে অথবা বছরের মধ্যেই অপর একটা পণ্য বা নগদ সম্পদের মালিক হওয়ার দরুন তার নিসাব পূর্ণ হয়ে গেল। এ সময় বছর শুরু হল তখন অতীতে যা ছিল তা গণ্য করা হবে না। এটাই জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মত।

কিন্তু ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী'র মত হচ্ছে, নিসাবের কম পরিমাণে বছর শুরু হলেও কেবল বছর শেষেই নিসাব পরিমাণ শর্ত। তা যদি হয়, তাহলে যাকাত ফরয হয়ে যাবে।

এ পর্যায়ে ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি পাঁচ দীনারের মালিক হয়—এ পরিমাণটা নিসাব পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ মাত্র—পরে তা নিয়ে সে ব্যবসা করে ও তার উপর একটি বছর পূর্ণ হয়ে যায় এবং তাতে তার নিসাব পরিমাণ সম্পদ হয়ে যায়, তাহলে তার যাকাত দিতে হবে।

এ গ্রন্থকারের মতে ইমাম মালিকের মতটাই গ্রহণীয়। শাফেয়ীদের কাছে তা-ই সহীহতম। কেননা সে জিনিসের নিসাবের একটি বছর পূর্ণ হওয়াটা প্রমাণিত হয়নি। কোন সহীহ মরফূ' হাদীসও তার পক্ষে নেই। বছর পূর্ণ হওয়া কালে নিসাব পূর্ণত্ব লাভ

—২০

করলেই তা গণ্য করা যেতে পারে। মুসলমানের যাকাত-বছরের সূচনাটাই গণ্য করতে হবে। প্রতি বছরের সে নির্দিষ্ট সময়টি উপস্থিত হলে যে যে মালের মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়ে গেছে, তখন তার যাকাত দিতে হবে। বছরের মাঝখানে নিসাবের কম হলে তা ধর্তব্য হবে না।

সরকার যদি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে, তবে সরকারী পক্ষ থেকেই একটা সময় নির্দিষ্ট করে দিতে পারে প্রতিবছরের যাকাত দেয়ার জন্যে। সে নির্দিষ্ট সময়ে যার যার মালিকানা নিসাব পরিমাণ পাওয়া যাবে, তার কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে। যদিও কারোর নিসাব একটি বছর পূর্ণ বয়সের হয়নি, হয়েছে মাত্র কয়েক মাসের—তবুও।

গবাদিপশুর যাকাতের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছিল নবী করীম ও খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে। তখন যাকাত আদায়কারীরা নির্দিষ্ট সময় হলে নিসাব পূর্ণ হওয়ার শর্তে যাকাত আদায় করে নিত। সে নিসাব কবে বা কখন পূর্ণত্ব পেয়েছে এ প্রশ্ন করতো না। যাকাত গ্রহণের সময় নিসাব পূর্ণ হওয়াটাই যথেষ্ট ছিল। তারপর চন্দ্র বছরের একটি বছর পূর্ণ হওয়ার আগে তার কাছ থেকে আর যাকাত গ্রহণ করা হত না।

চতুর্থ আলোচনা

ব্যবসায়ী তার ব্যবসা সম্পদের যাকাত কিভাবে দেবে

ব্যবসায়ী তার যে সম্পদ ব্যবসায়ের কাজে বিনিয়োগ করে, তার নিম্নোদ্ধৃত তিনটি বা ততোধিক অবস্থার কোন একটি অবশ্যই দেখা দেবে ঃ

১. হয় ব্যবসা সম্পদ পণ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্রের আকারে থাকবে, যা ব্যবসায়ী একটা মূল্য দিয়ে ক্রয় করে, পরে তা বিক্রয় করে না।

২. অথবা তা উপস্থিত নগদরূপে থাকবে, যা কার্যত তার হাতে সঞ্চিত হবে অথবা তার কর্তৃত্বাধীন ব্যাংকের হিসাবে জমাকৃত থাকবে।

৩. অথবা তা তার কর্মচারীদের অথবা অন্যদের কাছে ঋণ বাবদ দেয়া হয়েছে—এ হিসেবে থাকবে। ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে তাই স্বাভাবিক। আর এ-ও স্বাভাবিক যে, এভাবে প্রদত্ত ঋণের অনেকগুলো ফেরত পাওয়ারই আশা থাকে না, অবশ্য অনেকগুলো ফেরত পাওয়ার আশাও থাকে।

ব্যবসায়ী নিজের দেয়া ঋণ যেমন অন্যদের উপর থাকে—তার পাওয়ারূপে, তেমনি তাঁর উপরও অনেকের ঋণ থাকে—তার উপর পাওনা হিসেবে যা তাকে দিতে হবে। এ কথা আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি।

এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এ ব্যবসায়ী তার এ বিভিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকা সম্পদ ও ধনের যাকাত কি করে দেবে?

এ প্রশ্নের জবাবে আমরা তাবেয়ী ইমামগণ থেকে বর্ণিত মতসমূহ উদ্ধৃত করব, যার উল্লেখ করেছেন ইমাম আবূ উবাইদ।

মায়মুন ইবনে মাহ্রান বলেছেন, তোমার যাকাত দেয়ার সময় উপস্থিত হলে তুমি লক্ষ্য কর, তোমার কাছে নগদ কি আছে, কি আছে পণ্যদ্রব্য। তার নগদ মূল্য ধার্য কর। আর ফেরত দিতে সক্ষম—এমন সচ্ছল লোকের কাছে যা ঋণ হিসেবে তোমার পাওনা আছে তা থেকে তোমার উপর যে ঋণ অন্য লোকের পাওনা আছে তা দিয়ে অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদের যাকাত দেবে।

ইমাম হাসান বসরী বলেছেন, একজনের যাকাত দেয়ার নির্দিষ্ট মাস উপস্থিত হলে তার কাছে রক্ষিত সব সম্পদ, ব্যবসায়ের জন্যে ক্রয় করা সব জিনিস ও সব ঋণ বাবদ

নেয়া মালেরও যাকাত দেবে। যে ঋণ ফেরত পাওয়ার আশা নেই, তা অবশ্য বাদ দেবে।

ইবরাহীম নখয়ী বলেছে, ব্যক্তি তাঁর ব্যবসায়ে নিয়োজিত সমস্ত সম্পদের মূল্যায়ন করবে, তাতে যাকাত হলে যাকাত দিয়ে দেবে তার অন্যান্য সব মালের যাকাত সহকারে। ফিকাহ্‌র এ ইমামগণের কথা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, মুসলিম ব্যবসায়ীর যাকাত দেয়ার জন্যে নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে তার মালসমূহ পরস্পরের সাথে মিলিয়ে হিসাব করবে, মূলধন, লব্ধ মুনাফা ও সঞ্চিত সম্পদ এবং ফেরত পাওয়ার আশার ঋণসমূহ। তার ব্যবসায়কে আলাদা করে মূল্যায়ন করবে এবং তার পণ্যদ্রব্যসমূহের মূল্য নগদ সম্পদের সাথে মিলিয়ে হিসাব করবে। তা ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়েছে কি হয়নি, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। তার সাথে মিলাবে সে সব দেয়া ঋণ, যা ফেরত পাওয়ার আশা থাকবে। আর এ সব কিছু থেকে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ—শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে—যাকাত বাবদ দেবে। যে ঋণ ফেরত পাওয়ার আশা নেই, তার যাকাত দিতে হবে না বলেই আমরা মত দিয়েছি। তবে কখনও তা হাতে ফেরত পাওয়া গেলে তখন তার মাত্র এক বছরের যাকাত দিতে হবে। আর তার উপর যে ঋণ আছে তা তার সমস্ত মালের হিসাব থেকে বাদ দেবে। তারপরে যা অবশিষ্ট থাকবে তার যাকাত দিয়ে দেবে।

মজুদদার ব্যবসায়ী ও চলতি বাজার দরে বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীর মধ্যে পার্থক্য

উপরে জম্‌হুর ফিকাহ্‌বিদ্‌দের মত উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু ইমাম মালিক এ ক্ষেত্রে একটা ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি ব্যবসায়ীদের দু'ভাগে ভাগ করেন। এক ভাগে যে সব ব্যবসায়ী গণ্য, যারা চলতি বাজারদরে পণ্য বিক্রয় করে। তাদের এ ক্রয়-বিক্রয়ের কোন সময় সুনির্দিষ্ট নেই। ইমাম মালিক মনে করেন, এ ব্যবসায়ীরা প্রতিটি বছর শেষ হলেই তাদের দ্রব্যাদি ও পণ্যাদির যাকাত দিয়ে দেবে, যদিও তিনি বছরের শুরুতে নিসাব পরিমাণ থাকার শর্ত করেছেন—যেমন পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

অপর শ্রেণীর ব্যবসায়ী—যারা পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে এবং তার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে—ইমাম মালিক তাদের মজুদদারী বলে অভিহিত করেছেন। যেমন বহু লোক জমি সম্পত্তি ক্রয় করে এবং একটা সময়কাল অপেক্ষা করে বাজারের প্রতি কড়া নজর রাখে। যখন তার বাজার দাম বৃদ্ধি পেয়ে যায়, তখন তা বিক্রয় করে। ইমাম মালিক মনে করেন, বছরের পুনরাবৃত্তির দরুন যাকাত ফরয হওয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। তাই যখন সেই সম্পত্তি বিক্রয় করে দেবে, তখন সে এক বছরের যাকাত দিয়ে দেবে, যদিও তা তার কাছে কয়েক বছর অবধি আটক রয়েছে।

ইবনে রুশ্‌দ তাঁর এ মত বিশ্লেষণে যা কিছু বলেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

ইমাম মালিক বলেছেন, পণ্য যখন বিক্রয় হবে, তখন তার এক বছরকালের যাকাত দিয়ে দেবে। যেমন ঋণের অবস্থা। যে ব্যবসায়ীর পণ্যক্রয়ের কোন সময় সুনির্দিষ্ট

নয়, তারা 'আবর্তনকারী' বলে অভিহিত—তাদের ব্যবসা শুরু করার দিন থেকে একটি বছর পূর্ণ হলে তার কাছে ব্যবসায়ের দ্রব্য যা আছে তার মূল্য নির্ধারণ করবে এবং তার সাথে তার কাছে রক্ষিত সম্পদ হিসেবে মিলাবে এবং সেই ঋণ বাবদ দেয়া টাকা যা ফেরত পাওয়ার আশা আছে। এতে নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলে তার যাকাত দিয়ে দেবে।

ইমাম শাফেয়ী, আবূ হানীফা, আহমদ, সওরী ও আওযায়ী প্রমুখ জমহুর ফিকাহ্ বিদগণ বলেছেন ঃ এ উভয় ধরনের ব্যবসয়ীরা আসলে এক ও অভিন্ন। যে-ই কোন পণ্য ক্রয় করবে ব্যবসারের উদ্দেশ্যে ও তার উপর একটি বছর অতিবাহিত হবে, সে-ই তার মূল্য ধরে তার যাকাত দেবে।

ইবনে রুশদ ইমাম মালিকের মতের সমালোচনা করে বলেছেন, এ মতটি যেন একটি অতিরিক্ত বিধি, সপ্রমাণিত শরীয়াত থেকে বের করে নেয়া বিধি মনে হয়। 'মুরসাল কিয়াসের' সাহায্যে এ ধরনের মতই পাওয়া যায়। তাতে কোন অকাট্য দলীলের ভিত্তি গ্রহণ করা হয় না। শুধু শরীয়াতী মুসলিহাত—কল্যাণ বিবেচনাই হয় একমাত্র ভিত্তি। আর ইমাম মালিক এ ধরনের কল্যাণ চিন্তার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন, যদিও তার পশ্চাতে নির্ভরযোগ্য কোন মূল দলীল বর্তমান নেই।

সত্যি কথা এই যে, দলীলের দিক দিয়ে জমহুর ফিকাহ্বিদ্দের মত ইমাম মালিকের মত অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। ব্যবসায়ী দ্রব্যাদিতে যাকাত ফরয মনে করার গণনাযোগ্য ভিত্তি হচ্ছে এই যে, তা প্রবৃদ্ধির অপেক্ষায় ক্রয় করা মাল—নগদ সম্পদের মতই। তা কার্যত বৃদ্ধি পেয়েছে কি পায়নি তাতে কোন পার্থক্য নেই। মুনাফা করেছে কি করেনি বা লোকসান হয়েছে কিনা, সে বিষয়েরও কোন গুরুত্ব নেই। ব্যবসায়ী যে-ই হোক, আবর্তনশীল হোক কি মজুদদারী—নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেই তাকে যাকাত দিতে হবে।

তা সত্ত্বেও ইমাম মালিক ও সহ্নূনের মত একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষ করে মন্দাভাব বা ধ্বংসকালে যখন কোন বিপর্যয়কর অবস্থা দেখা দেবে কোন ব্যবসায়ীর উপর, ব্যবসায়ীর পণ্য বিক্রয় হয় না, বিক্রয় হলেও মুনাফা হয় না, লোকসান হয়, তখন কার্যত যা বিক্রয় হবে কেবল তারই যাকাত গ্রহণ করা যেতে পারে। আর যে যে পণ্যে এ বিপদ প্রকট হয়ে দেখে দিয়েছে, তার যাকাত মাফ করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা পণ্যের বিপদগ্রস্ত হওয়ায় তার কোন হাত নেই, সে নিজে এ জন্যে দায়ী নয়।

স্থিতিশীল পণ্যের যাকাত নেই

যে ব্যবসায়ের মূলধনের যাকাত দিতে হবে, তা প্রবহমান ও আবর্তনশীল হবে। নির্মিত প্রতিষ্ঠান—দালান কোঠা, ঘরবাড়ি ও ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপনের সম্পদ-সম্পত্তি—যা বিক্রয় করা হয় না, নড়ানোও হয় না—সম্পদের মূল্য ধরার সময় তা গণ্য করা হবে না। তার যাকাতও দেয়া লাগবে না। ফিকাহবিদগণ উল্লেখ করেছেন, ব্যবসায়ের পণ্য তা,

যা মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয় বিক্রয় করা হবে। এ পর্যায়ের দলীল হযরত সামুরা বর্ণিত হাদীস যা আলোচনার শুরুতেই উদ্ধৃত করেছি—নবী করীম (স) আদেশ করতেন—আমরা যা বিক্রয়ার্থে তৈয়ার করি তার যাকাত দিতে।

এ প্রেক্ষিতে ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, পণ্যদ্রব্য যেসব পাত্রে রাখা হয়, পিঞ্জরা ও দাঁড়ি-পাল্লা, এবং খন্তা, কুড়াল, করাত, লাঙ্গল-ট্রাক্টর, হাল-ব্যবসা সংক্রান্ত বা কৃষিকাজের এ সব যন্ত্রপাতির কোন যাকাত দিতে হবে না। কেননা এ জিনিসগুলো থেকে যায়, বিক্রয় হয়ে যায় না। ফলে তা সরঞ্জামের মধ্যে গণ্য, পণ্যে নয়। এগুলো ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পদ, প্রবৃদ্ধির জন্যে তৈয়ার করা বা রাখা হয়নি।

কেউ কেউ এসব জিনিসের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য করে বলেছেন, ব্যবসায়ের জন্যে জরুরী দ্রব্যসামগ্রী, আতর বিক্রেতার শিশি, বস্তা—ব্যবসায়ীরা যা ব্যবহার করে, ঘোড়ার জিন ইত্যাদি অশ্ব ব্যবসায়ী যা রাখে—এগুলো সহ পণ্য বিক্রয় করার নিয়ত থাকলে তা-ও পণ্যদ্রব্য হবে। আর তা বিক্রয়ের ইচ্ছা না থাকলে ও এগুলো থেকে গেলে, হিসাবে এগুলো ধরা হবে না।

যাকাত দেয়ার সময় পণ্যদ্রব্যের মূল্য কোন্ দরে হিসাব করা হবে

স্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্যে প্রস্তুত করা হয়নি এমন সব জিনিস বাদ দিয়ে যেসব পণ্যদ্রব্যের একটি বছরকাল কারোর মালিকানায় অতিবাহিত হয়েছে, তার হিসাব করে মূল্য ধরে যাকাত দিতে হবে।

কিন্তু ব্যবসায়ী কোন্ দামে বা দরে এ সব জিনিসের মূল্য ধরবে? .. অথবা সরকার নিয়োজিত যাকাত আদায়কারীই বা তা কোন্ দরে নিসাব করবে?

ক. সাধারণভাবে সকলের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম হল, যাকাত ফরয হওয়ার সময় চল্‌তি বাজার দর—যে দামে পণ্য সাধারণত বিক্রয় হচ্ছে—সেই দামে হিসাব করবে। তাবেয়ী ফিকাহ্‌বিদ ইবনে জাবির ব্যবসা পণ্য সম্পর্কে এ মত দিয়েছেন বলে জানাচ্ছেন যে, যাকাত ফরয হওয়ার দিন সেই জিনিসগুলোর যে মূল্য থাকবে, সেই মূল্য ধরে হিসাব করতে হবে এবং তারই যাকাত দিতে হবে। ফিকাহ্‌বিদদেরও এটাই মত।

খ. হযরত ইবনে আব্বাস বলছিলেন, যাকাত ফরয হওয়ার পরও পণ্য বিক্রয় হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা কোন দোষের কাজ হবে না।

অর্থাৎ পণ্য কার্যত বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা। কেননা পণ্য যে মূল্যে বিক্রয় হওয়ার, প্রকৃত সেই মূল্যটার ভিত্তিতেই গোটা সম্পদের মুল্যায়ন প্রয়োজন, এ কারণে এ মতটি দেয়া হয়েছে।

গ. ইবনে রুশ্‌দ উল্লেখ করেছেন, কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন, পণ্য যে মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে সেই মূল্য ধরে যাকাত দিতে হবে, তার বর্তমান মূল্যে নয়। কিন্তু ইবনে রুশ্‌দ কারোর নাম বলেন নি, কোন দলীলেরও উল্লেখ করেন নি।

ব্যাপারটির দুটি অবস্থা হতে পারে। হয় দাম কমে যাবে, তাহলে ক্রয়মূল্য ধরে নিসাব করলে ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথবা মূল্য বেড়ে যাবে। তাহলে নিয়োজিত মূলধনের যাকাত লওয়া হবে—যদি ক্রয়মূল্যে হিসাব ধরা হয়—আর তাতে মুনাফা বাদ পড়ে যাবে।

অথচ মূলধন ও তার মুনাফা উভয়ের একত্রে যাকাত আদায় করাই সর্বজনপরিচিত রীতি। গবাদিপশুর যাকাত তা-ই করা হয়।

এ কারণে জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মতই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। আর তা হল,. তখনকার সময়ের বাজার দরের ভিত্তিতে পণ্যের মূল্যের হিসাবকরণ, কেননা প্রয়োজনে খুব কম দরেও পণ্য বিক্রয় হয়ে যেতে পারে।

ব্যবসায়ী মূল ব্যবসা দ্রব্য থেকে যাকাত দেবে, না তার মূল্য থেকে

ব্যবসায়ী দ্রব্যাদির মূল্যায়ন করবে। তার পর প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যবসায়ী যাকাত দেবে কোথা থেকে? ব্যবসার দ্রব্যাদির অংশ যাকাত বাবদ দিয়ে দেবে, না নগদ মূল্য দিয়ে তা আদায় করবে?

এই পর্যায়ে কয়েকটি মত প্রকাশিত হয়েছেঃ

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ীর একটি মত এই যে, ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্য থেকে বা মূল পণ্য দিয়ে যাকাত দিতে পারে-এক্ষেত্রে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। যেমন কাপড়ের ব্যবসায়ী কাপড় দিয়েই যাকাত দিতে পারে, তার নগদ মূল্য দিয়েও যাকাত আদায় করতে পারে। যে পণ্যে যতটা যাকাত ধার্য হবে সেই মূল জিনিস দিয়েই যাকাত দেবে—অন্যান্য সমস্ত ধন-মালের মতই। তাতে কোন অসুবিধে নেই।

ইমাম শাফেয়ীর আর একটা মত হচ্ছে, মূল জিনিস দিয়ে নয়, জিনিসের মূল্য দিয়ে যাকাত দেয়াই ওয়াজিব। কেননা নিসাব তো মূল্যের হিসাবে ধরা হবে। তাই তা দিয়ে যাকাত দিয়ে দিলে সেই মূল পণ্য থেকেই দেয়া হল মনে করতে হবে।

'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, আমরা মনে করি না যে, যাকাত মালের উপর ফরয হয়, আসলে ফরয হয় তার মূল্যের উপর।

এ মতটিকে আমি অগ্রাধিকার দিচ্ছি শুধু দরিদ্রজনের কল্যাণের দিকে নজর রেখে। কেননা জিনিস না দিয়ে নগদ পয়সা দেয়া হলে দরিদ্র ব্যক্তি প্রয়োজন মত জিনিস ক্রয় করে নিতে পারে। আর কোন জিনিস দিলে তাতে তার কোন কাজ হয় না। অনেক সময় সেই জিনিসটির—যাকাত বাবদ যা দেয়া হবে—তার কোন প্রয়োজনেই আসবে না বলে সে তা বিক্রয় করে ফেলতে বাধ্য হবে এবং তা নিশ্চয়ই কম দামে বেঁচবে। এ মতটা মেনে নেয়া যেতে পারে, বিশেষ করে সরকারই যখন যাকাত আদায় ও বণ্টন করবে তখন। কেননা তার পক্ষে এটাই শোভন ও সহজ।

তবে প্রথম মত অনুযায়ী কাজ করা যেতে পারে একটি মাত্র ব্যতিক্রমধর্মী সময়ে। তা হচ্ছে, যে-ব্যবসায়ী যাকাত দিচ্ছে, সে যদি বিশেষ কোন দরিদ্র ব্যক্তি সম্পর্কে

জানতে পারে যে, এ জিনিসটি তার প্রয়োজন এবং সে জিনিসটি যদি তাকে যাকাত বাবদ দিয়ে দেয়, তাহলে তাতে তার উপকারও হয়। আসলে ব্যাপারটি সাধারণ কল্যাণ ও সুবিধার দৃষ্টিতে বিবেচ্য, এ ব্যাপারে অকাট্য দলীল বলতে কিছুই নেই।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা তাঁর ফতোয়ায় এ মতের পক্ষেই কথা বলেছেন। তাঁকে ব্যবসায়ী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যেসব জিনিসের উপর যাকাত ফরয হয়েছে, সে জিনিসের কোন অংশ দিয়ে যাকাত দিয়ে দেয়া কি তার পক্ষে জায়েয? তিনি এর জবাবে কয়েকটি কথা বলেছেন ঃ

১. হ্যাঁ, জায়েয, কোনরূপ শর্ত ছাড়াই,
২. না, জায়েয নেই, বিনা শর্তে,
৩. প্রয়োজনবশত অথবা অধিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ সময়ে তা জায়েয।

তিনি বলেছেন, সব কয়টি মতের মধ্যে এ শেষোক্ত মতটিই অধিক ভারসাম্যপূর্ণ। যাকাত গ্রহণকারী যদি প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পোশাক ক্রয় করতে চায়, তাহলে যাকাতদাতা তার জন্যে তা ক্রয় করে দিতে পারে। তা করা হলে বলা যাবে, তার প্রতি সে ইহ্সানই করেছে। আর ব্যবসায়ীর কাছে রক্ষিত কাপড়ের মূল্য ধরে যদি দিয়ে দেয় তাহলে হয়ত সে বাজার দরের তুলনায় বেশী দাম ধরবে, আর তা নেবে এমন ব্যক্তি, যার সেই কাপড়ের কোন প্রয়োজন নেই। তখন সে তা বিক্রয় করে দেবে, ফলে তাকে অনেক খেসারতও দিতে হতে পারে। পরিণামে যাকাত গ্রহণকারী গরীব ব্যক্তিটির বড় ক্ষতি হওয়ার আশংকা।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষি সম্পদের যাকাত

মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অপার-অসীম নিয়ামত হিসেবেই তিনি এই পৃথিবীকে মানুষের জন্যে সুসজ্জিত ও বাসোপযোগী বানিয়েছেন। এই যমীনকে উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরী করেছেন। তার উপর আল্লাহ্‌র প্রাকৃতিক বিধান কার্যকর করেছেন। মানুষের রিযিক ও জীবন-জীবিকার প্রথম উৎস বানিয়েছেন এই জমীনকে। এই জমীনই স্থিতি-স্থাপনের ক্ষেত্র। তা এতই গুরুপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের জীবনে যে, পাশ্চাত্যের কোন কোন অর্থনীতিবিদ কেবলমাত্র কৃষি জমির উপর কর ধার্যকরণ ও অন্য কোন কিছুর উপর কোনরূপ কর ধার্য না করার প্রস্তাব করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে এই জমিই হচ্ছে মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস।

বস্তুত যে লোকই তার সহজ দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিচার করবে সে-ই এর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হবে। কেননা তিনিই তো জমিকে মানুষের অধীন, নিয়ন্ত্রিত, নম্র, মসৃণ ও চাষাবাদযোগ্য বানিয়েছেন। তাতে প্রবৃদ্ধি সাধনের উর্বরা ক্ষমতা রেখেছেন এবং পরিমিত পরিমাণ রিযিক উৎপদানের ব্যবস্থা করেছেন। এভাবেই এই মহাসম্মানিত সৃষ্টিকুলের জীবন-জীবিকার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ্ নিজেই ইরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ-

আমরাই তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছি জমীনের বুকে এবং তাতেই সংরক্ষিত করেছি তোমাদের জন্য জীবন জীবিকা। তা সত্ত্বেও তোমরা খুব সামান্যই শোকর কর।

বস্তুত জমীনে বপনকৃত বীজ ও দানা জীবন্ত হতে, বড় হতে ও ফল ধারণ করতে যেসব মৌল উপাদানের মুখাপেক্ষী হয়, তা-ই প্রাকৃতিক নিয়ম ও জীবনের কার্যকারণ—তা যদি আমরা অনুধাবন করতে পারতাম তাহলে আল্লাহ্‌র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও বিচিত্র বিস্ময়কর ধরনের অনুগ্রহের কথা উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত।

সত্যি কথা, সব মাটি উর্বরা শক্তিসম্পন্ন ও উৎপাদনশীল নয়। এই কারণে বীজের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপকরণসম্পন্ন বিশেষ মাটির প্রয়োজন শস্যোৎপাদনের জন্যে। তাহলে কে জমিকে উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণসম্পন্না বানিয়েছে?

বীজের বেঁচে থাকা ও গাছে পরিণত হওয়ার জন্যে পানির প্রয়োজন। পানি না পেলে তার মৃত্যু অবধারিত। আকাশ থেকে নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি বর্ষানোর অথবা খাল-নদী-ঝর্ণা থেকে পানির পরিমিত প্রবাহ সৃষ্টির ব্যবস্থা কে করেছেন? ... তা

এতটা পরিমিত যে, পানির জোয়ারে লোক ডুবেও যায় না, ক্ষেত ও পশুকুল মরে ভেসেও যায় না।

উদ্ভিদের শোষণের জন্যে গ্যাস প্রয়োজন। বাতাসে এই প্রয়োজনীয় গ্যাসের ব্যবস্থা কে করে রেখেছেন? উদ্ভিদকে সেই কার্বন-ডাই অক্সাইড শুষে নেয়ার শিক্ষা কে দিল, যা মানুষ ও জীবজন্তু বাইরে নিক্ষেপ করে? এই একক বিনিময় ব্যবস্থার দরুনই তো প্রাণী জগত ও উদ্ভিদ জগতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

উদ্ভিদের জন্যে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ আলো ও তাপের প্রয়োজন। তা মাত্রাতিরিক্ত হলে সব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আর প্রয়োজনীয় মাত্রার কম হলে তা মরে যাবে। তাহলে সূর্যকে সৃষ্টি করে এই কাজে কে নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে? এবং তার মধ্যে এ সব বিশেষত্ব কেই বা গচ্ছিত রেখেছে? পৃথিবীর উপর সূর্যের এ আলো-তাপ বিকীরণের কার্য কে করাচ্ছে? ... তা এমনভাবে সুসম্পন্ন হচ্ছে যে, জীবন্ত জগত অতিরিক্ত শৈত্যে বরফাচ্ছাদিত হয়ে মরে যাচ্ছে না এবং সীমাতিরিক্ত তাপে সব জ্বলে পুড়েও যাচ্ছে না।

শুষ্ক স্থির বীজের মধ্যে জীবন প্রবর্তন ও নিপুলতা সৃষ্টির যোগ্যতা কে দিয়েছে? একটা খেজুর দানা কি করে একটা বড় গাছে পরিণত হয়ে বিপুল সংখ্যক খেজুরের কাঁদি ঝোলাতে পারছে কে? একটা শস্য দানা সাতটি ছড়া এবং প্রতিটি ছড়া একশ'টি দানা উৎপাদন করতে পারছে কি করে?

তিনিই আল্লাহ্। আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নয়। আর কারোরই এরূপ করার ক্ষমতা নেই। তিনিই এ সব করেন, করেন খুবই উত্তমভাবে, পরিমিত পরিমাণে। তাঁর এই ব্যবস্থাপনা যেমন নিখুঁত, তেমনি সুষ্ঠু। তাই কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে তিনি যদি মানবতার উপর তাঁর তুলনাহীন অনুগ্রহের অবদান হিসেবে এগুলোর উল্লেখ করে থাকেন, তাহলে তা বিস্ময়ের কিছু নয়। যেমন তিনি বলেছেনঃ

أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ- إِنَّا لَمُغْرَمُونَ- بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ-

তোমরা কি কখনও ভেবে দেখেছো, তোমরা যে বীজ বপন কর তা দিয়ে তোমরাই কি ফসল ফলাও কিংবা এ সবের ফসল ফলানোকারী আমরা? আমরা চাইলে এ ফসলগুলোকে কৃষি বানিয়ে দিতে পারতাম। আর তোমরা নানা কথা বলার মধ্যে ব্যস্ত থাকতে যে, আমাদের উপর তো উল্টা চাবুক পড়েছে। বরং আমাদের ভাগ্যই মন্দ হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেনঃ

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ- وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرٰزِقِينَ- وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ

الاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ الاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَسْقَيْنَا كُمُوْهُ وَمَا اَنْتُمْ لَهُ بِخٰزِنِيْنَ-

আমরা জমীনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পাহাড় গেঁড়ে দিয়েছি, তাতে সব জাতের উদ্ভিদ যথাযথভাবে মাপা-জোঁকা পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি করেছি। এবং তাতে জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়েছি তোমাদের জন্যই আর সেই অসংখ্য সৃষ্টির জন্যেও, যাদের রিযিক্দাতা তোমরা নও। কোন জিনিসই এমন নেই, যার সম্পদের স্তূপ আমার কাছে মজুদ নয়। আর যা-ই আমরা নাযিল করি, তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে নাযিল করি। ফলদায়ক বায়ু আমরাই পাঠাই, পরে পানি বর্ষণ করি। আর সেই পানি দ্বারা তোমাদের সিক্ত করি। এই সম্পদের খাজাঞ্চি তো তোমরা নও।

তিনি আর বলেছেন ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ- اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا- ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا- فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّ زَيْتُوْنًا وَّ نَخْلًا وَّحَدَائِقَ غُلْبًا وَّ فَاكِهَةً وَّاَبًّا- مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ-

মানুষ যেন তার খাদ্যের প্রতি খানিকটা দৃষ্টি দেয়। আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি, এদিকে মাটিকে বিস্ময়করভাবে দীর্ণ করেছি। অতঃপর তাতে উৎপাদিত করেছি শস্য, আঙুর, তরি-তরকারী, জয়তুন, খেজুর ঘন-সন্নিবেশিত বাগিচা, আর রকম-বেরকমের ফল ও উদ্ভিদ খাদ্য—তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের গবাদিপশুর জন্যে জীবিকার সামগ্রীরূপে। বলেছেন ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ- وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ- لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ-

আর মৃত জমীন তাদের জন্যে নিদর্শন। আমরাই তা জীবন্ত করেছি এবং তাতে উদ্ভূত করেছি দানা, শস্য। তা থেকেই তারা খায়। তাতে আমরা বানিয়েছি খেজুরের বাগিচা। এবং তার বুকে ঝর্ণধারা প্রবাহিত করেছি যেন তারা তার ফল খেতে পারে—আর যা তাদের হস্ত প্রস্তুত করে। ... তোমরা কি শোকর করবে না?

হ্যাঁ এটাই প্রশ্ন, তোমরা কি শোকর করবে না এ সব নিয়ামত ও অনুগ্রহের, যা আল্লাহ্ দয়া করে সৃষ্টি করেছেন? এ শোকরের প্রথম প্রকাশ ঘটবে যাকাত আদায়ের

মাধ্যমে। সে যাকাত দিতে হবে জমির ফসল থেকে। তা হবে মহান আল্লাহ্‌র কিছুটা হক আদায়ের একটা কাজ। সেই সাথে তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া-সহানুভূতিও প্রদর্শিত হবে, তাঁর দ্বীনের সাহায্য কাজে অংশ গ্রহণও হবে। ইসলামী ফিকাহ-এ এই যাকাতকে 'ওশর' নামে অভিহিত করা হয়েছে অথবা 'ফল ও ফসলের যাকাত'ও বলা যায়।

এ যাকাত অন্যান্য—গবাদিপশু, নগদ সম্পদ ও ব্যবসা-পণ্য ইত্যাদি মালের যাকাত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ হিসেবেও আলাদা যে, এতে এক বছর পূর্ণভাবে অতিবাহিত হওয়ার কোন শর্ত নেই। বরং শুধু, তা অর্জিত হলেই এ যাকাত দিতে হয়। কেননা তা জমির প্রবৃদ্ধি, জমির ফসল উৎপাদন। অতএব যেখানেই প্রবৃদ্ধি পাওয়া যাবে—তাই হবে যাকাত ফরয হওয়ার কারণ, আধুনিক পরিভাষায় উৎপাদন—জমির ফসল 'উৎপাদন কর'।

অন্যান্য ধন-মালের যাকাত দিতে হয় আসল মূলধন থেকে। তা প্রবৃদ্ধি লাভ করুক, কি না-ই করুক।

এ পর্যায়ের যাবতীয় নিয়ম-বিধান আমরা নিম্নোক্ত আলোচনাসমূহে, সবিস্তারে উপস্থাপিত করব ঃ

প্রথম আলোচনা ঃ ফল ও ফসলের উপর যাকাত ফরয হওয়ার দলীল

দ্বিতীয় আলোচনা ঃ কৃষি উৎপাদন—যার উপর যাকাত ফরয হয়,

তৃতীয় আলোচনা ঃ নিসাবের হিসাব ও তৎসংক্রান্ত কথা,

চতুর্থ আলোচনা ঃ যাকাত পরিমাণ এবং তার তারতম্য,

পঞ্চম আলোচনা ঃ মিথ্যা কথনের মাধ্যমে ফরয পরিমাণ নির্ধারণ ও তৎসংশ্লিষ্ট কথা,

ষষ্ঠ আলোচনা ঃ ফল ও ফসল মালিকের জন্যে কি ছেড়ে দেয়া হবে,

সপ্তম আলোচনা ঃ ঋণ পরিশোধে ব্যয়ভার বহন এবং অবশিষ্টের যাকাত দান,

অষ্টম আলোচনা ঃ ভাড়ায় লওয়া জমির যাকাত,

নবম আলোচনা ঃ ওশর ও খারাজ একত্রীকরণ।

প্রথম আলোচনা

ফল ও ফসলে যাকাত ফরয হওয়ার দলীল

প্রথম. কুরআন মজীদ ঃ

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ لْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে এবং যা তোমাদের জন্যে জমি থেকে উৎপাদন করাই তা থেকে ব্যয় কর। আর ব্যয় করতে গিয়ে তোমরা খারাপ জিনিস দেবার ইচ্ছা করো না। কেননা তোমরা নিজেরাও তা উপেক্ষা করা ছাড়া গ্রহণ করতে প্রস্তুত হও না।

ব্যয় করার এ নির্দেশ ফরয প্রমাণ করে। এ কাজকে ঈমানের অনিবার্য দাবিরূপে আল্লাহ্ তা'আলা উপস্থাপিত করেছেন। কুরআনের বহু আয়াতেই 'ব্যয় কর' বলে যাকাত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল-জাসসাস বলেছেনঃ 'ব্যয় কর' অর্থ যাকাত দাও। পরবর্তী কথা 'তোমরা খারাপ দিতে চেয়ো না ব্যয় করতে গিয়ে' এ কথার বড় প্রমাণ। পূর্বের ও শেষের দিকের সব বিশেষজ্ঞই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَاءَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوْشَاتٍ غَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ- كُلُوْامِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَوَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ-

তিনি আল্লাহ্ই, যিনি নানা প্রকারের গুল্ম-লতা ও গাছগাছালি সমন্বিত খেজুর বাগান সৃষ্টি করেছেন, ক্ষেত-খামার বানিয়েছেন, যা থেকে নানা প্রকারের খাদ্য উৎপাদন করা হয়, জয়তুন ও আনারের গাছ তৈরী করেছেন, যার ফল দেখতে সাদৃশ্য সম্পন্ন এবং স্বাদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। ...তোমরা সকলে খাও এসবের উৎপাদন—যখন তা ধরবে এবং আল্লাহ্র হক আদয় কর যখন তার ফসল কেটে তুলবে ...

মনীষীদের অনেকেই বলেছেন, এ আয়াতে 'হক' আদায় করার যে নির্দেশ তা আসলে যাকাত দেয়ার নির্দেশ এবং তা ফরয। এ যাকাত হচ্ছে ওশর—এক দশমাংশ অথবা অর্ধ-ওশর—এক বিংশতিতম অংশ।

আবূ জাফর তাবরী আনাস ইবনে মালিক-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছে ঃ এ 'হক' অর্থ 'যাকাত'। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বহু কয়টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ফল ও ফসলের যে যাকাত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা আসলে 'ওশর' বা অর্ধ-ওশর। তাঁরই অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহ্র হক' অর্থ ফরয যাকাত, যেদিন তা মাপা হবে ও কতটা পাওয়া গেল তা নির্দিষ্টভাবে জানা যাবে—সেদিনই তা আদায় করে দিতে হবে।

জাবির ইবনে যায়দ, হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া, তায়ুস, কাতাদাহ্ ও দাহ্হাক প্রমুখ থেকে হক-এর অর্থ বর্ণিত হয়েছে যাকাত—ফরয যাকাত বা ওশর, অর্ধ-ওশর। কথা বিভিন্ন হলেও মূল্য, উদ্দেশ্য ও বক্তব্য এক ও অভিন্ন।

কুরতুবী বলেছেন; ইবনে ওহাব, ইবনুল কাসিম ও মালিক থেকে এ তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ীর কতিপয় সাথীও তাই বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদের কথাও তা-ই। অন্যান্যরা বলেছেন, 'এ একটি সাধারণ আদেশ ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা সুনির্দিষ্ট যাকাত ফরয করার পূর্বে মু'মিনদের এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে ওশর ও অর্ধ-ওশর ফরয ধার্য হওয়ার পর তা বাতিল হয়ে যায়।

ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন; এ নির্দেশকে বাতিল করে দিয়েছে ওশর অর্ধ-ওশর।

মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া ও ইবরাহীম নখ্য়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে, উপরিউক্ত আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। ওশর ও অর্ধ-ওশর দেয়ার নির্দেশ তাকে বাতিল করে দিয়েছে।

সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেছেন, এ নির্দেশ ছিল যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে। যাকাতের হুকুম নাযিল হলে তা নাকচ হয়ে যায়। হাসানও তাই বলেছেন। সুদ্দী বলেছেন, ফসল কাটার দিন কেউ উপস্থিত হলে লোকেরা তাকে খাইয়ে দিত। পরে যাকাত ফরয হয়ে তা বাতিল করে দেয়। পরে জমির ফসলের এক-দশমাংশ বা তার অর্ধেক ফরয ধার্য হয়।

ইবনে জরীরও এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে। কেননা শস্যের উপর যে যাকাত ফরয, তা ফসল কাটার দিন দিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। বরং তা দিতে হয় মাড়াই, ঝাড়-পুছ ও পরিমাপ করার পর।

ফলের যাকাতও তা শুকানোর পরই দেয়া সম্ভব। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেছেন ঃ ولاتسرفوا 'সীমালংঘন করো না'। আর এক-দশমাংশ ও তার অর্ধেক নির্দিষ্ট করে তার হক্টা যখন স্পষ্ট করে বলে দেয়া হল তখন তাড়াহুড়ার কোন কারণও থাকল না। কেননা এটা একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলরাই তা গ্রহণের অধিকারী। তাহলে মালের মালিককে 'সীমালংঘন' থেকে কি করে বিরত রাখবে? এমতাবস্থায় এটা যাকাতের বাইরে দ্বিতীয় একটা 'হক্' হয়ে যায়। অথচ ধন-মালে যাকাত ভিন্ন আর কোন হক্ নেই। অতএব এ 'হক্'টা মনসূখ মনে করতে হবে। কেননা তা ধন-মালে পূর্বের সব হক্ বাতিল করে দিয়েছে।

মুফাস্‌সিরকুল শিরোমণি ইবনে জরীর তাবারী আয়াতটিকে মন্‌সূখ বলে স্বীকার করেছেন, এটা খুবই বিস্ময়কর। কেননা তিনি কোন আয়াতের মন্‌সূখ হওয়ার কথা সাধারণভাবে স্বীকার করেন না। অন্যান্য বহু আয়াতের মন্‌সূখ হওয়ার কথা তিনি অস্বীকার করেছেন। যদিও দুটি আয়াতের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বৈপরীত্য দেখা দিলেই মন্‌সূখ হওয়ার কথা সাধারণত বলা হয়ে থাকে। কেননা তখন একসাথে দুটি আয়াত অনুযায়ী আমল করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ—'তার হক্ দাও তা কাটার দিন' এবং ওশর বা অর্ধ-ওশর দেয়া ফরয করার পর্যায়ে কথিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোন বৈপরীত্য আছে কি? না, বৈপরীত্যের পরিবর্তে বলা যাবে যে, আয়াতটি ইজ্‌মালী নির্দেশেরই বাস্তব রূপ হাদীসে বলে দেয়া হয়েছে? অস্পষ্ট কথায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে কি হাদীসে?

এ শেষোক্ত সম্ভাব্যটাই অধিকতর স্পষ্ট। শরীয়াতের দলীলসমূহের মধ্যে এ সম্পর্কটাই মেনে নেয়া বাঞ্ছনীয়। তাবারী হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ থেকে যেসব কথা উদ্ধৃত করেছেন, তা যেন আমাদের কাউকে ধোঁকায় না ফেলে এবং আমরা যেন মনে করে না বসি যে, আয়াতে যে হক্ দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ওশর ও সুপরিচিত যাকাত তাকে মন্‌সূখ করে দিয়েছে। কেননা আমরা জানি যে, শেষের দিকের ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় মন্‌সূখ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, শরীয়াতের একটি হুকুম অপর একটি শরীয়াতী দলীলের দ্বারা বাতিল বা অকেজো হয়ে যাওয়া। সাহাবী ও তাবেয়ীনের সময়ে তা ছিল না। ছিল, সাধারণ কথাকে বিশেষ অর্থে গ্রহণ, নিঃশর্ত কথাকে শর্তাধীনকরণ, অস্পষ্ট কথাকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা এবং মোটামুটি কথাকে বিস্তারিত করে বলা।

ইমাম আবূ ইসহাক শাতেবী বলেছেন, পূর্ববর্তী মনীষীদের কালাম থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, তাঁরা নিঃশর্ত কথাকে শর্তাধীন করাকে 'মন্‌সূখ হওয়া' বলতেন। সাধারণ কথাকে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দলীলের ভিত্তিতে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করাকেও তাঁরা তাই মনে করতেন। অস্পষ্ট করা এবং পরবর্তী কোন দলীলের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী কোন হুকুমকে বাতিল করা বুঝতেন। কেননা এ সবের মৌল অর্থ একটিই।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন, পূর্বকালের লোকেরা সাধারণত 'নাসেখ' ও 'মন্‌সূখ বলে কখনো বুঝতেন একটার কারণে অন্যটির হুকুম নাকচ করা। এটা শেষের দিকের লোকদের ব্যবহৃত পরিভাষা। আবার কখনো বুঝতেন, সাধারণ তাৎপর্যের পরিবর্তে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করা। কোন শব্দের অর্থ ভিন্ন বা বাইরের কোন শব্দ দ্বারা করাকেও তাই মনে করতেন।

ইবনে কাসীর উক্ত আয়াতটিকে মন্‌সূখ বলা প্রসঙ্গ তুলে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে, এই আয়াতটিকে মন্‌সূখ বলা সহজে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা এ আদেশটি তো মূলতই অবশ্য পালনীয় ছিল। পরে কথাটিকে স্পষ্ট করে বলতে গিয়ে যা দিতে হবে তার পরিমাণটা বলে দেয়া হয়েছে। আর এটা ছিল হিজরতের দ্বিতীয় বছরের ব্যাপার।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আয়াতে কথিত হকটি 'ওশর' ধার্য করার দরুন মনসূখ হয়ে গেছে—যে সব উক্তিতে এ কথাটি বলা হয়েছে, তা এ কথার বিপরীত

হয় না, যাতে বলা হয়েছে যে, আয়াতে যে হক-এর কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ওশর।

ইবনে আব্বাস, ইবনুল হানাফীয়া ও হাসান থেকে দুটি কথা বর্ণিত হয়েছে কেমন করে, তা আমরা পূর্বের আলোচনার দৃষ্টিতে বুঝতে পেরেছি। কেননা আয়াতটি তো মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল, ওশর ও অর্ধ-ওশর দ্বারা তার ব্যাখ্যা করার অর্থ এ হতে পারে যে, মক্কা শরীফে যে ইজমালী নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, হিজরতের পর যাকাতের পরিমাণ বলে দিয়ে তারই ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ বহু কয়টি আয়াতে যাকাত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তখন তাতে তার হার বা নিয়ম বলা হয়নি। বরং তা পরে বলা হয়েছে।

এই যে বলা হয়েছে যে, ফসল কাটার দিনই তার যাকাত দেয়া সম্ভব নয়, এ কথাটি কয়েকটি কৃষি ফসলের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সত্য। যেমন ধান, গম ইত্যাদি। তাবে শাক-সব্জি, ফল—আঙুর, জয়তুন, ডালিম ইত্যাদি—যার কথা আয়াতেই কৃষি ফসলের সঙ্গে বলা হয়েছে—এর যাকাত ফল পাড়ার দিনই দিয়ে দেয়া যেতে পারে।

কোন কোন মনীষীর মতে 'হক' দিয়ে দেয়ার অর্থ, তার সংকল্প গ্রহণ করা। আর সীমালংঘন করতে নিষেধ করার ব্যাপারটি যুক্ত হবে খাওয়ার আদেশের সাথে অর্থাৎ খাওয়ার ব্যাপারে যেন সীমালংঘন করা না।

দ্বিতীয়. সুন্নত

(ক) ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْكَانَ عُشْرِ يًّا اَلْعُشْرُ وَفِيْهَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِسْفُ الْعُشْرِ- (نسائى- ابوداؤد، ابن ماجه)

বৃষ্টি ও খাল-নদীর পানিতে যে জমি সিক্ত হয় অথবা যা মাটির রসে সাধারণ সিক্ত থাকে, তাতে দেয় হচ্ছে ফসলের এক-দশমাংশ। আর যাতে সেচ কাজ করতে হয়, তাতে অর্ধ-ওশর—বিশ ভাগের এক ভাগ।

(খ) হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম (স)-এর কথা, যা খাল-নদী ও মেঘের পানিতে সিক্ত হয়, তাতে ওশর ধার্য হয়েছে। আর যা সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয়, তাতে অর্ধ-ওশর।" (আহমদ, মুসলিম)

(গ) কৃষি ফসল ও ফলাদির নিসাব নির্ধারণ ও যাকাত আদায়ের জন্যে আদায়কারী প্রেরণ পর্যায়ে বহু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

তৃতীয়. ইজমা

মোটামুটি জমির যা ফসল হবে তাতে ওশর বা অর্ধ-ওশর ফরয হওয়া সম্পর্কে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ আছে বটে।

দ্বিতীয় আলোচনা

কৃষি ফসলে ফরয যাকাত

জমির উৎপাদনের—ফসল ও ফলের যাকাত কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমার—এবং যুক্তির ভিত্তিতে ফরয প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এ যাকাত কোন্ ধরনের জমি-উৎপাদনে ওশর বা অর্ধ-ওশর ফরয মনে করতে হবে? জমিতে যা-ই উৎপন্ন হয়, তার সবটাতেই কি এ ফরয হবে, না তার কোন-কোনটিতে ফরয হবে, আর কোন-কোনটিতে নয়? কোনটিতে ফরয না হলে তা কেন?

এ ক্ষেত্রে আলিমদের বিভিন্ন মত দেখা যায়—

১. হযরত ইবনে উমরের মত

আগের কালের আরও কয়েকজন মনীষীর মত—বিশেষভাবে চারটি খাদ্যশস্যে যাকাত ফরয।

ইবনে উমর, কোন কোন তাবেয়ী এবং তাঁদের পরের কিছু ফিকাহ্‌বিদ এ মত রাখেন যে, গম ও যব ভিন্ন অন্য কোন শস্যে এবং খেজুর, কিশমিশ, মনাক্কা ছাড়া অন্য কোন ফলের যাকাত দিতে হবে না।

ইমাম আহমদ থেকে এ বর্ণনাটি এসেছে মূসা ইবনে তালহা, হাসান ইবনে শিরীন, শা'বী, হাসান ইবনে সালেহ, ইবনে আবূ লায়লা, ইবনুল মুবারক ও আবূ উবাইদের মত হিসেবে। ইবরাহীম এ মত সমর্থন করেছেন।

এ কথার পক্ষের দলীল হচ্ছে ঃ

(ক) ইবনে মাজা ও দারে কুতনী আমর ইবনে শুয়াইব সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّمَا سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكٰوةَ فِيْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمَرِ وَالزَّبِيْبِ-

নবী করীম (স) আটা বা ময়দা, গম, খেজুর ও কিশমিশ-মনাক্কার উপর যাকাত ধার্য করেছেন। ইবনে মাজা ذرة শব্দটি বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন।

(খ) আবূ বুরদা থেকে আবূ মূসা ও মুআয (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) তাঁদের দুজনকে ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন লোকদের দ্বীনের শিক্ষাদানের দায়িত্ব দিয়ে। তখন তিনি তাদের আদেশ করেছিলেন 'এ চারটি ছাড়া অন্য কিছু থেকে যেন ওশর

গ্রহণ না করেন—ভুট্টা, গম, খেজুর ও কিশমিশ-মনাক্কা। কেননা এ চারটি বাদে অন্যান্য ফসল সম্পর্কে কোন শরীয়াতী দলীল নেই, কোন ইজ্‌মাও অনুষ্ঠিত হয়নি। আর অন্য কিছু প্রধান খাদ্য হওয়ার স্তরে পরিচিতও নয়। অন্য কিছুর বেশী থাকা বা বেশী ফায়দা হওয়াও প্রমাণিত নয়। অন্য কিছুকেও এ চারটির সাথে যুক্ত করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। অতএব অন্য কিছু থেকে ওশর বা অর্ধ-ওশর নেয়াও যাবে না।

২. ইমাম মালিক ও শাফেয়ীর মত

যা-ই খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত এবং সঞ্চয় করে রাখা যায়, তাতেই যাকাত ধার্য হবে। যা-ই সাধারণ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত, জমা করে রাখা যায় এবং শুকানো যায়, তা শস্য দানা বা ফল যা-ই হোক, যেমন ভুট্টা , গম, চাল, ডাল ও অনুরূপ জিনিসগুলো—এ সবের উপর যাকাত ফরয। আখরোট, বাদাম, হেজেল ফল, পেস্তা ও এ ধরনের ফল—তা জমা করে রাখা গেলেও এ সবের উপর যাকাত ধার্য হবে না। কেননা এগুলো মানুষের সাধারণ খাদ্য হিসেবে প্রচলিত নয়। অনুরূপভাবে আপেল, ডালিম, কুম্মাসরা, পীচ ফল, কুল প্রভৃতিতেও যাকাত ফরয নয়।কেননা এসবের কোনটি শুকিয়ে জমা করে রাখা হয় না বা যায় না। ডুমুর ফলে যাকাত হবে কিনা এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। মালিকী মতের এক দল বলেছেন, যাকাত হবে না। কেননা ইমাম মালিক 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'যে সুন্নাতে কোন মতভেদ নেই—যা আমি আলিমগণের কাছ থেকে জানতে পেরেছি—তা হল, সব ফলের উপরই যাকাত ফরয নয়। যেমন ডালিম, পীচ ফল ও এ ধরনের বা অন্য ধরনের কোন ফলের উপরই যাকাত ধার্য হবে না।

আবূ আমর ইবনে আবদুল বার্ বলেছেন, তীন বা আঞ্জির জাতীয় ফলকে আমি এর মধ্যে গণ্য করছি, যদিও তা শুকিয়ে জমাকরে খাদ্য হিসেবে রাখা ও ব্যবহার করা হয়নি, সে কথা জানা যায়নি। যদি তা জানা যেত নিশ্চিতভাবে, তা হলে আমি তা এর মধ্যে গণ্য করতাম না। কেননা তা খেজুর সদৃশ। আমি জানতে পেরেছি যে, আব্‌হরি ও তাঁর সঙ্গীরা এর উপর যাকাত ধার্য মনে করতেন। তাঁরা ইমাম মালিকের ফতওয়া অনুযায়ীই এ মত গ্রহণ করেছিলেন।

খারশী উল্লেখ করেছেন যে, মাত্র বিশ প্রকারের ফলের উপর যাকাত ফরয। তা হচ্ছে, মাটর-কলাই, সিম ও বরবটি, ছোট সিম, পিয়াজ, রসুন, লুপিন, মটর ডাল, গম, যব, সল্‌ত্—গমের মত এক প্রকারের শস্য, আলাস—এক ধরনের ভুট্টা—সানাবাসীদের খাদ্য, চাউল, বিন্দুদানা, জোয়ার, কিশমিশ এবং জয়তুন, সরিসা, ধনিয়া, সয়াবীন বীজ ও খেজুর প্রভৃতি। অতএব আঞ্জির, বাঁশ-বেত, ফল, মূলি-তরকারী, হলুদ, পানির উপর ভাসমান তরকারী, গোল মরিচ, জিরা ইত্যাদির যাকাত হবে না।

ইমাম কুরতুবী লিখেছেনঃ ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, খেজুর ও আঙুর ব্যতীত অপর কোন ফলের উপরই যাকাত হয় না। কেননা নবী করীম (স) কেবলমাত্র এ দুটো জিনিসের উপর যাকাত ধার্য করেছেন। আর এ দুটো হিজাজের অধিবাসীদের সাধারণ খাদ্য ছিল, তা তারা জমাও করে রাখত। বলেছেনঃ আখরোট, বাদামও জমা করে রাখা

যায়। কিন্তু তার উপর যাকাত ধার্য হয় না। কেননা তদানীন্তন আরবে তা সাধারণ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হত না; শুধু ফল হিসেবেই ব্যবহৃত হত।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, জয়তুনের উপরও যাকাত হবে না। কেননা কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা 'রুম্মান' (ডালিম)-এর সঙ্গেই জয়তুনের উল্লেখ করেছেন। আর ডালিমের উপর যে যাকাত হয় না, তা সর্বজনবিদিত। ইমাম শাফেয়ীর এ কথাটি মিসরীয়। তাঁর ইরাকীয় একটি কথাও আছে, তা হল, তাতে যাকাত হবে।

ইমাম মালিক জয়তুনে যাকাত হবে বলে মত দিয়েছেন। 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে ইবনে শিহাবকে জয়তুন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, তাতে ওশর ধার্য হবে।

এ কথা প্রমাণ করে যে, এ দুজন ইমামের মতে উপরিউক্ত আয়াতটি মনসূখ হয়নি। অথচ এঁরা দুজনই ডালিমের যাকাত না হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। যদিও তার উপর যাকাত ধার্য করা তাঁদের দুজনেরই কর্তব্য ছিল।

ইমাম শাফেয়ীর মতের দুটো দলীল পেশ করা হয়েছে। প্রথম, হযরত মুআয ইবনে জাবাল বর্ণিত হাদীস। তাতে বলা হয়েছে, ক্ষীরা, কাঁকর, তরমুজ-খরবুজ, ডালিম, ঘাস, বাঁশ, শন ও শাক-সবজির যাকাত রাসূলে করীম (স) মাফ করে দিয়েছেন। হাদীসটি বায়হাকী 'সুনানে কুব্‌রা' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। সমস্ত হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেছেন এসব হাদীস 'মুরসাল' তবে তার সূত্র বিভিন্ন। ফলে পরস্পরের সমর্থনে অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সাহাবীদের উক্তিও তার সাথে রয়েছে। সে সব উক্তি হযরত আলী, উমর ও আয়েশা (রা) থেকে উদ্ধৃত।

দ্বিতীয়, নিত্য-নৈমিত্তিক খাদ্য অধিকতর কল্যাণময়, গবাদিপশুর মতই ব্যাপার। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহতে জমির উৎপাদন ও মেঘের পানির বর্ষণসিক্ত যে কোন ফসল থেকেই যাকাত দেয়ার সাধারণ নির্দেশের মুকাবিলা করার জন্যে দলীল দুটো কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়।

৩. ইমাম আহমদের মত

ইমাম আহমদ থেকে কয়েকটি কথা বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে সর্বাধিক প্রকাশিত ও খ্যাত মতটি 'আল-মুগনী' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, যে সব জিনিসে নিম্নের গুণগুলো রয়েছে, তাতেই যাকাত দিতে হবেঃ মাপা যায়, সংরক্ষণ করা যায়, শুকিয়ে রাখা যায়। সব দানা ও ফল জাতীয় জিনিসই এর মধ্যে গণ্য—মানুষ যা সাধারণভাবে উৎপাদন করে। তা খাদ্য হতে পারে, যেমন—ভুট্টা, গম, খোসাহীন যব, ধান-চাউল, শস্য বজড়া ইত্যাদি অথবা দানা জাতীয় হতে পারে যেমন, সীম-বীজ, মসুর, কলাই, চানা অথবা জিরা, ধনিয়া প্রভৃতি মসলা জাতীয় বীজ ও বিভিন্ন প্রকারের দানার উপর যাকাত ফরয হবে। তবে সর্বপ্রকার ফলের উপর যাকাত ফরয নয়। সর্বপ্রকারের শাক-সব্‌জির উপরও নয়।

এ থেকে বোঝা গেল, ইমাম আহমদের দৃষ্টিতে জমির সর্বপ্রকারের উৎপাদনেই যাকাত ফরয নয়।

এ পর্যায়ের দলীল হচ্ছে, নবী করীম (স) সাধারণভাবেই বলেছেন, যা কিছুই বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়, তাতেই ওশর ধার্য হবে এবং হযরত মুআয (রা)-কে বলেছিলেন, সবদানা থেকেই দানা গ্রহণ কর। এই দুটি কথা সর্বপ্রকার জিনিসের উপর যাকাত ফরয করে দেয়। তবে যা খাদ্য নয় ও যা 'দানা' নয়, তা এ থেকে বাদ যাবে। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন, 'দানা' ও খেজুরে যাকাত হবে তার পরিমাণ পাঁচ অসাক্ হলে, তার কম হলে নয়। মুসলিম ও নাসায়ী গ্রন্থে এই হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। এই হাদীস প্রমাণ করেছে যে, যা ওজন করা বা মাপা যায় না, তাতে যাকাত হবে না। কিন্তু যা ওজন করা ও মাপা যাবে, তা সাধারণ নির্দেশের আওতাভুক্ত থাকবে।

৪. ইমাম আবূ হানীফার মত ঃ জমির সর্বপ্রকার উৎপাদনেই যাকাত

ইমাম আবূ হানীফা মত দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা জমি থেকে যা-ই উৎপাদন করবেন, যে জমির চাষাবাদের লক্ষ্য হবে উৎপাদন এবং জমি থেকে সাধারণভাবে যা উৎপাদন করা হয়, তাতেই ওশর বা অর্ধ-ওশর ধার্য হবে। এ কারণে কাষ্ঠ, ঘাস ও ফার্সী, বাঁশ, বেত ইত্যাদি বাদ যাবে। কেননা মানুষ সাধারণত এসব উদ্দেশ্যমূলকভাবে উৎপাদন করে না। তবে কেউ যদি কোন জমিকে ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যে এসব উৎপাদনের জন্যে নির্দিষ্ট করে, তাহলে তাতে ওশর ধার্য হবে।

তাহলে তাঁর মতে উৎপাদন খাদ্য হতে হবে এমন শর্ত নেই। শুকিয়ে রাখা ও সঞ্চয় করারও কোন শর্ত নেই যাকাত (ওশর) ফরয হওয়ার জন্যে। পরিমাণযোগ্য হতে হবে এমন কথাও নেই। খাদ্য হওয়াও শর্ত নেই।

এ কারণেই দাউদ জাহেরী ও তাঁর সঙ্গীরা বলেছেন, জমি যা-ই উৎপাদন করবে, তাতেই যাকাত ফরয হবে। তাঁরা এ থেকে কোন কিছুই বাদ দিতে প্রস্তুত নন। নখয়ীও এ মত প্রকাশ করেছেন। উমর ইবনে আবদুল আযীয, মুজাহিদ ও হাম্মাদ ইবনে আবূ সালমানও এ মতই পোষণ করতেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ভিন্নমত পোষণ করতেন। তাঁদের মতে স্থায়ী ফল নেই—যেমন ঘাস, শাক-সব্জি, ওষধি ইত্যাদি পর্যায়ের দ্রব্যাদি—তার যাকাত দিতে হবে না।

ইমাম আবূ হানীফার মতে আখ, জাফরান, তুলা, উলশীর চারা—যা দিয়ে কাপড় বোনা হয় ও তৎসদৃশ জিনিসের উপর ধার্য হবে। যদিও তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ ও পরিমাপ করা হয় না।

তাঁর মতে সর্বপ্রকারের ফলেরও ওশর দিতে হবে। তা শুকিয়ে রাখা হোক আর না-ই হোক। সর্বপ্রকার ঘাস ও শাক-সব্জির উপরও তিনি যাকাত ধার্য করেছেন।

এ মতের পক্ষে দলীল

প্রথম, যা-ই আমরা জমি থেকে তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেছি—কুরআনের এই সাধারণ কথা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, জমির সর্বপ্রকার উৎপাদনের উপরই ওশর ধার্য হবে। আয়াতে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, 'এবং দাও তার হক তা কাটার দিন'—কুরআনের এই নির্দেশটি কয়েক প্রকারের খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখের পর উল্লিখিত হয়েছে। তাতেও ঘাস ও শাক-সব্জি সবই শামিল রয়েছে। তা কাটা বা তোলার দিনই তার উপর ধার্য হক আদায় করা সম্ভব। অতএব সেদিনই এ যাকাত দিয়ে দিতে হবে। তবে দানা ও শস্য জাতীয় ফসল থেকে যাকাত দেয়া সম্ভব তা পরিচ্ছন্ন করার দিন।

তৃতীয়, নবী করীম (স) বলেছেন, 'আকাশের পানি যা-ই সিক্ত করে তাতে ওশর এবং যা সেচ কার্যের দ্বারা সিক্ত হয় তাতে অর্ধ-ওশর ধার্য হবে।'—এই কথাও ফসলের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি।

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয, মুজাহিদ, দাউদ, নখয়ী প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদের মত অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফার উপরিউক্ত মতটিই অন্যান্য সব মতের তুলনায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। আর তা হচ্ছে, জমি যা-ই উৎপাদন করবে, তাতেই ওশর বা অর্ধ-ওশর ধার্য হবে। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সাধারণ দলীলের সমর্থনে তা অধিক শক্তিশালী মত। যাকাত বিধিবদ্ধ করার মূলে নিহিত উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতার দৃষ্টিতে তা-ই অধিক সংগতিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য মত। কেননা জমিতে এক ধরনের উৎপাদনকারীদের উপর ওশর ধার্য করা এবং অন্য ধরনের ফসল উৎপাদনকারীদের তা থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার কোন যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না। কেবলমাত্র খাদ্য হিসেবে গ্রহণীয় জিনিসের উপর যাকাত ধার্যকরণ সংক্রান্ত হাদীসসমূহের কোনটিই ত্রুটিমুক্ত নয়। তার সনদ বিচ্ছিন্ন, ধারাবাহিকতা ও অবিচ্ছিন্নতা নেই, না হয় কোন কোন বর্ণনাকারী যয়ীফ। কিংবা যে হাদীস রাসূলে করীম (স)-এর উক্তি হিসেবে বর্ণিত, কিন্তু আসলে তা কোন সাহাবীর উক্তি। আর তার কোনটিকে সহীহ ধরে নিলেও বিশেষজ্ঞগণ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বলে যে, তখন এ চারটি ছাড়া আর কোন জিনিস ছিল না বলেই সে সবের উল্লেখ করা হয় নি। অথবা এ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধকরণটা প্রকৃত নয়; আপেক্ষিক। এ কারণে অনুসৃত কোন মাযহাবই সে হাদীসের ভিত্তিতে মত গ্রহণ করেনি।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আল্লামা রশীদ রেজা মিসরী এ সীমাবদ্ধ যাকাত ক্ষেত্রকেই সমর্থন করেছেন। তবে তিনি এ চারটি দ্রব্যের উপর কিয়াস করে ধান বা চালকেও এর মধ্যে শামিল করেছেন। অথচ যে দলীলের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী সম্পদের উপর যাকাত ফরয ধরা হয়, সে দলীলের ভিত্তিতেই কৃষি সম্পদেও যাকাত হবে। বিশেষ করে এজন্যে যে, জমি থেকে ফল ও ফসল উৎপাদনের আল্লাহ্‌র যে নিয়ামত রয়েছে তা অন্য যে

কোন মালের তুলনায় অধিক প্রকাশমান। এ কারণে মক্কী পর্যায় থেকে ফসল কাটার দিনই তার হক দিয়ে দেয়ার নির্দেশ কার্যকর হয়েছে, যদিও তার নিসাব ও পরিমাণ মদীনায় যাওয়ার পর প্রকাশ করা হয়েছে।

মালিকী মাযহাবের ফকীহ্ ইবনুল আরাবী ইমাম আবূ হানীফার মতকেই সমর্থন দিয়েছেন 'আল-আহ্কামুল কুরআন' গ্রন্থে। আর তিরমিযীর ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন ঃ এ পর্যায়ে দলীলের দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী এবং মিসকীনদের কল্যাণে অধিক কার্যকর হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফার মত। আর নিয়ামতের শোকর আদায় অধিক সম্ভব এ মত অনুযায়ী কাজ করলে। কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকেও তা-ই অধিক অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

তিনি 'তার হক্ দিয়ে দাও তা কাটার দিন'—এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ হানীফার সমর্থনে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং তাতে অন্যান্য সব মতের প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন ঃ ইমাম আবূ হানীফা উক্ত আয়াতটিকে দর্পনস্বরূপ গ্রহণ করেছেন এবং তাতে তিনি প্রকৃত সত্য দেখতে পেয়েছেন। ফলে তিনি সর্বপ্রকারের ফল ও ফসলের উপর যাকাত ফরয মনে করেছেন। নবী করীম (স)-ও এ কথাই বলেছেন।

ইমাম আহমদ হাদীসের ভিত্তিতে যে মত গ্রহণ করেছেন, তা যয়ীফ। কেননা বাহ্যত সে হাদীসের দাবি হচ্ছে, ফল ও দানা উভয়ের ক্ষেত্রেই নিসাব জরুরী। তাছাড়া অন্যান্য সব জিনিসের উপর যাকাত ধার্য না করা কোন শক্তিশালী কথা নয়। এ পর্যায়ে ইমাম শাফেয়ীর মত একটি দাবি মাত্র। তার কোন ভিত্তি নেই, তাৎপর্যও নেই। কেননা তাৎপর্য হতে পারে যদি শরীয়াতের হুকুম তার মৌলনীতির উপর ভিত্তিশীল হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, খাদ্য ও ফল-ফাঁক্ড়ায় আল্লাহ্র নিয়ামতের উল্লেখ করা হবে ও সে জন্যে তার সবটাতেই 'হক' ধার্য করা হবে, তার অবস্থা বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও—যেমন আঙ্গুরের ছড়া-মালা ও খেজুর কাঁদি, যাতে তার বিভিন্ন 'প্রজাতি' রয়েছে—যেমন কৃষি ফসল ও খাদ্যের সহকারী উপকরণাদি—যার দ্বারা নিয়ামত পূর্ণত্ব লাভ করে—এসব সর্বদিক দিয়ে এক ও অভিন্ন নয়। যদি বলা হয়, যাকাত ফরয সে সব খাদ্যশস্যের উপর, যা স্থায়ী থাকে, কিন্তু শাক-সব্জি ও তরি-তরকারীর কোন স্থায়িত্ব নেই। এ কারণে খাদ্যের শাক-সব্জি অংশের যাকাত গ্রহণ না করে যা শুকিয়ে রাখা হয় তা থেকেই গ্রহণ করা উচিত। আমরা জবাবে বলব, প্রত্যেক প্রকারের চূড়ান্ত মাত্রা থেকেই যাকাত গ্রহণ করা হবে। আর শুষ্কতাই তার চূড়ান্ত মাত্রা। সুগন্ধি, হরিৎবর্ণ তার চূড়ান্ত। এ কারণে কাঁচা ফল যদি প্রবৃদ্ধি না পায়, আর আঙুর যদি কিশমিশ-মনাক্কা না হয়, তাহলে এ দুটির এই অবস্থায়ই যাকাত গ্রহণ করতে হবে, যদিও কাঁচা ফলের স্বাদ তেমন হয় না। তা পূর্ণ মাত্রার নিয়ামতও হয় না, যা দিয়ে জান্নাতে আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ-

তাতে ফল রয়েছে, খেজুর ও ডালিমও।

এখানে খেজুর মৌল খাদ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ডালিমের উল্লেখ হয়েছে শ্যামল তাজা জিনিসরূপে। কিন্তু লক্ষণীয়, সাধারণভাবে এ সব কিছুকে মানুষের ও গবাদিপশুর জন্যে দেয়া নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

انَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا- ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا- فَاَ نْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلاً وَّحَدَائِقَ غُلْبًا وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا-

আমরা পানি বর্ষণ করেছি, মাটি দীর্ণ করেছি, পরে তাতে উৎপাদন করেছি দানা, আঙুর, বড় বড় গাছ, জয়তুন ও খেজুর, ঘন-সন্নিবেশিত বাগান, ফল ও তৃণলতা।

ইবনুল আরাবী অতঃপর লিখেছেন, নবী করীম (স) মদীনা ও খায়বরের লোকদের কাছ থেকে শাক-সব্জি ইত্যাদির যাকাত নিয়েছেন, এমন কথা বর্ণিত হয়নি কেন?

আমরা বলব, তা বর্ণিত হয়নি বলেই যে তা গ্রহণ করা হত না, এমন কথা তো বলা যায় না।

যদি বলা হয়, নেয়া হলে তো বর্ণিত হতই।

আমরা বলব, বর্ণনা করার প্রয়োজন এজন্যেও নেই যে, খোদ কুরআন মজীদই সেজন্যে যথেষ্ট। তাতেই তার উল্লেখ রয়েছে।

নবী করীম (স)-এর কথা হিসেবে বর্ণিত 'শাক-সব্জিতে যাকাত নেই সনদের দিক দিয়ে খুবই দুর্বল হাদীস। তাই তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন-হাদীসের সাধারণ ও ব্যাপক ঘোষণাবলীকে সীমিত ও সংকীর্ণ করা তো দূরের কথা। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে লিখেছেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ্ নয়। আসলে এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে কোন কথাই সহীহ্ভাবে বর্ণিত হয়নি।

হাদীসটিকে সহীহ্ মেনে নিলে হানাফীদের মতে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে তাতে এমন যাকাত ধার্য নয় যা আদায়কারী কর্মচারীদের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। বরং মালিকরা নিজেরাই তা দিয়ে দেবে। কেননা শাক-সব্জির স্থিতি নেই বলে তার যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের পর্যন্ত পৌছার আগেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ কারণে কোন কোন ফিকাহবিদ মনে করেন, শাকসব্জির মূল্য থেকে যাকাত গ্রহণ করা উচিত। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ গম, যব, খোসাহীন যব, জয়তুন ইত্যাদির মূল্য থেকে যাকাত গ্রহণ কর্তব্য মনে হয়।

আতা খুরাসানী থেকে বর্ণিত, শাক-সবজি, আখরোট ও সর্বপ্রকারের ফলের উপর ওশর ধার্য হবে। তার কোন অংশ বিক্রয় করা হলেও তার মূল্য বাবদ একশ' দিরহাম বা তদূর্ধ্ব হয়ে গেলে তাতে যাকাত দিতে হবে। শা'বী থেকেও তা-ই বর্ণিত।

আবূ উবাইদ এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ মায়মুন ইবনে মাহ্রান জুহ্রী ও আওযায়ীও এ মত পোষণ করেন। তবে জুহরী মনে করেন, এই যাকাতটা নগদ

সম্পদ—স্বর্ণ-রৌপ্যের-যাকাতের ন্যায় হবে। মায়মুন বলেছেন, এসব যখন বিক্রয় করা হবে, তখনই যাকাত ধার্য হবে যদি তার মূল্য দুইশ' দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছায়। তখন তা থেকে পাঁচ দিরহাম যাকাত বাবদ দিতে হবে।

খেজুর যদি কাঁচা হয়, তা থেকে শুষ্ক খেজুর না হয় কিংবা আঙুর থেকে যদি কিশমিশ না হয়, তা বিক্রয় করা হলে এবং পাঁচ অসাকের মূল্য পাওয়া গেলে প্রতি দুইশ'তে পাঁচ দিরহাম যাকাত বাবদ দিতে হবে। যে জয়তুন থেকে তৈল হয় না তার যাকাতও অনুরূপভাবে দিতে হবে।

বস্তুত উপরিউক্ত ফিকাহ্‌বিদ ইমামগণ শাক-সবজি ও ফল-ফাঁকড়ায়—যা বায়তুলমালে সংরক্ষণ করা যায় না, খুব দ্রুত পাকে ও নষ্ট হয়ে যায়, তার মূল্যের উপর যাকাত ধার্য করে ভালোই করেছেন। তবে ফরয পরিমাণের ক্ষেত্রে আমার ভিন্ন মত আছে। আমার মতে তাতে নগদ সম্পদের যাকাতের ন্যায় এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ ধার্য হওয়া উচিত নয়, বরং এক-দশমাংশ বা তার অর্ধেক ধার্য হওয়া উচিত। কেননা জমির আসল উৎপাদন থেকে তো এই যাকাত দেয়া হচ্ছে না, তার মূল্য থেকে দেয়া হচ্ছে। তাই তার হুকুমটা গ্রহণ করা হলে তার পরিমাণটারও গ্রহণ করতে হবে। কেননা দুই বিকল্প জিনিসের হুকুম একই হওয়া উচিত।

যে সব বর্ণনায় এ সবের উপর যাকাত ধার্য হওয়ার কথা আছে, কিন্তু তার পরিমাণ নির্ধারিত হয়নি তা থেকে এ কথাই বোঝা যাচ্ছে, যে লোক তার আঙুর কাদি আঙুরের মূল্যে বিক্রয় করে, সে তার মূল্য থেকে ওশর বা অর্ধ-ওশর দেবে। ইমাম শা'বী এ মতই দিয়েছেন।

ইবনে আবূ যায়দ বলেছেন, জয়তুনের যাকাত দিতে হবে; যদি তার দানাগুলোর পরিমাণ পাঁচ অসাক হয়ে যায়। তার তৈল থেকেই তা দিতে হবে। আর বিক্রয় করা হলে তার মূল্য থেকে দিতে হবে।

ইমাম মালিক থেকেও এ মত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ মূল্যের এক-দশমাংশ দিতে হবে। বলা হয়েছে, যে জয়তুন থেকে তৈল লওয়া হয়, সেই তৈল থেকেই যাকাত দিতে হবে। আর যাতে তৈল হয় না, তার মূল্য থেকে দিতে হবে।

তৃতীয় আলোচনা

কৃষি ফসল ও ফল-ফাঁকড়ার যাকাত

নিসাবের হিসাব

সাহাবী, তাবেয়ীন ও সব আলিম মত প্রকাশ করেছেন যে, পাঁচ অসাক পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত কৃষি ফসল ও ফল-ফাঁকড়ার যাকাত ধার্য হয় না। তাঁদের দলীল রাসূলে করীমের কথাঃ

'পাঁচ অসাকের কম পরিমাণের উপর কোন যাকাত হয় না—' এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত।

ইমাম আবূ হানীফার মত হল, পরিমাণ কম হোক বেশী হোক, সবটাতেই যাকাত ধার্য হবে। কেননা রাসূলের কথাই সাধারণ অর্থবোধক ঃ বৃষ্টিতে সিক্ত সব জমির ফসলেই ওশর হবে। এ-ও একটি সহীহ্ হাদীস এবং বুখারী শরীফে উদ্ধৃত। ইমাম আবূ হানীফা এজন্যে বছর অতীত হওয়ার কোন শর্ত করেন নি, তাই তার কোন নিসাবও নেই।

ইবরাহীম নখয়ী ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম থেকে বর্ণিত, জমির ফসল কম বা বেশী হোক, ওশর বা অর্ধ-ওশর দিতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস বসরায় পিঁয়াজ-রসূনের মত জিনিস থেকেও যাকাত আদায় করতেন।

ইবনে হাজম, মুজাহিদ, হাম্মাদ, উমর ইবনে আবদুল আযীয এ ইবরাহীম নখয়ী থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, জমি যা কিছু উৎপাদন করে তাতেই যাকাত ফরয হবে, তার পরিমাণ কম হোক বা বেশী।

দাঊদ জাহেরী বলেছেন, যা পাত্র দিয়ে মাপা হয়, তার পরিমাণ পাঁচ অসাক না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত হবে না। তুলা, জাফরান ও সব শাক-সব্জিতে—পরিমাণ যা-ই হোক ধার্য হবে।

আসলে এ মতে দুটি হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্ট করা হয়েছে। তার একটি হাদীসে সাধারণভাবে সব উৎপন্ন দ্রব্যের উপর যাকাত ফরয, আর অপরটিতে পাঁচ অসাকের কমে যাকাত না হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বাকের ও নাসের থেকে একটা ভিন্নমত বর্ণিত হয়েছে। তা হল শুষ্ক খেজুর ও কিশমিশ, গম ও যবে নিসাব ধার্য হবে। কেননা এটাই সাধারণ অভ্যাস। অতএব সেদিকেই ফিরতে হবে।

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার দান

ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব মুতাবিক জমির সর্বপ্রকারের উৎপাদনের উপর যাকাত ফরয হওয়ার মতকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। কিন্তু তার নিসাব নির্ধারণ না করা ও ফল ফসলের কম বা বেশী—সর্ব পরিমাণের উপর যাকাত ধার্যকরণে আমরা তাঁর বিপরীত মত পোষণ করি। কেননা এই কথাটি সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। কেননা সহীহ হাদীসে পাঁচ অসাকের কম পরিমাণে যাকাত ধার্য না করার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যাকাত তো কেবলমাত্র ধনী লোকদের উপরই ধার্য করা হয়েছে। সাধারণভাবে এটাই শরীয়াতের বিধান। আর নিসাব হচ্ছে ধনীর সম্পদের নিম্নতম মাত্রা। এ কারণে যাকাত ফরয হয়েছে—এমন সব মালেরই একটা নিসাব নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে।

যদি দাবি করা হয় যে, উপরিউক্ত দুটি হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে, পাঁচ অসাকের কমে যাকাত নেই এবং আকাশের পানিতে যা-ই সিক্ত হয় তাতেই ওশর ধার্য হবে—এ দুটি কথার প্রথমটি বিশেষ এবং দ্বিতীয়টি সাধারণ পর্যায়ে—প্রথমটি দ্বিতীয়টির বিপরীত—আর দুটি দলীলের পারস্পরিক বৈপরীত্য দেখা দিলে যেটি অধিকতর সতর্কতা বিধায়ক অর্থাৎ সর্বপ্রকারের জমির উৎপাদনের উপর যাকাত ধার্যকরণকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে—এরূপ বলা বাঞ্ছনীয় নয়; বরং বলতে হবে সেই কথা, যা ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম এ পর্যায়ে বলেছেন। তা হচ্ছেঃ

দুটি হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে। একটিকে অপরটির বিপরীত মনে করা অনুচিত। কোন একটিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চলাও সম্ভবপর নয়। কেননা দুটিই রাসূলের কথা এবং দুটি বিধান পালন করেই রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। তা-ই ফরয। আসলে দুটির মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই। তার কয়েকটি কারণ স্পষ্ট। কেননা আকাশের পানি যা-ই সিক্ত করে তাতেই ওশর—কথাটি দ্বারা কোন্ জমির ফসলে ওশর ধার্য হবে এবং কোন্‌টিতে অর্ধ-ওশর তার মধ্যকার পার্থক্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যাকাত পরিমাণের পার্থক্য নির্দেশ পর্যায়ে দুই প্রকারের জমি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নিসাবের পরিমাণটা কি হবে সে বিষয়ে এই হাদীসে কিছু বলা হয়নি। তা বলা হয়েছে অপর হাদীসে। তাহলে অকাট্য, সুস্পষ্ট, সহীহ্ দলীল এড়িয়ে যাওয়া কি করে জায়েয হতে পারে? তার পরিবর্তে কি করে সেই অস্পষ্ট ও অপার্থক্য নির্দেশক কথা গ্রহণ করা যেতে পারে?

ইবনে কুদামাহ্ বলেছেন, পাঁচ অসাকের কম পরিমাণে যাকাত নেই—নবী করীম(স)-এর এ হাদীসটি বুখারী মুসলিমে উদ্ধৃত, সর্বসমর্থিত। এ একটা বিশেষ নির্দেশক কথা। এটিকে সাধারণ অর্থবোধক নির্দেশের উপর অগ্রাধিকার দেয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন 'প্রতিটি উন্মুক্তভাবে পালিত উটের যাকাত দিতে হবে—এই সাধারণ কথার উপর 'তিন থেকে দশ বছর বয়সের উটের পাঁচটির কমে কোন যাকাত নেই—এই হাদীসটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আর প্রতি নগদ সম্পদেই এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ

যাকাত—এই কথাটির উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে 'পাঁচ আউকিয়ার কম পরিমাণে যাকাত নেই' এই কথাটিকে। কেননা এ পরিমাণ সম্পদের উপরই যাকাত ফরয হতে পারে, তার কমের উপর নয়। সর্বপ্রকার যাকাতযোগ্য মালেরই এ নিয়ম।

আর এক বছরকাল অতীত হওয়ার শর্ত নেই এ জন্যে এই ফসল কাটা হলেই তার প্রবৃদ্ধিটা পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর হয়, তাকে রেখে দিলে নয়। আর অন্যান্য সম্পদে এক বছরকাল অতীত হওয়ার শর্ত এ জন্যে যে, এ সব মাল-সম্পদে প্রবৃদ্ধি পূর্ণত্ব পায় এ সময়ের মধ্যে আর নিসাব নির্ধারণ করা হয় এ জন্যে যে, সম্পদের একটা এমন পরিমাণ সঞ্চিত হওয়া আবশ্যক, যা দান করার জন্যে তার মালিক সমর্থ হবে। উপরন্তু যাকাত তো কেবল ধনী লোকদের উপর ধার্য হতে পারে। আর নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকানা না হলে কাউকেই ধনী বলা যায় না।

শস্য ও ফলের নিসাব

শস্য ও ফলের নিসাব ধার্য করা হয়েছে পাঁচ অসাক। এ পর্যায়ে সহীহ্ হাদীসসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ একমত হয়ে বলেছেন ঃ ষাট ছা'তে এক অসাক হয় অর্থাৎ পাঁচ অসাকে হয় তিনশ' ছা'। হাদীসেও বলা হয়েছে, 'এক অসাকে ষাট ছা' হয়। কিন্তু এই হাদীসটি যয়ীফ, এ কারণে ইজমা'র উপরই নির্ভর করতে হবে।

ছা'র পরিমাণ

ফসল ও ফলাদির নিসাব নিশ্চিতরূপে জানবার জন্যে ছা'র পরিচিতি প্রয়োজন। কেননা তার পরিমাণ করা হয়েছে 'অসাক' দ্বারা আর অসাকের পরিমাণ করা হয়েছে ছা'র দ্বারা। রোযার ফিত্‌রার পরিমাণও এই ছা'র দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাহলে ছা'র পরিমাণটা কি?

'লিসানুল আরব' অভিধান গ্রন্থের বক্তব্য অনুযায়ী ছা' তদানীন্তন মদীনাবাসীদের একটা পরিমাপ, যা চার 'মদ' পরিমাণ হয়। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) এক ছা' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং এক 'মদ' পানি দিয়ে ওযু করতেন। আর নবী করীম (স)-এর ছা তখনকার সমাজে প্রচলিত চার 'মদ' দ্বারা পরিমাপ করা হত।

'মদ'-ও একটা বিশেষ মাপ। মধ্যম মানের ব্যক্তির পূর্ণ দুই অঞ্জরী ভরা পরিমাণ। 'কামুস' গ্রন্থকার বলেছেন, পরীক্ষায় এই কথাটি সহীহ্ পাওয়া গেছে।

নবী করীম (স) উম্মতকে তদানীন্তন মদীনায় প্রচলিত ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থাকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন দিরহাম ও মিশকাল মক্কায় প্রচলিত পরিমাপ ব্যবস্থা। হযরত ইবনে উমর বর্ণিত হাদীস হল 'পাত্র ছাড়া মাপ বা 'কায়ল' চলবে মদীনাবাসীদের এবং দাড়িপাল্লার ওজন চলবে মক্কাবাসীদের।

এরূপ পার্থক্যকরণের একটা যৌক্তিকতা রয়েছে। তদানীন্তন মদীনাবাসীরা ছিল কৃষিজীবী, ফল ও ফসল উৎপাদক। এ জন্যে তারা পাত্রের মাপ চালু করেছিল। এ

মাপটাই ছিল তাদের কাছে অধিক যথার্থ ও সংরক্ষিত। আর মক্কাবাসীরা ছিল ব্যবসায়ী। এ কারণে তারা দাঁড়িপাল্লার ওজনের মুখাপেক্ষী ছিল। যেমন দিরহাম ও দীনার। এটার দ্বারাই তারা সঠিক হিসাব করতে পারত।

ছা'র ব্যাপারে হিজাজ ও ইরাকের মধ্যকার পার্থক্য

নবী করীম (স) মদীনায় প্রচলিত পরিমাপ ব্যবস্থাকে মানদণ্ড (measure) রূপে ঘোষণা করেছেন এবং সেটিকেই অনুসরণ করতে বলেছেন। অতএব স্বভাবতই আশা ছিল দুনিয়ার মুসলমান মদীনায় প্রচলিত ছা'র পরিমাপে সম্পূর্ণ একমত হবেন কিন্তু এ ব্যাপারে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সমর্থকগণ ইরাকের অধিবাসী—এর পরিমাপ 'আট রতল' করছেন। এ 'রতল' হচ্ছে বাগদাদী। আর হিজাজবাসীরা ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখ—এর পরিমাপ করেন পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ 'রতল' দিয়ে।

ইরাকী ফিকাহ্‌বিদদের দলীল

ইরাকী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেন, আমাদের পরিমাপটা হযরত উমর (রা) ব্যবহৃত ছা'র অনুরূপ। কেননা তাতে আট রতল হত, এ কথা প্রমাণিত। আর এ কথাও প্রমাণিত যে, নবী করীম (স) এক 'মদ' পরিমাণ পানি দিয়ে ওযু করতেন ও এক ছা' পানি দিয়ে গোসল করতেন। আর অপর হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি আট 'রতল' পানি দিয়ে গোসল করতেন। আর একটি হাদীসের কথা, তিনি দুই রতল পানি দিয়ে ওযু করতেন।

হিজাজীদের দলীল

হিজাজীদের দলীল হচ্ছে, পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ 'রতলই হল মদীনায় প্রচলিত এক ছা'। আর তা রাসূলে করীম (স) থেকেই পরম্পরানুযায়ী চালু হয়ে এসেছে। আর হাদীস অনুযায়ী পাত্র দিয়ে মাপার মাদানী নিয়মই অনুসরণ করতে হবে।

ইবনে হাজম বলেছেন, এ ব্যাপারটা মদীনায় সর্বজনবিদিত। সার্বিকভাবে বর্ণিত এবং ছোট বড় সকলেরই জানা, যেমন মক্কাবাসীরা সাফা ও মারওয়া সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। মদীনাবাসীদের ছা' ও 'মদ' সম্পর্কে আপত্তি করার অর্থ মক্কাবাসীদের উপর সাফা-মারওয়ার অবস্থিতি সম্পর্কে আপত্তি করা। এ দুটির মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

তিনি আরও লিখেছেন, এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ সঠিক কথা জানবার জন্যে মদীনায় উপস্থিত হয়েছিলেন ও সেখানকার প্রচলিত 'মদ' -এর পরিমাণ জেনে নিয়ে এই পর্যায়ে সত্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। তিনি নিজেই এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

> আমি মদীনায় উপস্থিত হয়ে ছা' সম্পর্কে জানতে চাইলাম। মদীনাবাসীরা বললো, আমাদের এই ছা'ই রাসূলে করীম (স)-এর ব্যবহৃত ছা'। আমি জিজ্ঞেস করলাম,

তার প্রমাণ কি? বললে, প্রমাণ আগামীকাল পেশ করা হবে। পরের দিন প্রায় পঞ্চাশজন বৃদ্ধ বয়সের লোক উপস্থিত হলেন। তাঁরা ছিলেন আনসার ও মুহাজিরদের অধঃস্তন। তাঁদের প্রত্যেকেরই হাতে একটি করে ছা' পাত্র, চাদরের তলে রক্ষিত। প্রত্যেকেই তাদের পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্যের উল্লেখ করে বললেন, রাসূলে করীম (স)-ই এই ছা' ব্যবহার করেছেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম পাত্রগুলো সমমানের। অনুমান করলাম তা পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ 'রতল' পরিমাণের হবে, খুব সামান্য কমতিসহ। আমার কাছে ব্যাপারটি খুব শক্ত ও অনস্বীকার্য হয়ে উঠল। অতঃপর আমি ছা'র ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফার কথা ত্যাগ করলাম ও মদীনাবাসীদের কথা গ্রহণ করলাম।'[১]

এই কাহিনীর বর্ণনাকারী হুসাইন বলেছেন, আমি এ নিয়ে আরও অনেকের সাথে আলোচনা করেছি। ইমাম মালিক ইবনে আনাসের কাছেও জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বললেন, এ ছা'ই রাসূলে করীম (স) কর্তৃক ব্যবহৃত। জিজ্ঞেস করলাম, এটা কয় রতলের হবে? বললেন, এটা তো ওজন করা হয় না।

ইমাম মালিকের পর তৃতীয় শতকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, আমি ছা' ওজন করেছি, তা পাঁচ ও দুই-তৃতীয়াংশ রতল পরিমাণের হয়। তিনি বলেছেন, আবূ নযর থেকে আমি ছা' গ্রহণ করেছি। আবূ নযর বলেছেন, আমি আবূ যি'ব থেকে তা গ্রহণ করেছি। তিনি বলেছেন, এটাই রাসূলে করীম (স)-এর ছা' যা তখনকার মদীনায় প্রচলিত ছিল। আমরা তা ওজন করে দেখেছি, তা পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল পরিমাণের হয়। আমার কাছে এটাই রাসূলের ছা' বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দুটো কথার সমন্বয়ের কোন পথ আছে কি

ক. কোন কোন হানাফী বলেছেন, ইমাম আবূ ইউসুফ ছা' নির্ধারণ করতে গিয়ে তাকে পাঁচ ও দুই-তৃতীয়াংশ রতল (মদীনার রেওয়াজ মত) পরিমাণের পেয়েছেন। আর এ পরিমাণটা বাগদাদী রতল অনুযায়ী আট রতল সমান হয়। ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আবূ ইউসুফের সাথে দ্বিমত করেন নি। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হিজাজী ও ইরাকী উভয়ের কাছে ছা' তো এক ও অভিন্ন; কিন্তু 'রতল' বিভিন্ন। কিন্তু এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইমাম আবূ ইউসুফ নিজেই তাঁর 'কিতাবুল খারাজ'-এ লিখেছেন ঃ নবী করীম (স)-এর ছা' অনুযায়ী 'এক অসাক হয় ষাট ছা'তে, আর ছা' হচ্ছে পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল।' এ যে বাগদাদী রতল, তাতে সন্দেহ নেই। কেননা উক্ত গ্রন্থখানি খলীফা হারুন-অর-রশীদের নির্দেশক্রমে লিখিত হয়েছিল। ইমাম আবূ ইউসুফ রাজধানী বাগদাদেই অবস্থান করতেন। এমতাবস্থায় তিনি বাগদাদে ছা'র পরিমাণ মাদানী 'রতল' হিসেবে কি করে নির্ধারণ করতে পারেন?

খ. হিজাজীদের ও ইরাকীদের এ দুটো পরিমাণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা বলেছেন, আসলে এখানেই দুই ধরনের ছা' প্রচলিত ছিল। একটি

১. السنن الكبرى لبيهقى

ছিল খাদ্য ও শস্য ইত্যাদি পরিমাপ করার জন্যে আর অপরটি ছিল পানি পরিমাপের জন্যে। খাদ্য পরিমাপের ছা' পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল পরিমাণ হত। আর পানি পরিমাপের জন্যে ছা' ছিল আট রতলের। এ দুটো বিষয়েই সাহাবীদের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। অতএব যাকাত, কাফ্ফারা ও সদ্‌কায়ে ফিতর-এর জন্যে সেই ছা' গণ্য হবে, যা গোসলের পানি পরিমাপের ছা'র দুই-তৃতীয়াংশ। ইমাম আহমদের সাথীদের একাংশেরও এই মত।

এ মত অনুযায়ী সব রতল এক পরিমাণেরই হয়, কিন্তু দুই ছা' ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে দাঁড়ায়।

গ. এই শতকে আলী পাশা মুবারক ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে ছা' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, শরীয়াতসম্মত ছা' হচ্ছে পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ 'রতল'। নবী করীম (স)-এর হাদীস ও হিজাজী ফিকাহ্‌বিদগণ এই মতেরই প্রবক্তা। পূর্ববর্তী মত-পার্থক্যের কারণ দর্শানো প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, এই পার্থক্য শুধু বাহ্যিক, প্রকৃত নয়। তিনি বলেছেন ঃ

> ইরাকী আলিম ও আরব আলিমদের মধ্যকার মতপার্থক্য এভাবে সৃষ্ট হয়েছে যে, ইরাকী আলিমগণ 'মদ' বা ছা'র পাত্রে রক্ষিত পানির পরিমাণটাকে ধরেন। আর অন্যরা ধরেন এই পাত্রদ্বয়ে ধরতে পারে এমন পরিমাণ শস্যদানা।'

পরে তিনি বলেছেন, এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে জানা যায় যে, পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ 'রতল' সমান হয় ততটা পরিমাণ শস্যের। আর আট 'রতল' সমান হয় ততটা পরিমাণ গোসলের পানির। 'আট' একটি নৈকট্যমূলক সংখ্যা। কেননা অনেকে বলেছেন, ছা' আট 'রতলে'র কম সাত রতলের বেশী—এটাই ঠিক কথা। এভাবে যদি হিসাব করা হয় যে, শস্যের ওজন ও পানির ওজনের মধ্যে ৩ ঃ ৪-এর হার রয়েছে, তাহলে দেখা যাবে পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ 'রতল' গম সমান হবে সাত রতলের বেশী কিংবা আট রতলের কম পানির। তার অর্থ, রতল আসলে অভিন্ন। উভয়ের কাছে ছা'ও এক। পার্থক্য আসলে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে মাত্র।

ইরাকবাসীরা—হানাফী মাযহাব পন্থীরা—ছা'তে যতটা পানি ধরে, সেটা গণ্য করেছেন। আর অন্যরা গণ্য করেছেন যতটা শস্য ধরানো যায়—তা।

কিন্তু মতপার্থক্য শুধু এতটুক হয়ে থাকলে ইমাম মালিক কেন ভয়ানকভাবে ক্রুদ্ধ হবেন এবং ইমাম আবূ ইউসূফই বা কেন তাঁর নিজস্ব মত পরিহার করে তাঁর উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা ও সাথী ইমাম মুহাম্মাদের বিরোধিতা করবেন?

ফলশ্রুতি

এক্ষণে একথা সুস্পষ্ট যে, হিজাজী ফিকাহবিদদের মতটাই সহীহ্ এবং অধিক শক্তিশালী দলীল-প্রমাণে সমৃদ্ধ। আর তা হল, পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতলে এক ছা' হয়।

মনীষী রীস যেমন বলেছেন, সত্যি কথা এই যে, এই পরিমাণটার পক্ষে অকাট্য দলীল-প্রমাণ দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর এ ব্যাপারে আর কোন সংশয় থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বহু মনীষী মুজতাহিদই এই মতটির সমর্থক রয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দলীল হচ্ছে ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত সংবাদ। তিনি নবী যুগের অবশিষ্ট মদীনার অধিবাসীদের ব্যবহৃত দুটো ছা'র পরিমাণ তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। খলীফা হারুন-উর-রশীদের সম্মুখে তাঁর বিচারপতি আবূ ইউসুফের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এই ঘটনা ঘটেছিল। এই বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষণের পর ইমাম আবূ ইউসুফ তা মেনে নিয়েছিলেন এবং নিজের মত পরিহার করে ইমাম মালিক ও মদীনাবাসীদের মত স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

আমরা বলব, মদীনায় প্রচলিত নিয়মাদি সম্পর্কে ইমাম মালিকের তুলনায় অধিক আর কে জানতে পারে? এবং ফকীহ মুজতাহিদ ইমাম আবূ ইউসুফের সাক্ষ্যের অপেক্ষা বড় সাক্ষ্য আর কার হতে পারে?

বস্তুত ছা'র এই পরিমাণ নির্ধারণ অন্যান্য সব এককের সাথে সম্পূর্ণ একাকার। এটাই যুক্তিসংগত বটে; দ্রব্যসমূহের প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ। কিন্তু অপর নির্ধারণ মেনে নিলে বিরাট পার্থক্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। যৌক্তিকতার সীমাও তাতে লংঘিত হয়।

সে যা-ই হোক, 'মুদ' -এর পরিমাণও জানা গেছে—মাঝামাঝি ধরনের এক ব্যক্তির পূর্ণ দুই অঞ্জলি পরিমাণ (Double handfull)। এ প্রেক্ষিতে ধারণা হয় যে, এক ও দুই-তৃতীয়াংশ 'রতল'-এর প্রথম পরিমাণ ছাড়িয়ে যাবে না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে এই রকমেরই চার বার।

আধুনিক মানে শস্য ও ফলের নিসাব

এটা যখন প্রমাণিত যে, ছা ও 'মুদ' বাগদাদী রতল হিসেবে পরিমাপ করতে হবে তখন অন্য যে কোন মান দ্বারা তার পরিমাণ নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। যেমন মিসরীয় 'রতল' বা দিরহাম কিংবা কিলোগ্রাম অথবা লিটার। কেননা এই সবের মধ্যকার ওজনের হার সুনির্দিষ্ট।

ছা'র পরিমাণ যখন জানলাম, তখন অসাক-এর পরিমাণটাও জানা গেল। এই অসাকেরই পাঁচটি হল শস্য ও ফলের নিসাব।

ইবনে কুদামাহ যেমন লিখেছেন, পাত্র পরিমাপের (كيل) দ্বারাই নিসাব নির্ধারিত হবে। কেননা অসাক তো পাত্র দ্বারা পরিমাপ পর্যায়ের জিনিস। তাকে ওজনে রূপান্তরিত করা হয়েছে সুসংবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ ও অনুসরণের জন্যে। এ কারণে যাকাত ধার্য করা হয় পাত্র পরিমাপ অনুযায়ী, পাল্লার ওজন হিসেবে নয়। আর পাত্র মাপ-ওজন হিসেবে বিভিন্ন হয়ে থাকে। অনেক জিনিস খুব ভারী যেমন যব, ডাল ও মসুর। আর কতক জিনিস হালকা—যেমন বার্লি ও ক্ষুদ্র দানা। কতক আছে মধ্যম। ইমাম আহমদ দৃঢ়তা সহকারে নির্ধারণ করেছেন যে, এক ছা' পীচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল পরিমাণের গম।

কোন কোন মনীষী বলেছেন, হাদীসবিদগণ একমত হয়ে বলেছেন, নবী করীম (স)-এর গৃহীত 'মুদ' পরিমাণ ছিল মধ্যম মানের এক ও এক-তৃতীয়াংশ রতল গম। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা ভারী জিনিস দিয়েই ছা'র পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। আর হালকা জিনিস হলে যাকাত ফরয হবে যদি এ পরিমাণের কাছাকাছি হয়, পূর্ণটা না হলেও। আর এ দৃষ্টিতেই তা মধ্যম মানের গমের ওজনের পরিমাণ নির্ধারণের ভিত্তি হতে পারে।

আর যেহেতু বাগদাদী রতল ও মিসরীয় রতলের মধ্যকার পার্থক্য হার হচ্ছে ৯ ঃ ১০,—যেমন আলী মোবারক সিদ্ধান্ত করেছেন; কেননা মিসরীয় হিসেবে এক ছা—

$৪, ৮ = \frac{৯}{১০} \times ৫\frac{১}{৩}$ = গম

এ সংখ্যাটি গমের ওজন হিসেবে ২১৭৬ কিলোগ্রামের সমান। আর এ পরিমাণটা সমাহ হচ্ছে ২.৭৫ লিটার পানির। সাম্প্রতিক কালের হিসেবে মিসরীয় 'আরদব' = ১২৮ লিটার (পানি)। আর তা ৯৬টি পানি পানের পাত্র পরিমাণ।

তাই হিসেব কার্যের ফলে আমরা দেখতে পাই, একটি ছা' = $১\frac{১}{৩}$ পান পাত্র অর্থাৎ ত(১,৬) মিসরীয় পরিমাপ।

আর এক্ষণে প্রচলিত মিসরীর মাপ = ৬ আছা' (اصع) এবং আদব = ৭২ ছা'। অসাক্ = ৬ ছা ১০ $\frac{৫০}{৬}$ --- মিসরীয় মাপের সমান। আর পাঁচ অসাক—শরীয়াতী নিসাব= ৫০ =১০ × ৫ মিসরীয় মাপ সমান অর্থাৎ তার চার 'আরদব ও এক 'আয়বা' এক আরদবের $\frac{১}{৬}$ (২২ কিংবা ২৪ মুদ-এর একটা মাপ)।

একাদশ হিজরীর মধ্যকালের মালিকীপন্থী আলিম শায়খ আলী আঝুরীও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। মিসরীয় পরিমাপ অনুযায়ী নিসাব নির্ধারণ পর্যায়ে তিনি এই কথাই জানতে পেরেছেন। তিনি ১০৪২ হিজরী সনে মিসরীয় পরিমাপে নিসাব নির্ধারণ করতে গিয়ে চার আরদব ও এক 'অয়বা' ঠিক করেছেন। তা এ জন্যে যে, 'মুদ' হচ্ছে মধ্যম ধরনের দুইখানি না-খোলা না-বন্ধ পূর্ণ অঞ্জলি পরিমাণ। বলেছেন, মিসরীয় পানি পানপাত্র এই দুই পূর্ণ অঞ্জলিতে তিনবার ধরলে যা হয়, তা। আর একথাও জানা গেছে যে, তিনশ ছা'ই নিসাব। আর এক ছা' চার 'মুদ'। তাহলে মিসরীয় 'পানি পানপাত্র' (قدح) কাদহ্ অনুযায়ী ৪০০ পাত্র সমান। আর তা হচ্ছে চার আরদব ও এক অয়বা।

আর ওজনে মিসরীয় রতল = ১৪৪০ = ৪.৮× ৩০০ রতল গমের সমান।

কিলোগ্রামের হিসাবে ৬৫২,৮ = ২১৭৬ × ৩০০ গম ও প্রায় = ৬৫৩ কিলোগ্রাম সমান।

পাত্র দিয়ে মাপা হয় এমন জিনিসের নিসাব

পাত্র দিয়ে মাপা হয় এমন জিনিসের নিসাব পূর্ণ হলে বলে যা কিছু বলা হয়েছে, তা সে সব কৃষি ফসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা পাত্র দিয়ে মাপা হয় এবং যা যা পাত্র দিয়ে

মাপা হয় না—যেমন তুলা, জাফরান ইত্যাদি—তার নিসাব নির্ধারণে মনীষীদের মতবিরোধ রয়েছে।

ক. ইমামা আবূ ইউসুফ বলেন, তাতে মূল্যের হিসাব করা হবে। তুলা ইত্যাদির মূল্য যদি পাঁচ অসাকের সমপরিমাণ শস্যের মূল্যের নিকটবর্তী হয়, তাহলে তাতে যাকাত দিতে হবে। কেননা অসাক'-ই হল যাকাত হিসাবের ভিত্তি, হাদীসেও তা-ই বলা হয়েছে।

এ কারণে তুলার যাকাতের মূল্য যদি পঞ্চাশ মাপের গমের মূল্য দাঁড়ায় তাহলে তার যাকাত দিতে হবে। কেননা খাদ্যশস্যের মধ্যে গমের মূল্য তুলনামূলকভাবে সস্তা—বিশেষ করে মিসরে।

খ. ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন, সেই জিনিসটি যা দিয়ে মাপা হয় তার উচ্চতার পাচঁ গুণ নিসাব ধরতে হবে। কেননা পাত্র দিয়ে মাপার জিনিসের অসাক দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে এজন্যে যে, এপর্যায়ে তা-ই হচ্ছে উচ্চতর মাপ।

এক্ষণে তুলা যদি এ যুগে 'কিন্তার' মিসরীয় প্রায় ১১২ রতল বা ৪৪.৯৩ কিলোগ্রাম মাপা হয়, তাহলে পাচঁ 'কিন্তার' হবে তার নিসাব। কেননা দেশ, অঞ্চল ও বাজারের পার্থক্যের কারণে উচ্চতর পরিমাণ ধরা খুবই কঠিন। এর ফলে বড়ই বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

গ. যা পাত্র দিয়ে মাপা হয় না, এমন জিনিসের নিসাব কারো-কারো মতে দুই'শ দিরহাম নির্ধারণ করতে হবে। আর তাই হচ্ছে নগদ অর্থের নিসাব। সে জিনিসের নিজের জন্যে কোন নিসাব নির্ধারিত না হওয়ার কারণে অন্য জিনিসের নিসাবই সে জন্যে নির্দিষ্ট করতে হবে।

ঘ. দাউদ বলেছেন, যা পাত্র দিয়ে পরিমাপ করা হয় না, তার পরিমাণ কম বেশী যা-ই হোক, তার উপরই যাকাত ধার্য হবে।

ঙ. ইমাম আহমদের মতে যা পাত্র দিয়ে মাপা হয় না, তা ওজনে মাপতে হবে। এ কারণে জাফরান, তুলা ও তার মত অন্যান্য জিনিসকে এক হাজার সাতশত রতল দিয়ে তার ওজন ঠিক করতে হবে। কেননা তা পাত্র দিয় মাপা হয় না বলে তার ওজনটাই পাত্র মানের স্থলাভিষিক্ত হবে। যেহেতু শরীয়াত তার যে নিসাব পেশ করেছে তার পরিমাণ ওজন দিয়ে যাকাত দিতে হবে। আর তা হচ্ছে ৬৫৩ কিলোগ্রাম।

ইবনে কুদামাহ্ বলেছেন, এ সব কথার মূলে এমন কোন দলীল আছে বলে জানা নেই, যার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। এসব কথাকে রদ করে দেয় রাসূলে করীম (স)-এর বাণী ঃ 'পাচঁ অসাকের কমের উপর কোন যাকাত নেই ; আর কম বা বেশী যা-ই পরিমাণ হোক, তার উপর যাকাত ধার্যকরণ যাকাতে সর্ব প্রকার মালেরই বিরোধী।

যে সব জিনিসে ওশর ধার্য হয়, তার বিরোধী কাজ হচ্ছে অন্য জিনিসের নিসাব কোন জিনিসের ব্যাপারে নির্ধারণ করা। আর যার উপর যাকাত হয়, তার কম পরিমাণের

উপর যাকাত ধার্যকরণের কোন নজীর ইসলামী শরীয়াতে নেই। আর অস্থায়ী জিনিসের ভিত্তিতে কিয়াস করাও ঠিক নয়। কেননা অস্থায়ী জিনিসের মূল্যের উপর কোন যাকাত ধার্য হয় না, ধরা হয় তার মূল্যের উপর, আর সেই ধরা মূল্যের হিসাবে যাকাত দিতে হবে।

এ তো সেই মালের কথা যার যাকাত সেই মাল থেকেই নেয়া হবে। তাই সেই জিনিস দ্বারাই নিসাব ঠিক করতে হবে—যেমন শস্যের ক্ষেত্রে করা হয়। আর যেহেতু তা জমির উৎপাদন, তাই তাতে ওশর বা অর্ধ-ওশর ধার্য হবে। উপরে যাদের মত উদ্ধৃত হয়েছে, সে মতের উপর কোন ইজমা হয়নি। তাদের মত সেই অর্থেও নয়; তাই তা বলা উচিত নয়। কেননা তার কোন দলীল নেই।

আমাদের গৃহীত মত

আমাদের গৃহীত মত হচ্ছে, যা পাত্র দিয়ে মাপা বা ওজন করা হয় না তাতে মূল্যের হিসাবে নিসাব ঠিক করতে হবে। কিন্তু তা যাকাত দেয়ার মাল হতে হবে, যদিও তার নিসাব শরীয়াতে বলে দেয়া হয়নি। তাই তা অন্য জিনিস দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। আর অন্য জিনিস দ্বারা তার নিসাব নির্ধারণ যখন একান্তই অপরিহার্য, তখন যা অসাক হিসেবে ওজন করা যায় তার মূল্যকে গণ্য করতে হবে। কেননা তার দলীল রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফও এ মত দিয়েছেন। কিন্তু গম বা চাল ইত্যাদি, যা ওজন করা হয়, তার নিকটবর্তী মূল্য হিসাব করতে বলেছেন। আমি এক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফের মতের বিরোধিতা করছি। তাই এতে যদিও গরীব-মিসকীনের ভাগে বেশী পড়বে, কিন্তু সেই সাথে মালের মালিকদের প্রতি অবিচার হবে।

এ কারণে আমি মনে করি, প্রচলিত ধরনের পাত্র দিয়ে মাপার জিনিসগুলো যা ওজন করা যায় তার গড় পরিমাণ ধরতে হবে কমও নয় বেশীও নয়। তাতে ধনী ও গরীব উভয়ের স্বার্থই রক্ষিত হবে।

যা অসাক হিসেবে ওজন করা হয় তার গড় বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে বিভিন্ন হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক অবস্থার দরুনও তা হয়। কাজেই তার নিসাব নির্ধারণের দায়িত্ব প্রত্যেক দেশের শরীয়াতবিদদের উপর অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়। কোন দেশে হবে গম, কোন দেশে হবে চাল। এভাবে জাফরান, নার্গিস প্রভৃতি অধিক মূল্যবান জিনিসের নিসাব নির্ধারণ সম্ভব হবে। এগুলো জমিতে সাধারণত উৎপাদন করা হয় না, যেমন হয় চাল ও গম। তাই আমাদের দেশের গম বা চাল ইত্যাদি শস্যের গড় হিসেবে ৬৫৩ কিলোগ্রাম মূল্য ধরতে হবে। তুলা, আখ ইত্যাদিতেও এ নীতি গ্রহণ করতে হবে।

নিসাব কখন হিসাব করা হবে

ফল শুকিয়ে যাওয়ার পর তার নিসাবের হিসাব করতে হবে অর্থাৎ কাঁচা খেজুর শুকিয়ে গেলে, আঙুর কিশমিশ হলে, আর কৃষি ফসলের খোসা পরিষ্কার করার পর।

ইমাম গাযালী বলেছেন, যখন কিশমিশ বা শুকনো খেজুর হবে, তখনই তার অসাক ওজন করা হবে। আর শস্যের ক্ষেত্রে ছাল বা খোসা পরিষ্কার করার পর। তবে যা খোসাসহ পেষা ও গুড়ি বানানো হয় ; আর যা কাচাঁ রাখা হয়, শুকনো হয় না, তার কথা আলাদা। যা খোসা না ছাড়িয়েই জমা রাখা হয়, তার খোসা দূর করতে মালিকদের বাধ্য করা ঠিক হবে না। তাতে তাদের ক্ষতি হওয়ার আশংকা।

কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ খোসা দূর করা জিনিসের দ্বিগুণকে নিসাব ধরেছেন। যেন খোসা দূর করার পর মূল্যের নিসাব যথার্থ হয়। তবে প্রত্যেক ধরনের শস্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে সে বিষয়ে জেনে নেয়া ভাল। কেননা প্রত্যেক ধরনের কৃষি ফসলের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন।

চতুর্থ আলোচনা

যাকাতের পরিমাণ ও তার পার্থক্য

ওশর ও অর্ধ-ওশর

বুখারী হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْكَانَ عَشَرِيًا الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ-

আকাশের পানিতে ও খাল-ঝর্ণার পানিতে যে জমি সিক্ত হয়, কিংবা জমি যদি গর্তসমন্বিত নিচু হয়. তাহলে তার ফসলের এক-দশমাংশ দিতে হবে। আর যে জমিতে সেচকার্য করতে হয়, তার ফসলের অর্ধেক ওশর—বিশ ভাগের একভাগ দিতে হবে।

মুসলিম শরীফে হযরত জাবির থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'যে জমি খাল-ঝর্ণা বা মেঘের পানিতে সিক্ত হয়, তাতে ওশর ধার্য হবে। আর যাতে কৃত্রিমভাবে সেচ করতে হয়, তাতে অর্ধ-ওশর দিতে হবে।'

ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম হযরত আনাস থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ যে জমিকে আকাশ সিক্ত করে তাতে নবী করীম (স) ওশর ধার্য করেছেন। আর যে জমি কৃত্রিমভাবে সিক্ত করতে হয়, তাতে অর্ধ-ওশর।

ইবনে মাজা হযরত মুআয থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেনঃ 'রাসূলে করীম (স) আমাকে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। আমাকে মেঘের পানিতে সিক্ত কিংবা যে জমি স্বতঃই সিক্ত, তা থেকে ওশর গ্রহণ করতে এবং যা কৃত্রিমভাবে সিক্ত করা হয় তা থেকে অর্ধ-ওশর গ্রহণ করতে এবং যা কৃত্রিমভাবে সিক্ত করা হয় তা থেকে অর্ধ ওশর গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন।'

'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'মোটকথা, যে জমিই কোনরূপ কৃত্রিম উপায়ে ও পন্থায় সিক্ত হয়, তার ফসলে অর্ধ-ওশর ধার্য হবে। আর যে জমি কোনরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছাড়াই সিক্ত হয়, তাতে ওশর ধার্য হবে। হাদীসে এ কথাই বলা হয়েছে। কেননা স্বতন্ত্রভাবে দেয়া শ্রমের যাকাত ধার্যকরণে একটা মোটামুটি প্রভাব রয়েছে, যেমন গবাদিপশুকে ঘাস কেটে এনে খাওয়ানো হলে তার যাকাত হয় না। তাই এ ক্ষেত্রে

যাকাতের পরিমাণ হ্রাসকরণের সে প্রভাব অবশ্যই কার্যকর হবে। তা ছাড়া যাকাত তো শুধু ক্রমবর্ধমান সম্পদে ফরয হয়ে থাকে। আর কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমানতা হ্রাসকরণে একটা বিশেষ প্রভাব রাখে। এই কারণে ফরয পরিমাণে এই ক্রিয়াটা অবশ্যই কার্যকর হবে।

পানি ক্রয় করে সেচ করা হলে তাও এই কৃত্রিম সেচ বলে গণ্য হবে। বছরের একাংশে যে জমির সেচ করতে হয় ও বাকি সময় করতে হয় না।

ক. যে জমির অর্ধেক বছর কৃত্রিম সেচ করতে হয়, আর বাকি অর্ধ বছর সেচ কার্য করার প্রয়োজন হয় না, তার ফসল থেকে ওশরের এক-চতুর্থাংশ দিতে হবে। ইবনে কুদামাহ্ বলেছেন, 'এই ব্যাপারে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমরা জানি না। কেননা যদি জমির উভয় খণ্ডের সারা বছরের অবস্থা একই প্রকারের হত, তাহলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। যখন অর্ধ বছর এই অবস্থা থাকে, তখন সেই অর্ধ বছরের জন্যে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ. যদি দুটি খণ্ডের এক খণ্ডে অন্য খণ্ডের তুলনায় অধিক সেচ করা হয়, তাহলে এই অধিক সেচের অংশের ব্যবস্থাই গণ্য করা হবে। অপর অংশের অবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। আতা, সওরী, আবূ হানীফা এবং ইমাম শাফেয়ীর একটি কথা এই মতের সমর্থনে রয়েছে।

গ. পরিমাণ জানা না গেলে ওশর ধার্য করায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা ওশর ফরয করাটা মৌলিক ব্যাপার। কেবলমাত্র কষ্ট থাকলেই তা প্রত্যাহার করা যেতে পারে। তাই যেখানে প্রত্যাহারকারী কিছু নেই, সেখানে মূল বিধান কার্যকর হবে। যেহেতু জমি চাষে প্রায়শই কষ্ট না থাকার কথা—সেটাই আসল অবস্থা। কেবল সন্দেহের কারণে তার অস্তিত্ব আছে বলে মনে করা যাবে।

সেচ প্রয়োজন না হলেও কষ্টের সম্ভাব্যতা

যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃত্রিমভাবে সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন কারণে অনেক সময় কষ্টের মাত্রা অধিক হয়ে পড়তে পারে। যেমন পানি প্রবাহের জন্যে খাল ও নালা-ড্রেন কাটা বা গর্ত খোদার প্রয়োজন হতে পারে। এই বাবদ যে কষ্ট ও ব্যয় হবে তা কি যাকাত ধার্যকরণে গণ্য হবে?

এই পর্যায়ে 'আল-মুগ্নী' গ্রন্থকার মত দিয়েছে, খাল ও গর্ত খোদায় যে কষ্ট বা অর্থ ব্যয় হয়, তা যাকাতের হার কমকরণে কোন প্রভাব রাখবে না। তার কারণ হচ্ছে, জমি আবাদকরণ সংক্রান্ত কাজের সাথে এগুলো জড়িত এবং তা প্রতি বছরে বারবার করার প্রয়োজন হয় না।

রাফেয়ী-ও এই মত সমর্থন করেছেন। তিনি কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেছেন, খাল-ড্রেন কাটা বা গর্ত খোদার কষ্টটা জমি আবাদকরণ পর্যায়ে অবশই বহন করতে

হবে। যখন তা হয়ে যাবে এবং অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই পানি পৌঁছতে থাকবে, তখন তাতে ওশর ধার্য হওয়া শুরু হবে। পক্ষান্তরে বলদ দ্বারা চাকা ঘুরিয়ে পানি তোলার ব্যবস্থা করা হলে ভিন্ন কথা হবে।

ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, 'কৃষি ফসলের জন্যে যদি খাল-ড্রেন কাটতে হয়, তাহলে তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। যদি প্রথম খোদাইর কষ্টের অধিক কষ্ট তাতে না লাগে—কোন কোন সময় যদি তা পুন ঃ খনন বা পরিষ্কার-করণের প্রয়োজন হয়, তাহলে তার উপর ওশর ধার্যকরণে খাল ও জমির উপর পানি প্রবাহিত করণের পথই হবে তার পথ। যদিও তাতে কষ্ট বেশী হবে—তাতে বেশী পানি প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে বারবার হয়ত বা করতে হতে পারে এবং তখন নতুন করে খোদাইর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তখন তার পথ হবে সেই সব কূপের পানির পথ যেখান থেকে জন্তুর সাহায্যে পানি টেনে নেয়া হয়।

পঞ্চম আলোচনা

অনুমানের ভিত্তিতে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ

খেজুর ও আঙুর ফলের যাকাত ও ফরয পরিমাণ নির্ধারণে ওজন বা পাত্র দিয়ে পরিমাপ করা ছাড়া শুধু অনুমানের সাহায্য গ্রহণের একটা রীতি নবী করীম (স) চালু করেছেন। তখন এটা অনুমানমূলক ব্যাপার হবে এবং একজন অভিজ্ঞ, আমানতদার, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি এ কাজটা করবে। তা এভাবে হবে যে, ফল যখন পাকতে শুরু করবে তখন অনুমানকারী গাছের কাঁচা খেজুর ও আঙুর দেখে পরিমাণ নির্ধারণ করবে। পরে তা পরিপক্ক ও কিশমিশ হওয়ার পর কি পরিমাণ হতে পারে, তার অনুমান করবে। তখনই যাকাতের পরিমাণটা জানা যাবে। পরে পূর্ণ পরিপক্কতা লাভের পর পূর্বের অনুমান অনুযায়ী যাকাত (ওশর বা অর্ধ-ওশর) তা থেকে নিয়ে নেয়া হবে।

অনুমান করার নীতির একটা ফায়দা হল মালের মালিক ও প্রাপক গরীব মিস্‌কীন উভয় পক্ষের কল্যাণ সাধন। যেহেতু অনুমানটা হয়ে যাওয়ার পর মালিক তার খেজুর-আঙুর নিয়ে যা করার ইচ্ছা হবে করতে পারবে। কেননা ওশর বাবদ যা ধার্য হবার তা তো পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ওদিকে যাকাত আদায়ের দায়িত্বশীল—প্রাপকদের প্রতিনিধি—তার প্রাপ্য পরিমাণটাও জেনে নিতে পেরেছে, সে তা যথাসময়ে আদায় করে নিতে পারবে।

খাত্তাবী বলেছেন, অনুমানের ফায়দা ও তাৎপর্য হচ্ছে, গরীব-মিস্‌কীনরা উৎপন্ন ফসলে মালিকদের সাথে অংশীদার। মালের মালিক যদি তাদের অধিকার দিতে অস্বীকার করে, তার ভোগের সুযোগ না দেয়, ওদিকে ফসলও পূর্ণ পরিপক্কতা বা শুষ্কতা পেয়ে যায়, তাহলে তাতে প্রাপকদের ক্ষতি হবে। মালিকদের হস্ত তার মধ্যে প্রসারিত হলে গরীবদের অংশে ক্ষতি সূচিত হতে পারে। কেননা সব মানুষ বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার দিক দিয়ে সমান নাও হতে পারে। এ কারণে শরীয়াত এ অনুমানের পথ অবলম্বন করেছে। যেন মালের মালিকও তা থেকে ফায়দা পেতে পারে এবং মিসকীনদের হকটাও সুনিশ্চিত থাকে। এ অনুমানের কাজটা করতে হবে ফসল পাকা শুরু হতেই, তা খাওয়া ও ব্যবহার শুরু করার পূর্বে, যেন ওশরের পরিমাণটা নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ ও সংরক্ষণ করা যায় এবং সেই অনুযায়ী পূর্ণ পরিপক্কতার পর তা বের করে নেয়া যায়।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ও সহল ইবনে আবূ হাস্‌মা, মারওয়ান, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, হাসান, আতা, জুহরী, আমর ইবনে দীনার এবং ইমাম মালিক, শাফেয়ী,

আহমদ, আবূ উবাইদ ও আবূ সওর এবং আরও বহু বিশেষজ্ঞ থেকেই এ অনুমান করার রীতি বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। কেননা তাঁর মতে অনুমান হচ্ছে গায়েবের উপর ঢিল মারা বা নিরুদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করা। আর শরীয়াতে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তই বাধ্যতামূলক হয় না। এ কারণে তিনি 'কুরয়া' (lot)-কে অগ্রাহ্য করেছেন। জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ তাঁদের মতের ভিত্তি স্থাপন করেছেন নিম্নোদ্ধৃত হাদীসসমূহের উপর ঃ

১. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) লোকদের বাগানে আঙুর ও অন্যান্য ফলাদির পরিমাণ অনুমান করার জন্যে দায়িত্বশীল লোক পাঠাতেন।

২. এই সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবেরই অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী করীম (স) আঙুরের পরিমাণ নির্ধারণের আদেশ দিয়েছেন, যেমন খেজুরের পরিমাণ অনুমান করা হয় এবং তার কিশমিশ হওয়াকালে যাকাত গ্রহণেরও নির্দেশ দিয়েছে, যেমন খেজুর পেকে শুষ্ক হওয়া কালের যাকাত গ্রহণ করা হয়।

৩. নবী করীম (স) নিজে এ কাজ করেছেন। তিনি তাবুক যুদ্ধের বছর ওয়াদিউল-কুরাস্থ একজন মেয়েলোকের বাগানের ফলের পরিমাণ আন্দাজ করেছেন এবং সে অনুমানে দশ অসাক্ পরিমাণ ধরা হয়েছিল। পরে স্ত্রীলোকটিকে বললেন, এ বাগানে কতটা ফল থাকতে পারে তা আমি নিজে অনুমান করেছি। পরে সে নিজে অনুমান করেও ঠিক সেই পরিমাণটাই স্থির করে।

৪. আবূ দাউদ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেন (খায়বরের অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন তিনি) নবী করীম (স) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে ইয়াহুদীদের কাছে পাঠাতেন। তিন খেজুর পরিপক্ক হওয়াকালীন পরিমাণ অনুমান করতেন তা থেকে কিছু খাওয়ার পূর্বেই।

৫. সহল ইবনে আবূ হাস্‌মা থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা যদি অনুমানের ভিত্তিতে যাকাত গ্রহণ কর, তাহলে অনুমিত পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে নিও। আর যদি এক-তৃতীয়াংশ বাদ দেয়া সমীচীন মনে না কর, তাহলে অন্তত এক-চতুর্থাংশ অবশ্যই বাদ দেবে।

ইমাম খাত্তাবী লিখেছেন, এই হাদীস অনুমান করা ও তদনুযায়ী কাজ করার বৈধতা প্রমাণ করে। আর তা-ই সর্বসাধারণ আলিমেরও মত। তবে শা'বী বলেছেন, অনুমান করা বিদ'আত। ইরাকী ফিকাহবিদগণও তা অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, অনুমানের রীতিটা চালু হয়েছিল ফসল উৎপাদনকারীদের ভীত করার জন্যে যেন শেষে তারা বিশ্বাসঘাতকতা না করে। কিন্তু তার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন হতে পারে না। কেননা তা একটা ধারণা-অনুমানই মাত্র। তাতে ধোঁকার আশংকা খুব বেশী। সূদ ও জুয়া হারাম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা জায়েয ছিল। তারপর তা জায়েয থাকেনি।

এ কথার জবাবে ইমাম খাত্তাবী লিখেছেন, অনুমান করার কাজ প্রমাণিত সূদ, জুয়া ইত্যাদি হারাম হওয়ার পূর্বে। তারপরও নবী করীম (স) সারা জীবন ধরে এ অনুমানের কাজটি করেছেন। তাঁর অন্তর্ধানের পরে হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-ও এ কাজ করেছেন। সাধারণভাবে সাহাবিগণ এ কাজকে জায়েয বলেছেন। কেউ ভিন্নমত পোষণ করতেন বলে কোন বর্ণনাই পাওয়া যায় নি।

এটাকে নিছক আন্দাজ-অনুমান বলে উড়িয়ে দেয়াও কিন্তু ঠিক নয়। বরং একে বলতে হবে, 'পরিমাণ জানবার জন্যে ইজতিহাদ'। আন্দাজ-অনুমানও এক প্রকারের পরিমাপ, তার সাহায্যে পরিমাণ জানতে চেষ্টা চালানো যাবে, যেমন পাল্লায় ওজন করে ও পাত্র দিয়ে মেপে তা জানা যায়।

এটা এমনই, যেমন কোন বিষয়ে শরীয়াতের স্পষ্ট দলীল পাওয়া না গেলে ইজতিহাদ করার সুযোগ রয়েছে, যদিও ইজতিহাদে ভুল হওয়ার আশংকা থাকে। খুব ঘন জঙ্গলের মধ্যের গাছের মূল্য ইজিতিহাদের মাধ্যমে নির্ধারণ একটা প্রচলিত রীতি। আর বাহ্যিক দিক দিয়ে ইজতিহাদ করার দ্বার খুব প্রশস্ত, তা কোন আলিম অস্বীকার করতে পারেন না।

অনুমান করার উপযুক্ত সময়

ফলের পক্কতা শুরু হলে তখনই মোট পরিমাণ অনুমান করার সঠিক সময়। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, 'নবী করীম (স) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে পাঠাতেন, তিনি গিয়ে খেজুরের পরিমাণ অনুমান করতেন, যখন তা পেকে যেত। তা ছাড়া অনুমানের লক্ষ্য হল যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ এবং তার পর মালিককে তাতে হস্তক্ষেপের স্বাধীনতা দেয়া। আর তার প্রয়োজন তখনই দেখা দিতে পারে, যখন ফল পাকতে শুরু করে ও তার উপর যাকাত ফরয হয়ে দাঁড়ায়।

অনুমানকারীর ভুল

অনুমানকারী যদি পরিমাণ নির্ধারণে ভুল করে—বেশী বা কম নির্ধারণ করে,—তাহলে কি হবে, এ পর্যায়ে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (মদীনার সাতজন ফকীহ্র অন্যতম) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, যা অনুমান করে ধার্য করা হয়েছে তাই দেয়াই তোমার কর্তব্য। সে তো একজন অনুমানকারী মাত্র।' ইমাম মালিকের মতও তাই। তিনি বলেছেন, অনুমানকারী যদি পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও সততার ভিত্তিতে অনুমান করে থাকে ও প্রকৃত পরিমাণটা জানবার জন্যেই চেষ্টা করে থাকে, তাহলে তাতে কম ধরুক, বেশী ধরুক তা কার্যকর হবে। ইমাম মালিকের মত হচ্ছে, এ একটা বাস্তব সিদ্ধান্ত, তাতে কোন দোষ নেই।'

এ কথার সমর্থনে আবূ উবাইদ বলেছেন, আমার মতে তার কারণ হচ্ছে, এ ভুলটা যদি পারস্পরিক ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যমূলক হয় এবং তাতে ভুল করেও পরিমাণটা বেশী ধরে ফেলে তাহলে তা প্রত্যাহার করে সঠিক অনুমান করতে হবে। তাতে কিন্তু

অনুমানের রীতিটা কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষুণ্ন হয় না। কেননা এই মারাত্মক ভুল যদি পাত্র দিয়ে পরিমাপ করায় ঘটে তাহলেও তা প্রত্যাহার করা হয়, অনুমানের বেলায়ও অনুরূপ অবস্থা হলে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বেশী বা কম যদি অতটা হয়, যতটা সাধারণত দুটি মাপ-পাত্রের মধ্যে হতে পারে—তাহলে এটা জায়েয বলতে হবে।

ইবনে হাজম বলেছেন ঃ অনুমানকারীর ভুলে জুলুম হয়—বেশী কিংবা কম ধরার কারণে, তাহলে প্রকৃত পরিমাণ অনুযায়ী-ই ফরয পরিমাণ ধার্য করতে হবে। যা অতিরিক্ত নেয়া হবে, তা মালিককে ফেরত দিতে হবে। আর কম ধরা হলে সেই পরিমাণটা নিয়ে নিতে হবে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

তোমরা সুবিচার ও ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠাকারী হও।

অনুমানকারী পরিমাণ বেশী ধরলে মালিকের উপর জুলুম হয়। আর কম ধরলে যাকাত প্রাপকদের প্রতি জুলুম করা হয়; তাদের হক নষ্ট হয়। এর প্রতিটিই অন্যায় এবং গুনাহ্। যদি দাবি করা হয় যে, অনুমানকারী জুলুম করেছে কিংবা ভুল করেছে, তাহলে অকাট্য প্রমাণ ছাড়া সে দাবি মেনে নেয়া যাবে না—যদি অনুমানকারী সুবিচারক ও বিশেষজ্ঞ হয়। কিন্তু আবূ উবাইদ যা বলেছেন, তা অধিক সহজ, বাস্তবতার অতি কাছে এবং গ্রহণোপযোগী।

খেজুর-আঙুর ছাড়া অন্যান্য ফলেও কি অনুমান করা যাবে

জমহুর ফিকাহ্‌বিদ্‌গণ মত দিয়েছেন যে, খেজুর আঙুর ছাড়া অন্যান্য ফলের পরিমাণ নির্ধারণে অনুমান প্রয়োগ করা যাবে না। জয়তুনে তা করা যাবে না, কেননা তার ফলগুলো গাছে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এবং পাতা দিয়ে ঢাকা থাকে। মালিকের প্রয়োজন হয় না তা খাওয়ার। কিন্তু খেজুর ও আঙুরের ব্যাপার স্বতন্ত্র। কেননা খেজুর তার ছড়ার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। আর আঙুর থাকে তার ঝাড়ের মধ্যে। তাই এই উভয় ক্ষেত্রে অনুমানটা সহজভাবে সাধিত হতে পারে। ইমাম মালিক ও আহমদেরও এই মত।

জুহ্‌রী, আওযায়ী ও লাইস বলেছেন, জয়তুনেরও পরিমাণ অনুমান করে নির্ধারণ করা যাবে। কেননা তা এমন ফল যার উপর যাকাত ফরয হয়। তাই খেজুর ও আঙুরের মত তার অনুমান করা চলবে।

এপর্যায়ে আমার বাছাই করা মত হচ্ছে, অনুমানের সম্ভাব্যতার সাথে তা করা জায়েয বা না-জায়েয—এ প্রশ্ন জড়িত। তার প্রয়োজন আছে কি না তাও দেখতে হবে। বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের মতকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তারা যদি তাদের কৌশলগত উপকরণের সাহায্যে অনুমানের ভিত্তিতে পরিমাণ নির্ধারণ সহজ মনে করে এবং যাকাত প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনও বোধ করে, তাহলে সব ব্যাপার লিপিবদ্ধ করে নিতে হবে। কিংবা মালিক যদি প্রয়োজন বোধ করে, তাহলে অনুমান করেই তার উপর যাকাত ধার্য করা যাবে। এ পর্যায়ের দলীল অনুযায়ীই এ কথা বলা হচ্ছে।

ষষ্ঠ আলোচনা

কৃষি ফসল ও ফলের মালিকের জন্যে কি ছেড়ে দেয়া যাবে

১. পূর্বে উদ্ধৃত সহল ইবনে আবূ হাসমা বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) বলতেন, 'তোমরা যখন অনুমানের ভিত্তিতে পরিমাণ নির্ধারিত করবে, তখন এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দেবে। যদি তা না ছাড়, তাহলে এক-চতুর্থাংশ অবশ্যই ছাড়বে।'

২. ইবনে আবদুল বার্ নবী করীম (স)-এর কথাটি উদ্ধৃত করেছেন: 'অনুমান করার বেলা খুবই হালকা করে পরিমাণ ধরবে।'

৩. আবূ উবাইদ মক্হূল থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) যখন অনুমানকারী পাঠাতেন, বলতেন, 'খুব হালকা (কম) করে ধরবে। কেননা তাতে লোকদের খেতে দেয়া শূন্য ছড়াও থাকতে পারে, থাকতে পারে বীজ বের করে মূলটা খেয়ে ফেলা ফল।'

৪. আওজায়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত উমর বলেছেন বলে আমাদের কাছে খবর পৌঁচেছে যে, অনুমানে লোকদের প্রতি হালকা করে পরিমাণ ধর। কেননা মালে অনেক শূন্যতা বা খেয়ে ফেলা অংশ থাকতে পারে।

৫. বশীর ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর আবূ হাসমা আনসারীকে মুসলিম জনগণের মালের পরিমাণ নির্ধারণে অনুমান করার জন্যে পাঠিয়ে বলেছেন, 'তোমরা যদি লোকদের তাদের খেজুর বাগানে দেখতে পাও যে, তারা খেজুর পেড়ে ফেলছে, তাহলে তা থেকে তারা যা খেয়ে ফেলেছে, তা বাদ দাও, অনুমানে তা গণ্য করবে না।'

৬. সহল ইবনে আবূ হাসমা থেকে বর্ণিত, মারওয়ান তাকে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণে অনুমান করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সা'দ ইবনে আবূ সা'দের খেজুর সাতশত 'অসাক' অনুমান করলেন। বললেন, আমি যদি তাতে চল্লিশটি আশ্রয়স্থল না দেখতে পেতাম, তাহলে আমি নিশ্চয়ই নয় শত অসাক অনুমান করতাম। কিন্তু আমি মালিকদের প্রতি লক্ষ্য রেখে যে-পরিমাণ খেয়ে ফেলেছে তা বাদ দিয়েছি।' এ আশ্রয়স্থলগুলো ছিল ছায়াচ্ছন্ন, লোকেরা এখানে বসে ফল খেয়েছে।

প্রথম হাদীসটি বহু সংখ্যক হাদীসবিদের বিবেচনায়ই সহীহ হাদীস। হযরত জাবির ও মকহূল বর্ণিত হাদীস দ্বারা তা শক্তিশালী হয়েছে। সাহাবিগণের কথাও তার সমর্থনে রয়েছে। রাসূলের প্রদর্শিত নিয়মাদি সম্পর্কে তাঁরাই বেশী জানেন। তাঁর অনুসরণেও

তাঁরা ছিলেন অধিকতর আগ্রহী। ইবনে হাজম বলেছেন, এটা হযরত উমর , আবূ হাসমা ও সহল—এ তিনজন সাহাবীর কাজ। অন্যান্য সাহাবীও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। কেউ ভিন্ন মত পোষণকারী ছিলেন না। এসব হাদীস ও সাহাবীদের উক্তি প্রমাণ করে যে, মালের মালিকদের প্রতি নম্রতা দেখাতে হবে তাদের পরিমাণে যথাসম্ভব কম ধরতে হবে। তাদের রেয়াত দিতে হবে তাদের প্রয়োজন ও পাত্রের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

'আল-মুগ্‌নী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, অনুমানকারীর উচিত এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ রেয়াত দেয়া। তাতে মালিকদের প্রতি দয়া প্রশস্ততা দেখানো হবে। কেননা তারা নিজেরা এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন ও মেহমানরা তা থেকে কিছুটা খেয়ে ফেলতে পারে। তারা তাদের প্রতিবেশীদের, তাদের ঘরের লোকদের, বন্ধু-বান্ধব ও প্রার্থীদেরও খেতে দিয়ে থাকতে পারে। তা থেকে পাখীরাও অনেক খেয়ে ফেলতে পারে। পথিকেরাও যে খায়নি, তা-ও বলা যায় না। এমতাবস্থায় এসব বাদ দিয়ে অনুমান ধরা না হলে মালিকদের ক্ষতি অবধারিত। ইসহাক, লাইস ও আবূ উবাইদ এ কথাই বলেছেন। বাদ দেয়ার ব্যাপারে যাকাত আদায়কারীর দায়িত্ব রয়েছে। তাকেও ইজতিহাদ করতে হবে। খাওয়ার লোক বেশী মনে হলে এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে ধরবে, আর কম হলে এক-চতুর্থাংশ বাদ দেবে। অনুমানকারী আদৌ বাদ না দিলেও মালিকের পক্ষে তার মাল—ফল-ফলাদি থেকে—সমপরিমাণ খেয়ে ফেলা জায়েয, হিসেবে তা ধরা যাবে না, তাদেরও সে জন্যে দায়ী করা চলবে না। কেননা এটা তাদের অধিকার।

রাষ্ট্র সরকার যদি অনুমানকারী না পাঠায়, ওদিকে ফলের মালিক তাতে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয় এবং সে নিজে অনুমানকারী নিযুক্ত করে পরিমাণের অনুমানটা করিয়ে নেয়, তাহলে সেই অনুযায়ী অনুমিত পরিমাণ মেনে নেয়া জায়েয হবে। সে নিজে অনুমান করলে তাও না-জায়েয হবে না। তবে কোনদিকে বাড়াবাড়ি না হয় সে দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। যে ফল ও ফসলের পরিমাণ অনুমান করা হয় না, মালিকের বিশ্বস্ততার উপরই তা ছেড়ে দেয়া হয়, 'আল-মুগনী' গ্রন্থকারের মতে সাধারণ রীতি অনুযায়ী পরিমানমত তা থেকে খাওয়া হলে কোন দোষ হবে না, সে জন্যে মালিককে দায়ী করাও চলবে না। ইমাম আহমদের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'কৃষি ফসলের মালিক যদি খোসামুক্ত ফসল খেয়ে ফেলে তাহলে কি হবে? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ 'মালিক প্রয়োজনমত কিছু খেয়ে ফেললে তাতে কোন দোষ নেই।' কারণ এরূপ খাওয়া সাধারণত প্রচলিত। ফলের মালিক যদি কিছু ফল খেয়ে ফেলেই থাকে, তা স্বাভাবিক মনে করে নিতে হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, 'মালিক নিজে, তার সঙ্গী বন্ধু ও প্রতিবেশী কিছু খেয়ে ফেলে থাকলে তার রেয়াত দিতে হবে। এমন কি, সবও যদি খেয়ে ফেলে কাঁচা অবস্থায়, তা হলে তার উপর কোন যাকাত ধার্য করা যাবে না।'

ইমাম মালিক ও আবূ হানীফা ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা ফল কৃষি ফসলের মালিককে কিছুই রেয়াত দিতে রাযী নন। তাঁরা ফল পাড়া বা ফসল কাটার পূর্বে

মালিকরা কিছু খেয়ে ফেললে বা লোকদের খাওয়ায়ে থাকলে তারও হিসেব করার পক্ষপাতী।

ইবনুল আরাবী বলেছেন—সওরী তাঁর সমর্থন করেছেন—এভাবে মালিকদের জন্যে কিছু বাদ দেয়া যাবে না। এ থেকে মনে হয়, ইমাম মালিক ও সুফিয়ান সওরী সহল ইবনে আবূ হাসমা'র হাদীসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন কি, যাতে অনুমানে নম্রতা অবলম্বন ও এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ রেয়াত দিতে বলা হয়েছে। অথবা তাঁরা এ হাদীসটি পান নি।

ইবনে হাজম বলেছেন, কৃষি ফসলের মালিক নিজে বা তার পরিবারবর্গ তার খোসা বের করে কিংবা ছাতু বানিয়ে কিছু খেয়ে থাকলে যাকাতের হিসেবে তা গণ্য করা জায়েয হবে না—তার পরিমাণ কম হোক বি বেশী। আর যে সব ছড়া পড়ে যায়, পাখী খেয়ে ফেলে, পথিক বা অভাবী লোকেরা নিয়ে যায়, তা-ও ধরা যাবে না। কাটার সময় কিছু দান করে থাকলে তাও বাদ যাবে। তবে যা পরিচ্ছন্ন অবস্থায় পাওয়া যাবে, তাতে যাকাত অবশ্যই ধার্য হবে। পূর্বে এর দলীল উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে, মাপা সম্ভবকালে যে পরিমাণটা হবে, তারই উপর যাকাত ধার্য হবে। তার পূর্বে যা হাত ছাড়া হয়ে গেছে, যাকাত ফরযরূপে ধার্য হওয়ার পূর্বেই তা চলে গেছে বলে মনে করতে হবে। শাফেয়ী ও লাইসও এই কথা বলেছেন, মালিক ও আবূ হানীফা বলেছেন, এই সবই হিসেবে ধরতে হবে।

আবূ মুহাম্মাদ বলেছেন, এটা সাধ্যের অতীত কাজের দায়িত্ব চাপানো। ছড়া থেকেই এতটা পরিমাণ ঝরে পড়ে যায় যে, তা থাকলে পাঁচ অসাক পূর্ণ হত। কিন্তু এটা তো হিসেব করা সম্ভব নয়। আর মূলতও তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই—'আল্লাহ্ নিজেই কোন অসাধ্য কাজের দায়িত্ব চাপান না'। বলেছেন, খেজুরের ব্যাপারে মালিক নিজে বা তার পরিবারবর্গ যদি কাঁচা অবস্থায়ই কিছু খেয়ে ফেলে তা হলে তার প্রতি নম্রতা বিধান স্বরূপ তা বাদ দেয়া অনুমানকারীর কর্তব্য। তার যাকাত দিতে তাকে বাধ্য করা যাবে না। ইমাম শাফেয়ী ও লাইস ইবনে সাদ এই মত দিয়েছেন।

ইবনে হাজম, সহর ইবনে আবূ হাস্মা বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হযরত উমর, আবূ হাস্মা ও সহল প্রমুখ সাহাবীর মতও এই কথার দলীল।

আর যাঁরা সহল বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী আমল পরিহার করেছেন তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং জবাবে তাঁরা বলেনঃ অনুমানের এই রীতিটা বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছিল খাবারের ক্ষেত্রে। অতএব অন্য কোথাও তার প্রয়োগ হতে পারে না।

অপর কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসটির অর্থ হল মালিকের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ ওশর বাদ দেবে, যেন তারা তাদের দরিদ্র আত্মীয় ও প্রতিবেশী লোকদের মধ্যে তা বিতরণ করতে পারে। তা হলে মালিকরা দ্বিতীয়বার তার উপর জরিমানার মত দিতে বাধ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ীও হাদীসটির এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

তার একটা পুরানো কথাও আছে। তা হল, তার পরিবারবর্গের খাওয়ার জন্যে কিছু খেজুর রেখে দেবে। আর তার পরিবারের লোকদের কমবেশী হওয়ার ভিত্তিতে এর পরিমাণেও কম বেশী হবে। অপররা জবাব দিয়েছেন এই বলে যে, কৃষি ও জমিতে যা খরচ হয়, তা বাদ দিয়ে হিসাব করতে হবে। ইবনুল আরাবী বলেছেন, সঠিক দৃষ্টিভংগী হচ্ছে, হাদীস অনুযায়ী আমল করা। আর তা হচ্ছে ব্যয়ের পরিমাণ। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, কাঁচা অবস্থায় যা খাওয়া হয় তার চাইতে সব সময় ব্যয়ের ভাগ বেশী থাকে।

আমি মনে করি, সহজ হাদীসও অন্যান্য দলীলাদি যা প্রমাণ করে তা গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। হযরত উমর ফারূকও এ মত অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম আহমদ, ইসহাক, লাইস, শাফেয়ী (তাঁর পুরনো কথায়) ও ইবনে হাজমও এ মত গ্রহণ করেছেন।

সত্যি কথা এই যে, এ হাদীসটি আমাদের যাকাত পর্যায়ে এক গুরুত্বপূর্ণ শুভ সূচনা দান করে। আর তা হচ্ছে, মালের মালিক ও তার পরিবারবর্গের যুক্তিসংগত প্রয়োজনকে মেনে নেয়া এবং সে অনুপাতে পরিমাণ নির্ধারণী রেয়াত দান ও কম্-সে-কম পরিমাণ ধার্য করা। আর যে মালেই যাকাত ধার্য হয় তাতে এ একটা সাধারণ শর্ত বিশেষ। তা হল মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্তের উপর যাকাত ধার্য করণ।

ইসলাম সব সময়ই ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা ও তার পরিবারবর্গের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানবীয় চিন্তা ও কর ধার্যকরণ রীতিতে এ চিন্তাটা এসেছে। তবে তা খুব বেশী দিনের কথা নয়। পূর্বের নীতি ছিল আসলের উপর কর ধার্যকরণ, মালিকের সুবিধা-অসুবিধা ও তার প্রয়োজন এবং ঋণের প্রতি কোনই লক্ষ্য না দেয়া।

সপ্তম আলোচনা

ঋণ ও ব্যয়ভার বাদ দিয়ে অবশিষ্টের যাকাত

ঋণ ও ব্যয়ভার বাদ দিয়ে কি যাকাত দেয়া হবে

কৃষি ফসল ও ফলের মালিকের ঋণ দুরকমের হয়ে থাকে। তার কৃষি ও চাষাবাদের কাজে ব্যয় করার কারণে ঋণ হয়ে থাকে। বীজ, সার ও শ্রমিকের মজুরী দান প্রভৃতি ব্যয় এ পর্যায়ে গণ্য। আর কতক ঋণ হয় কৃষি মালিকের নিজের ও তার পরিবারবর্গের ব্যয়ভার বহনে। এ প্রকারের ঋণের ক্ষেত্রে শরীয়াতের নির্দেশ কি?

আবূ উবাইদ জাবির ইবনে যায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি ঋণ করে নিজের পরিবারবর্গ ও চাষের জমির উপর ব্যয় করে, তার সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যা জামির উপর ব্যয় করা হয়েছে, তাই আদায় করা হবে। ইবনে উমর বলেছেন, তার পরিবার ও জমি উভয়ের উপর ব্যয়িত অর্থই যাকাত দেয়ার সম্পদ থেকে বাদ দেয়া হবে। তারপর অবশিষ্টের যাকাত দিতে হবে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে উমরের এ মত উদ্ধৃত করেছেন যে, প্রথম সম্পূর্ণ ঋণ হিসাব করে বাদ দেয়া হবে, পরে অবশিষ্টের যাকাত দেয়া হবে। আর ইবনে আব্বাসের মত হল, যা ফসলের জন্যে ব্যয় করা হয়েছে, তা বাদ দিয়ে অবশিষ্টের যাকাত দিতে হবে।

তা হলে ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর উভয়ই জমি ও ফল-ফসলের জন্যে ব্যয় করা ঋণ সর্বপ্রথম বাদ দেয়া, হিসেবে তা না ধরা এবং শুধু অবশিষ্টের যাকাত দেয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত। তবে নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনে নেয়া ঋণ সম্পর্কে তাঁরা দুজন একমত হতে পারেন নি।

মকহুল বলেছেন, কৃষি মালিক ঋণগ্রস্ত হলে সে ঋণ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তার কাছ থেকে যাকাত আদায় করা যাবে না। যা অবশিষ্ট থাকবে, কেবল তারই যাকাত দিতে হবে, যদি তা যাকাত ফরয হওয়া পরিমাণের হয়। আতা ও তায়ূস থেকেও এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। ইরাকী ফিকাহবিদদের অনেকেই ইবনে উমর, আতা, তায়ূস ও মকহুল থেকে বর্ণিত মত সমর্থন করেছেন। সুফিয়ান সওরীও এই মতই প্রকাশ করেছেন।

আহমদ ইবনে হাম্বলের দুটি মত উদ্ধৃত হয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে, যে লোক পরিবারের ব্যয়ভার বহন ও কৃষি কাজের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনের জন্যে ঋণ করবে, তার প্রথমটির হিসাব গণ্য হবে না, গণ্য হবে দ্বিতীয়টির হিসাব। কেননা ওটা তো কৃষিসংক্রান্ত ব্যয়। আর দ্বিতীয় মতে বলা হয়েছে, এই গোটা ঋণই যাকাতের প্রতিবন্ধক। ফলে প্রথম মতটি ইবনে আব্বাসের মতের অনুকূল। আর দ্বিতীয় মতে তিনি ইবনে উমরের সাথে একাত্ম।

'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এই বর্ণনানুযায়ী সর্ব প্রকার ঋণই গণ্য ও হিসাব করা হবে। তারপরে অবশিষ্ট কৃষি ফসলের উপর ওশর ধার্য হবে, যদি নিসাব পরিমাণ

থাকে—অন্যথায় নয়। কেননা ঋণ তো যাকাত ধার্য হওয়ার পথেই বড় বাধা। যেমন গোপন মালের যাকাতের ক্ষেত্রে। আর এই ঋণটাও ওশর ফরয হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন খারাজ ও তার কৃষি কাজের ব্যয়। প্রথম বর্ণনানুযায়ী দুটির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, যা কৃষি সংক্রান্ত ব্যয় হবে তার মুকাবিলায় অর্জিত ফসল ভিন্ন কাজে ব্যয় করা হবে, যেন তা অর্জিতই হয়নি।

আবূ উবাইদের মতে ইবনে উমর ও তাঁর অনুকূল মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন অর্জিত ফসল থেকে সম্পূর্ণ ঋণটা বাদ দেয়া ও অবশিষ্টের যাকাতা দেয়ার ব্যাপারে। তবে শর্ত হচ্ছে, ঋণটা যথার্থ হতে হবে। বলেছেন, 'ঋণ যদি যথার্থ হয় এবং জমির মালিকেরই হয়ে থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। তার ঋণের কারণেই তা প্রত্যাহৃত হবে।' ইবনে আমর, তায়ূস, মকহুলও এ কথাই বলেছেন। আর তা সুন্নাতের অনুসরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা নবী করীম (স) তো ধনীদের কাছে থেকে যাকাত গ্রহণের সুন্নাত কার্যকর করেছেন, যেন তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করা যায়। যে লোকের ঋণ তাকে গ্রাস করেছে, আদায়ের মত অর্থ যার নেই, সেই নিজেই যাকাত পাওয়ার যোগ্য। তার কাছ থেকে যাকাত নেয়া যাবে কি করে?—আর একই সময় ধনী ব্যক্তি কি করে দরিদ্র গণ্য হতে পারে? তা সত্ত্বেও সে-যাকাত পাওয়ার যোগ্য আটজনের একজন—ঋণী। তাই দুই দিক দিয়েই তার পাওনা সাব্যস্ত হয়।

খারাজ হচ্ছে জমিখণ্ডের উপর ধার্য করা ভূমিকর মাত্র। জমির ফসল থেকে তা কি বাদ দিয়ে হিসাব করা হবে এবং অবশিষ্টের যাকাত দিতে হবে? ... না অন্য কিছু?

ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদাম বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সওরী খারাজী জমির মালিককে বলেছেন, 'তোমার ঋণ ও খারাজ বাদ দাও। তারপর পাঁচ অসাক ফসল অবশিষ্ট থাকলে তার যাকাত দাও।'

আবূ উবাইদ বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয আবদুল্লাহ্ ইবনে আওফ—ফিলিস্তিনে তাঁর নিয়োজিত কর্মকর্তাকে লিখেছিলেন ঃ 'যে মুসলিমের মালিকানায় জিযিয়ার জমি রয়েছে, তার জিযিয়া বাদ দিয়ে অবশিষ্ট থেকে যাকাত নিতে হবে।' (এখানে 'জিযিয়া' অর্থ খারাজ)। উমর, সুফিয়ান 'খারাজ' পরিমাণ বাদ দিয়ে যাকাত নেয়ার পক্ষপাতী। অবশিষ্ট নিসাব পরিমাণ হলেই তার উপর যাকাত হবে। উমর একজন অন্যতম ইমাম ছিলেন।

ইমাম আহ্মদের মতও প্রায় এমনিই। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, খারাজ জমি বাবদ ব্যয়। তাই অতটা পরিমাণ বাদ দিয়েই যাকাত ফরয হবে—ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর যেমন করে কৃষি কার্যে ব্যয় করা পরিমাণ বাদ দিয়ে অবশিষ্টের যাকাত দেয়ার কথা বলেছেন।

কৃষি শ্রমিককে জমির মালিক যে মজুরী দেয় তা এই খারাজের মতই মূল উৎপাদন থেকে বাদ পড়বে, তার পর যাকাত দেয়া হবে। কেননা জমহুর ফিকাহ্বিদ খারাজকে জমির মজুরীর পর্যায়ে গণ্য করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম বলেন, কেউ যদি সাদা ওশরী জমি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে কাউকে চাষ করতে দেয়, সে তাতে খাদ্যের চাষ করে, তাহলে তার দেয় খাদ্য পরিমাণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট থেকে যাকাত দিতে হবে। যাকাত ওশর হতে পারে, হতে পারে অর্ধ-ওশর। পরে বলেছেন সে তার ঋণও বাদ দেবে, পরে যা থাকবে তা থেকে ফরয পরিমাণ যাকাত দেবে।

তবে কৃষি কাজ ও ফলোৎপাদনে যদি ঋণ না হয় ও খারাজ দিতে না হয়, যেমন যদি কেউ নিজ থেকেই বীজ, সার, চাষ ইত্যাদি বাবদ যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে, তাহলে কি করা হবে? তখনও কি এই সব ব্যয় ও দায়িত্ব পরিমাণ ফসল থেকে বাদ দিয়ে অবশিষ্টের যাকাত দিতে হবে? যেমন ঋণ ও খারাজ বাদ দিয়ে ওশর দেয়া হয়? অথবা সমস্ত ফসলের উপরই যাকাত ধার্য হবে।

ইবনে হাজম বলেছেন, ফসল উৎপাদনকারী নিজে এ পর্যায়ে যা কিছু ব্যয় বা বিনিয়োগ করেছে তা সবই বাদ যাবে ও তারপরই অবশিষ্টের উপর যাকাত ধার্য হবে, এ কথা ঠিক নয়। তাতে সে ঋণী হোক, কি ঋণ ছাড়াই এই সব ব্যয় করে থাকুক। এবং সমস্ত ব্যয় সমস্ত ফসল ও ফলের মূল্য দিয়ে পূর্ণ হোক, কি না-ই হোক, এ ক্ষেত্রে পূর্বকালীন মনীষীদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমরের মধ্যেও রয়েছে মতপার্থক্য। একজন বলেছেন, সম্পূর্ণটার যাকাত দিতে হবে, অপর জন বলেছেন, ব্যয়টা বাদ দিয়ে তবে যাকাত দিতে হবে।

আতার মতে যে ব্যয় ন্যায়সংগত রয়েছে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্টের উপর যাকাত ধার্য হলে তা বাদ দেবে, নতুবা নয়। ইবনে হাজম এ কথার প্রতিবাদ করে বলেছেন, আল্লাহ্ যে হক ধার্য করেছেন, তা কুরআন বা প্রমাণিত সুন্নাতের দলীল ব্যতিরেকে প্রত্যাহার করা জায়েয হতে পারে না। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আবূ হানীফাও এ মত দিয়েছেন।

উপরিউক্ত ব্যাপারে ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করলেও এ ব্যাপারে দুজনই একমত যে, কেউ ঋণ নিয়ে ফল ও ফসল এবং নিজ পরিবারের জন্যে ব্যয় করলে ফল-ফসলে যা ব্যয় হয়েছে তা বাদ দেয়ার পরই অবশিষ্টের উপর যাকাত ধার্য হবে। তবে ইবনে উমরের মতে নিজের ও পরিবারবর্গের জন্যে যা ব্যয় করা হয়, তাও বাদ যাবে।

এই মতটি দুজন মহাসম্মানিত সাহাবীর—সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে নিজের কৃষি ফসল ও ফলে নিজ থেকে অথবা ঋণ নিয়ে ব্যয় করেছে। ঋণ না নিয়ে নিজের মাল থেকে ব্যয় করে থাকলে কি হবে, এ বিষয়ে দুজনই নীরব। এ পর্যায়ে কেবল ইবনে হাজমের উপরোদ্ধৃত মতটিই পাওয়া যায়। আতাও এ মত দিয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আমার নিজের জমি আমি নিজে চাষাবাদ করি, আমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত? বললেন ঃ 'তোমার ব্যয়টা তুলে নাও তারপর যা থাকবে তা থেকে যাকাত দাও।

ইবনুল আরাবী বলেছেন, আমাদের আলিমগণের মত বিভিন্ন হয়ে গেছে, যাকাতযোগ্য মাল থেকে ব্যয় বাদ দেয়া হবে ও তারপর যাকাত ধার্য হবে, অথবা মাল ও খেদমতের ব্যয় ফসল লাভ করা পর্যন্ত সব মালিকের ভাগে চলে যাবে এবং মূলধন থেকে যাকাত দেয়া হবে—এ ধরনের বিভিন্ন মত রয়েছে। সহীহ্ কথা হল, লব্ধ ফসল থেকেই তা বাদ দেয়া হবে ও অবশিষ্ট থেকে ওশর নেয়া হবে। দলীল হচ্ছে, নবী করীম (স) বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দাও। এ পরিমাণটা মোট খরচের প্রায় সমান। যা কাঁচা খাওয়া হয়েছে ও যা ব্যয় করা হয়েছে তা বাদ দিলে চার ভাগের তিন ভাগ অথবা দুই-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি।

ইবনুল আরাবীর কথার অর্থ হল, এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ—যেমন

হাদীসে বলা হয়েছে—এর ব্যয় পরিমাণ ফসল থেকে বাদ দেয়া, এ দুটি এক সাথে চলবে না। কেননা তা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের মধ্যেই গণ্য। তার অর্থ এই যে, এক-তৃতীয়াংশের অধিক হলেও বাদ দিতে হবে আর তা করা হবে প্রত্যেকবারের ফসলে ও ফলে—তা অনুমান করা হোক, আর না-ই হোক।

ইবনুল হুম্মাম এ মত সমর্থন করেন নি এই বলে যে, শরীয়াত প্রদাতা নিজেই ব্যয়ভারের পার্থক্যের কারণে যাকাতের পরিমাণে পার্থক্য করার নির্দেশ করেছেন। যদি ব্যয় পরিমাণ বাদ দেয়া হয় তাহলে থাকে এককভাবে ফরয পরিমাণ। আর তা হচ্ছে, চিরদিন অবশিষ্টের উপর ধার্য ওশর। কেননা কেবলমাত্র এই ব্যয়ভারের জন্যেই অর্ধ-ওশরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসলে ফরয ধার্যই হয় অবশিষ্টে উপর—ব্যয়ভার বাদ দেওয়ার পর, এমন অবস্থায় যে, তাতে ব্যয়ভার নেই। তাহলে ফরয পরিমাণ চিরকালই ওশর হবে। কিন্তু এই পরিমাণটা শরীয়াতই পার্থক্যপূর্ণ করে দিয়েছে—একবার ওশর ও একবার অর্ধ-ওশর করে—তা এ ব্যয়ভারের কারণে। এ থেকে আমরা জানলাম যে, কতক উৎপাদনের উপর ওশর ধার্য না হওয়াটা শরীয়াত কর্তৃক গ্রাহ্য হয়নি। কেননা মৌলিকভাবে তা হচ্ছে খরচের সমপরিমাণ।[১]

আমার কাছে মনে হয়, শরীয়াত প্রদাতা উৎপাদনে ফরয পরিমাণে পার্থক্য করেছেন জমির সেচকাজে কষ্ট চেষ্টা-প্রচেষ্টার পার্থক্যের কারণে। আর কৃষি জমির বিভিন্নতার দরুন এ কথাটি খুবই স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে ওঠে। এ ছাড়া অন্যান্য পার্থক্যে গণ্য করার পক্ষে কোন দলীল নেই। তা বাদ দেয়ার পক্ষেও নেই। কিন্তু শরীয়াতের মৌল ভাবধারার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হচ্ছে উৎপাদন থেকে খরচের সমপরিমাণ যাকাত প্রত্যাহার করা। দুটি ব্যাপার এ কথার সমর্থনে রয়েছে ঃ

প্রথম, শরীয়াতের দৃষ্টিতে কষ্ট ও খরচের একটা প্রভাব ও গুরুত্ব রয়েছে। এ কারণে ফরয পরিমাণ কম ধরা হয়। যেমন যন্ত্র দ্বারা পানি সেচ করা। তাতে অর্ধ-ওশর ধরা হয়েছে। আর সারা বছর যে গবাদিপশুকে কেটে এনে ঘাস খাওয়াতে হয়, তাতে যাকাত ধার্যই হয় না। কাজেই জমির উৎপাদন থেকে সে পরিমাণ প্রত্যাহার করায় তা প্রভাবশালী হবে, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

দ্বিতীয়, প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে বাড়তি অংশ। কিন্তু অর্জনে যদি সমপরিমাণ ব্যয় হয়ে যায়, তাহলে মাল বাড়তি হল বা বেশী উপার্জন হল তা মনে করা যায় না। এ কারণে কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন, খরচের পরিমাণটা বিনিময়ে অর্পিতের মত, যেন সে তা ক্রয় করেছে। আর এটাই ঠিক।

এ কথা এ ভিত্তিতে বলা হচ্ছে যে, যে পানি সেচের ব্যয়ের জন্যে শরীয়াতে ওশর থেকে ফরয পরিমাণকে অর্ধেকে নিয়ে আসা হয়েছে, আমরা তা হিসেব করব না।

তাহলে যার জমি দশ 'কিন্তার' ৩.৪৪ কিলোগ্রাম তুলা উৎপাদন করেছে, যা দুইশ' 'জনীহ'র (মিসরীয় পাউণ্ড) সমান অথচ পানি সেচ ছাড়া জমির করসহ অন্যান্য কাজে ব্যয় হয়ে গেছে ষাট 'জনীহ' (যা তিন কিন্তারের সমান) সে মাত্র অবশিষ্ট সাত 'কিন্তার'-এর যাকাত দেবে। আর যদি মেঘের পানিতেই সিক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাতে ওশর ধার্য হবে এবং যন্ত্রের সাহায্যে সেচ হয়ে থাকলে অর্ধ-ওশর হবে।

---

১. فتح القدير ج ٢- ص ٩٨

অষ্টম আলোচনা

ভাড়া করা জমির যাকাত

মালিক নিজেই চাষ করলে

১. জমির মালিক নিজেই নিজের জমি চাষ করবে—যদি সে কৃষিজীবী হয়ে থাকে। শরীয়াতের দৃষ্টিতে এটাই উত্তম কাজ। তখন সে জমির ফসলের ওশর বা অর্ধ-ওশর যাকাত দেবে। কেননা জমি ও চাষাবাদ উভয়েরই মালিক সে নিজে।

ধার করা জমির যাকাত

২. কিন্তু জমির মালিক যদি তার জমি অপর কোন কৃষিজীবীকে ধার দেয়, সে তা চাষ করেও কোনরূপ বিনিময় না দিয়ে, ফসল পায়—তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে তা খুবই প্রশংসনীয় কাজ। ইসলামে এজন্যে উৎসাহও দান করা হয়েছে। এরূপ হলে জমির যাকাত দিতে হবে চাষাবাদকারীকে, কেননা সে কোনরূপ বিনিময় বা ভাড়া ছাড়াই জমি থেকে উপকৃত হয়েছে।

জমি মালিক ও শরীক

৩. কিন্তু জমি যদি সহীহ্‌ভাবে পারস্পরিক চুক্তিতে চাষাবাদ করা হয়। ফসলের এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক দেয়ার চুক্তিতে সেখানে যেমন নিয়ম—শর্তে, তাহলে প্রত্যেক অংশীদারকে তার প্রাপ্ত অংশ থেকে যাকাত দিতে হবে—যদি তার অংশ যাকাত পরিমাণ হয়। অথবা তার যদি অন্য চাষাবাদও থাকে, তাহলে তার সাথে মিলিয়ে তার মোট প্রাপ্ত ফসল পরিমাণ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে—নিসাব পরিমাণ হলে।

কিন্তু দুজনার একজনের অংশ যদি নিসাব পরিমাণ হয়—অন্য জনের তা না হয়, তাহলে যার সেই পরিমাণ হবে, তাকেই নিজের অংশ থেকে যাকাত দিতে হবে, অপরজনকে কিছুই দিতে হবে না। কেননা সে নিসাব পরিমাণের কম ফসল পেয়েছে। এ জন্যে যে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে সে ধনী ব্যক্তি নয়। আর যাকাত তো কেবল ধনীর কাছ থেকেই নিতে হবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ এই দুইজনকে একজন ব্যক্তি ধরে উভয়ের উপর ওশর ধার্য করার পক্ষে—যদি উভয়ের প্রাপ্ত ফসলসমষ্টি পাঁচ অসাক পরিমাণের হয়। তখন প্রত্যেকেই নিজের অংশ থেকে ওশর দেবে।

মালিক যাকাত দেবে, না কেরায়াদার

৪. জমি যদি নগদ অর্থ বা কোন জ্ঞাত জিনিসের বিনিময়ে ভাড়ায় লাগানো হয়, জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ তা জায়েয বলেছেন—তা হলে ওশর বা অর্ধ-ওশর কে দেবে?

জমির মালিক? কেননা জমির ভাড়া সে-ই পেয়েছে।—অথবা কেরায়াদার?—কেননা সে-ই চাষাবাদ করে কার্যত উপকৃত হয়েছে, ফসল পেয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফার মত

এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, মালিকই জমির ওশর দেবে, কেননা তাঁর কাছে মৌলনীতি হচ্ছে, ওশর জমির বর্ধনশীলতার হক এবং দেয়, কৃষিকাজের হক বা দেয় নয়। আর এখানে জমির মালিক রয়েছে, জমি তারই; আর ওশর হচ্ছে জমির খরচ, যেমন তার খারাজ। আরও এ জন্যে যে, জমি যেমন কৃষি-কাজে বর্ধনশীল হয়, তেমনি ভাড়ায় লাগানোও বর্ধনশীল হয়। তাহলে তার ভাড়াটা ফল ও ফসলের মতই মূল লক্ষ্যবস্তু। মালিকের জন্যে প্রবৃদ্ধির একটা তাৎপর্য থাকে, সেই সাথে মালিকানার নিয়ামতও সে-ই ভোগ করে। কাজেই ওশর তার উপরই ধার্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইবরাহীম নখয়ীও এ মত দিয়েছেন।

জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মত

জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মত হচ্ছে, ওশর দিতে হবে কেরায়া গ্রহণকারীকে। কেননা ওশর হচ্ছে কৃষির হক, জমির হক নয়। কিন্তু এখানে জমি-মালিক কোন ফল বা ফসল পায়নি। সে কৃষি ফসলের যাকাত দেবে কি করে, সে তো ফসলের মালিক হয়নি, মালিক হয়েছে অন্য লোক?

মতপার্থক্যের কারণ

ইবনে রুশ্‌দ বলেছেন, ওশর জমির হক, না কৃষি কাজের হক অথবা উভয়ের, এই নিয়ে মতপার্থক্য হচ্ছে উপরিউক্ত মতবিরোধের আসল কারণ। কেননা উভয়ের সামষ্টিক হক হওয়ার কথা কেউ বলেন নি। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা উভয়েরই সামষ্টিক হক।

জমির ফসলের উপর হক ধার্য হয় দুটি দিক দিয়ে। একটি দিক জমি, আর অপর দিক হচ্ছে ফসল। এক্ষণে মতবিরোধ হয়েছে এই নিয়ে যে, এ দুটির কোনটি 'হক' নির্দিষ্ট করা উত্তম তাঁদের মধ্যে ঐকমত্যের ক্ষেত্রও রয়েছে। জমি ও কৃষিকাজ উভয়ের মালিক যদি একজন হয়, তাহলে সেই ঐকমত্য বাস্তবায়িত হতে পারে। সাধারণ ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, জমির ফসলই হচ্ছে যাকাত হওয়ার আসল কারণ। আর ইমাম আবূ হানীফা মনে করেছেন, যাকাত ফরয হওয়ার আসল কারণ হচ্ছে জমি।

অগ্রাধিকার দান

'আল-মুগ্‌নী' গ্রন্থ প্রণেতার দৃষ্টিতে জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মতই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। অর্থাৎ ওশর ফরয হবে কৃষি ফসলে, এই ফসলের মালিকই তা দেবে। আর বলেছেন, ওশরকে জমির ব্যয় মনে করা ঠিক নয়। কেননা যদি তা-ই হত, তাহলে তাতেই ওশর ফরয হত তা চাষাবাদ করা না হলেও। যেমন খারাজ বা কর ধার্য থাকে

ও দিতে হয় সর্বাবস্থায়ই। যিম্মীর উপরও তা ফরয—যেমন খারাজ। আর তা জমির পরিমাণ অনুযায়ী ধার্য হত, কৃষি ফসলের পরিমাণ হিসেবে হত না এবং তা ফাই-এর ব্যয় ক্ষেত্রেই ব্যয় করা হত, যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্রে নয়।

রাফেয়ী বলেছেন, মালিকানাভুক্ত জমির ফসল এবং ভাড়ায় লওয়া জমির ফসলের মধ্যে ওশর ফরয হওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। কেরায়াদারের উপর ওশর ও কেরায়া—উভয়ই একত্রিত হয়ে পড়ে। যেমন কেউ যদি ব্যবসায়ের জন্যে কোন দোকান ভাড়া নেয়, তাহলে তাকে ভাড়া ও ব্যবসায়ের যাকাত উভয়ই বহন করতে হয়।

কিন্তু এই তুলনা সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা ব্যবসায়ীর কাছে প্রবর্ধনশীল মূলধনের যা-ই অবশিষ্ট থাকবে, প্রতি বছর তার উপর ব্যবসায়ী যাকাত ধার্য হবে—সারা বছরের দোকান ভাড়া, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় বাদ দিয়ে। বছরের বা এক মাসের ভাড়া ইত্যাদি কিছু বাকি থেকে থাকলে তা তার ঋণ হবে এবং জমা থেকে বাদ দেয়ার পরই তার যাকাত দিতে হবে। কিন্তু কৃষি ফসলের যাকাতে বছরের হিসাব নেই। যখনই ফসল কাটা হবে, তখনই যাকাত ফরয হবে। কাজেই যাকাত দেয়ার পূর্বে কৃষি ফসল থেকে ভাড়া দিয়ে দেয়া সম্ভব নয়—যেমন দোকানের ভাড়া ব্যবসায়ের আয় থেকে দিয়ে দেয়া সম্ভব হয়ে থাকে।

এ কারণে কেরায়াদার জমিতে প্রাণপণ খাটুনী খাটবে, পরে তার ভাড়া দেবে, আর তারপরও তার কাছ থেকে ওশর নেয়া হবে—এটা তার প্রতি খুবই অতিরিক্ত চাপ বলে মনে হয়। এমতাবস্থায় জমির মালিক সর্ব প্রকার দায়দায়িত্বমুক্ত থেকে জমির ভাড়াটি আদায় করে নেয়। ভাড়ার টাকার এক বছর বয়স হওয়ার পূর্বে তার কাছে কিছুই দাবি করা হয় না।

সুবিচারপূর্ণ নীতি হচ্ছে, জমি বাবদ দেয় যাকাতে উভয় পক্ষকে শরীক হতে হবে। প্রত্যেকেই যা যা অর্জন করেছে, তার উপর থেকে তা দিতে প্রত্যেককেই বাধ্য থাকতে হবে। তাহলে কেরায়াদারও যাকাত দেয়ার দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে না—যেমন ইমাম আবূ হানীফা মনে করেন। আর মালিককে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিয়ে যাকাতের সমস্ত দায়-দায়িত্ব কেরায়াদারের উপর চাপানোও হবে না—যেমন জমহুর ফিকাহ্‌বিদ্‌রা মনে করেছেন।

> ইবনে রুশ্‌দ তাঁর দার্শনিক বিবেকের বলে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, কৃষি জমির উপর ফরয ধার্যকরণটা কেবলমাত্র জমির হক্‌ নয়, নয় কেবলমাত্র কৃষি ফসলের হক্‌; বরং এই উভয়েরই যৌথ হক।

তার অর্থ, জমি-মালিক ও কৃষি ফসলের মালিক উভয়ই ওশর বা অর্ধ-ওশর—যাই হোক—তা দেয়ার ব্যাপারে সমান দায়িত্বশীল হবে। আমার মতে এই মতটাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

কিন্তু ফরয আদায় করার ব্যাপারে দুজন লোক কিভাবে শরীক হতে পারে এবং কিসের ও কোন্ ভিত্তিতে তা আদায় করবে?

আমরা মনে করি, এ মতটাই ঠিক যে, যাকাত পরিচ্ছন্ন কৃষি ফসলের উপর ধার্য হবে। ঋণ ও কর-খাজনা-খারাজ হচ্ছে ব্যয়, আর চাষকার্য ও বীজ মোট উৎপাদন থেকে সমপরিমাণ বাদ দিতে হবে। পরে অবশিষ্ট পরিমাণ যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে তার যাকাত দিতে হবে। জমির ভাড়া নিঃসন্দেহে কৃষিকার্য পর্যায়ের ব্যয়। তা খারাজের মতই, তা ভাড়াটের উপর ঋণরূপে গণ্য হবে। অতএব উৎপাদন থেকে সেই পরিমাণ বাদ দিতে হবে। সেই সঙ্গে অন্যান্য যাবতীয় ঋণ ও ব্যয়াদি... পরে ওশর বা অর্ধ-ওশর দেয়ার সময় হবে যদি তার নিসাব পরিমাণ ফসল হাতে থাকে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, জমির কেয়ারা যদি ২০ জনীহ্ হয়, আর উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ যদি হয় ১০ আরদব। এক আরদব পাঁচ জনীহ্র সমান। (তা হলে উৎপাদন পরিমান হল ১০×৫=৫০ জনীহ্)। তাই কেবলমাত্র ৬ আরদবের যাকাত দিতে হবে। বাকীটা ভাড়া বাবদ কাটা যাবে।

আর যদি ভাড়া ব্যয় হয় ৩০ জনীহ্ (যা ৬ আরদবের মূল্যের সমান) তা হলে অবশিষ্ট ৪ আরদব—৪৮ মাপ। তা যাকাত ফরয হওয়া পরিমাপের কম বলে তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। কিন্তু জমির মালিকের পক্ষে ফসলের ওশর বা অর্ধ-ওশর দেয়া সম্ভব নয়। কেননা সে তো ফসলের মালিক নয়। সে তো জমির ভাড়া পেয়েছে মাত্র, ফসল পায়নি।

তবে জমি যদি অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে চাষ করতে দেয়া হয়, তাহলে সে তার প্রাপ্ত অংশ থেকে তার যাকাত দিতে পারে, যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়।

এমতাবস্থায় সে ভাড়া বাবদ যা পাবে—তা অর্ধেক ফসল—তা থেকে ওশর বা অর্ধ-ওশর দেবে। তবে শর্ত এই যে, তা জমির ফসলের নিসাবের মূল্য পর্যন্ত হতে হবে। কেননা তা তারই বিনিময়। তার উপর ঋণ বা খারাজও রয়েছে জমির কর বাবদ দেয়, তাও তাকে প্রাপ্ত অংশ থেকে দিতে হবে এবং অবশিষ্ট থেকে যাকাত দেবে যা ধার্য হয়। ঋণ ও খারাজ তো মৌল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত, যেমন তার নিজের ও পরিবারবর্গের খাবার, পোশাক, বাসস্থান ও চিকিৎসা ইত্যাদি বাবদ ব্যয় মৌল প্রয়োজনের শামিল। এগুলোর উপর সে পুরাপুরি নির্ভরশীল। এ জন্যে ফিকাহ্বিদগণ মনে করেছেন, পানের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি থাকা অবস্থায়ও তায়াম্মুম করা জায়েয। কেননা তখন মনে করতে হবে যে, আদপেই কোন পানি নেই। এখানেও তেমনি।

এখানে যা বললাম, জমি মালিক ও ভাড়ায় চাষাবাদকারী—এ দুজনই সুবিচার ও ইনসাফের ভিত্তিতে যাকাত দেয়ায় শরীক হবে।

তাই ভাড়ায় জমি চাষকারী ঋণ, ভাড়া ও কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ের দায়িত্ব মুক্ত হয়ে প্রাপ্ত ফসল থেকে যাকাত দেবে। আর জমির মালিক যাকাত দেবে যা আল্লাহ্ তাকে পাইয়ে দেবেন—ঋণ ও কর ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে—তা থেকে।

ভাড়ায় চাষকারীর অংশের ফসল থেকে ভাড়ার পরিমাণ অংশ বাদ যাবে। আর যে পরিমাণ যাকাত মাফ করা হবে, তা মালিকের ভাগে চলে যাবে এবং তা থেকে ফরয

যাকাত দিয়ে দেবে। সেই পরিমাণের যাকাত কেরায়াদারের পরিবর্তে সে-ই আদায় করার অধিক যোগ্য।

মালিক ও কেরায়াদারের এই পারস্পরিক সুবিচারপূর্ণ সহানুভূতির ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফার মতের উত্তম অংশ এবং জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মতের উত্তম অংশ অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারি এবং উভয়ের উপর সেই পরিমাণ ধার্য করতে পারি, যার সে অধিকারী ও মালিক। সেই সাথে একই মালের উপর দুইবার যাকাত ফরয হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষাও পাওয়া যায়। কেননা যে পরিমাণ মালের যাকাত জমি মালিক দিয়েছে, তা কেরায়াদারের অংশ থেকে বাদ দেয়া হবে।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটি স্পষ্ট করে তোলা যেতে পারে। একটি লোক দশ ফেদান বা একর পরিমাণ জমির মালিক। সে তা ভাড়া দিল তাতে ধান উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে। আর তার ভাড়া হল ২০ জনীহ। জমিতে ১০০ 'আরদব' ধান উৎপন্ন হল। প্রতি আরদবের মূল্য হল ৪ জনীহ। এক্ষণে এ মালিক ও কেরায়াদার এর যাকাত দেবে কিভাবে?

কেরায়াদার মোট উৎপাদন থেকে ভাড়া পরিমাণ ফসল—৫০—আরদব—(৫০×৪=২০০ জনীহ তা থেকে ১০×২০=২০০ ভাড়া) বের করে নেবে। আর সে যেহেতু এ ফসল উৎপাদনে বীজ ও সার বাবদ ব্যয় করেছে আরও ৪০ জনীহ (যা ১০ আরদব সমান)। ফলে তার জন্যে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে অবশিষ্ট থাকবে ৪০ আরদব। আর তার উপর ফরয যেহেতু অর্ধ-ওশর, তাই সে তা থেকে ২ আরদব যাকাত দেবে। আর জমির মালিক তার প্রাপ্ত ২০০ জনীহর যাকাত দেবে। তর উপর যদি খারাজ বা কর দেয় থাকে, যা ৪০ জনীহর সমান, তাহলে তার কাছে অবশিষ্ট থাকবে = ১৬০ জনীহ। অতএব এক্ষণে তার দেয় হবে অর্ধ-ওশর বাবদ ৮ জনীহ।

আমি এ মতটি ১৯৬৩ সন থেকে লিখে আসছি। কিন্তু জামে আযহারের বহু আলিমই তা গ্রহণ করেন নি। শেষ পর্যন্ত শায়খ আবূ জুহরা লিখিত تنظيم الاسلام للمجتمع নামক গ্রন্থের ১৫৯ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কথাগুলো পড়লাম ঃ

> এ যুগের কতিপয় আলিম যাকাত ব্যবস্থা পর্যায়ে প্রস্তাব করেছেন যে, জমি মালিক ও কেরায়াদার উভয়ের কাছ থেকেই যাকাত গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকের কাছে সর্বশেষে সকল দায়মুক্ত অবস্থায় যা প্রাপ্ত হবে—মালিকের কর-খাজনা ইত্যাদি বাদ দিয়ে এবং কেরায়াদারের চাষ সংক্রান্ত যাবতীয় দায়দায়িত্ব বাদ দিয়ে তারই যাকাত গ্রহণ করা হবে। আমি সর্বশেষ এ মতটি পছন্দ করছি ও অগ্রাধিকার দিচ্ছি।

অর্থাৎ তিনি আমার উপরিউক্ত প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন।

দশম আলোচনা

ওশর ও খারাজ

হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ কৃষি ফসল ও ফলে ওশর বা অর্ধ-ওশর ফরয হওয়ার ব্যাপারে শর্ত আরোপ করেছেন যে, জমি ওশরী হতে হবে—খারাজী হবে না। জমি খারাজী হলে তার উপর বার্ষিক যে খারাজ ধার্য রয়েছে, তা ছাড়া আর কিছু তার উপর ধার্য হবে না। আর একালে তা হচ্ছে জমির মালিকানা কর বা খাজনা। কিন্তু এ অবস্থায় হানাফী ফকীহ্‌দের মতে জমির ফসলের উপর যাকাত—ওশর বা অর্ধ-ওশর ধার্য হবে না।

জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ এ মত মেনে নেন নি। তাঁরা সর্বপ্রকার জমির উপরই—তা ওশরী হোক, কি খারাজী—ওশর ফরয বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ কারণে এ পর্যায়ে আলোচ্য বিষয় হল ওশরী জমি কি, আর খারাজী জমি কি? এবং এ দুই শ্রেণীর ফিকাহ্‌বিদদের মতপার্থক্যের প্রকৃত কারণ কি। পরে তাঁদের প্রত্যেক পক্ষের দলীল উল্লেখ করা হবে এবং কোন্ মতটি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য তা-ও বিবেচনা করা হবে।

জমি কখন ওশরী হয়, কখন হয় খারাজী

ক. ওশরী জমি

আবূ উবাইদের আলোচনার দৃষ্টিতে নিম্নোক্ত কয়েক প্রকারের মধ্যে যে কোন প্রকারের জমি ওশরী হতে পারে ঃ

প্রথম প্রকার ঃ যে জমি-মালিকই ইসলাম কবুল করবে ও তারপরও সেই জমির মালিক থেকে যাবে সেই জমিই ওশরী জমি হবে। মদীনা, তায়েফ, ইয়েমেন ও বাহ্‌রাইন এবং মক্কার জমি এ পর্যায়ে গণ্য। তবে যে জমি সশস্ত্র যুদ্ধের পর দখল করা হয়েছে অথচ নবী করীম (স) জমির প্রাচীন মালিকদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের প্রাণের উপর হামলা করেন নি, তাদের ধন-মালও 'গনীমত' বানিয়ে নেন নি। শেষ পর্যন্ত যখন তাদের ধন-মাল নিষ্কৃতি পেল এবং তারাও পরে ইসলাম কবুল করল—এ সময় তাদের সব ধন-মাল তাদের মালিকানায়ই থেকে গেল এরূপ অবস্থায় তাদের জমি 'ওশরী' বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ যে জমিই বল প্রয়োগপূর্বক অর্থাৎ জমি মালিক ও মুসলমানদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পর মুসলিম কর্তৃক বিজিত হবে, পরে ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান সেই

জমিকে 'ফাই' রূপে গণ্য না করে তাকে 'গনীমত' গণ্য করে তার উপর এক পঞ্চমাংশ ফসল (খুমুস) দেয়রূপে ধার্য করেছেন এবং বিশেষভাবে বিজয়ীদের মধ্যে তার পাঁচ ভাগের চার ভাগকে বন্টন করে দিয়েছেন—যেমন নবী করীম (স) খায়বরের জমির ক্ষেত্রে করেছেন (যুদ্ধের পূর্বে তা সব ইয়াহুদীদের মালিকানাধীন ছিল)। এ জমি তাদেরই মালিকানা সম্পত্তিরূপে থেকে যাবে এবং তাতে ওশর ছাড়া আর কিছুই ধার্য হবে না। এমনিভাবে উপত্যকাসমূহ যখন তা বিজয়ীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে এবং তার উপর থেকে এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ যাদের নাম করেছেন তাদের দেয় প্রত্যাহার করা হবে, তাও ওশরী হবে।

তৃতীয় প্রকার ঃ সব প্রাচীন পড়ো জমি, যার মালিক বা আবাদকারী কেউ নেই, রাষ্ট্রপ্রধান তা লোকদের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করে বন্টন করে দিয়েছে। আরব উপদ্বীপের জমি যেমন, নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুন তাই করেছিলেন। ইয়েমেন, ইয়ামামা ও বসরা প্রভৃতি অঞ্চলের জমিও অনুরূপ।

চতুর্থ প্রকার ঃ মৃত জমি, কোন মুসলিম ব্যক্তি তা পানি ঢেলে আবাদ ও সঞ্জীবিত করে ফসল ফলিয়েছে।

এই সকল প্রকারের জমি সম্পর্কে রাসূলের সুন্নাত হচ্ছে, তা ওশরী বা অর্ধ-ওশরী জমি হিসেবে গণ্য হবে। হাদীসে এ সব কথা উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এ সব জমিতে যে ফসল দেবেন, তা পাঁচ অসাক্ বা ততোধিক হলে তাতে ওশর ধার্য হবে এবং আল্লাহ্ যাকাত বন্টনের যে আটটি খাত নির্ধারণ করেছেন, সে অনুসারে তা বন্টন করা হবে।

খারাজী জমির বিভিন্ন প্রকার

আবূ উবাইদ বলেছেন, উপরোল্লিখিত জমিগুলো বাদে যে সব জমি রয়েছে, যা হয় জোর প্রয়োগ করে দখল করা 'ফাই'জমি—যেমন ইরাকের সওয়াদ, আহ্ওয়াজ, ফারেস, কিরমান, ইসফাহান, রায় এবং সিরিয়া, মিসর ও মাগরিব এলাকার জমি অথবা তা হবে সন্ধির মাধ্যমে পাওয়া জমি। যেমন, নাজরান, 'আইলা আযরাহ, দওমাতুল জন্দাল ও ফিদাক প্রভৃতি এলাকার জমি। রাসূলে করীম (স) এই সব এলাকার অধিপতিদের সাথে সন্ধি করেছিলেন অথবা তাঁর পরবর্তী রাষ্ট্রকর্তাগণ তা করেছিলেন। যেমন, উপদ্বীপ এলাকা ও আরমেনিয়ার কোন কোন এলাকা এবং খোরাসানের অধিকাংশ অঞ্চল।

জমি মোটামুটি এই দুই ধরনেরই। সন্ধি ও শক্তি প্রয়োগে বিজিত জমি 'ফাই' হয়। তা সাধারণ মানুষের হয়ে যায়—দান হিসেবে ও সন্তানাদির খাদ্য যোগানের সূত্র হিসেবে। আর রাষ্ট্র প্রধান যে সব জমি জনগণের ব্যাপারাদি সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন তা।

অর্থাৎ এই দুই প্রকারের জমি থেকে খারাজ হিসেবে যা গ্রহণ করা হবে, তা সাধারণ রাষ্ট্রীয় বিভাগে রক্ষিত হবে এবং তা থেকে সেনাবাহিনী ও সরকারী কর্মচারীদের

বেতন-ভাতা ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হবে। আর সামগ্রিকভাবে জনগণের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।—উৎপাদন বৃদ্ধি অথবা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হবে।

যে জমি শক্তি প্রয়োগ করে জয় হয়েছে, যা দখল করার জন্যে মুসলমানেরা যুদ্ধ করেছে, মালিকদের সাথে কোন প্রকার চুক্তি করেনি, মুসলমান ও তাদের মধ্যে একমাত্র অস্ত্রই ছিল চূড়ান্ত ফয়সালাকারী' এই ধরনের জমির ব্যাপারে ইসলামের বিশেষ নীতি রয়েছে। কুরআন মজীদে এই জমি সংক্রান্ত নীতি বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (স) সেই নীতি বাস্তবায়ন শুরু করেছেন। হযরত উমরের আমলে সে নীতি অধিক স্পষ্ট ও পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত হয়েছে। সে নীতির সারকথা হল, মালিকানা ব্যক্তিদের হাত থেকে নিয়ে মুসলিম উম্মতের সমষ্টির হাতে তুলে দেয়া হবে। তা যেমন এই পর্যায়ের সমস্ত জমিতে কার্যকর হবে, তেমনি হবে সব পর্যায়ে ও যুগে। তা কখনই ব্যক্তি-মালিকানাভুক্ত হবে না, তা হবে মুসলিম জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত। তা এজন্যে যে, জমির মালিকানার একটা বড় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। এই পর্যায়ে উল্লেখ্য, ইসলাম-পূর্ব যুগে জমি বন্টনে চরম জুলুম করা হয়েছে। কেবল শাসক পরিবারের লোকেরাই সে সব জমি ভাগ-বন্টন করে নিত, নিত খুব ভালো-ভালো ও উচ্চ ধরনের জমিগুলো। আর কৃষক-চাষীরা নিতান্ত দাসানুদাসের মতই তাতে কাজ করত।

ইসলামী ফিকাহ্‌বিদদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এই জমিগুলো মুসলিম জনগণের জন্যে ওয়াক্‌ফ হবে। তার উপর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খারাজ ধার্য হবে, প্রতি বছর তা যথারীতি আদায় করা হবে। জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনুপাতে তার ভাড়া-খারাজ নির্ধারণ হবে। এই খারাজ যদ্দিন তারা নিয়মিত আদায় করতে থাকবে, তদ্দিন জমি সেই মালিকদের হাতেই থাকবে, তারা মুসলমান হোক, কি যিম্মী—অমুসলিম। মালিকরা ইসলাম কবুল করলেও এই খারাজ প্রত্যাহার করা হবে না। অমুসলিম এলাকা থেকে স্থানান্তরিত হলেও নয় (কেননা, তা-ই এই জমির ভাড়া)। অতএব তা চিরকাল 'খারাজী জমি' নামে অভিহিত হবে।

হযরত উমর ফারূক (রা) তাই করেছেন তাঁর সময়ে জয় করা ইরাক ও সিরিয়ার জমির ক্ষেত্রে। হযরত বিলাল (রা) ও অন্যান্য জয়লাভকারী মুজাহিদগণ সৈন্যদের মধ্যে গনীমতের মাল বন্টনের ন্যায় এই জমিও বন্টন করে দেয়ার দাবি করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা বন্টন করে দিতে অস্বীকার করলেন এবং তাদের কুরআনের আয়াত পাঠ করে শোনালেন ঃ

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা গ্রামবাসীদের থেকে যা কিছু তাঁর রাসূলকে 'ফাই' হিসেবে দেওয়ায়ে দিয়েছেন, তা আল্লাহ্র জন্যে, তাঁর রাসূলের জন্যে এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম. মিসকীন, ও নিঃসম্বল পথিকদের জন্যে—যেমন ধন-সম্পদ কেবলমাত্র তোমাদের ধনীদেরই কুক্ষিগত হয়ে না যায়।

পরে তিনি বলেছেন ঃ

لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ-

তা হবে সেই সব দরিদ্র ও মুহাজিরদের জন্যে, যারা তাদের ঘর-বাড়ি ও ধন-মাল সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত হয়েছে।

পরে পাঠ করলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَوَالْاِيْمَانَ مِنْقَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ-

আর যারা তাদের পূর্বে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ঘর ও ঈমানের, তারা ভালবাসে সেই সব লোককে যারা হিজরত্ করে তাদের কাছে এসেছে।

এরপর পাঠ করেলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاؤُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ-

আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের সেই ভাইদেরও ক্ষমা কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে।

পরপর এই চারটি আয়াত পাঠ করার পর হযরত উমর ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন ঃ তোমাদের পরে যারা আসবে এই 'ফাই' সম্পদে আল্লাহ্ তাদের শরীক বানিয়েছেন। কাজেই এখনই যদি এই সম্পদ তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিই তাহলে তোমাদের পরে যারা আসবে, তাদের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। জেনে রাখ, আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে সানয়ার অধিবাসী রাখালও এই 'ফাই' সম্পদ থেকে তার প্রাপ্য অংশ পেয়ে যাবে এবং তার মর্যাদা সুরক্ষিত থাকবে—তাকে ভিক্ষার লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে না।

কুরআনের আয়াত 'ফাই' সম্পদকে সমাজে দুর্বল-অক্ষম ও অভাবগ্রস্থ লোকদের মধ্যে বণ্টন করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছে এই বলে ঃ

ধন-সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ও কুক্ষিগত হয়ে না থাকে।

হযরত উমরের দীর্ঘকাল পরে সমাজবাদী ও সাধারণ কল্যাণকামী লোকেরা এই কথার যথার্থতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কুরআনের আয়াত ফাই সম্পদের সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ বন্টনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। উপস্থিত সে সব মুহাজির—যাঁরা তাঁদের ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত ও বহিষ্কৃত হয়েছেন এবং নিতান্ত অন্যায়ভাবে তাঁদের বিত্তসম্পত্তি হারাতে বাধ্য করা হয়েছে—তাদের অপরাধ তো ছিল শুধু এতটুকু যে, তাঁরা বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ই আমাদের রব্' এবং সে সব আনসার—যাঁরা তাঁদের মুহাজির ভাইদের জন্যে তাদের হৃদয় ও ঘরবাড়ি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাদের আশ্রয় ও সাহায্য দিয়েছিলেন, তারা নিজেরা দারিদ্রপীড়িত হয়েও; তাদের অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তাঁদের নিজেদের উপর—এঁদের জন্যেও 'ফাই' সম্পদের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল।

এ সময়ের লোকদের পরবর্তী বংশধরেরা—যারা আত্মত্যাগ করেছে তাদের জন্যেও তাতে অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। এ আয়াতটি এই নির্ধারণের ঘোষণা দিয়েছে ঃ

> যারা তাদের পরে এসেছে, বলছে ঃ হে আমাদের রব। আমাদের ক্ষমা কর, ক্ষমা কর আমাদের সেসব ভাইদেরও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের দিলে এ ঈমানদার লোকদের প্রতি কোনরূপ হিংসা সৃষ্টি করো না।

এসব আয়াত আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে, গোটা মুসলিম উম্মত অবিভাজ্য, পূর্ণাঙ্গ, তাদের স্থান ও সময়কাল যতই বিভিন্ন ও দূরবর্তী হোক না কেন, কালের অগ্রগতি যতই হোক, তারা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ। প্রথম দিকের লোকেরা শেষের দিকে আগতদের কল্যাণের জন্যে কাজ করবে, তারা বৃক্ষ রোপণ করবে, যেন পরে আসা লোকেরা তা থেকে ফল আহরণ ও ভক্ষণ করতে পারে। তাদের পরে যারা আসবে তারাও এ ধারাকে রক্ষা করবে। পূর্ব পুরুষেরা যা করে গেছে, পরবর্তী বংশধরেরা তা নিয়ে গৌরববোধ করবে এবং পূর্ববর্তীদের জন্যে আল্লাহ্র কাছে মাগ্ফিরাত কামনা করবে, অভিশাপ বর্ষণ করবে না।

ইসলামের ধন ও সম্পদ-সম্পত্তি বন্টনের এ নীতি পুঁজিবাদের উপর কঠিন আঘাত হানছে। কেননা পুঁজিবাদে শুধু বর্তমানের কিছু লোকের স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা বিধান করা হয়; কিন্তু পরে যারা আসছে, তাদের জন্যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রও বেশীর ভাগ লোককেই বঞ্চিত রেখে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীনের একচেটিয়া ভোগ-সম্ভোগে সমগ্র জাতীয় সম্পদকে উৎসর্গীকৃত করে দেয় এবং সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার পথ রুদ্ধ করে দেয়।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল উমর ফারূক (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—যখন তিনি প্রথমত ওসব জমি বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করার ইচ্ছা করেছিলেনঃ

> আল্লাহ্র নামের শপথ, এখন তো তাই হবে, যা আপনি পছন্দ করেন না। আজ যদি এ সব সম্পত্তি এখানকার লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেন, তাহলে লোকদের হাতে বিরাট সম্পদ এসে যাবে, তারা তা ভোগ দখল করতে থাকবে। পরে তা এক ব্যক্তি

ও এক স্ত্রীলোকের হাতে এসে যাবে। পরে বহু লোক আসবে, যারা কোন জিনিসই পাবে না। তাই এমন একটা উপায় ও পন্থা বের করুন, যা আগের ও পরের সব লোকের জন্যেই কল্যাণকর হবে।'—পরে হযরত উমর হযরত মুআযের এ কথার উপর গুরুত্ব দেন।

যারা এ সম্পদকে গোটা উম্মতের জন্যে ওয়াক্‌ফ করার পথে বাধা দিয়েছিলেন, তাদের লক্ষ্য করে হযরত উমর বললেনঃ পরে যারা আসবে এ উম্মতের লোক, তারা কিছুই না পাক, তা-ই কি তোমরা চাও?'

বস্তুত শক্তি প্রয়োগে যে সব এলাকা বা জমি দখল করা হয়েছে, তা সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছে বলে আমরা জানি না—কেবল-মাত্র 'খায়বর' ছাড়া। নবী করীম (স) তার অর্ধেক বন্টন করে দিয়েছিলেন, তা তাদের মালিকানায় চলে গেল, তার খারাজও তাদের দিতে হত না। এ ছাড়া হযরত উমর ও তৎপরবর্তীকালে যা-ই শক্তি প্রয়োগে দখল করা হয়েছে,—তার কোনটিই বন্টন করা হয়নি। সিরিয়া, ইরাক ও মিসর প্রভৃতি এলাকার জমি তার দৃষ্টান্ত।

খারাজী জমি ক্রয় ও বিক্রয়

ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত যে, খারাজী জমি ক্রয় বা বিক্রয় করা জয়েয নয়। কেননা তা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি। ওৎবা ইবনে ফারকদ খারাজী জমি ক্রয় করেছিলেন বলে হযরত উমর তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি এ জমি কার কাছ থেকে কিনলে? বললেন, তার মালিকদের কাছ থেকে।' পরে মুহাজির ও আনসারগণ একত্রিত হলে তাদের লক্ষ্য করে বললেন, 'এরাই হচ্ছে খারাজী জমির মালিক।' তুমি এদের কাছ থেকে কিছু ক্রয় করেছ? বললেন 'না'। বললেন, 'তাহলে তুমি যার কাছ থেকে তা ক্রয় করেছ, তাকে তা ফেরত দাও এবং তোমার টাকা তুমি ফেরত নিয়ে নাও।'

কেউ কেউ বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান যদি শক্তি প্রয়োগে দখল করা জমি তার মালিকদের হাতেই রেখে দেন, তাহলে উত্তরাধিকার নিয়মে তার উপর মালিকানা চলবে এবং তারা তা বিক্রয়ও করতে পারবে। দলীল হিসেবে উল্লেখ করা যায়, হযরত ইবনে মাসউদ একজন সামন্তের কাছ থেকে জমি ক্রয় করেছিলেন এই শর্তে যে, তার খারাজ সে নিজে দিয়ে দেবে।

অনেকে আবার বিক্রয় করা নাজায়েয বলেছেন, কেবল ক্রয় জায়েয বলেছেন। কেননা তাতে যিম্মিদের কাছ থেকে জমি খালাস করে নেয়া হয়। ফলে তা যার হাতে ছিল, সে তার স্থলাভিষিক্ত হবে।

ইবনে কুদামাহ বলেছেন, 'ক্রয় জায়েয' বলেছি। কেননা তা ক্রয়কারীর হাতে আসবে, যা বিক্রেতার হাতে ছিল, তার বিনিময়ে সে তার খারাজ আদায় করবে। এখানে 'ক্রয়' অর্থ, কোন কিছুর বিনিময়ে বিক্রেতা থেকে ক্রয়কারীর হাতে মালিকানা এসে

যাওয়া। খারাজ দেয়া বিক্রেতার দায়িত্ব—যেমন ইবনে মাসউদ বলেছিলেন—তাহলে তা কার্যত ভাড়ায় নেয়া হবে, ক্রয় করা নয়। তখন তাতে মেয়াদের উল্লেখ হওয়া বাঞ্ছনীয়—যেমন ক্রয়ে হয়ে থাকে।

পরে বলেছেন, এ জমি যখন বিক্রয় হবে—শাসন কর্তৃপক্ষ তার বিক্রয় যথার্থ বলে ঘোষণা করবে,—তখন তা সঠিক বলে গৃহীত হবে। কেননা ব্যাপারটি বিরোধপূর্ণ ছিল। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ফলে তা যথার্থ হয়ে গেল, যেমন সব ইজতিহাদী ব্যাপারে হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান যদি তার বিবেচনা মত কোন কল্যাণের জন্যে তা বিক্রয় করে, যেমন জমির কোন সংস্কারের প্রয়োজন আর তা করবে কেবল সে, যে তা ক্রয় করবে, তাহলে তা বিক্রয় করা ঠিক হবে। কেননা সেটা রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ।

সমর্থনের মাধ্যমে খারাজ ধার্যকরণ

এই আলোচনায় খারাজী জমির প্রকৃতি ও হযরত উমর (রা)-এর সময় থকে এ ব্যাপারে মুসলমানদের দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, তা গোটা মুসলিম উম্মতের সম্মিলিত সম্পত্তি। তার মালিক বলে পরিচিত লোকেরা তার শুধু দখলের মালিক, প্রকৃত মালিকানা তাদের নয়। আর তার উপর ধার্য খারাজ তার ভাড়া সমতুল্য। তা ইসলামী রাষ্ট্রকে দিতে হবে মুসলিম জনগণের সাধারণ কল্যাণে ব্যয় করার জন্যে। মূল খারাজী জমির উন্নয়ন, তার সহজ উৎপাদন, তার পানি প্রবাহের সংস্কার এবং উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে করা যাবতীয় কাজ এ পর্যায়ে গণ্য।

এ সব জমির ভোগ দখলকারীরা পরে যদি ইসলাম কবুল করে কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে তার মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে যায়, তাহলেও তার উপর ধার্য খারাজ বহাল থাকবে। সর্বকালের সব ফিকাহ্‌বিদই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। কোন একজনের মালিকানাও তা প্রত্যাহার করতে পারে না। কেনন' তা সর্বযুগের মুসলিম উম্মতের মালিকানা। কোন এক যুগের লোকেরা তার উপর এককভাবে মালিক হয়ে বসতে পারে না এবং পরবর্তী যুগের লোকদেরও যে হক তার উপর রয়েছে, তা প্রত্যাহৃত হতে পারে না।

ওশর ও খারাজ কি একসাথে ধার্য হতে পারে

একটা ফিক্‌হী সমস্যা দেখা দিয়েছে এ নিয়ে। এটা জানা কথা যে, কোন মুসলমান যদি কোন জমি চাষ করে, তার কর্তব্য তার ফসলের ওশর বা অর্ধ-ওশর আদায় করা। একটা সুনির্দিষ্ট যাকাত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, খারাজ দেয়া হচ্ছে, তারপরও কি ওশর দিতে হবে, না এ দুটির একটি মাফ হয়ে যাবে?

খারাজ তো চিরন্তন ব্যবস্থা, স্থায়ীভাবে চাপানো আছে। তা প্রত্যাহার করার কোন পথ নেই। তা হলে কি ওশর ধার্য হবে নাকি দুটিই এক সঙ্গে ধার্য হতে পারবে?

হানাফী মত ও তার দলীল

ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদের মত হচ্ছে, খারাজ চাপানো থাকা অবস্থায় ওশর দেয়া ফরয নয়। কেননা তা ফরয হতে পারে কেবল খারাজী জমির উপর। লাইস ইবনে

সাদ, ইবনে আবূ শায়বা, শাবী ও ইকরামারও এ মতের প্রতি সমর্থন রয়েছে। তা হচ্ছে ওশর ও খারাজ উভয়ই একটা জমির উপর একত্রে ধার্য হতে পারে না। এ মতের কতিপয় দলীল এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

প্রথমত, ইবনে মাসউদ কর্তৃক নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

لَا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِىْ اَرْضِ مَسْلِمٍ-

কোন মুসলমানের এক জমির উপর ওশর-খারাজ উভয়ই একসঙ্গে ধার্য হতে পারে না।

এই দলীলটিই এই প্রসঙ্গে যথার্থ ও কাম্য।

দ্বিতীয়ত, আবূ হুরায়রার বর্ণনা, নবী করীম (স) বলেছেন, 'ভবিষ্যত ইরাক তার দেয় দিরহাম ও 'কফীজ' (একশ' চল্লিশ হাত জমি), সিরিয়া তার 'মদী' (সিরীয় মাপ) ও দীনার এবং মিসর তার 'আরদব' ও দীনার দিতে অস্বীকার করবে। তখন তোমরা ফিরে আসবে যেখান থেকে শুরু করেছিলে।' এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। আবূ হুরায়রার গোশ্ত ও রক্ত এর সাক্ষী। (মুসলিম, আবূ দাউদ)

হাদীসটি ভবিষ্যদ্বাণী পর্যায়ের। শেষ যামানায় ধার্য করা ফরয হক দিতে লোকেরা যে অস্বীকৃতি জানাবে, তা-ই বলা হয়েছে এ হাদীসে। তাতে প্রকারান্তরে হক-এর কথাটিও প্রমাণিত হল। এ হক হচ্ছে তার উপর ধার্য করা খারাজ। তা দিরহাম ও কফীজ হতে পারে, কিন্তু ওশর নয়। যদি ওশর ফরয হত, তাহলে এর সঙ্গে তারও উল্লেখ করা হত।

তৃতীয়ত, তারেক ইবনে শিহাব বলেছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব বাগদাদের এক বিশাল পরগনার সরদারদের সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ 'তোমরা তাদের জমি তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও, তারা তার খারাজ দিতে থাকবে।' এই চিঠিতে তিনি খারাজ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, ওশর গ্রহণের নয়; তা যদি ফরয হত তাহলে নিশ্চয়ই তার আদেশ দিতেন।

চতুর্থত, ওশর ও খারাজ একত্র না করার নীতি হযরত উমরের সময় থেকেই পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হয়ে এসেছে অব্যাহত ও অক্ষুণ্নভাবে। সাহাবিগণও তা সমর্থন করেছেন। সওয়াদ এলাকার জমির খারাজ ব্যবস্থা তার দৃষ্টান্ত। কোন ন্যায়বাদী সুবিচারক রাষ্ট্রনেতা বা কোন জালিম শাসকও সওয়াদের জমি থেকে ওশর গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। যদিও মুসলমানরা বিপুল পরিমাণ খারাজী জমির মালিক ছিলেন। কাজেই এর উপরই ইজমা হয়েছে। কার্যত তার বিরোধিতা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না।

পঞ্চমত, যে অর্থে খারাজ ফরয ও ওশর ফরয সেই অর্থে। আর তা হচ্ছে জমির চাষযোগ্য ও প্রবৃদ্ধিপ্রবণ হওয়া। এজন্যে জমি যদি লবণাক্ত ও অনুর্বর নিষ্ফল হয়

তাহলে তাতে খারাজ বা ওশর কোনটাই ফরয হবে না। তা থেকে বোঝা গেল যে, ফরয হওয়ার মূল কারণ হল জমির প্রবৃদ্ধি প্রবণতা। যাকে কথায় বলা হয় 'জমির খারাজ'—'জমির ওশর'। এরূপ বলা তো নিশ্চয়ই কারণভিত্তিক। তাই এই দুটিই একত্রে চাপানো যেতে পারে না। যেমন কেউ যদি ব্যবসায়ের নিয়তে এক বছরের জন্যে নিসাব সংখ্যক গবাদিপশুর মালিক হয়, তাহলে তাকে নিশ্চয়ই দুটি যাকাত দিতে হবে না। কেননা একই কারণে একই মালে একই সময় দুটি যাকাত ধার্য করা নিষিদ্ধ। নবী করীম (স)-এর হাদীসে বলা হয়েছেঃ لا ثنى فى الصدقة যাকাতে দ্বৈততা নেই।

ষষ্ঠত, খারাজ মূলত কুফরের কারণে ধার্য হয়ে থাকে। যে জমি শক্তিবলে জয় করা হয়েছে এবং তার মালিকদেরই তাতে অবস্থিত ও ভোগদখলকারী হিসেবে থাকতে দেয়া হয়েছে, সেই জমির উপরই খারাজ ধার্য হয়। পক্ষান্তরে ওশর ধার্য হয় ইসলামের কারণে। কেননা তা ইবাদত। আল্লাহ্র শোকর আদায় মালিকের ধন ও মালের পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা বিধানের উদ্দেশ্যেই তা ফরয হয়। তাই এ দুটি ফরয হওয়ার মৌল কারণের দিক দিয়েই পরস্পর পরিপন্থী। অতএব এ দুটি কখনই একত্রিত হয়ে একটি জমির উপর ধার্য হতে পারে না।

জমহুর ফিকাহ্বিদদের অভিমত

মুসলিম উম্মতের জমহুর আলিমগণ মত দিয়েছেন যে, ওশর একটা অনিবার্য ফরয। তা খারাজ ধার্য হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। তাঁদের দলীল এই—

প্রথম, যে সব সাধারণ স্পষ্ট অকাট্য দলীল জমির ফসলের উপর যাকাত (ওশর) ফরয করেছে, তাতে জমির বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ-

হে ঈমানদার লোকেরা। তোমরা ব্যয় কর তোমাদের পবিত্র উপার্জন এবং তোমাদের জন্যে জমি থেকে যা উৎপাদন করে দিয়েছি তা থেকে।

বলা হয়েছে ঃ

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ-

তাঁর হক দিয়ে দাও তা কাটাই-মাড়াইর দিন।

সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

'আকাশের মেঘ যাই সিক্ত করে তাতেই ওশর।'

শরীয়াতের এসব অকাট্য দলীল সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। জমির সর্বপ্রকারের উৎপাদন, কাটাই-মাড়াই করা হয়েছে এবং যা-ই আকাশের পানিতে সিক্ত হয়—এই পর্যায়ের সবগুলোই এর অন্তর্ভুক্ত। জমি ওশরী হোক কি খারাজী, তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। খারাজ ধার্য হয় জমির উপর চাষাবাদ করা হোক, আর না-ই হোক—তা মুসলমানের মালিকানা হোক কি কাফিরের। আর ওশর হচ্ছে বিশেষভাবে ফসলের উপর ধার্য—যদি তার মালিক মুসলমান হয় তবে।

দ্বিতীয়ত, ওশর খারাজ দুই স্বতন্ত্র প্রকৃতির হক। দুটি ভিন্ন ভিন্ন কারণে তা ধার্য হয়। একটির ফরয হওয়া অপরটির ধার্য হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়।

কেননা খারাজ ধার্য হওয়ার কারণ হচ্ছে ব্যবহার করা ও ফসল ফলানোর কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়া। আর ওশরের কারণ হচ্ছে ফসল লাভ। ওশরের সম্পর্ক সরাসরি ফসলের সাথে। আর খারাজ সম্পর্কিত যিম্মী হওয়ার সাথে। ওশর ব্যয়ের ক্ষেত্র কুরআনের ঘোষিত যাকাতের আটটি খাত। আর খারাজ ব্যয়ের ক্ষেত্র সৈন্য, কর্মচারী ও রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যয় ও জনকল্যাণমূলক কাজ। সম্পর্ক ও ব্যয়-ক্ষেত্রের দিক দিয়ে দুটি যখন ভিন্ন ভিন্ন এবং দুটির মধ্যে যখন কোন বৈপরীত্য নেই, তখন দুটিরই একসাথে ধার্য হওয়া না-জায়েয হতে পারে না। যেমন দোকানের ভাড়া ও মালের যাকাত একই সাথে দিতে হচ্ছে।

ইহ্‌রাম বাধা থাকা অবস্থায় যদি কেউ অন্য লোকের মালিকানাভুক্ত শিকার হত্যা করে, তাহলে তার কাফফারা দিতে হবে জন্তু হত্যার সমপরিমাণ, সেই সাথে অতিরিক্ত দিতে হবে মালিককে তার জন্তুর মূল্য বাবদ।—এ-ও তেমনি।

তৃতীয়, কুরআন ও সুন্নাহের অকাট্য স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে ওশর ফরয হয়েছে। এমতাবস্থায় ইজতিহাদের সাহায্যে খারাজ ধার্য করা নিষিদ্ধ হতে পারে না।

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার দান

সত্যি কথা, জম্‌হুর ফিকাহ্‌বিদদের মত সুস্পষ্ট ও সহীহ দলীলের উপর ভিত্তিশীল। তার প্রমাণে কোন দুর্বলতাই নেই। হানাফী ফিকাহবিদগণ এ সব দলীলের মুকাবিলায় যথেষ্ট ও অকাট্যভাবে গ্রহণযোগ্য কোন দলীল উপস্থাপিত করতে পারেন নি। জমির উপর খারাজ ধার্য হওয়ার কারণে মুসলমানকে তার ফসল ফলের উপর ওশর ধার্যকরণ থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার ব্যাপারটি বোধগম্য নয়। বস্তুত যাকাত হচ্ছে ইসলামের সুদৃঢ় ইমারত, তিনটি মৌল বিধানের অন্যতম এবং তার বড় বড় প্রতীকের একটি। ইবনুল মুবারক কুরআনের আয়াত ومما اخرجنا لكم من الاوض 'আর জমি থেকে যা তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেছি' পাঠ করে বললেন, ইমাম আবূ হানীফার কথা মেনে নিয়ে আমরা কি আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ অমান্য করব?

হানাফী মতের পক্ষে এছাড়া আর যেসব দলীলের উল্লেখ করা হয়েছে, পেশ করা হয়েছে যে সব প্রমাণ, জম্‌হুর ফিকাহ্‌বিদগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তার দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়েছেন বিস্তারিতভাবে। নিম্নে তা বিবৃত হল।

১. 'ওশর ও খারাজ একসাথে ধার্য হবে না'—এ মর্মের হাদীসটি—যেমন ইমাম নববী বলেছেন, বাতিল, এর দুর্বল হওয়া সর্বসমর্থিত। এ হাদীসটি এককভাবে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আম্বাসাতা, আবূ হানীফা, হাম্মাদ, ইবরাহীম নখ্য়ী, আলকামা এবং ইবনে মাসউদ—নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আম্বাসাতা যে দুর্বল বর্ণনাকারী, তা সর্বজনবিদিত। কেননা তিন মওজু (মনগড়া) 'হাদীস' সিকাহ্ বর্ণনাকারীর নামে বর্ণনাকরণের অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম সুয়ূতী ইবনে আব্বাস ও ইবনে আদী সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা দুজনই উপরিউক্ত কথাটিকে বাতিল ঘোষণা করে বলেছেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ছাড়া আর কেউ-ই তা বর্ণনা করেন নি, সে দাজ্জাল।

২. উপরে উল্লিখিত ও হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম নববী লিখেছেন, আগের ও পরবর্তীকালের আলিমগণের গ্রন্থাবলীতে এর দুটি প্রখ্যাত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে, ওরা শীঘ্রই ইসলাম কবুল করবে এবং তাদের উপর থেকে জিযিয়া প্রত্যাহার করা হবে।

আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, শেষ যামানায় যে সব ফিতনার সৃষ্টি হবে, হাদীসটি সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপিত করেছে। ভবিষ্যতে তারা ফরয অধিকারসমূহ দিতে অস্বীকার করবে। যাকাত জিযিয়া ইত্যাদি দেয়া থেকে বিরত থাকবে। তাদের ধারণা মতেই যদি হাদীসের অর্থ হত, তাহলে তো দিরহাম-দীনার—নগদ অর্থ ও ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাতও ফরয হত না। কিন্তু সে কথা কেউই বলেন নি।

৩. বাগদাদের পরগনা সংক্রান্ত কাহিনীর তাৎপর্য হল, তাদের কাছে থেকে খারাজ নিতে হবে। কেননা তা হচ্ছে ভাড়া, তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে তা প্রত্যাহার করা যেতে পারে না। আর তদ্দরুন 'ওশর' প্রত্যাহৃত হওয়ারও কোন প্রয়োজন হয় না। খারাজের উল্লেখ করা হয়েছে এজন্যে যে, তারা ভুলবশত মনে করে নিয়েছিল, ইসলাম গ্রহণের কারণে জিযিয়ার ন্যায় খারাজও নাকচ হয়ে যাবে। কিন্তু ওশর সম্পর্কে তো সকলেরই জানা যে, প্রত্যেক স্বাধীন মুসলমানের উপর তার ফরয, এ জন্যে তার উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। যেমন গবাদিপশুর যাকাতের উল্লেখ করা হয়নি। নগদ সম্পদে যাকাতের কথাও এখানে বলা হয়নি।

কেউ কেউ জবাবে বলেছেন, হযরত উমরের ভাষণ সম্ভবত তাদের জন্যে যারা খারাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ছিল, ওশরের উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। অথবা ওশর গ্রহণের সময়ে তা ছিল না কিংবা তার জন্যে সেই জিনিস ছিল না, যাতে ওশর ফরয হয়।

৪. তাদের এই দলীল—'সব রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রশাসকের স্থায়ী আমল ছিল। ওশর ও খারাজ একত্রিত না করার উপর এটা একটা ইজ্মার রূপ পরিগ্রহ করেছে'—গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা খলীফায়ে রাশেদ, উমর ইবনে আবদুল আযীয ওশর ও খারাজ একসাথে আদায় করেছেন, এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য।

আমর ইবনে মায়মুন থেকে বর্ণিত, তিনি উমর ইবনে আবদুল আযীযকে খারাজী জমির মালিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, 'জমি থেকে খারাজ গ্রহণ কর এবং ফসল থেকে ওশর গ্রহণ কর।'

শরীক বলেছেন, উমর এ কথা বলেছেন প্রশ্ন করার পর কিংবা তিনি পর্যন্ত এ কথা পৌঁছেছে; কেননা তিনি তো মাননীয়ও অনুসরণীয় ব্যক্তি ছিলেন।

হযরত উমর ও সাহাবিগণ খারাজের সঙ্গে ওশর গ্রহণ করেন নি, এ কথা সত্যি বটে। কিন্তু তার কারণ হচ্ছে, সেকালে খারাজী জমি ছিল কাফিরদের মালিকানাধীণ। কোন মুসলিম ব্যক্তি খারাজী জমির মালিক ছিল না; তাই যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের কাছ থেকেও ওশর গ্রহণ করেন নি—এই দাবির সমর্থনে কোন দলীল নেই।

৫. ওশর ও খারাজ ধার্য হওয়ার কারণ একটি কথা বলা ঠিক নয়। কেননা ওশর ধার্য হয় মূল ফসলের উপর, আর খারাজ হচ্ছে জমি বাবদ দেয়—তাতে ফসল করা হোক কিংবা না-হোক। অন্য কথায়, খারাজ ধার্য হওয়ার কারণ জমি থেকে ফায়দা নেয়ার ক্ষমতা লাভ। আর ওশর ধার্য হওয়ার কারণ ফসল বর্তমান থাকা।

৬. খারাজ কুফরীর শাস্তি স্বরূপ বিধিবদ্ধ হয়েছে, একথা বলাও কিছুমাত্র যুক্তিসঙ্গত নয়। আসলে তা জমির 'ভাড়া হিসেবেই ধার্য হয়, তার মালিক মুসলমান কি কাফির সে প্রশ্ন অবান্তর। খারাজ যদি শাস্তিই হত তাহলে তা কখনই মুসলমানদের উপর ধার্য হত না, যেমন জিযিয়া কখনই মুসলমানের উপর ধার্য হয় না। আর আধুনিককালের রাষ্ট্রসমূহ যে দেশবাসীর উপর 'ভূমিকর' বা 'ভুমি মালিকানা কর' ধার্য করে, তা কখনই শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে হয় না। তা হয় রাষ্ট্রীয় ব্যয় বহনে তাদের আর্থিকভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ দানের লক্ষ্যে। কাজেই খারাজ ও ওশর-এ দুটোর পথ ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী, এ কথা বলা কোনক্রমেই যক্তিসঙ্গত হতে পারে না। খারাজ হচ্ছে জমির ভাড়া, আর ওশর হচ্ছে ফসলের যাকাত, এ দুটির মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য নেই। কোন জমির ভাড়ার বিনিময়ে গ্রহণ করে তাতে চাষাবাদ করা হলে যেমন হয়।

উৎপাদন থেকে খারাজ বাদ দিয়ে অবশিষ্টের যাকাত দান

খারাজ ধার্য হলে জমির ফসলের ওশর ধার্য হওয়া যখন নিষিদ্ধ নয়, তখন খারাজকে ফসলের উপর ঋণ ধরে জমির মোট উৎপাদন থেকে তা বাদ দিতে হবে। তারপরে অবশিষ্ট পরিমাণ নিসাব মাত্রার হলে তার যাকাত দিতে হবে।

এক্ষণে খারাজী জমি কোথায়

এক্ষণে ইসলামী বিশ্বের মানচিত্রে একটা বাস্তববাদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে হবে, ফিকাহ্‌বিদ ও ঐতিহাসিকগণ যে জমির প্রকৃতির পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলেছেন তা খারাজী, তা এক্ষণে কোথায় অবস্থিত। যেমন মিসর, সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি দেশের জমি। প্রাথমিককালের মুসলমানরা এসব এলাকা দখল করেছিলেন এবং সে সবের ভোগ দখলকারীদের হাতেই তা রেখে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন হল, এসব জমি কি এখনও খারাজী হয়ে আছে? যার দরুন হানাফী ও অন্যান্য ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে উপরিউক্ত ধরনের মতবিরোধ হচ্ছে? .... অথবা সে জমি প্রকৃতি পরিবর্তন করে অন্যান্য সাধারণ জমির মতই হয়ে গেছে, ফলে তাতে ওশর ধার্য হওয়ার সুযোগ হয়েছে?

শেষ যামানার বহু হানাফী মতের ফিকাহ্‌বিদ ফতওয়া দিয়েছেন যে, মিসর ও সিরিয়ার সেসব জমি এখন আর খারাজী থাকেনি। সেসব জমির তখনকার মালিকরা সব মরে গেছে, এক্ষণে তা বায়তুলমালের সম্পত্তি! অতএব তার উপর থেকে 'খারাজ' উঠে গেছে। তারপর বায়তুলমাল থেকে তা কেউ যথাযথভাবে ক্রয় করে নিলে, তবে তার মালিক হবে এবং তার উপর 'খারাজ' ধার্য হবে না। খারাজ ফরয হবে না তার উপর। কেননা রাষ্ট্র সরকার মুসলমানদের জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

তাই 'খারাজ' যখন প্রত্যাহার হল, তখন ওশর তার উপর উপবিষ্ট থাকল। কেননা মুসলমানদের মালিকানাভুক্ত সব জমির আসল অবস্থাই তাই। তা কুরআন ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

আর বাস্তব কথা হচ্ছে, এ কালের সব রাষ্ট্র সরকার সর্ব রকমের কৃষিজমির উপর একটা বিশেষ ধরনের 'ভূমিকর' বা খাজনা ধার্য করে থাকে। সে জমি মূলত খারাজী ছিল কি ওশরী—সেদিকে কোন দৃষ্টিপাত করা হয় না। ফলে সব জমিই সমান ও অভিন্ন পর্যায়ে এসে গেছে। এক্ষণে সংগতিপূর্ণ কাজ এই হতে পারে যে, মুসলমানের মালিকানাভুক্ত সব জমির উপরই ওশর কিংবা অর্ধ-ওশর ধার্য করতে হবে—যদি তাতে নিসাব বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ ফসল ফলে। আর ধার্যকৃত ভূমিকর তো মালিককে দিতেই হবে। তাই ওশর বা অর্ধ-ওশর দিতে হবে জমির উৎপাদিত ফল ও ফসল থেকে।

ওশর ও খারাজ একত্র হওয়া সম্পর্কে একালের বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গী

জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মতামত ব্যক্ত ও স্পষ্ট হওয়ার পর এ সম্পর্কে একালের ফিকাহ বা আইনবিদদের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

ডঃ আহ্‌মাদ সাবিত উয়াইজাহ্‌ একটি আলোচনায় বলেছেন; 'এদিকে ইংগিত করা আমাদের কর্তব্য যে, মুসলমানরা যখন খারাজ বিধান ও ফসলের যাকাত বিধানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, তখনই কৃষি ফসলের আমদানী ও জমির আমদানীর পার্থক্য করেছেন। এ পার্থক্যটিকে বিংশ শতক ধরনের কর এর ভিত্তিরূপে গণ্য করা যেতে পারে। প্রায় সব দেশেই জমির মালিকের আমদানী এবং ভাড়ায় লাগালে সে বাবদ প্রাপ্ত পরিমাণের ভিত্তিতে এক প্রকারের কর ধার্য হয়ে থাকে। আর অপর একটি কর ধার্য হয় ফসল বাবদ আমদানীর উপর। জমিতে ফসল ফলালে যে ফসল জন্মে তার ভিত্তিতে এ কর ধার্য হয়, সে জমি মালিক নিজেই সেই ফসল ফলাক, কিংবা কেউ তা ভাড়ায় নিয়ে ফলাক। জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ জমির মালিকের আমদানী কর হিসেবে খারাজকে গণ্য করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন, কৃষি ফসল ও ফলের যাকাত (ওশরটা) কৃষি ফসলের আমদানীর

উপরই ধার্য কর বিশেষ। এই ভিত্তিতে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, কোন মুসলিম যদি কোন যিম্মীর মালিকানার জমিতে চাষাবাদ করে, তাহলে সে তার কৃষি ফসলের যাকাত নেবে, যেমন যিম্মী দেবে সেই জমির খারাজ। অনুরূপভাবে কোন মুসলমান যদি খারাজী জমির মালিকানা লাভ করে, তাহলে সে ওশর এবং খারাজ উভয় দেবে।

শায়খ মাহমাদ শালতুত তাঁর 'বিভিন্ন মাযহাবের তুলনা' শীর্ষক গ্রন্থে হানাফী দলীলের দুর্বলতা ও জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের প্রমাণের শক্তি স্পষ্ট করে তোলার এবং তাঁদের মতকে অগ্রাধিকার দেয়ার পর লিখেছেন ঃ

> এ কথা যখন জানতে পারলে যে, মুসলমানদের উপর ওশর একটা দ্বীনি ফরয হিসেবে ধার্য এবং খারাজ ধার্য ইজতিহাদ পদ্ধতিতে—যেন তা মুসলিম সমষ্টির জন্যে একটা সম্পদ হয় এবং তার দ্বারা জনগণের সাধারণ প্রয়োজন পূরণ করা যায়—সত্য নীতির ধারক শাসকের পক্ষে—যদি সে কল্যাণকর মনে করে ও প্রয়োজন বোধ করে—মুসলিম জনগণের উপর, যারা রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষণ পায় ও তার শক্তি ও আনুকূল্যে উপকৃত হয়—তাদের উপরও এমন একটা কর ধার্য জায়েয, যদ্দার সেই কল্যাণ সাধিত হতে পারবে ও প্রয়োজন পূরণ হতে পারবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর 'জিযিয়া' হিসেবে যে যাকাত ধার্য করেছেন তাদের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা বিধানের উদ্দেশ্যে, তা মুসলমানদের উপর ধার্য করণে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তারপর যদি খারাজও ধার্য হয়, তবে তাতে কুরআনের অকাট্য দলীলও সুস্পষ্ট সুন্নাতের ভিত্তিতে ফরয হওয়ার ব্যবস্থা তা আর বাদ দেয়া যেতে পারে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধু ও প্রাণী উৎপাদনের যাকাত

এই অধ্যায়ে চারটি আলোচনা ঃ

প্রথম আলোচনা ঃ মধুর যাকাত।

দ্বিতীয় আলোচনা ঃ কত পরিমাণে যাকাত বাবদ কতটা দিতে হবে?

তৃতীয় আলোচনা ঃ মধুর নিসাব পরিমাণ, এবং

চতুর্থ আলোচনা ঃ রেশম ও দুগ্ধ ইত্যাদি প্রাণীজাত সম্পদের যাকাত।

প্রথম আলোচনা

মধুর যাকাত

শুরু কথা

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যেসব উত্তম নিয়ামত দান করেছেন এবং খাদ্যপ্রাণ, নিরাময়তা ও স্বাদ আস্বাদনের উপকরণ হিসেবে যে সব সংরক্ষিত করেছেন, মধু সে সবের মধ্যে অন্যতম। একারণে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তাঁর একটি অনুগ্রহের দান হিসেবে তার উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ- ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً- يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ- (النحل - ٦٨- ٦٩)

লক্ষ্য কর, তোমার রব মধুমক্ষিকার প্রতি এ নির্দেশ ওহী করেছেন যে, পাহাড়-পর্বতে, গাছে ও উপরে ছড়িয়ে-থাকা লতাপাতায় নিজেদের ছাতা নির্মাণ কর। পরে সর্বপ্রকারের ফলের রস চুষে লও এবং তোমাদের রব কর্তৃক নির্ধারিত পথে নিয়মানুগভাবে চলতে থাক। এই মক্ষিকার ভিতর থেকে রঙ-বেরঙের পানীয় নির্গত হয়, তাতে রয়েছে মানুষের জন্যে নিরাময়তা। নিশ্চয়ই এ সমস্ত ব্যাপারে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে একটা নিদর্শন নিহিত রয়েছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এই মধুর যাকাত দিতে হবে কিনা, যেমন জমির উৎপাদিত ফসলের যাকাত দিতে হয়?

মধুর যাকাতের পক্ষে যাঁরা

ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গী-শাগরিদদের মত হচ্ছে, মধুর যাকাত দেয়া ফরয। কিন্তু মৌমাছির চাক খারাজী জমিতে গড়ে উঠলে তা ফরয নয়। কেননা খারাজী জমির তো খারাজ আদায় করা হয়। তাও আল্লাহ্র ধার্য করা হক, আর এই জমীনের উপর আল্লাহ্র দুটি হক এক সঙ্গে ও একই কারণে ধার্য হতে পারে না, তা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা, তা ওশরী জমি হোক, আর যা-ই হোক। যেমন মৌচাক যদি পাহাড়ে হয়, তাহলেও তাই। কেননা তাতে ওশর ধার্য রয়েছে।

ইমাম আহ্‌মদও বলেছেন, মধুর যাকাত দিতে হবে। ইমাম আহমদের কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ' মধুর যাকাত দেয়া ফরয, এটাই আমার মত। কেননা হযরত উমর (রা) মধুর যাকাত আদায় করেছেন।' লোকেরা হয়ত তখন ইচ্ছামূলকভাবে নফল হিসেবেই তা দিয়ে থাকবে, এই কথা বলা হলে তিনি বললেন, 'না, তা নয়। তিনি তা রীতিমত আদায় করেছেন।'

মকহুল, জুহরী, সুলায়মান ইবনে মূসা, আওযায়ী ও ইসহাক প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদও এ মতই প্রকাশ করেছেন।

এ মতের দলীল

প্রথমঃ মধুর উপর যাকাত ফরয হওয়ার যে মতটি উপরে উদ্ধৃত হল তার দলীল দুই ধরনের ঃ প্রথম, সাহাবীদের মত ও কথা এবং দ্বিতীয়, যুক্তি ও বিবেচনা।

ক. সাহাবীদের মত ও কথা পর্যায়ে উল্লেখ্য, আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত ঃ নবী করীম (স) মধু থেকে ওশর নিয়েছেন।' ইবনে মাজা এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন।

আবূ দাঊদ ও নাসায়ী হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, বনূ মাত্‌য়ান-এর হিলাল নামক এক ব্যক্তি তার মধুর ওশর নিয়ে রাসূলে করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হল এবং 'সালবা' নামক উপত্যকা তাকে দেয়ার জন্যে প্রার্থনা জানাল। ফলে নবী করীম (স) সেই উপত্যকা তাকে দিয়েছিলেন। হযরত উমরের খিলাফত আমলে সুফিয়ান ইবনে ওহাব এ বিষয়ে আপত্তি করে লিখেছিলেন। জবাবে তিনি লিখেছেন ঃ রাসূলের যুগে যে ওশর দেয়া হল, তা যদি সে রীতিমত দিতে থাকে, তাহলে 'সালবা' তার কাছে থাকতে দেবে। অন্যথায় তা বৃষ্টির মাছি, যার ইচ্ছা খাবে। ইবনে হাজারের মতে এ বর্ণনাটি সহীহ্।

খ. সুলায়মান ইবনে মূসা বর্ণনা করেছেন, আবূ সাইয়ারাতা বললেন ঃ 'ইয়া রাসূল! আমার মৌমাছির চাষ আছে।' রাসূল বললেন ঃ 'তার ওশর দিতে থাক।' বললেন ঃ 'হে রাসূল, এ ভূমির উপর দাঁড়ানো পাহাড় আমার তত্ত্বাবধানে দিয়ে দিন।' তখন নবী করীম (স) পাহাড়টিও তাকে মধু চাষের জন্যে দিয়েছিলেন। আহমদ ইবনে মাজা এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

গ. সাদ ইবনে আবূ যুবাব থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) তাঁকে তাঁর জনগণের উপর দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর লোকদের বললেন ঃ 'তোমরা মধুর যাকাত আদায় কর। পরে তিনি আদায়কৃত মধু হযরত উমরের কাছে নিয়ে আসেন। তিনি তা বিক্রয় করে তা মুসলমানদের যাকাত ফাণ্ডে জমা দিয়ে দিলেন। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি তাঁর লোকদের বললেন, 'যে মালের যাকাত দেয়া হয়নি, তাতে কোন কল্যাণ নেই।' তখন আমি প্রতি দশটি পাত্রের ওশর বাবদ একটি পাত্র ভর্তি মধু গ্রহণ করলাম এবং তা খলীফা হযরত উমরের কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তা মুসলমানদের থেকে

সংগৃহীত যাকাত ফাণ্ডে জমা করে নিলেন। ইবনুল আসরম বর্ণনা করেছেন, 'হযরত উমর তাঁকে মধুর ওশর নেয়ার জন্যে আদেশ করেছেন।'

ঘ. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম (স) বলেছেন, 'মধুর যাকাত প্রতি দশটি পাত্রের একটি।'

এ সব হাদীস ও সাহাবীদের আমল সংক্রান্ত বর্ণনার কোন কোনটি সূত্রের দিক দিয়ে যয়ীফ হলেও পরস্পর সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী এবং এ থেকে এ কথাও জানা যায় যে, বিষয়টির একটি ভিত্তি ও মৌলিক গুরুত্ব অবশ্যই আছে। ইবনুল কাইয়্যেম এ সব হাদীস এবং তার উপর অন্যান্যদের সমালোচনার উল্লেখ করে বলেছেন, ইমাম আহমদ ও তাঁর জামায়াতের মত হচ্ছে, মধুর যাকাত দিতে হবে। তাঁরা মনে করেন, এসব বর্ণনা পরস্পরের দ্বারা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এ সবের সূত্রও বিভিন্ন।

দ্বিতীয় ঃ বিবেক-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনাও এ মতের সমর্থন করে। কেননা মধু আসলে গাছ ও ফলের নির্যাস। তা যেমন মাপা যায়, তেমনি সঞ্চয় করেও রাখা যায়। অতএব তাতে যাকাত ধার্য হবে, যেমন শস্য ও খেজুরে হয়। বিশেষ করে এজন্যেও যে, তাতে মানুষের শ্রম শস্য ও ফল উৎপাদনের তুলনায় অনেক কম লাগে।

ইমাম আবূ হানীফার মতে ওশরী জমিতে মধু উৎপাদন করা হলে তাতে ওশর ধার্য হবে। তবে খারাজী জমিতে হলে তার যাকাত দিতে হবে না। কেননা মূলনীতি হচ্ছে, ওশর ও খারাজ একসঙ্গে ও একটি জমির উপর ধার্য হবে না। খারাজী জমিতে যেহেতু তার প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদন ক্ষমতার জন্যে খারাজ ধার্য হয়ে থাকে, তাই এ কারণেই তার উপর অপর একটি হক ধার্য হতে পারে না। আর ওশরী জমিতে এ পর্যায়ের কোন হক ধার্য হয় না। কাজেই যা ওশরী জমি, তাতে এ হক ধার্য হবে। কিন্তু ইমাম আহমদ এ ব্যাপারে দুই ধরনের জমির মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ধারণ করেন নি। তাই তিনি খারাজী ও ওশরী সর্বপ্রকার জমিতেই মধুর যাকাত ফরয বলে মনে করেছেন।

এ পর্যায়ে অন্যান্য মত

ইমাম মালিক, শাফেয়ী, ইবনে আবূ লায়লা, হাসান ইবনে আবূ সালেহ ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ মনে করেন, মধুর যাকাত দিতে হবে না। দুটি দলীল তাঁদের সমর্থনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ একটি—যেমন ইবনুল মুনযির বলেছেন, 'মধুর ওশর ফরয হওয়ার পক্ষে প্রমাণিত কোন হাদীস নেই, এ পর্যায়ে কোন ইজমাও অনুষ্ঠিত হয়নি। অতএব তাতে যাকাত হবে না।

দ্বিতীয়ঃ মধু তরল, প্রাণী নির্যাস। ফলে তা দুগ্ধের মত। আর দুগ্ধে যে কোন যাকাত ধার্য হয় না, তা সর্বসম্মত।

আবূ উবাইদের মত

ইসলামী অর্থনীতিবিদ আবূ উবাইদ উপরিউক্ত দুটি মতের মধ্যবর্তী মত গ্রহণ করেছেন। কেননা তাঁর দৃষ্টিতে এ পর্যায়ে উদ্ধৃত সমস্ত হাদীস ও সাহাবীর উক্তি পরস্পর বিরোধী। যদিও তাঁর বেশী ঝোঁক যাকাত ফরয হওয়ার দিকে।

মধুর যাকাত পর্যায়ে দুই ধরনের মতের উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ আমার দৃষ্টিতে সমস্ত দিক বিবেচনা করে এ মতই অধিক গ্রহণযোগ্য যে, রাষ্ট্রনেতাগণ মধুর যাকাত দেয়ার জন্যে লোকদের বলবে, তাদের উৎসাহ দেবে, তা না দেয়াকে ঘৃণ্য করে তুলবে তাদের কাছে। তবে তা গোপন করে রাখা হলে তাদের উপর দোষ চাপানো যাবে না। কেননা কোন জিনিস নিঃসন্দেহে ফরয প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা করা যায় না। যেমন জমির ও জন্তুর যাকাত পর্যায়ে করা যায়। মুধুর যাকাত দিতে রাযী না হলে সেজন্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা যাবে না, যেমন ফসল ও জন্তুর যাকাত না দিলে তা করা যায়। এরূপ কথা বলা হচ্ছে এ জন্যে যে, নবী করীম (স) থেকে এ পর্যায়ে কোন বলিষ্ঠ কথা সহীহ্‌রূপে প্রমাণিত হয়নি, যেমন অন্য দুটির যাকাত পর্যায়ে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি যাকাত বিষয়ে যেসব ফরমান লিখে পাঠিয়েছিলেন, তাতেও এর উল্লেখ নেই। আর তা যদি সেই পর্যায়ের বিধি হত, তা হলে তার সীমাও নির্দিষ্ট হত; যেমন জমির ফসলের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। পরবর্তী ইমামগণের মধ্য থেকেও এ পর্যায়ে কারোর কোন বলিষ্ঠ উক্তি পাওয়া যায়নি।

তবে এটা প্রমাণিত যে, মধু উৎপাদক যদি তার যাকাত নিয়ে আসে, তবে সরকারী বায়তুলমালে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যেমন হযরত উমর করেছেন।

পরে লিখেছেন, এ পর্যায়ে মোটমুটি কথা হচ্ছে, কেউ যদি মধুর যাকাত দিতে অস্বীকৃত হয়, তাহলে তার উপর জোর প্রয়োগ করা উচিত হবে না। কাউকে অরাযী করে আদায় করারও কোন হুকুম নেই।

মধুর যাকাত পর্যায়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত

এই গ্রন্থকারের মতে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, মধুও এক ধরনের সম্পদ। তার জন্যে যেমন শ্রম প্রয়োজন, তেমনি তাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহও নিহিত। তাই তা এমন সম্পদ, যার উপর যাকাত ফরয হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমাদের এ কথার দলীল হচ্ছে ঃ

ক. সর্বপ্রকার মাল-সম্পদে যাকাত সাধারণভাবে ফরয, তাতে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি। যেমন আল্লাহ্‌র নির্দেশ ঃ "লোকদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর।" তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমরা জমি থেকে তোমাদের যা দান করি তা থেকে ব্যয় কর" "এবং আমরা তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় কর" ইত্যাদি কুরআনের আয়াত।

খ. আল্লাহ্ তা'আলা কৃষি ফসল ও ফলে যে যাকাত ফরয করেছেন তার ভিত্তিতে বিবেচনা করলেও আমাদের উক্ত কথার সমর্থন মেলে। কেননা জমির ফসল উৎপাদনে যেমন আয় হয়, মৌচাকে উৎপাদিত মধু থেকেও তেমনি আয় হয়। আর আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, এ দুই প্রকারের আয়ের মধ্যে কোনরূপ তারতম্য করা যায় না, যেমন সমান ধরা যায় না ও এক করা যায় না দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে।

গ. এ পর্যায়ে যেসব হাদীস ও সাহাবীদের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে বিভিন্ন সূত্রে ও বর্ণনাভঙ্গীতে, তা পরস্পরকে শক্তিশালী বানিয়ে দিয়েছে। এ বর্ণনা যেমন বহু তেমনি সূত্রও অসংখ্য। এ কারণে ইমাম তিরমিযী এ পর্যায়ে উদ্ধৃত সমস্ত হাদীসকে পাইকারীভাবে অ-সহীহ বলেন নি। বরং বলেছেন ঃ 'এ পর্যায়ে অনেকগুলো বর্ণনাই নবী করীম (স) থেকে সহীহ্‌ভাবে প্রমাণিত।' তার অর্থ, অনেকগুলো সহীহ্ না হলেও বেশ কিছু কথা নিশ্চয়ই সহীহ্। পরে ইমাম তিরমিযী লিখেছেন, বহু সংখ্যক ইসলাম বিশেষজ্ঞই এই অনুযায়ী আমল করেন।

ইমাম শাওকানীও এই মতই দিয়েছেন, যদিও তিনি যাকাতের ক্ষেত্র প্রশস্ত করার পক্ষপাতী নন। বলেছেন, মধুর ওশর দেয়া ফরয। তাঁর ব্যাখ্যাকার সিদ্দীক হাসান লিখেছেন, 'ইমামের মতে এ পর্যায়ের সমস্ত দলীলই গ্রহণযোগ্য মানে উত্তীর্ণ নয়।

যাঁরা বলেছেন, মধু তরল পদার্থ ও প্রাণীনিঃসৃত বলে তা দুগ্ধের সমতুল্য, আর দুগ্ধে যাকাত ধার্য হয় না, সর্বসম্মতভাবে; তাঁদের জবাবে বলা যায়, মূলত দুগ্ধের মূল যে মুক্ত গাভী, তার যাকাত দেয়া ফরয কিন্তু মধুর যে মূল তার উপর যাকাত ফরয নেই। তাই তা দুগ্ধের মত তরল হলেও তার উপর যাকাত ফরয হবে।

দ্বিতীয় আলোচনা

মধুর যাকাতের পরিমাণ

মধুর যাকাত ফরয বলে যাঁরা মত দিয়েছেন, তাঁদের মতে তার দশ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হবে। পূর্বে এর দলীল উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন, কৃষি ফসলের এক-দশমাংশ ফরয হয়ে থাকে।

তাতে যে শ্রম ও অর্থ বিনিয়োজিত হবে, তা কি বাদ দিয়ে হিসাব করা যাবে?

হযরত উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মধুর ওশর পর্যায়ে বলেছেন যা খুব সহজে ও বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায়, তাতে ওশর—এক-দশমাংশ দিতে হবে। আর যা লালন ও পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদিত হবে, তার অর্ধ-ওশর দিতে হবে। অর্থাৎ যাকাতের পরিমাণ কম হওয়ায় শ্রম ও অর্থব্যয়ের একটা ভূমিকা আছে, যেমন কৃষি ফসলের ক্ষেত্রে হয়।

নাসের নামক এক আহলি বায়ত ফিকাহ্‌বিদ ছাড়া এ মতের বিরাধিতা আর কেউ করেন নি। তিনি বলেছেন, তাতে এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে, যেমন 'ফাই' সম্পদের হুকুম। কেননা তা মাপযোগ্য নয়, জমির পর্যায়েও নয়।

এই গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য মত হচ্ছে, যাবতীয় ব্যয় ও শ্রমের মূল্য বাদ দিয়ে অবশিষ্ট থেকে ওশর নিতে হবে, যেমন কৃষি ফসল ও ফলের ওশর সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা সবিস্তারে বলেছি।

তৃতীয় আলোচনা

মধুর নিসাব

মধুর নিসাব কি, এ পর্যায়ে কোন কথাই নির্দিষ্ট সীমার উল্লেখসহ উদ্ধৃত হয়নি। এ কারণে ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফার মতে কম হোক, বেশী হোক, সর্বাবস্থায়ই ওশর দিতে হবে। কৃষি ফসল ও ফলের ক্ষেত্রে তাঁর আসল মত তাই।

ইমাম আবূ ইউসুফ বলেছেন, সাধারণ মাপযোগ্য পাঁচ অসাকের মূল্য পর্যন্ত তার পরিমাণ পৌঁছলে তাতেই ওশর ধার্য হবে। অন্যথায় হবে না। মাপযোগ্য নয়, এমন জিনিসের ক্ষেত্রে অসাকের মূল্য ধরে হিসাব করাই তাঁর আসল নীতি। দশ 'রতল' হচ্ছে নিসাবের পরিমাণ, এ-ও তাঁর একটি মত। ইমাম মুহাম্মাদ থেকে যত বর্ণনা এসেছে, তাতে বলা হয়েছে, পাঁচ 'ফরক'—এক 'ফরক' ছত্রিশ 'রতল' পাঁচ 'মণ'—একমণে দুই 'রতল' পাঁচ 'কুরব্'—এক কুরব্ একশত রতল।

ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত, মধুর নিসাব হচ্ছে দশ 'ফরক্'। আর তাঁর মতে এক ফরক্ হচ্ছে ষোল 'রতল'। তাহলে নিসাব দাঁড়ায় একশত ষাট বোগদাদী 'রতল' আর একশ' চুয়াল্লিশ মিসরীয় 'রতল'।

এই গ্রন্থকারের মতে পাঁচ অসাকের মূল্য হিসেবে মধুর নিসাধ ধার্য হবে (অর্থাৎ ৬৫৩ কিলোগ্রাম অথবা ৫০ মিসরীয় কিলো)। শরীয়াতের বিধানদাতা কৃষি ফসল ও ফলের নিসাব নির্ধারণ করেছেন পাঁচ অসাক। মধুর নিসাবও তাই হবে এবং সেই পরিমাণ হলে তা থেকে ওশর নিতে হবে। তা হলে মধুর নিসাব হচ্ছে অসাক হিসেবে।

চতুর্থ আলোচনা

রেশম ও দুগ্ধ ইত্যাদি প্রাণীজাত সম্পদের যাকাত

মধুর যাকাত দেয়া ফরয বলে যাঁরা মত দিয়েছেন, তাঁদের মতকেই আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি এবং তা কুরআন-হাদীসের দলীলের সাধারণ ভাবধারার ভিত্তিতে। সেই সাথে কৃষি ফসলের উৎপাদনের উপর ধারণাটাও সম্মুখে রয়েছে এবং সাহাবিগণের উক্তি ও কার্য বর্ণনা—যা পরস্পরকে শক্তিশালী করে। তাহলে অন্যান্য প্রাণীজাত সম্পদ সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান কি হবে, সেটা প্রশ্ন।

একালে গবাদিপশু ছাড়া আরও বড় প্রাণীর কথা আমরা জানতে পেরেছি, যার উৎপাদন থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আয় করা সম্ভব। গুটি পোকাজাত রেশম এ পর্যায়েরই একট মূল্যবান সম্পদ। তা দিয়ে বহু মূল্যবান রেশমী কাপড় তৈরী হয়। মুরগীর ফার্ম এ কালের ব্যবসায়ের একটা বড় সূত্র, যেখানে বিপুল পরিমাণ ডিম লাভ করা যায়। অথবা মাংস সমৃদ্ধ মুরগীর উৎপাদন হয়। নবী করীম (স) ও সাহাবিগণ এবং তাঁদের পরবর্তী যুগে এসব ক্রমবৃদ্ধিশীল সম্পদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। আর এ কারণে শরীয়াতে এ জন্যে সরাসরিভাবে কোন হুকুমের উল্লেখও পাওয়া যায় না।

ফিকাহ্‌বিদগণ গবাদিপশুর দুগ্ধের উপর যাকাত ধার্য না হওয়া এবং মধুর উপর যাকাত ধার্য না হওয়ার কারণ স্বরূপ যা বলেছেন, তাতেই এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। এ দুটোই প্রাণীজাত। কিন্তু এ দুটোর মধ্যকার পার্থক্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, দুগ্ধের আসল উৎস গবাদিপশুর উপর যাকাত ধার্য রয়েছে, সে কারণে দুগ্ধের উপর ধার্য হবে না। কিন্তু মধু সেরূপ নয়। অর্থাৎ যার মূল্য বা আসল উৎসের উপর যাকাত ধার্য নেই, তার প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনের উপর যাকাত ধার্য হবে। গাভীর দুগ্ধ প্রভৃতি প্রাণীজাত সম্পদকে কিয়াস বকরতে হবে মৌমাছি জাত মধুর উপর। কেননা এ দুটোই এমন প্রাণীজাত সম্পদ, যার মূল্যের উপর যাকাত ধার্য হয়নি। কাজেই আমরা মনে করি, দুগ্ধ ও আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে মধুর ক্ষেত্রে গৃহীত নীতিই প্রযোজ্য হবে। তাই তার পরিচ্ছন্ন সম্পদের 'ওশর গ্রহণ করতে হবে। যেসব গবাদিপশু কেবলমাত্র দুগ্ধ উৎপাদনের জন্যে রাখা হয়, সেসব ছাড়া অন্য গবাদিপশু সম্পদের এই কথা, যতক্ষণ পর্যন্ত সেসব পশু ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে গৃহীত না হচ্ছে।

এখানে যে মৌল নীতিটি পাওয়া যাচ্ছে, তা হল, যার মূল্যের উপর যাকাত ধার্য নয়, তার উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির উপর যাকাত ধার্য হবে, যেমন জমির উৎপাদন কৃষি ফসল,

মৌমাছির উৎপাদন মধু, চতুষ্পদ জন্তুর দুগ্ধ, মুরগীর ডিম এবং গুটি পোকার উৎপাদন রেশম। শিয়া মতের ফিকাহ্‌বিদ ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া এই মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে মধুর উপর যেমন যাকাত ধার্য হয়, রেশমের উপরও তেমনি যাকাত ধার্য হবে। কেননা এই দুটিই বৃক্ষ ও গাছ-গাছালি থেকে পাওয়া যায়। গুটি পোকার উপর যাকাত ধার্য নয়। তবে তা-ও যদি ব্যবসায় পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তার উপরও যাকাত ধার্য হবে।

তবে এমন ফিকাহ্‌বিদও রয়েছেন, যাঁরা উৎপাদন ও পণ্য বানানোর উদ্দেশ্যে গৃহীত পশু সম্পর্কে ভিন্ন একটি মত পোষণ করেন। তাঁরা সেগুলোকে ব্যবসায়ের পণ্য গণ্য করে প্রতি বছর তার মূল্য এবং তার উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করে তার উপর যাকাত ধার্য হওয়ার কথা বলেছেন। আর মূলধন ও তার প্রবৃদ্ধি একসঙ্গে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ যাকাত বাবদ দিতে হবে বলে মত দিয়েছেন। যায়দীয়া মতের হাদী ও মুয়াইয়্যিদ বিল্লাহ্‌ প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদ্‌ থেকে উপরিউক্ত কথা জানা গেছে।

তাই যদি কেউ ঘোড়া ক্রয় করে তার উৎপাদন বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে বা গাভী খরিদ করে তা থেকে পাওয়া দুগ্ধ ও মাখন বিক্রয়ের লক্ষ্যে, আর গুটিপোকা ক্রয় করে ও পালন করে তদ্‌লব্ধ রেশম বিক্রয় করার জন্যে, তাহলে বছরের শেষে তার উৎপাদনসহ মূল্য হিসাব করে তার যাকাত দিতে হবে, ঠিক যেমন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে করার নিয়ম রয়েছে।

তাঁদের মতে এ কথা কেবল উৎপাদনশীল পশু বা প্রাণী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না, ব্যবসায় ছাড়া উৎপাদন ও ফসল লাভ হয় এমন সর্বপ্রকার মালই এর মধ্যে গণ্য হবে; যেমন কোন চাকা, যা ভাড়া দেয়া হয়। পরবর্তী অষ্টম অধ্যায়ে আমরা প্রাসাদ ও শিল্প-কারখানা যা উৎপাদন দেয় ও উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়—সেসব সম্পর্কে ও তা থেকে যাকাত গ্রহণ পর্যায়ে আলোচনা করব। এখানে শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে, মধুর উপর কিয়াস করে প্রাণীজাত দ্রব্যাদির উপর যাকাত ধার্য করা একটা নির্ভুল সিদ্ধান্ত, এর বিপরীত মত কিছু নেই। অতএব তাতে ব্যত্যয় হওয়া উচিত নয়।

সপ্তম অধ্যায়

খনিজ ও সামুদ্রিক সম্পদের যাকাত

এই অধ্যায়ের আলোচনা নিম্নোক্ত বিষয় সমন্বিত ঃ

শুরু কথা ঃ খনি, পুঁজি, মাটির তলে সঞ্চিত সম্পদ ইত্যাদির ব্যাখ্যা। এ ছাড়া আরও সাতটি আলোচনা ঃ

প্রথম ঃ মাটির তলায় গচ্ছিত সম্পদ এবং সে বাবদ যা ফরয হয়,

দ্বিতীয় ঃ খনিজ সম্পদে যে হক ধার্য হয়, সে সম্পর্কিত আলোচনা,

তৃতীয় ঃ এই ফরযের পরিমাণ,

চতুর্থ ঃ নিসাব এবং সে নিসাব কখন গণ্য হবে,

পঞ্চম ঃ খনিজ সম্পদের যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে কি একটি বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরী?

ষষ্ঠ ঃ খনিজ সম্পদের যাকাত বাবদ গৃহীত সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্র,

সপ্তম ঃ সমুদ্র থেকে পাওয়া সম্পদ,

শুরু কথা

খনি পুঁজি বা সঞ্চিত ধন (Treasure) ও মাটির তলে পুঞ্জিত সম্পদ-সংক্রান্ত বর্ণনা

ইবনুল আসীর বলেছেন ঃ খনি বলতে বোঝায় সেসব ক্ষেত্র, যেখান থেকে জমি নিঃসৃত মহামূল্য সম্পদ নিষ্কাশন করা হয়। যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি।

ইবনুল হুম্মাম বলেছেন ঃ প্রতিটি জিনিসের অবস্থিতি স্থানকেই খনি বলা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম ভূ-সৃষ্টির দিন থেকে যেসব স্থানে মহামূল্য সম্পদরাশির স্থিতি স্থাপন করেছেন তা-ই 'খনি' নামে অভিহিত। 'সঞ্চিত ধন ' (Treasure) হচ্ছে মানুষ কর্তৃক সংগৃহীত ও সঞ্চয়কৃত সম্পদ।

ইবনে কুদামাহ্ বলেছেন ঃ জমির মধ্য থেকে যেসব মূলবান সম্পদ নির্গত হয়, তাই 'কান্‌জ' ও 'রিকাজ' নামে অভিহিত হয়। সমুদ্র থেকে আলাদা মানুষ কর্তৃক মাটির ভেতরে রক্ষিত সম্পদকে খনি বলা হয় না; বলা হয় পুঁজি বা সঞ্চিত ধন।

প্রথম আলোচনা

মাটির তলায় প্রোথিত সম্পদ এবং তার উপর ধার্য যাকাত

আগের কালের লোকেরা মাটির তলে যেসব মূল্যবান সম্পদ—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, তৈজসপত্র ইত্যাদি জমা করে রেখেছে এবং পরে তা উদ্ধার হয়েছে, ফিকাহ্‌বিদগণের মত হচ্ছে, তার এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে দেয়া ফরয। যে তা পেয়েছে তার উপর এ ফরয কার্যকর হবে। কেননা হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ في الركاز الخمس। 'মাটির তলে প্রোথিত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ দেয়'। বহু কয়টি হাদীস গ্রন্থেই এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। আর মাটির তলে গচ্ছিত সম্পদকেই ইসলামী পরিভাষায় ركاز বলা হয়, তাতে কোন মতপার্থক্য নেই।

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স)-কে পড়ামাত্তা বা পড়ে পাওয়া দ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'যা চলাচলের রাস্তায় পাওয়া গেছে অথবা পাওয়া গেছে জনবসতিপূর্ণ কোন গ্রাম বা বস্তিতে, এক বছর কাল পর্যন্ত তার প্রচার চালাতে হবে। এ সময়ের মধ্যে তার মালিক পাওয়া গেলে তো ভালই। নতুবা তা তোমার হবে। আর যা লোক চলাচলের পথে পাওয়া যায়নি এবং পাওয়া যায়নি কোন লোকবসতিতে, তাতে এবং মাটির তলে গচ্ছিত অবস্থায় প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে।

হাদীসদ্বয় থেকে কয়েকটি কথা জানা যায় ঃ

ক. কোন অনাবাদী জমিতে কিংবা মালিক জানা নেই এমন কোন জমিতে কিছু পাওয়া গেলে তার এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে। জমির উপরে পাওয়া গেলেও। আর যদি কোন মুসলিমের বা অমুসলিম যিম্মীর মালিকানাধীন জমিতে কিছু পাওয়া যায়, তাহলে তা সেই মালিকের প্রাপ্য।

খ. অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মত হচ্ছে, 'রিকাজ' (ركاز) বলতে এমন সব মালই বোঝায়, যা মাটির তলায় সঞ্চিত ও প্রোথিত পাওয়া গেছে। ইমাম শাফেয়ীর মতে বিশেষভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্পদ এ পর্যায়ে গণ্য। তবে প্রথম মতটি হাদীসের সাধারণ তাৎপর্যের সাথে সংগতিপূর্ণ।

গ. হাদীসদ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকে যেমন স্পষ্ট হয়, সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ দেয়া প্রাপকের দায়িত্ব, সে মুসলিম হোক, কি অমুসলিম যিম্মী, ছোট হোক বা বড়—সাধারণ ফিকাহ্‌বিদদের এটাই মত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যিম্মী হলে তার কাছ থেকে কিছুই

নেয়া যাবে না। কেননা এই এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ফরয হয় কেবল তারই উপর, যার উপর যাকাত ফরয হয়। কেননা এই এক-পঞ্চমাংশ যাকাত পর্যায়ের ফরয। প্রাপক শিশু বা নারী হলে তারা এই 'রিকাজের' মালিক হতে পারবে না।

ইবনে কুদামাহ লিখেছেন, আমরা রাসূলের কথা 'রিকাজ-এর এক-পঞ্চমাংশ দেয়'-এর সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ তা যে কোন প্রাপ্ত সম্পদের ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আর অবশিষ্ট যা থাকবে তা প্রাপকের হবে ; সে যে-ই হোক।

ইবনে দকীকুল-ঈদ বলেছেন,যাঁরাই বলেছেন, 'রিকাজ' মাত্রেরই এক-পঞ্চমাংশ দেয়—তা হয় সাধারণ ও শর্তহীনভাবে কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা-ই হাদীসের নিকটতর কথা।

ঘ. হাদীসের বাহ্যিক তাৎপর্যের দৃষ্টিতে কোন নিসাব নির্ধারিত নয়। আগের কালের মাটির তলায় প্রোথিত কম-বেশী যে-কোন পরিমাণ সম্পদই হোক, তার এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা দিতে হবে। ইমাম মালিক, আবূ হানীফা, তাঁর সঙ্গীদ্বয়, আহমদ, ইসহাক ও শাফেয়ীর প্রাচীন কথা থেকে উপরিউক্ত মতেরই সমর্থন মেলে। যেহেতু তা এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণযোগ্য সম্পদ, তাই তার কোন নিসাব হতে পারে না, যেমন গনীমতের মালের কোন নিসাব হয় না। আর যেহেতু তা কোনরূপ ব্যয় পরিশ্রম ব্যতীত পাওয়া গেছে, তাই তার যাকাত ধার্যকরণে কোন কিছু বাদ দেয়ার প্রশ্ন উঠে না। খনিজ সম্পদ ও চাষের ফসলের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ীর শেষ মত হচ্ছে 'রিকাজে'ও নিসাব ধরতে হবে। কেননা তা একটা হক যা জমি নিঃসৃত সম্পদের উপর ধার্য হয়ে থাকে। তাই তারও নিসাব নির্ধারণ করতে হবে, যেমন খনিজ সম্পদ ও কৃষি ফসলে করা হয়।

ঙ. এই ক্ষেত্রে মালিকানার একটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার কোন শর্ত নেই। এক-পঞ্চমাংশ দিয়ে দিতে হবে সঙ্গে সঙ্গেই।

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী নিসাবের শর্ত করেছেন বলে ইবনুল আরাবী যে উল্লেখ করেছেন, তা ঠিক নয়। কেননা তাঁর নিজের বা তাঁর সঙ্গীদের লিখিত কোন গ্রন্থ থেকেও তা প্রমাণিত হয় না।

চ. রিকাজ থেকে গৃহীত এক-পঞ্চমাংশ কি কাজে ব্যয় করা হবে, তা হাদীসে উল্লিখিত হয়নি। এ কারণে ফিকাহবিদগণ এই পর্যায়ে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। হয় তা যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহে—ফকীর, মিসকীন ও অন্যান্য আটটি ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে কিংবা 'ফাই' সম্পদের ব্যয় ক্ষেত্র অর্থাৎ সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজকর্মে নিয়োজিত হবে এবং ফকীর-মিসকীনকে তার অংশ দেয়া হবে।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্রই এরও ব্যয়ক্ষেত্র। কেননা হযরত আলী প্রোথিত সম্পদের প্রাপককে নির্দেশ দিয়েছিলেন মিসকীনদের জন্যে ব্যয় করতে। যেহেতু তা জমি থেকেই পাওয়া গেছে, অতএব তা ফসল ও ফলের সমতুল্য।

ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ, মালিক এবং সাধারণ ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, 'ফাই' সম্পদের ব্যয়ক্ষেত্রই তারও ব্যয়ক্ষেত্র। অর্থাৎ তা রাষ্ট্রের সাধারণ বাজেটভুক্ত হবে। কেননা শা'বী বলেছেন, এক ব্যক্তি মদীনার বাইরে মাটিতে প্রোথিত অবস্থায় এক হাজার দীনার পেয়েছিল। তা নিয়ে হযরত উমরের কাছে উপস্থিত হলে তিনি তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ দুইশ' দীনার গ্রহণ করে অবশিষ্ট সবই সেই ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন। গৃহীত এই দুইশ' দীনার তিনি উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন অর্থাৎ এক ব্যক্তির প্রাপ্ত সম্পদে সকলকেই অংশীদার বানালেন। শেষে কিছু অতিরিক্ত হওয়ার দরুন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, প্রাপক ব্যক্তি কোথায় গেল? লোকটি সম্মুখে দাঁড়ালে তিনি বললেন, 'তুমি এ সব দীনার নিয়ে যাও, এসব তোমার।'

'আল-মুগনী' গ্রন্থকার লিখেছেন, তা যদি যাকাত হত, তাহলে তা যাকাত পাওয়ার অধিকারী লোকদেরই দেয়া হত, উপস্থিত সাধারণ লোকদের মধ্যে তা বণ্টন করতেন না এবং অবশিষ্টটাও প্রাপককে ফেরত দিতেন না। তাঁদের কথা হচ্ছে, তা যিম্মীর উপরও ফরয, অথচ যাকাত তো যিম্মীর উপর ধার্য হয় না। আরও কারণ এই যে, তা খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণীয় সম্পদ—কাফিরের হাত থেকে পড়ে গেছে। ফলে তা গনীমতের এক-পঞ্চমাংশের মতই হয়ে গেছে।

ব্যয়ক্ষেত্র যাই হোক, এসব প্রোথিত সম্পদ পাওয়া বিরল ঘটনা। যাকাত ফাণ্ডের জন্যে তা খুব মূল্যবান জিনিস নয়, সাধারণ রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারও এতে ভরে না। তবে খনিজ সম্পদের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পরবর্তী আলোচনা আমরা এ প্রসংগেই রাখতে চাই।

দ্বিতীয় আলোচনা

খনি এবং খনিজ পদার্থের যাকাত

পূর্বের একটি অধ্যায়ে আমরা কৃষি সম্পদের উপর ধার্য যাকাত সংক্রান্ত বিধান বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তা হচ্ছে জমির উপরিভাগ থেকে পাওয়া সম্পদ। জমির অভ্যন্তর থেকে পাওয়া সম্পদের উপর ধার্য যাকাতের বিষয়টি আলোচনার অপেক্ষায় রয়ে গেছে। জমির গভীরে পাওয়া খনিজ সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার অধীন তা সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত করে রেখেছেন। তা মাটির সাথে মিলে-মিশে থাকে। তা উত্তোলন ও নিষ্কাশন করার বিভিন্ন পন্থা ও প্রক্রিয়াও তিনিই মানুষকে শিখিয়েছেন। ফলে মানুষ লাভ করছে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, রাং, আরসেনিক, তৈল, লবণ ইত্যাদি। তন্মধ্যে কতগুলো হয় তরল এবং কতগুলো হয় জমাট বাঁধা। আর এসব সম্পদ যে মহামূল্যবান, মানবজীবনের জন্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—বিশেষ করে আধুনিক যুগে, যখন বিশ্বব্যাপী কোম্পানীসমূহ মাটির গর্ত থেকে উত্তোলিত এসব খনিজ সম্পদের বলে দুনিয়ায় অগ্রগতি লাভের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে—তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। উপরন্তু এসব পুঞ্জীভূত সম্পদের জন্যে দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহ পরস্পর কঠিন দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, অন্তহীন যুদ্ধে জড়িত হয়, বিশেষ করে পেট্রোল এ দিক দিয়ে যে কতটা ভূমিকা পালন করে, তা কারোর অজানা নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, এসব খনিজ সম্পদ থেকে যা কিছু মানুষ লাভ করে, ইসলামী শরীয়াতে তার জন্যে কি বিধান রয়েছে? তাতে আল্লাহ্র হক কি ধার্য হবে, কখন তা ফরয হবে, কত পরিমাণ হলে তা ফরয হবে, এ ফরযের রূপ কি এবং তা কোথায় কিভাবে ব্যয় করা হবে?

এ প্রশ্নগুলোর জবাব বিভিন্ন ফিকাহবিদ বিভিন্নরূপে দিয়েছেন। এই বিভিন্নতার কারণ হচ্ছে এতদসংক্রান্ত দলীলসমূহের তাৎপর্যের বিভিন্নতা। এ বিষয়ে 'কিয়াস' করতে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। যদিও কুরআনের আয়াত অনুযায়ী এ ব্যাপারে তাঁরা সকলেই একমত যে, খনি থেকে যা উত্তোলিত হবে, তার যাকাত অবশ্যই দিতে হবে। এ পর্যায়ে উল্লেখ্য আয়াত হচ্ছে ঃ

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ-

হে ঈমাদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত পবিত্র জিনিস এবং আমরা যা কিছু তোমাদের জন্যে জমি থেকে বের করে দেই, তা থেকে ব্যয় কর। আর খনিজ সম্পদ যে জমি থেকে আল্লাহ্র বের করে দেয়া সম্পদ, তাতে সন্দেহ নেই।

যে খনিজ সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হয়

কোন খনিজ সম্পদ থেকে যাকাত নিতে হবে, তা নির্ধারণে ফিকাহ্বিদদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম শাফেয়ীর প্রখ্যাত মত হচ্ছে, তিনি শুধু স্বর্ণ ও রৌপ্য থেকেই যাকাত গ্রহণের পক্ষপাতী। এ ছাড়া অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ—লৌহ, তামা, সীসা, ফিরোজা, হীরা, ইয়াকুত, জুমররদ, সবুজ বর্ণের জুমররদ, সুরমা প্রভৃতি—এতে যাকাত ধার্য হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয় মনে করেছেন, জমি থেকে পাওয়া সর্ব প্রকারের খনিজ সম্পদ—যা বিভিন্নভাবে ঢালাই করা যায়—তার সবটার উপর যাকাত ফরয হবে। আর তরল জমাটবাঁধা খনিজ সম্পদ—যা ঢালাই করা যায় না, তার উপর কোন কিছুই ধার্য হবে না। তারা অবশ্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর কিয়াস করেই এ কথা বলেছেন। কেননা এ দুটির উপর তো নিঃসন্দেহে ও সর্ববাদীসম্মতভাবে যাকাত ফরয হয়ে আছে অকাট্য দলীল ও ইজমার ভিত্তিতে। অতএব তাঁর মতে অন্যান্য জিনিস সম্পর্কেও—যা আগুনে উত্তপ্ত করে ঢালাই করা যায়—সেই কথাই প্রযোজ্য হবে।

হাম্বলী মাযহাবের মত হচ্ছে, যা ঢালাই করা যায় আর যা যায় না তার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। অতএব যা কিছুই মাটির নীচ থেকে উত্তোলিত হবে এবং যার কিছু না-কিছু মূল্য রয়েছেও তারই উপর যাকাত ফরয হবে। তা জমাটবাঁধা হোক—যেমন লৌহ, সীসা, তামা ইত্যাদি অথবা তরল প্রবহমান হোক—যেমন তৈল, পেট্রোল, সালফার ইত্যাদি। যায়দ ইবনে আলী, বাকের এবং সাদিক প্রমুখ শিয়ামতের ফিকাহ্বিদ এই মত দিয়েছে। তবে মুয়াইদবিল্লাহ লবণ, তৈল ইত্যাদিকে এ থেকে বাদ দিয়েছেন।

আবূ জাফর বাকেরকে যবক্ষার (Salt peter) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, যবক্ষার কি? বলল, লবণাক্ত জমি, যার উপর পানি জমে লবণে পরিণত হয়। তখন তিনি বললেন, 'তা খনিজ সম্পদের মধ্যে গণ্য, অতএব তার এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে।' প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞেস করল ঃ 'সালফার' ও ন্যাপথলিও জমি থেকে পাওয়া যায়, তার কি হুকুম? বললেন, 'এগুলো এবং এর মত অন্যান্য সব জিনিসেরই এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে।'

এ গ্রন্থকারের মতে হাম্বলী মাযহাবের এই মতটি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। 'খনিজ সম্পদ' বলতে যা-ই বোঝায়, তাই এই অর্থের সমর্থ। কেননা জমাটবাঁধা ও তরল পদার্থ-এর মধ্যে মৌলিকতার দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। তেমনি পার্থক্য নেই যা ঢালাই করা যায় আর যা যায় না, তার মধ্যে। অনুরূপ লৌহ, সীসা এবং ন্যাপথলি ও সালফারের মধ্যেও কোন পার্থক্য গণ্য করা যায় না। এ সবগুলোই মহামূল্যবান সম্পদ

এবং মানুষের জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয়। একালে এগুলো তো 'কালো স্বর্ণ' নামে অভিহিত। আমাদের ইমামগণ যদি এসব মহামূল্য খনিজ সম্পদের আধুনিক মূল্য ও গুরুত্ব দেখতে পেতেন, তার দ্বারা যে কল্যাণ এবং জাতীয় বৈভব লাভ করা যায়, তা যদি তাঁদের গোচরীভূত হত, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই ইজতিহাদের মাধ্যমে ভিন্নতর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন।

'আল-মুগনী'র গ্রন্থকার হাম্বলী মাযহাবের পক্ষে দলীল পেশ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

ক. কুরআনে উপরিউক্ত আয়াতের সাধারণ অর্থই আমাদের প্রধান দলীল।

খ. আর যেহেতু তা-ও খনিজ সম্পদ, তাই তা থেকে প্রাপ্ত সম্পদের উপর অবশ্যই যাকাত ধার্য হবে। যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্য হয়।

গ. যেহেতু তা সম্পদ, তা লাভ হলে তার এক-পঞ্চমাংশ অবশ্যই দিতে হবে। আর তা যদি খনি থেকে পাওয়া যায়, তাহলে তার উপর স্বর্ণের মতই যাকাত ধার্য হবে।

তৃতীয় আলোচনা

খনিজ সম্পদের উপর ধার্য যাকাতের পরিমাণ : এক-পঞ্চমাংশ অথবা এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ

খনিজ সম্পদের উপর কি পরিমাণ যাকাত ফরয, তা নিয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা, তাঁর সঙ্গিগণ, আবূ উবাইদ, যায়দ ইবনে আলী, বাকের, সাদিক এবং শিয়া যায়দীয়া ও ইমামীয়া ফিকাহ্‌বিদগণ মত দিয়েছেন, তাতে ফরয হচ্ছে এক-পঞ্চমাংশ।

ইমাম আহ্‌মদ ও ইসহাক বলেছেন, ফরয পরিমাণ হচ্ছে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ, যেমন নগদ সম্পদের যাকাত। তা অকাট্য দলীল এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম মালিক এবং শাফেয়ীও এ মত দিয়েছেন।

মালিকী মাযহাবে খনিজ সম্পদ দু'ধরনের। এক প্রকার খনিজ সম্পদ যার উৎপাদনে যথেষ্ট শ্রম বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। সে সম্পর্কে সর্বসম্মত মত হচ্ছে, তাতে যাকাত ছাড়া আর কিছুই ধার্য হবে না। অপর ধরনের খনিজ সম্পদে শ্রম প্রয়োজনীয় নয়। এ ব্যাপারে ইমাম মালিকের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কখনো বলেছেন, তাতে যাকাত হবে। আবার কখনো বলেছেন—তাতে যাকাত ধার্য হবে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ—যেমন নগদ সম্পদে হয়।

ইমাম শাফেয়ীরও এ ধরনের কথা আছে। তাঁর প্রখ্যাত মত এবং যে মতের উপর তাঁর সঙ্গীরা ফতওয়া দিয়েছেন, তা হচ্ছে, তা থেকে গ্রহণ করতে হবে এক-দশমাংশের এক-চুতর্থাংশ।

আরও একটি মত আছে, যা মালিকী মাযহাবে খুবই প্রসিদ্ধ। তা হচ্ছে, যা মাটির গর্ভ থেকে বের হবে, তা তামা ধরনের কঠিন হোক, কি তরল, তা সবই বায়তুলমালের মালিকানাভুক্ত হবে। জমির গর্ভ থেকে প্রাপ্ত প্রেট্রোলও রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে যাবে। কেননা সর্বসাধারণ মুসলমানের কল্যাণ এতেই নিহিত যে, এই সমস্ত সমষ্টির মালিকানা হবে, ব্যক্তিগত নয়। এই সব মহামূল্য সম্পদ খারাপ ব্যক্তিদের হস্তগত হলে চরম অকল্যাণ ডেকে আনবে। তা নিয়ে জনগণের মধ্যে দ্বন্দ-কলহ্ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাতও হয়ে যেতে পারে। তাই তা মুসলিম নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় সরকারের ব্যবস্থাধীন থাকতে হবে এবং তার কল্যাণ সাধারণভাবে সকলের মধ্যে বিতরিত হতে হবে।

এ কথার সমর্থক হচ্ছে হাদীসের একটি বর্ণনা। হযরত আবিয়ায হাম্মাল আল মাজিলী বলেন ঃ তিনি রাসূলে করীম (স)-এর কাছে মাজ'রিবের কাছে অবস্থিত লবণের খনির লীজ—প্রার্থনা করলে তিনি তা তাঁকে দিলেন। আবিয়ায যখন চলে গেলেন, তখন রাসূলে করীমকে বলা হল, 'ইয়া রাসূল! আপনি এ লোকটিকে কিসের লীজ দিলেন, তা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন? আপনি তো তাকে আটকে থাকা পানির লীজ দিয়েছেন। পরে রাসূল (স) তা ফেরত নিয়ে নেন।

এই পানি স্থিতিশীল, চলাচল করে না এবং তা বিনাশ্রমে পাওয়া যায় বলে তা লবণ-সদৃশ মনে করা হয়েছে।

আবূ উবাইদ লবণ খনিজ লীজ দেয়া এবং পরে তা ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাখ্যায় বলেছেন, নবী করীম (স) তা মৃত অনাবাদী জমি হিসেবেই লীজ দিয়েছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, আবিয়ায তা পুনরুজ্জীবিত ও আবাদ করবেন। কিন্তু পরে তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তা আটকে থাকা পানি, প্রবহমান ঝর্ণার মত নয়, তখন তা তার কাছ থেকে ফেরত নিলেন। কেননা নবী করীমের সুন্নাত হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত ঘাস, আগুন ও পানির ক্ষেত্রে সব মানুষই সমানভাবে শরীক হবে। তাই তা মাত্র একজনের কর্তৃত্বের ছেড়ে দিয়ে তা থেকে অন্যদের বঞ্চিত করাকে পছন্দ করতে পারেন নি।

এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ দেয়ার পক্ষের দলীল

খনিজ সম্পদের এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ দেয়ার পক্ষের দলীল হচ্ছে ঃ নবী করীম (স) হিলাল ইবনুল হারিসকে কাব্‌লিয়ার খনিসমূহ লীজ দিয়েছিলেন। (তা সমুদ্রোপকূলের পার্শ্বের জমি। মদীনা থেকে পাঁচদিনের পথ দূরে অবস্থিত) তা নখ্‌লা ও মদীনার মধ্যবর্তী করা'র পার্শ্বে অবস্থিত। এসব খনি থেকে যাকাত ছাড়া আর কিছুই নেয়া হয় না।

ইমাম শাফেয়ী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে লিখেছেনঃ হাদীসবিদগণ বর্ণনার সূত্র হিসেবে এটাকে সহীহ মনে করেন নি। যদিও তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন; কিন্তু নবী করীম কর্তৃক লীজ দেয়ার খবর ছাড়া আর কিছু প্রমাণ করা যায় নি। আর খনিজ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ ছাড়া যাকাত দেয়ার ব্যাপারটি নবী করীম (স) থেকে আদপেই বর্ণিত নয়।

আবূ উবাইদ আরও বলেছেন ঃ কাব্‌লিয়ার জমি দেয়া সংক্রান্ত রবীয়ার বর্ণনাটির কোন সনদ নেই। তা ছাড়া তাতে একথা বলা হয়নি যে, নবী করীম (স) তা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুধু বলেছেন ঃ তা নবী করীম থেকে প্রমাণিত হলে একটা দলীল হত এবং তা দেয়া জায়েয হত না।

এক-পঞ্চমাংশ দেয়ার পক্ষের দলীল

ক. ইমাম আবূ হানীফা এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ তাঁদের মতের সমর্থনে রাসূলের এ কথাটির উল্লেখ করেছেন ঃ في الركاز الخمس 'রিকাজে এক-পঞ্চমাংশ ফরয।'

তাঁরা বলেছেন, জমির উৎপাদন দুই প্রকারের। একটার নাম পুঁজিকৃত সম্পদ—'কানজ'। তা মানুষ কর্তৃক মাটির গর্ভে পুঁতে রাখা সম্পদ। আর দ্বিতীয়টি খনিজ সম্পদ। তা আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির দিন মাটির মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন। 'রিকাজ' শব্দটি এই দুই প্রকারের সম্পদই বোঝায়। তবে তার প্রত্যক্ষ অর্থ খনিজ সম্পদ আর পরোক্ষ অর্থ 'কান্‌জ'।

কিন্তু ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও হিজাজের সাধারণ ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, খনিজ সম্পদ 'রিকাজ' নয়, বরং প্রাচীন যুগ থেকে মাটির গর্ভে পুঁতে রাখা সম্পদই হচ্ছে 'রিকাজ'। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেনঃ

اَلْعِجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُجُبَارُ وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ وَفِيْ الرِّكَازِ الْخُمُسُ-

বোবা জন্তু আহত করার কোন জরিমানা বা খেসারত দেয়া বাধ্যতামূলক নয়, কূপে পতিত হলে বা খনিতে মৃত্যুবরণ করলে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। তবে রিকাজে এক-পঞ্চমাংশ দেয়া বাধ্যতামূলক।

নবী করীম (স) এ হাদীসে খনিজ সম্পদ ও রিকাজের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাই বলতে হবে, রিকাজ খনিজ সম্পদ থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র জিনিস।

হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, খনিজ সম্পদ 'রিকাজে এক-পঞ্চামংশ দেয়' রাসূলের একথার অন্তর্ভুক্ত। কেননা তিনি খনিজ সম্পদের উল্লেখ করেছেন। যদি বলতেন ঃ তাতে এক-পঞ্চামাংশ, তাহলে লোকের গচ্ছিত সম্পদ তার অন্তর্ভুক্ত ধরা যেত না—কেননা তা খনিজ সম্পদ নয়।

এ দুই পক্ষের মধ্যকার বিরোধ নির্মূল করতে পারে—এমন ভাষাভাষী কাউকে পাওয়া যায় নি। ইরাকের ফিকাহবিদগণ ভাষা পারদর্শী ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান তাঁদের মধ্যে একজন। আর হিজাজের ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে ভাষা বিশেষজ্ঞ ছিলেন ইমাম শাফেয়ী।

পাঠকদের কাছে বাহ্যত মনে হবে, 'রিকাজ' শব্দটি দুটি অর্থ দেয়। 'কামুস' ইত্যাদি অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

اَلرِّكَازُ مَا رَكَزَهُ اللّٰهُ اَىْ اَحْدَثَهُ فِيْ الْمَعَادِنِ وَرَفِيْنَ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقِطَعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ الْمَعْدَنِ-

রিকাজ তা-ই, যা আল্লাহ্ তা'আলা সঞ্চিত করে রেখেছেন অর্থাৎ খনির মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, আর ইসলাম-পূর্ব যুগের প্রোথিত সম্পদ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য খণ্ডাকারে খনিজ সম্পদ।

ইবনুল আসীর 'নিহায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, 'রিকাজ' হিজাজবাসীদের মতে ইসলাম-পূর্ব যুগের লোকদের ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদ। আর ইরাকবাসীদের মতে খনিজ সম্পদ। দুটি অর্থই ভাষাসম্মত। কেননা দুটি মাটির তলায় স্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত।

ইমাম আবূ হানীফা দলীল দিয়েছেন এই বলে যে, 'রিকাজ' অর্থ খনিজ সম্পদ। হাদীসে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর কাছে প্রাচীন পরিত্যক্ত স্থানে প্রাপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ 'তাতে এবং রিকাজে এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে।'

পরে বলেছেন, প্রথম প্রোথিত সম্পদ সম্পর্কে জবাব দিয়েছেন তারপরে ভিন্নভাবে বলেছেন রিকাজের কথা। এভাবে বলায় মৌলিকতার দিক দিয়ে দুটো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস বোঝানো হয়েছে।

তাঁর কোন কোন সঙ্গী বলেছেন, খনিজ সম্পদকে 'রিকাজ' নামকরণ মূল ভাষায় পাওয়া না গেলেও তা ভাষাগত ধারণার পথে ব্যাপকভাবে প্রচারিত। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শায়বান ফিকাহ্ শাস্ত্রে গভীর মনীষার অধিকারী এবং সেই সাথে একজন আরব মনীষীরূপেও খ্যাত—তিনি বলেছেন ঃ 'স্বর্ণ ও রৌপ্য খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া গেলে আরবরা বলে ঃ ركز المعدن খনি কানায় কানায় ভরে গেছে।

'আল -বাদায়েউ' গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন ঃ ركز – ركاز থেকে গৃহীত। তার অর্থ 'প্রতিষ্টিত করা'। আর যা খনিতে থাকে তা জমির গর্ভে প্রতিষ্ঠিত। তা জমাকৃত বা 'কান্‌জ' নয়। কেননা তা জমির সাথে প্রতিবেশী হয়ে থাকার জন্য রক্ষিত হয়েছে।

খ. খনিজ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ফরয প্রমাণার্থে হানাফীগণ অপর একটি দলীলের অবতারণা করেছেন। তা হচ্ছে যুদ্ধে লব্ধ গনীমতের মালের উপর কিয়াস অর্থাৎ তাও এ পর্যায়েরই একটি জিনিস মনে করা।

তাঁরা বলেছেন, যেহেতু খনিজ সম্পদগুলো কাফিরদের হাতে ছিল। পরে তাদের হাত থেকে তা বিচ্যুত হয়। কিন্তু তার উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেননা তাঁরা এসব পাহাড়-পর্বত গুহাস্থলের উপর প্রাধান্য অর্জনের ইচ্ছুক ছিলেন না। ফলে তা কাফিরদের মালিকানাধীনই থেকে যায়। পরে মুসলিমরা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেগুলোর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। অতএব তার এক পঞ্চমাংশ দেয়া ফরয হবে।

কিন্তু এরূপ দলীল উপস্থাপনে একটা কৃত্রিমতা আছে। যেহেতু এসব খনি কাফিরদের মালিকানায় থাকার দাবিটা অগ্রহণযোগ্য। আর তা হতে বা পারে কিভাবে? সমগ্র অঞ্চল তো ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন এসব খনি ইসলাম-পূর্ব যুগের অবস্থায় পড়েছিল, তা কি করে মেনে নেয়া যায় ? আর-কেইবা তা দাবি করে দৃঢ়তার সাথে বলতে পারে?

গ. ইমামীয়া মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদগণ খনিজ সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ ফরয প্রমাণের জন্যে সূরা 'আল-আনফাল '-এর এ আয়াতটি দলীল হিসেবে পেশ করেছেন ঃ

তোমরা জানবে , তোমরা যে জিনিসই গনীমত স্বরূপ পাও তাতে আল্লাহ্‌র জন্যে রাসূলের নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্যে এক পঞ্চমাংশ ধার্য হবে। (৪১ আয়াত)

আয়াতটি গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ নেয়া ফরয সাব্যস্ত করছে। আর অভিধানের দৃষ্টিতে 'গনীমত' হচ্ছে যা-ই উপরি পাওনা হিসেবে পাওয়া যাবে—তা। তাই বাহ্যত সেসব জিনিসই এর অন্তর্ভুক্ত, যা জমির স্থল, জল ও অভ্যন্তর ভাগ থেকে পাওয়া যাবে।

কিন্তু এ দলীলে আপত্তি আছে। প্রথম কথা, আসলে পূর্বের বর্ণনা দৃষ্টে আয়াতটি যুদ্ধে যে গনীমতের মাল পাওয়া যায়, সে সম্পর্কেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয়, নবী করীম (স)-এর ভাষায় প্রধানত এবং বেশীর ভাগ 'গনীমত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এ অর্থেই। যেমন তাঁর কথা ঃ احلت لى الغنائم। 'আমার জন্যে গনীমত হালাল করা হয়েছে'।

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ-গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন, 'সাধারণ অর্থবোধক শব্দ অনেক সময় বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় এমন কতগুলো নিদর্শন ও ইংগিতের ভিত্তি, যা সেদিকে স্পষ্ট নির্দেশ করে। তখন তা থেকে সে অর্থই গ্রহণ করা হয়, যদিও তা ভিন্ন অর্থও দিতে পারে। ইবনে দকীকুল-ঈদ বলেছেন, পূর্ব প্রসংগ (context) মোটামুটি অর্থ সম্পন্ন শব্দের নির্দিষ্ট একটা অর্থ গ্রহণের নির্দেশ করে, বহু কয়টি অর্থের মধ্যে একটিতে অগ্রাধিকার দেয়ার পথ দেখায়। পাঠক তার রুচি অনুযায়ী সেদিকে পরিচালিত হয়।

এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে প্রথম দলীলটিই উত্তম। অর্থাৎ 'রিকাজ'-এর এক-পঞ্চমাংশ দেয়া সংক্রান্ত সহীহ্ হাদীস খনিজ সম্পদকেও শামিল করে, যেমন শামিল করে মাটির গর্ভে পুঁতে রাখা গচ্ছিত সম্পদ। ইমাম আবূ উবাইদ তাঁর 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে এই মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

শ্রম পরিমাণ ফরয হওয়ার মত

কিছু সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদ একটা স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা সে জিনিস উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রম, অর্থ ব্যয় ও কষ্টের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বলেছেন, নিয়োজিত শ্রম ও কর্মের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ যদি অধিক হয়, তাহলে এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ফরয হবে। আর তার তুলনায় উৎপাদন যদি কম হয়, তাহলে দেয়া ফরয হবে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ। ইমাম মালিক ও শাফেয়ীও এই মত দিয়েছেন।

এরূপ পার্থক্যকরণের লক্ষ্য হচ্ছে, দুই ধরনের হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এক ধরনের হাদীস থেকে জানা যায়, স্বর্ণ-রৌপ্যের এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ দিতে হবে। আর এ দুটি খনিজ সম্পদ, অতএব অন্যান্য খনিজ সম্পদেও অনুরূপ নিয়ম কার্যকর হবে। অপর ধরনের হাদীস হচ্ছে, খনিজ সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ দেয়। আর তা

'রিকাজ' বা রিকাজের মত। অপর দিক দিয়ে তা কৃষি ফসলের উপর ধারণাযোগ্য, তাতে চেষ্টা ও কষ্টের পার্থক্যের ভিত্তিতে ফরয পরিমাণেও পার্থক্য হবে।

শাফেয়ী মযহাবের রাফেয়ী এই কথার দলীল দান প্রসঙ্গে বলেছেন, যা কোনরূপ শ্রম ও অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকেই পাওয়া যায়, তার এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে। আর যা অর্জনে কষ্ট ও অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে, তাতে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ দিতে হবে। এতে করে সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হতে পারে। আরও এ জন্যে যে, কষ্ট কম হওয়ায় ফরয পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। অর তা বেশী হলে তার পরিমাণ কম হবে। আকাশের পানিতে সিক্ত জমি ও কৃত্রিম সেচে সিক্ত করে জমির ওশর পরিমাণে যে পার্থক্য স্বীকৃত হয়েছে, তা কি লক্ষ্য করার মত নয়?

এক-পঞ্চমাংশ—২০% ও এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ ২.৫%-এর মধ্যকার পার্থক্য খুব সামান্য নয়। তাই ওশর বা অর্ধ-ওশর ধার্যকরণে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কেননা উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের মূল্যায়নের দৃষ্টিতে এই পার্থক্যটা করা হয়। আধুনিক আইন-প্রণয়নেও এটা কোন অভিনব ব্যাপারে নয়। শরীয়াতের বিধানের দৃষ্টিতে এটা একটা স্পষ্ট নিয়ম। গৃহীত মালের মুনাফা তার মূল্য ও অর্জন-সহজতা বা কষ্টের দৃষ্টিতে ফরয পরিমাণে কম-বেশীর পার্থক্যকরণ একটা চিরস্বীকৃত স্বাভাবিক ব্যবস্থা।

চতুর্থ আলোচনা

খনিজ সম্পদের নিসাব—তা কখন গণনা করা হবে

খনিজ সম্পদের কি কোন নিসাব আছে

ইমাম আবূ হানীফা তাঁর সঙ্গী-সাথিগণ মত দিয়েছেন যে, খনিজ সম্পদের পরিমাণ কম হোক বেশি হোক, তার হক দিতে হবে, কোনরূপ নিসাবের হিসাব ছাড়াই। কেননা তা 'রিকাজ', আর এ প্রসঙ্গের হাদীস সাধারণ অর্থ ব্যক্ত করে। তার এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত নেই। অতএব তার কোন নিসাবও নেই, যেমন রিকাজের নিসাব নেই।

ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক এবং তাঁদের সঙ্গীগণ বলেছেন, একটা নিসাব অবশ্যই ধরতে হবে। আর তা হচ্ছেঃ উৎপন্ন জিনিসের মূল্য নগদ সম্পদের নিসাব মূল্যের সমান হলে তার উপর হক ধার্য হবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাব নির্ধারণ পর্যায়ে যেসব হাদীস এসেছে সে সবের সাধারণ অর্থকেই দলীল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন ঃ 'পাঁচ আউকিয়ার কমে কোন যাকাতা ধার্য হবে না'। 'একশ' নব্বইটিতে কিছুই দিতে হবে না'। আর সর্বদেশের ফিকাহ্-বিদগণের ঐকমত্য হচ্ছে, স্বর্ণের নিসাব বিশ মিশকাল।

দলীল দ্বারা প্রমাণিত, খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত সত্য কথা হচ্ছে, নিসাব গণ্য করতে হবে, তবে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত থাকবে না। তার অর্থ—যেমন রাফেয়ী বলেছেন—নিসাব গণ্য করতে হবে এজন্যে যে, প্রাপ্ত সম্পদ যেন এতটা পরিমাণের হয়, যা ধার্য হক দিতে সক্ষম হতে পারে। আর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত করা হয় সম্পদের প্রবৃদ্ধি ও ফলোৎপাদনের সম্ভাবনার দৃষ্টিতে। কিন্তু খনিজ সম্পদ তা স্বতঃই প্রবৃদ্ধিপ্রাপ্ত। এই কারণে কৃষি ফসলের নিসাব নির্ধারিত হয়েছে; কিন্তু তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত করা হয়নি।

নিসাব নির্ধারণে সময়—মেয়াদ

নিসাব নির্ধারণের শর্ত আরোপের অর্থ এই নয় যে, একবারে যা পাওয়া যাবে, তার নিসাব হয় কিনা, তা দেখতে হবে। বরং বহু বারে যা পাওয়া যাবে তা একত্রিত করে পরিমাণ ধরতে হবে। কেননা খনিজ সম্পদ এভাবেই উদ্ধার ও উত্তোলিত হতে পারে—হয়ে থাকে। কৃষি ফসল লব্ধ সম্পদের যাকাতের হিসাবও এমনিভাবেই করা হয়।

কিন্তু কৃষি ফসল ও ফল একত্র করে হিসাব করা হয় তা একই বছর ও একই মৌসুমে লব্ধ ফল বা ফসল হিসেবে। এখানে লক্ষ্য করতে হবে; কাজ প্রাপ্তি, খনিজ সম্পদের

প্রকাশ পাওয়া এবং তা আয়ত্ত করার দিকে। কাজ যদি অব্যাহতভাবে চলে, প্রাপ্তিও হতে থাকে ক্রমাগতভাবে তাহলে একত্রিতকরণ সহীহ হবে। উৎপাদন তার মালিকানায় থেকে যাওয়া শর্ত করা হয়নি। এক্ষণে যদি বিক্রয়ের মাধ্যমে যাকাত দেয়া হয় তাহলে অপর ফসল তার সাথে মেলানো ফরয হবে—যেন মোট উৎপাদন নিসাব পরিমাণ হয়। কিন্তু কাজ যদি কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়—যেমন হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি মেরামতের বা কর্মচারীর রোগ অথবা বিদেশ যাত্রার দরুন হতে পারে—তাহলে তা উৎপাদন একত্রিতকরণে প্রতিবন্ধক হবে না, কিন্তু খনিজ সম্পদ পাওয়া থেকে নিরাশ হওয়ার দরুন ভিন্ন পেশা গ্রহণের কারণে যদি কাজ বন্ধ হয়ে যায় অথবা এই পর্যায়ের অন্য কোন কারণে তাহলে তার প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য হবে।

আর কাজ যদি অব্যাহতভাবে চলে; কিন্তু প্রাপ্তি ধারাবাহিক না হয়,—এভাবে যে, হয় খনি দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে গেল, পরে প্রাপ্তি শুরু হল—এরূপ অবস্থায় এই বন্ধের সময়টা অল্প হলে একত্রিত করে হিসাবকরণে কোন দোষ হবে না। আর দীর্ঘ হলে বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ মনে করেছেন, একত্র করা যাবে—কেননা খনির এরূপ অবস্থা সাধারণত হয়েই থাকে। তাই তা একত্রিত করে নিসাব ধরা না হলে খনিজ সম্পদের যাকাতই অনেক সময় আদায় করা সম্ভব হবে না।

অবশ্য অনেকে এ-ও মনে করেছেন যে, তা একত্রিত করা যাবে না, যেমন কাজ বন্ধ হয়ে গেলে করা হয় না। তখন তা দুই স্বতন্ত্র চাষের ফসল বা দুই মৌসুমের ফল মনে করতে হবে।

এ বিষয়ে এ গ্রন্থকারের মত হচ্ছে, এসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের পরিমাণ নির্ধারণের উপর ছেড়ে দিতে হবে। কেননা কুরআনই আমাদের সেই নির্দেশ দিয়েছে এই বলে ঃ 'তোমরা না জানলে যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস কর।'

পঞ্চম আলোচনা

খনিজ সম্পদে যাকাত ধার্যকরণে এক বছর কি শর্ত

জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণের মত হচ্ছে, খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও অর্জন সমাপ্ত এবং তা পরিচ্ছন্নকরণ, পৃথকীকরণ হলেই তার যাকাত দেয়া ফরয হয়ে যাবে।

ইমাম মালিক বলেছেন, খনিজ সম্পদ কৃষি ফসলের মতই। কৃষি ফসলের ওশর নেয়ার মত তার যাকাতও নিতে হবে এবং যে সময় খনিজ সম্পদ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে এসে যাবে, তখনই তা গ্রহণ করতে হবে। একটি বছর মালিকানায় থাকার কোন শর্ত দরকার নেই। প্রাচীন ও পরবর্তীকালের সব ফিকাহ্‌বিদই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত।

ইসহাক ও ইবনুল মুনযির অবশ্য ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এক বছর অতিক্রম হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। কেননা হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে একটি পূর্ণ বছর অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত কোন মালেরই যাকাত ফরয হবে না। যদিও এ হাদীসটি যয়ীফ এবং এটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ হাদীসটি আর সাধারণ অর্থে অবশিষ্ট থাকেনি। কৃষি ফসল ও ফল তা থেকে বিশেষ করে নেয়া হয়েছে তাই খনিজ সম্পদ তার সাথে যুক্ত হবে ও তার উপর কিয়াস করা হবে।

এক বছর শর্ত না করার ব্যাপারে 'আল-মুগনী' গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন, খনিজ সম্পদ জমি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ। তাই তার যাকাত ফরয হওয়ায় এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত করা যায় না; যেমন কৃষি ফসল ও ফলের ক্ষেত্রে করা হয় না। তাছাড়া এক বছরের শর্ত করা হয় এসব ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে প্রবৃদ্ধির মাত্রা পূর্ণত্ব লাভের জন্যে। আর খনিজ সম্পদের প্রবৃদ্ধি তো একবারেই হয়ে যায়। অতএব তাতে কৃষি ফসলের মত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত করা যাবে না। — (আল-মুগনী, ৩য় খণ্ড)

শাফেয়ী ফিকাহ্‌র গ্রন্থ 'আল-মুহায্‌যাব' প্রণেতা বলেছেন; খনিজ সম্পদের যাকাত তা প্রাপ্ত হওয়ার পরই ফরয হবে, তাতে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত করা যাবে না। কেননা তা করা হয় প্রবৃদ্ধির পূর্ণত্ব প্রাপ্তির জন্য। কিন্তু খনিজ সম্পদ প্রাপ্তিতেই প্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাই তাতে বছর অতিক্রান্তির শর্ত হতে পারে না।

ষষ্ঠ আলোচনা

খনিজ সম্পদের যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র

খনিজ সম্পদের যাকাত কোথায় ব্যয় করা হবে

খনিজ সম্পদের উপর ধার্য ও গ্রহীত হকের স্বরূপ নির্ধারণে ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তা কি 'যাকাত' হিসেবে গণ্য হবে? এবং যাকাত ব্যয়ের কুরআন নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করতে হবে? অথবা তা যাকাত গণ্য হবে না, তা ব্যয় করা হবে গনীমত ও 'ফাই' লব্ধ এক পঞ্চমাংশ সম্পদের ব্যয়ক্ষেত্রে? অর্থাৎ সাধারণ রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মে দরিদ্র, মিসকীনদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে—যদি যাকাত লব্ধ সম্পদ যথেষ্ট না হয়?

ইমাম শাফেয়ীর ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি মত পাওয়া গেছে। একটি মতে শুধু যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। অন্য মতে বলা হয়েছে, তার উপর এক-পঞ্চমাংশ ধার্য হলে তার ব্যয়ক্ষেত্র হবে 'ফাই' সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্র। আর যদি এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ ধার্য হয়, তাহলে যাকাতের ব্যয় ক্ষেত্রেই তা ব্যয় করা হবে।

এ মতপার্থক্যের ভিত্তিতে যাঁরা একে যাকাত মনে করেন নি, তাঁরা এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ফরয করেছেন যিম্মীর উপর—যদি সে খনিজ সম্পদ লাভ করে। কেননা যিম্মীর উপর তো যাকাত ফরয হতে পারে না। যাকাত তো ইবাদত পর্যায়ের কাজ; যিম্মী এ ইবাদতের অধিকারী নয়। অনুরূপভাবে যাঁরা একে যাকাত গণ্য করেন নি, তাঁরা তা আদায় করণে নিয়তেরও শর্ত করেন নি। অপররা নিয়তের শর্ত করেছেন। কেননা তা একটি ইবাদত। আর ইবাদতে নিয়ত জরুরী—তা ছাড়া ইবাদত হয় না।

সপ্তম আলোচনা

সমুদ্র থেকে লব্ধ সম্পদ

সমুদ্র থেকে পাওয়া মণি-মুক্ত, আম্বর ইত্যাদি প্রসঙ্গে

সমুদ্র থেকে যেসব মহামূল্য সম্পদ পাওয়া যায়—যেমন মণি, মুক্তা, আম্বর .... প্রভৃতি সুগন্ধি ইত্যাদি, সে সংক্রান্ত হুকুম কি হবে, তা নিয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানাফী, তাঁর সঙ্গিগণ, হাসান ইবনুস সালেহ্ এবং শিয়াদের যায়দীয়া মত হচ্ছে, তাতে কিছুই ফরয হবে না।

পূর্বে ইবনে আব্বাসেরও সেই মত ছিল। বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'আম্বর' 'রিকাজ' নয়, তা এমন একটা জিনিস যা সমুদ্র উপরে উৎক্ষিপ্ত করেছে। তাতে কোন কিছু ফরয নয় অর্থাৎ তাতে যাকাত বা এক-পঞ্চমাংশ কিছুই ফরয হবে না।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, আম্বর গনীমত নয়। তা যে পাবে, তারই হবে অর্থাৎ তাতে গনীমতের মত এক-পঞ্চমাংশ ফরয হবে না।

আবূ উবাইদ বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর দুজন সাহাবী মনে করেছেন যে, সমুদ্র থেকে লব্ধ সম্পদে কোন কিছুই ধার্য হবে না।

কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাসের একটি বর্ণনা সহীহ্ প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আম্বর সম্পর্কে বলেছেন, "তাতে যদি কিছু দেয় ধার্য হয়ও তবে তা হবে এক-পঞ্চমাংশ।"

মনে হচ্ছে, ইবনে আব্বাস একটা নির্দিষ্ট ঘটনার পর তাঁর শেষ মত থেকে রুজু করেছেন। ইবরাহীম ইবনে সাদ এডেনের কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাসকে আম্বর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তাতে যদি কিছু ধার্য হয়; তবে তা হবে 'খুমুস' বা এক-পঞ্চমাংশ। সম্ভবত এডেনের মত সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানে এ কর্মকর্তাকে এ ধরনের বহু জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফলে হযরত ইবনে আব্বাস ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করেছিলেন। আর মুজতাহিদ যে অবস্থা ও কালের পরিবর্তনে নিজের দেয়া ফতোয়াও পরিবর্তন করেন, তা তো জানা কথা। কেননা তিনি তো সঠিক কল্যাণ ও দিক-পার্থক্যকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেই কথা বলেন।

অপর একটি বর্ণনা ইবনে আব্বাস—উমর ইবনুল খাত্তাব সূত্রে বর্ণিত এবং উদ্ধৃত হয়েছে এই 'আম্বর' সম্পর্কে। তাতে বলা হয়েছে, 'আম্বর এবং সমুদ্রগর্ভ থেকে অলংকারাদি পর্যায়ের আর যা কিছু উদ্ধার করা হয়, তাতে এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে।'

ইবনে আব্বাসের আর একটি বর্ণনা, ইয়ালা ইবনে সাইনাতা হযরত উমরকে লিখলেন সমুদ্রোপকূলে পাওয়া একটি আম্বর সম্পর্কে। হযরত উপস্থিত সাহাবীদের এ বিষয় জিজ্ঞেস করলেন; তাতে কি ফরয হবে? সাহাবিগণ তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। হযরত উমর এ কথা লিখে পাঠালেন, 'তাতে এবং যে কোন দানা সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হবে, তাতে এক-পঞ্চমাংশ ধার্য হবে।'

হযরত উমর থেকে এর বিপরীত একটা বর্ণনাও পাওয়া গেছে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ঃ 'সামুদ্রিক অলঙ্কারাদি এবং আম্বর থেকে এক-দশমাংশ গ্রহণ কর।'

কিন্তু হযরত উমর থেকে বর্ণিত এসব বর্ণনার সনদ সহীহ্ হওয়ার মর্যাদা পায়নি। এ বৈপরীত্য সহকারে যদি তা সহীহ্ হয়ও, তবু এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের বিপুল সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে ফরয পরিমাণ নির্ধারণে। তাই প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, তাতে রিকাজের ন্যায় এক-পঞ্চমাংশ ধার্য হবে কিংবা কৃষি ফসলের ন্যায় এক-দশমাংশ? অথবা দিরহাম, দীনার ইত্যাদি নগদ সম্পদের ন্যায় এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ?

আম্বর ও মণি-মুক্তার উপর এক-পঞ্চমাংশ ধার্য করার কিছু কিছু বর্ণনা কয়েকজন তাবেয়ী থেকেও পাওয়া গেছে। আবূ উবাইদ তা হাসান বসরী ও ইবনে শিহাব জুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে শায়বা উমর ইবনে আবদুল আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'তিনি আম্বর' থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফের মতও তা-ই। ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে যাকাত ধার্য হবে। কেননা প্রকারান্তরে তা খনি থেকে লব্ধ। আর সমুদ্রের গর্ভ থেকে লব্ধ জিনিসের উপরও তাই ধার্য হবে।

আবূ উবাইদ সামুদ্রিক সম্পদাদির উপর কিছুই ধার্য না হওয়ার মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা নবী করীম (স)-এর যুগেও সমুদ্র থেকে বহু জিনিসই উত্তোলিত হত, কিন্তু তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার কোন সুন্নাত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তাঁর পরে খুলাফায়ে রাশেদুন থেকেও সহীহ্ভাবে বর্ণিত কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই আমরা মনে করেছি যে, তা সম্পূর্ণ ক্ষমা করা হয়েছে, যেমন—ঘোড়া ও দাসকে যাকাতমুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আসলে সমুদ্র থেকে বের করা জিনিসের উপর কোন হক ধার্য হওয়া স্থলভাগের খনি থেকে বের করা জিনিসে ধার্য হকের মতই হওয়া উচিত।

অনেকে এ দুটোকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করেন। তাঁরা বলেন, রাসূল (স)-এর সুন্নাতই এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য করেছে। তিনি 'রিকাজে' এক-পঞ্চমাংশ ধার্য করেছেন। আর সমুদ্রগর্ভ থেকে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। কিন্তু যে বিষয়ে স্পষ্ট দলীল আছে আর যে বিষয়ে কোন দলীল নেই—কিছুই বলা হয়নি—এ দুয়ের মাঝে কোন সমন্বয়কারী কারণের ভিত্তিতে মিলানো ছাড়া কিয়াস আর কিছু বলে কি?

সমুদ্র থেকে নির্গত জিনিস যখন শরীয়াতের দৃষ্টিতে গনীমতের মাল সদৃশ নয়, তখন তা স্থলভাগের খনি লব্ধ জিনিসের মত হবে। কেননা উভয়ই সম্পদ। আর সম্পদ হওয়াই উভয়ের মধ্যে সমন্বয় বিধানকারী কারণ। অতএব তার উপর কিয়াস করা চলবে।

সমুদ্রলব্ধ জিনিসের উপর কোন-না কোন হক ধার্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। খনিজ সম্পদের

উপর কিয়াস করেই তা করা হবে। কৃষিলব্ধ সম্পদের উপরও কিয়াস করা যায়। এ হকটিকে আমরা যাকাত বলি, আর না বলি তাতে কিছু যায় আসে না।

তবে ধার্য হকের পরিমাণটা কি হবে? তা নির্ধারণ করতে হবে পরামর্শদানকারীদের পরামর্শের ভিত্তিতে—হযরত উমর তাই করেছেন। রাসূলে করীম (স) ক্ষেতের সেচকার্যে নিয়োজিত কষ্ট ও ব্যয়ের পার্থক্যের ভিত্তিতে ফসলের যাকাতের পরিমাণে কম-বেশী করেছেন—ওশর বা অর্ধ-ওশর ধার্য করে। এখানেও অনুরূপভাবে কষ্টের মাত্রার পার্থক্যের দৃষ্টিতে ফরয পরিমাণ কম-বেশী নির্ধারণ করতে হবে এবং তা করতে হবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী। কেননা অনেক সময় খুব অল্প কষ্টে উত্তম ও মহামূল্যবান জিনিস উদ্ধার করা যায়। তাই তাতে সেই দৃষ্টিতেই হকের পরিমাণ বেশী ধার্য হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে।

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী থেকে খনিজ সম্পদ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তাতে উপরিউক্ত কথার সমর্থন পাওয়া যায়। কষ্ট ও ব্যয়ের পার্থক্যের দৃষ্টিতে ধার্য হকের পরিমাণও কম-বেশী হয়েই থাকে। কখনো তা এক-পঞ্চমাংশ হতে পারে, আর কখনো এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ।

আমরা মনে করি, এই পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারটি ইজতিহাদ ও যোগ্য অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর ছেড়ে দেয়া বাঞ্ছনীয়। তখন ওশর বা অর্ধ-ওশর—যা-ই হোক একটা ধার্য করা যাবে। আবূ উবাইদ হযরত উমর থেকে অপর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তা হল তিনি তাতে ওশর ধার্য করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ওশর ধার্য হওয়ার কারণ বা যৌক্তিকতা কি থাকতে পারে, বুঝি না। কেননা তিনি তা 'রিকাজের' মতো মনে করেন নি। তা করলে এক-পঞ্চমাংশ ধার্য করা যেত। তাকে খনিজ সম্পদও ধরেন নি, তা ধরা হলে তা থেকে যাকাত—এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করা যেত। তিনি তাতে ওশর ধার্য করেছেন; কিন্তু এটা ওশর ধার্যের ক্ষেত্র নয় তা হতে পারে শুধু তখন, যদি তাকে জমি থেকে পাওয়া ফসল ও ফল সমতুল্য মনে করা যায়। কিন্তু এরূপ মত কেউ দিয়েছেন বলে জানা যায়নি।

মাছে কি ধার্য হবে

সামুদ্রিক সম্পদাদি ও আম্বর পর্যায়ে যা কিছু বলা হয়েছে, তা নদী-সমুদ্র থেকে শিকার করা মাছের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাহলে তো একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দাঁড়িয়ে যাবে। বিরাট সম্পদ পাওয়া যাবে এই বাবদ। বিশেষ করে যখন বড় আকারের যৌথ কোম্পানীর ভিত্তিতে মৎস্য শিকার করার কাজ করা হবে। তাকে হক ধার্য হওয়া থেকে মুক্ত রাখা কিছুতেই উচিত হতে পারে না—যেমন খনি ও ক্ষেত-খামারকে রাখা হয়নি।

আবূ উবাইদ ইউনুস ইবনে উব্বাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয আম্মানে নিযুক্ত তাঁর কর্মচারীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন; 'শিকার করা মাছের মূল্য পরিমাণ দুইশত দিরহাম পর্যন্ত না পৌঁছলে সে বাবদ কিছুই গ্রহণ করা যাবে না। নগদ সম্পদের নিসাব পরিমাণটাও এই। এই পরিমাণ হলে তা থেকে যাকাত গ্রহণ করতে হবে।' ইমাম আহমদও এ মত দিয়েছে বলে বর্ণনা পাওয়া গেছে। ইমামীয়া ফিকাহ্‌বিদদের মতে এক-পঞ্চমাংশ ধার্য হবে। কেননা তাঁদের মতে তা গনীমতের মালের মত।

অষ্টম অধ্যায়

দালান-কোঠা ও শিল্প-কারখানা প্রভৃতি প্রবৃদ্ধিমূলক প্রতিষ্ঠানের যাকাত

এই অধ্যায়ে তিনটি আলোচনা ঃ

প্রথম, প্রবৃদ্ধি দান ক্ষেত্রসমূহের যাকাত

দ্বিতীয়, এসব জিনিসের যাকাত কিভাবে দেয়া যাবে?

তৃতীয়, তাতে নিসাবের হিসাব কিভাবে নির্ধারিত হবে?

প্রথম আলোচনা

প্রবৃদ্ধি দান—ক্ষেত্রসমূহের যাকাত

অর্থ-সম্পদ প্রবৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত জিনিস-পত্র ঃ এ সব জিনিসের উপর স্বতঃই যাকাত ধার্য হয় না, এগুলো বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করার জন্যও রাখা হয় না। এগুলো গ্রহণ করা হয় প্রবৃদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে এবং এসবের মালিকেরা তা থেকে ফায়দা লাভ করে, তা ভাড়ায় লাগিয়ে তার মাধ্যমে উপার্জনও করে। অথবা তার উৎপাদন বিক্রয় করার মাধ্যমে আয় করে।

যেমন ঘর-বাড়ী ও জন্তু-জানোয়ার, যা নির্দিষ্ট মজুরীর বিনিময়ে ভাড়ায় লাগানো হয়—ভাড়ায় লাগানো অলংকারাদিও এ পর্যায়ে গণ্য। একালে দালান-কোঠা ও পরিবহন উপকরণ ইত্যাদিও ভাড়ায় লাগিয়ে অর্থোপার্জন করা হয়।

এমন সব জিনিসও আছে যা কোন-না কোন উৎপাদন দেয় এবং সেই উৎপাদন বিক্রয় করে অর্থ লাভ করা হয়। যেমন গরু-ছাগল, যা খোলা মাঠে ছেড়ে দিয়ে পালা হয় না। তার দুগ্ধ বা পশম বা গোশ্‌ত-চর্বি বিক্রয় করা হয়। একালে এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে শিল্প-কারখানা-যন্ত্রপাতি, যা উৎপাদন দেয় এবং সে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রয় করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা বলে এসেছি যে, প্রাণী উৎপাদনকে মধুর উপর কিয়াস করতে হবে এবং তার সম্পূর্ণভাবে উৎপন্ন (Finished) থেকে ওশর নিতে হবে। কেননা তা প্রাণীজাত, আর এ প্রাণীর উপর কোন যাকাত ধার্য হয় না।

এ কারণে আমি এক্ষেত্রে মনে করি, উপরে অর্থোপার্জনের মাধ্যম পর্যায়ের যেসব জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে যাকাত থেকে মুক্ত রাখতে হবে। যদিও কোন কোন ফিকাহবিদ তা যাকাত ধার্য হওয়ার জিনিসের মধ্যে গণ্য করেছেন।

যেসব মাল সরাসরি ব্যবসায়ের জন্যে গ্রহণ করা হয় এবং যেসব মাল অর্থাগমের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়—এ দুপর্যায়ের জিনিসের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম পর্যায়ের জিনিস থেকে তা হস্তান্তরিত করার মাধ্যমে মুনাফা লাভ হয়। কিন্তু যে জিনিস প্রবৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তা স্ব-স্থানে থেকেই যায়, তার ফায়দাটুকুই শুধুই গ্রহণ করা হয়।

এসব উৎপাদন-মাধ্যম সংক্রান্ত জিনিসসমূহ সম্পর্কে শরীয়াতের হুকুম জানতে চেষ্টা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিশেষ করে বর্তমান যুগে। কেননা এ যুগে প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন

মাল বহু প্রকারের হয়ে গেছে। কেবল জন্তু ও নগদ সম্পদের উপরই কোন নির্ভরতা নেই। ব্যবসায়-পণ্য ও কৃষি জমিই একালের একমাত্র মুনাফা লাভের মাধ্যম নয়।

ভাড়ায় লাগানো ও অর্থাগমের জন্যে নির্মিত দালান-কোঠাও একালের প্রবৃদ্ধি-সম্পন্ন সম্পদরূপে গণ্য। শিল্প-কারখানাও, যা উৎপাদনের জন্যে নিয়োজিত—গাড়ী ও উড়োজাহাজ, নৌকা-জাহাজ-লঞ্চ ইত্যাদি যাত্রী পরিবহন পণ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী স্থানান্তরিতকরণে ব্যাপক ও বিপুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলোতে নিয়োজিত মূলধন হয় স্থিতিশীল, নয় প্রায় স্থিতিশীল। অন্য কথায়, অর্থাগম ও প্রবৃদ্ধি সাধনে নিয়োজিত মূলধন—যা হস্তান্তরিত হয় না, বরং মালিকদের বিপুল অর্থ আমদানীর সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এসব জিনিসে যাকাত পর্যায়ে শরীয়াত এবং ফিকাহ্‌বিদগণ কি বলেন?

যাকাত ধার্যকরণে সংকীর্ণতাবাদীদের বক্তব্য

১. যে সব জিনিসের যাকাত ধার্য হতে পারে, নবী করীম (স) তা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করে গেছেন। কিন্তু ভাড়ায় লাগানো জমি, জন্তু ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতিকে তার মধ্যে গণ্য করেন নি। আসলে মানুষকে সর্বপ্রকার বাধ্যবাধকতা ও কর্তব্য-দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখাই ইসলামের লক্ষ্য। এ মৌলনীতি থেকে বাইরে যাওয়া যেতে পারে কেবলমাত্র অকাট্য দলীল ও বিধানের ভিত্তিতে, যা মহান আল্লাহ্‌ ও রাসূলের কাছ থেকে এসেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি।

২. ইসলামের ফিকাহ্‌বিদগণও এসব জিনিসের উপর যাকাত ফরয হওয়ার পক্ষে কোন কথাই বলেন নি। যদি বলতেন, তা হলে নিশ্চয়ই তা কারোরই অজানা থাকতে পারত না।

৩. বরং তাঁরা এর বিপক্ষে দলীল উপস্থাপিত করেছেন। বলেছেন, বসবাসের ঘরে, বিভিন্ন পেশাদারদের পেশা সংক্রান্ত কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি যানবাহনরূপে ব্যবহৃত জন্তু-জানায়ার এবং ঘরের আসবাবপত্রের উপর কোন যাকাত ধার্য হবে না।

তাহলে এ ব্যাপারে তাঁদের মতে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, শিল্পকারখানার কোন যাকাত দিতে হবে না, তার উৎপাদন যত বড় ও বিরাটই হোক-না-কেন। এসব দালান-কোঠারও যাকাত দিতে হবে না; তা যত উঁচু বুনিয়াদেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন। গাড়ী, উড়োজাহাজ ও নৌকা জলযানের বা ব্যবসায়ী জাহাজের আমদানী যত বেশীই হোক, তার কোন যাকাত দিতে হবে না।

হ্যাঁ , তবে তা থেকে যা আমদানী হয়, তা হস্তগত হওয়ার পর যদি একটি বছর অতিক্রান্ত হয়, তাহলে তার উপর নগদ সম্পদ হিসেবে যাকাত ধার্য হবে। আর এক বছরকাল পর্যন্ত যদি নিসাব পরিমাণ না থাকে কিংবা নিসাব পূর্ণই না হয়, তাহলে তাতে কিছুই ধার্য হবে না।

যাকাত ধার্যের ক্ষেত্র সংকীর্ণ করে রাখা একটা প্রাচীন মত। আগের কালের লোকেরা এই মত উপস্থাপিত করেছেন। জাহিরী মতের ফকীহ্ ইবনে হাজম এই মতের একজন বড় সংরক্ষক ও প্রবক্তা। শেষের দিকে ইমাম শাওকানী ও নওয়াব সিদ্দিক হাসান এই মতের পিছনে সমর্থন যুগিয়েছেন। তাঁরা এতদূর বলেছেন যে, ব্যবসায়ের পণ্যেও যাকাত ধার্য হবে না, ফল-ফাঁকড়া ও শাক-সব্জিতেও যাকাত নেই।

প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণের যাকাত ধার্যকরণের প্রতিবাদ করে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট কথা বলেছেন। الروضة الندية। এর গ্রন্থকার। বলেছেন, সর্বসম্মতভাবে যেসব জিনিসের উপর যাকাত ধার্য হয়, তাছাড়া অন্যান্য জিনিসের উপর যাকাত ধার্যকরণ—ইসলামের প্রাথমিক স্তরে কখনই শোনা যায়নি। অথচ সেই যুগটাই ইসলামের সোনালী যুগ এবং সর্বোত্তম সময়। কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে তার পক্ষে কোন দলীল পেশ করা তো সুদূরপরাহত ব্যাপার।

যাকাত ধার্যকরণে উদার দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের বক্তব্য

যাঁরা যাকাত ধার্যকরণে উদার দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁরা বলেন যে, উপরিউক্ত জিনিসগুলোর উপরও যাকাত ধার্য হবে। মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবেরও কোন কোন আলিমের এরূপ মত রয়েছে—যদিও তাঁরা খুব পরিচিত নন। আল্লামা আবূ জুহরা, খাল্লাফ ও আবদুর রহমান হাসান প্রমুখ একালের মনীষিগণও তাই মনে করেন। এ গ্রন্থকারও এ মতে বিশ্বাসী এবং সে বিশ্বাস নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহের উপর ভিত্তিশীল ঃ

১. আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব প্রকারের মাল-সম্পদের উপরই একটা সুপরিজ্ঞাত হক ফরয করেছেন, তা যাকাত হোক বা সাদ্কা। কুরআনের ঘোষণা ঃ 'লোকদের ধন-মালে সুপরিজ্ঞাত হক রয়েছে'। কুরআনের নির্দেশ ঃ 'তাদের ধন-মাল থেকে সাদ্কা-যাকাত গ্রহণ কর।' রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ 'তোমরা তোমাদের ধন-মালের যাকাত দাও।' এসব আয়াত ও হাদীসে বিভিন্ন মালের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি।

ব্যবসায়-পণ্যে যাকাত হয় না বলে জাহিরী ফিকাহ্বিদগণ যে মত দিয়েছেন, ইবনুল আরাবী তা রদ্ করেছেন। কেননা সেরূপ কোন সহীহ্ হাদীস পাওয়া যায়নি। বরং আল্লাহ্র নির্দেশ ঃ 'তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত নাও' সর্বপ্রকারের মালই বুঝিয়েছে—যদিও সে মাল বিভিন্ন প্রকারের, নামও সে সবের এক নয়। এর মধ্য থেকে কোন প্রকারের মালকে যদি যাকাতদানের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করতে হয়, তবে তা নিশ্চয়ই অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে করতে হবে।

২. মালমাত্রের উপরই যাকাত ফরয হওয়ার কারণটা অতীব যুক্তিসংগত এবং বোধগম্য। আর তা হচ্ছে প্রবৃদ্ধি। আইনের কারণ বিশ্লেষণকারী ফিকাহ্বিদগণও এ কথা বলেছেন। তাঁরা কিয়াসকে পুরাপুরি কাজে লাগিয়েছেন। আর তাঁরা জাতির সমস্ত ফিকাহবিদ্ সমন্বিত পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় জাহিরী মুতাযিলা ও শিয়া ফিকাহ্বিদরাই শুধু ভিন্ন মত পোষণ করেন। আর এ কারণেই তাঁরা বসবাসের ঘর, ব্যবহার্য

কাপড়—পোশাক, হীরা-জহরতের অলংকার, পেশার কাজের যন্ত্রপাতি, জিহাদের ঘোড়ার উপর ইজমা' করেছেন যাকাত ফরয না হওয়ার। কাজেই উট, গরু ও স্ত্রীলোকদের সাধারণ ব্যবহার্য অলংকারাদির উপর থেকে যাকাত প্রত্যাহার করার কথাটিও নির্ভুল, সহীহ। যেসব মাল স্বভাবতই প্রবৃদ্ধিপ্রবণ নয় বা মানুষের কাজের ফলে প্রবৃদ্ধি পায় না, তা-ও এ পর্যায়ে গণ্য।

প্রবৃদ্ধিই যখন যাকাত ফরয হওয়ার কারণ, তখন এতদসংক্রান্ত হুকুম আবর্তিত হবে—কারণ পাওয়া যাওয়া-না যাওয়ার মধ্যে, তাই যে মালই প্রবৃদ্ধিপ্রবণ তাতে যাকাত ফরয হবে, নতুবা নয়।

৩. যাকাতের বিধান প্রণয়নে নিহিত লক্ষ্য ও যৌক্তিকতা হচ্ছে মালের মালিকদের মন পবিত্র ও পরিচ্ছন্নকরণ এবং অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রতি সহানুভূতি কার্যকরকরণ, আর দ্বীন-ইসলামের সমর্থন সংরক্ষণে আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থাকরণ। ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় বিনিয়োগও তার অন্তর্ভুক্ত। যাকাত ফরয করা মালিকদের নিজেদের কল্যাণে অধিকতর কার্যকর। তারা যাকাত দিয়ে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অর্জন করতে পারে, গরীব-মিসকীনদের সাহায্য করাও এর দ্বারা সম্ভব।

জমির উৎপাদনে ওশর ধার্যকরণের বিবেক-বুদ্ধিসম্মত যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেছেন ইমাম কাসানী। বলেছেনঃ "গরীবদের মধ্যে ওশর বন্টনে নিয়ামতের শোকর আদায় নিহিত রয়েছে। যারা অক্ষম, তাদের শক্তিশালী করাও সম্ভব, তাদের নিজেদের ফরয আদায়ে সক্ষম করে তোলাও এভাবেই সম্ভব হতে পারে। গুনাহ ও কার্পণ্য থেকে মন ও মানসিকতাকে পবিত্র-পরিশুদ্ধিকরণের এ একটা অধিক কার্যকর উপায়। আর এর প্রত্যেকটি কাজই অবশ্য করণীয়, বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিতে যেমন, শরীয়াতের দৃষ্টিতেও তেমনি। তাহলে নিয়ামতের শোকর, অক্ষমের সাহায্যকরণ মন-মানসিকতা পবিত্র-পরিশুদ্ধিকরণ কি বিবেক ও শরীয়াতের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র ফসল ও ফলের মালিকদের জন্যেই প্রয়োজন? আর কারখানা, দালান-কোঠা, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ, উড়োজাহাজের মালিকদের জন্যে তার কোন প্রয়োজনই নেই? ... অথচ তারা এসবের মাধ্যমে জমি, ফসল ও ফলের মালিকদের তুলনায় অনেক-অনেক গুণ বেশী পরিমাণ আয় করে থাকে! আর তাদের কষ্ট বলতেও তেমন কিছু স্বীকার করতে হয় না?

যাকাত ধার্য করার ক্ষেত্র সংকীর্ণকারীদের মতের প্রতিবাদ

নবী করীম (স) যেসব মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করেছেন, কেবল তা থেকেই যাকাত গ্রহণ করা যাবে, তার বাইরে অপর কোন জিনিস থেকে যাকাত নেয়া চলবে না—এ কথার জবাবে আমরা বলতে চাই ঃ

কোন্ বিশেষ মাল থেকে নবী করীম (স) যাকাত গ্রহণ করেছেন, এর কোন দলীল বর্তমান না থাকাটা এটা প্রমাণ করে না যে, সে মালে যাকাত ফরয নয়। কেননা এ তো

জানা কথা যে, নবী করীম (স) সেসব প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করেছেন, যা তাঁর সময়ে আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। যেমন উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি জন্তু এবং গম, যব, খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি কৃষি ফল ও ফসল আর নগদ রৌপ্য মুদ্রা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিমগণ অন্যান্য এমন বহু জিনিস থেকেই যাকাত গ্রহণ করেছেন, যে বিষয়ে কোন দলীল আসেনি এবং তা করা হয়েছে ওসব মালের উপর কিয়াস করে, যেসব থেকে নবী করীম (স) যাকাত গ্রহণ করেছেন; অথবা দলীলের সাধারণ তাৎপর্যকে ভিত্তি করে এবং যাকাত ফরয করার মূলে নিহিতকরণের সামঞ্জস্য বিধানস্বরূপ।

ক. ইমাম শাফেয়ী স্বর্ণের যাকাত পর্যায়ে এ কারণই লিখেছেন ঃ নবী করীম (স) নগদ রৌপ্য মুদ্রার উপর যাকাত ধার্য করেছেন। পরে মুসলিমরা স্বর্ণ থেকেও যাকাত গ্রহণ করেছেন, হয় এমন হাদীসের উপর ভিত্তি করে, যা আমাদের কাছে পৌঁছেনি অথবা এ কথা 'কিয়াস' করে যে, স্বর্ণ হচ্ছে সঞ্চয়কারীদের জন্যে নগদ সম্পদ। ক্রয়-বিক্রয়ে তা মূল্য হিসেবে আদান-প্রদান করার নিয়মও চালু রয়েছে। ইসলামের পূর্বেও তা এরূপ ছিল এবং ইসলামের যুগেও তা চলমান ছিল।

ইমাম শাফেয়ীর 'এমন কোন হাদীসের বর্তমান থাকার সম্ভাব্যতা বোধ—যা তাঁর কাছে পৌঁছেনি' কথাটির সম্ভাবনা খুবই দুর্বল। কেননা এরূপ কোন হাদীস আদৌ থেকে থাকলে তা লোকেরা নিশ্চয়ই পরস্পরের কাছে বর্ণনা করতেন, তার কঠিন প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিল। অতএব কিয়াস করাই উত্তম পন্থা। ফিকাহ্‌বিদ কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবীও এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। নবী করীম (স) রৌপ্য, তার নিসাব ও যাকাতের পরিমাণ স্পষ্ট করে বলেছেন; কিন্তু স্বর্ণের কথা উল্লেখ করেন নি, তার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে, তখনকার লোকদের ব্যবসা বিশেষ করে রৌপ্যকেন্দ্রিক ছিল—অন্তত ঃ বেশীর ভাগ। তাই এ বেশীর ভাগ ব্যবহৃত জিনিসেরই উল্লেখ করা হয়েছে, যেন অবশিষ্ট জিনিসগুলোও বোঝা যায়। কেননা তাঁরা সকলেই অধিক বোধসম্পন্ন লোক ছিলেন। পরে হেমইয়ারীরা এসে যখন ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়ের দলীল চাইতে শুরু করল, তখন আল্লাহ্ তাদের সম্মুখে হিদায়েতের দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন এবং যারা পূর্বের লোকদের আচরিত নীতি অনুসরণ করে হিদায়েত লাভ করেছিল, তাদের সমষ্টি থেকে বাইরে চলে গেল। এ কথাটি হয়েছে তাদের সম্পর্কে, যারা কিয়াস মেনে নিতে ও 'কারণের প্রতি লক্ষ্য করতে অস্বীকার করেছেন'।

খ. অনুরূপভাবে ব্যবসায়ের পণ্যের উপর যাকাত ফরয হওয়ার পক্ষে কোন অকাট্য দলীল না-থাকা সত্ত্বেও ইবনুল মুনযির বলেছেন, তা ফরয হওয়ার উপর ইমাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল জাহিরী মাযহাবের লোকেরা ছাড়া আর কেউই এর বিরোধিতা করেন নি।

গ. হযরত উমর ঘোড়ার যাকাত গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন তা-ও এ পর্যায়েরই একটি কাজ। কেননা তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, এক-একটা ঘোড়ার মূল্য বিপুল পরিমাণ থাকে। ইমাম আবূ হানীফা সে মতই গ্রহণ করেছেন—যদি তা প্রবৃদ্ধি বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালন করা হয়।

ঘ. ইমাম আহ্‌মদ মধুর উপর যাকাত হওয়ার পক্ষপাতী। কেননা এ বিষয়ে যেমন সাহাবীর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, তেমনি কৃষি ফসল ও ফলের যাকাতের উপর কিয়াস করলেও তাই করতে হয়। তিনি সর্বপ্রকার খনিজ সম্পদেও যাকাত ফরয মনে করেন স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর কিয়াস করে। তাছাড়া এ পর্যায়ের আয়াত 'যা কিছু আমরা তোমাদের জন্যে বের করেছি জমি থেকে'—খুবই ব্যাপক ও সাধারণ তাৎপর্যসম্পন্ন।

ঙ. ইমাম জুহ্‌রী, হাসান ও আবূ ইউসুফ রিকাজ ও খনিজ সম্পদের উপর কিয়াস করেই বলেছেন, সমুদ্র থেকে পাওয়া মণি-মুক্ত ও আম্বরের উপর যাকাত ধার্য হবে।

চ. মাযহাবগুলো বহু প্রকারের হুকুম-বিধানে যাকাত পর্যায়ে কিয়াসকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন শাফেয়ীরা লোকদের বেশীর ভাগ খাদ্যের উপর কিয়াস করেছেন ফিতরার যাকাত সম্পর্কে উদ্ধৃত হাদীসের উপর। যেমন খেজুর, কিশমিশ, যব বা গম্। উল্লিখিত চারটি সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের উপর কিয়াস করা চলে, কেননা এগুলো কৃষি ফসল বিধায় এ সম্পর্কে শরীয়াতের দলীল উদ্ধৃত হয়েছে।

ছ. 'সর্বকালের ও সব দেশের ফিকাহ্‌বিদগণ থেকে এ কথার সমর্থনে কোন উক্তি বর্ণিত হয়নি' এই দাবিও ঠিক নয়। কেননা তাঁদের যুগে হয়ত এসব প্রবৃদ্ধি-সম্পন্ন মাল সাধারণভাবে ততটা প্রচার ও প্রচলন লাভ করেনি। ফলে ফিকাহবিদকে ইজতিহাদ করে মাসলা বের করতে হচ্ছে। এসবের কোন কোনটি তা সেকালে ছিলই না। এসবই প্রায় একালের নবোদ্ভূত। তা সত্ত্বেও এ সব জিনিসের উপর বা তার ফল ও ফসলের উপর যাকাত ধার্য হওয়ার পক্ষে ফিকাহ্‌বিদ্‌দের উক্তি পাওয়া গেছে। আমরা তার উল্লেখ পরে করছি।

জ. যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ইত্যাদিকে যাকাতমুক্তকরণ সংক্রান্ত ফিকাহ্‌বিদ্‌দের ঘোষণা খুবই যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ। কিন্তু ফিকাহ্‌বিদগণ এসব জিনিসকে যে যাকাত ক্ষেত্রের বাইরে ধরেছেন, আমরা তা থেকে স্বতন্ত্র মত পোষণ করি। কেননা বসতি ঘর ও অর্থাগমের জন্যে নির্মিত দালান-কোঠা এক জিনিস নয়, পেশার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ইত্যাদি থেকে ভিন্ন হচ্ছে সে সব জিনিস, যা কাজে ব্যবহৃত হয়ে মুনাফা আমদানী করে দেয়। এগুলো আবিষ্কৃত হয়ে দুনিয়ায় মানুষের জীবনকে রীতিমত বদলে দিয়েছে। এ কারণে ঐতিহাসিকগণ এগুলোর উদ্ভাবনকে 'শিল্প বিপ্লব' নামে অভিহিত করেছেন। সাধারণ চলাচলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জন্তু নিশ্চয়ই গাড়ি, বাস, উড়োজাহাজ ও সমুদ্রে চলমান বড় বড় জাহাজের মত নয়। ঘরের সাধারণ ব্যবহার্য সরঞ্জামাদি সেসব বিছানা-ফরাশ থেকে স্বতন্ত্র, যা ভাড়ায় লাগানো হয় এবং তার বিনিময়ে বিপুল অর্থাগম হয়। তাহলে আমাদের বিশেষজ্ঞগণ যখন বলেন যে, তাঁরা যেসব জিনিসের উল্লেখ করেছেন, তার উপর যাকাত ধার্য হবে না, তখন তাঁরা কোন ভুল করেন না। বরং তারা খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিবেচনা করে যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে শর্ত নির্ধারণ করেছেন। তা হচ্ছে এই যে, তা প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন হবে এবং মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হবে। এ কারণে 'হিদায়া' গ্রন্থকার এ সব জিনিসের উপর যাকাত ধার্য না হওয়ার কারণ দর্শাতে

গিয়ে বলেছেন ঃ 'কেননা এগুলো মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের কাজে নিয়োজিত—এগুলো প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন নয়।'

'এনায়া' গ্রন্থকার আরও স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ 'মৌল প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকা এবং প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন না হওয়া—এ দুটির প্রতিটিই যাকাত ফরয হওয়ার প্রতিবন্ধক অথচ এ দুটিই এখানে একত্রিত হয়েছে। প্রথমত এ জন্যে যে, বসবাসের একটি ঘরের জন্যে এ সব সরঞ্জাম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর দ্বিতীয় এ জন্যে যে, তা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় স্বভাবতই প্রবৃদ্ধিপ্রবণ নয়। ওগুলো বিক্রয় করে ব্যবসাও করা হয় না। কিন্তু অন্যান্য সব জিনিসে এ দুটির কোনটিই উপস্থিত নেই।

এ কারণে সব ফিকাহ্‌বিদ একমত হয়ে বলেছেন যে, মালিক নিজের বসবাসের জন্যে যে ঘর ব্যবহার করে, তার উপর যাকাত ধার্য হবে না, এ তো ন্যায়বিচারের কথা। ইসলাম এই ন্যায়বিচার নিয়েই দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছে। একালের বহু সরকারই জমি-জায়গার উপর এক ধরনের কর ধার্য করে, এমনকি বসবাসের স্থানের উপরও—তা যত ছোট্টই হোক না কেন (কিন্তু ইসলামে তা নেই)।

এ কারণেই আমাদের ইসলামী ফিকাহ্‌বিদগণ ঘর-বাড়ি, কাপড়-পোশাক, পেশার কাজে নিয়োজিত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উপর যাকাত ধার্য না করার পক্ষপাতী। কেননা এগুলো মৌলিক প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত এবং সেই সাথে এগুলো প্রবৃদ্ধিপ্রবণও নয়। তার বিপরীত অর্থে যা প্রবৃদ্ধির জন্যে গ্রহীত এবং মৌল প্রয়োজন পূরণে ব্যবহৃত নয়, তার উপর যাকাত ধার্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় আলোচনা

দালান-কোঠা ও শিল্প-কারখানার যাকাত কিভাবে দিতে হবে

ইসলাম যে সব প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন ধন-মালের উপর যাকাত ফরয করেছে, তা দু'ধরনের ঃ

প্রথম ঃ যেসব ধন-মাল, যার মূল বা আসল এবং প্রবৃদ্ধি উভয় থেকে বছরান্তে একসঙ্গে যাকাত গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ মূলধন থেকেও এবং তা থেকে পাওয়া মুনাফা থেকেও। যেমন গবাদিপশু ও ব্যবসায় পণ্যের যাকাত। তা করা হয় এজন্যে যে, এখানে মূল এবং তদলব্ধ ফসল সম্পূর্ণ একাকার। এসব ক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ হয় এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ।

দ্বিতীয় ঃ সেসব ধন-মাল, যার মুনাফা ও আয় থেকেই শুধু যাকাত গ্রহণ করা হয়, মুনাফা বা আয় লাভ হওয়ার সাথে সাথে, এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার অপেক্ষা না করেই। সেখানে মূলধন স্থিতিশীল হোক—যেমন কৃষি জমি কিংবা অস্থিতিশীল—যেমন, মধুর চাক। এখানে যাকাতের পরিমাণ হচ্ছে ওশর কিংবা অর্ধ-ওশর—১০% অথবা ২০%।

তা হলে আধুনিককালের নবোদ্ভূত এসব প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন ধন-মালের যাকাত গ্রহণের ব্যাপারটি কোন্ ভিত্তিতে মীমাংসা করা হবে? কি হিসাবে যাকাত গ্রহণ করা হবে তা থেকে? .... যাকাত কি কেবল মূলধন ও অবশিষ্ট ফসল থেকেই নেয়া হবে, যেমন হয় ব্যবসা সম্পদে? না তার আয় বা ফসল থেকেই শুধু তা গ্রহণ করা হবে,—যেমন হয় শস্য, ফল ও মধুতে?

ভাড়া দেয়া ঘর-বাড়ি ইত্যাদি মুনাফা লাভের উপায় থেকে যাকাত গ্রহণের ব্যাপারে দুটি প্রাচীন মত

ফিকাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখেন কিন্তু তার গভীরে পেঁছেন না, এমন বহু লোকই মনে করেন যে, যেসব ঘর-বাড়ি লোকদের কাছে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে ভাড়া দেয়া হয়, যা প্রতি বছর বা প্রতিমাসে নতুন করে আয় এনে দেয়, তার যাকাত দেয়া সম্পর্কে কোন ফিকাহ্‌বিদই দৃঢ়তার সাথে কিছুই বলেন নি। কেননা এভাবে ঘর-বাড়ি ভাড়ায় লাগানোর কোন নিয়ম তখনকার সময় সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল না। তাই এ বিষয় একালে লোকদের একটা চূড়ান্ত কথা জানার প্রয়োজন রয়েছে।

এই কারণ প্রদর্শন যুক্তিসংগত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছেন যাঁরা এসব মালের যাকাত দেয়ার কথা বলেছেন। যদিও এ ব্যাপারে তাঁদের দৃষ্টিকোণ ও আচরণ অভিন্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তাকে ব্যবসায়ে বিনিয়োজিত

মূলধনের মত মনে করা হবে এবং প্রতি বছর তার মূল্যায়ন করে তার এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ (২.৫%) যাকাত বাবদ গ্রহণ করা হবে, না তার মূল্য কি হয় তা না দেখে শুধু তার আয় ও আমদানী থেকেই যাকাত গ্রহণ করা হবে—যখন তার পরিমাণ নিসাব পর্যন্ত পৌঁছবে?

প্রথম দৃষ্টিকোণ ঃ মূল্যায়ন করে ব্যবসায়ী যাকাত গ্রহণ

এ মত অনুযায়ী অর্থাগমকারী দালান-কোঠা, উড়োজাহাজ এবং পণ্যবাহী নৌকা-জাহাজ-লঞ্চের মালিকদের অবস্থা হচ্ছে ব্যবসা পণ্যের মালিকদের মত। প্রতি বছর দালানের মূল্য হিসাব করা হবে তার সাথে আয়-আমদানী যোগ করে এবং যেমন ব্যবসা পণ্যের মূল্য থেকে ঐ পরিমাণ বাদ দেয়া হয় তেমনি তা থেকে ২.৫% বাদ দিয়ে—হিসাব করতে হবে।

আহলে সুন্নাত ও শিয়া মতের বহু ফিকাহ্‌বিদ এ মত পোষণ করেন।

হাম্বলী ফকীহ্ ইবনে আকীলের মত

আহলে সুন্নাতের হাম্বলী ফিকাহ্‌বিদ আবুল ওফা ইবনে আকীল উপরিউক্ত মত প্রকাশ করেছেন। তিনি একজন প্রতিভা সম্পন্ন শক্তিশালী চিন্তাবিদ এবং মাসলা বের করতে সক্ষম ফিকাহ্‌বিদ্। ইবনুল কাইয়্যেম তাঁর এ মতটি তাঁর بدائع الفوائد গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি ইমাম আহমদ থেকে পাওয়া বর্ণনার ভিত্তিতে ভাড়ায় দেয়া অলঙ্কারের উপর কিয়াস করেই একথা বলেছেন। তাঁর মত হচ্ছে ভাড়ায় লাগানোর জন্যে প্রস্তুত জমি এবং অনুরূপভাবে ব্যবসায়ের জন্যে প্রস্তুত বা ভাড়ায় লাগানো পণ্যেরও যাকাত দিতে হবে।

এ কথা অলংকারের উপর কিয়াস করে বলা হয়েছে। কেননা অলংকার সম্পর্কে আসল কথা হচ্ছে, তার যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু তা ভাড়ায় লাগানোর জন্যে তৈরী করা বা রাখা হলে তার উপর যাকাত ধার্য হবে। এ থেকে জানা গেল যে, 'ভাড়ায় লাগানো' যাকাত ফরয হওয়ার একটা কারণ। তাই যেসব জিনিসের উপর মৌলিকভাবে যাকাত ফরয নয়; কিন্তু তা যদি ভাড়ায় লাগানো হয়, তাহলে সেই আসল জিনিসের উপর যাকাত ফরয হবে (কেননা তখন তা অর্থাগমের একটা উপায়ে পরিণত হয়ে যায়)।

আরও স্পষ্ট কথা—স্বর্ণ ও রৌপ্য দুটো মৌলিক জিনিস, তার আসলের উপরই যাকাত ফরয। পরে পরিধান, সৌন্দর্য ও ফায়দা লাভের জন্যে কারুকার্য গ্রহণের দরুন তার যাকাত ধার্য হওয়াটা প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। পরে তা ভাড়ায় লাগানোর জন্যে নিয়োজিত করা হলে সে অবস্থারও পরিবর্তন হবে এবং যাকাত ফরয হওয়ার কারণ প্রধান হয়ে দাঁড়াবে। অতএব যাকাত প্রত্যাহৃত না হয়ে বরং তার উপর যাকাত ধার্য হবে। তাই যে সব জমি, তৈজসপত্র ও জন্তু—যার আসলের উপর যাকাত হয় না, সে সবের উপর যাকাত ফরয হবে।

আমরা বলব, ইমাম আহমদ বলেছেন ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য হালাল অলংকাররূপে ব্যবহৃত হতে শুরু করলে তার উপর যাকাত ধার্য হবে না, তবে ভাড়ায় লাগানোর জন্যে তৈরী করা বা রাখা হলে তা ফরয হবে',—এই মতটি অত্যন্ত শক্তিশালী। তা একটি গুরুত্বপূর্ণ

মৌলনীতির উপর ভিত্তিশীল এবং তা হচ্ছে, অপ্রবৃদ্ধিসম্পন্ন বা মৌল প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত মালের উপর যাকাত ধার্য হবে না, যাকাত ফরয হবে প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন মালের উপর, যা মালিককে আয় এবং উপার্জন এনে দেয়।

সৌন্দর্যের জন্যে ব্যবহৃত জায়েয অলংকার এবং পোশাক অপ্রবৃদ্ধিসম্পন্ন মাল, এসব কেবল মালিকের প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত। কিন্তু তা যখন ভাড়ায় লাগানোর জন্যে প্রস্তুত রাখা হবে তখন তা প্রবৃদ্ধি অর্জনের পরিমণ্ডলে পৌছে যায় এবং যাকাত ধার্য হওয়ার ক্ষেত্র হিসেবেও তা উপযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। ইবনে রুশ্‌দের উল্লেখ অনুযায়ী ইমাম মালিকের মতও তাই।

আমরা যদি এই নীতিটি জমি, সরঞ্জামাদি, গাড়ি, নৌকা, জাহাজ লঞ্চ, উড়োজাহাজ ও শিল্পোৎপাদনের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার উপকরণের উপর প্রয়োগ করি, তাহলে এই সিদ্ধান্তটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা ব্যক্তিগত ব্যবহারে নিয়োজিত থাকলে তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। কিন্তু যখনই তা ভাড়ায় লাগানো হবে এবং তা মুনাফা ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যম হবে, তখন তার উপর যাকাত ধার্য হবে। আর এরূপ অবস্থায় তার যাকাত হবে ব্যবসাপণ্যের যাকাতের মত—নির্দিষ্ট নিসাব ও নির্দিষ্ট যাকাত পরিমাণ নিসাব অনুযায়ী।

তার অর্থ, এই দালান-কোঠার বা অটোমোবাইল, উড়োজাহাজ, হোটেল কিংবা বিয়ে-শাদীতে ভাড়ায় দেয়া তাঁবু, কাপড়-পোশাক ইত্যাদি বা পণ্যদ্রব্য—যা ভাড়ায় দেয়া হয় ও ভাড়ায় লাগানোর জন্যে প্রস্তুত করা হয়—তা ব্যক্তি মালিকানায় হোক বা গোষ্ঠীগত কোম্পানীর মালিকানায় হোক—এগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে অবশিষ্ট নগদ মূলধন ও ফেরত পাওয়া সম্ভব পরিমাণ তার সাথে যোগ করে—যেমন মূলধনের ব্যবসায়ীরা করে থাকে—তার শতকরা ২.৫% ভাগ যাকাত বাবদ দিতে হবে।

এগুলোকে স্থিতিশীল মূলধন বলা যায় না। কেননা তার উপর যাকাত ফরয হয় না, যেমন দোকানের পাত্র-ভাণ্ডার-সরঞ্জামাদির যাকাত দিতে হয় না। যেহেতু এই স্থিতিশীল দ্রব্যাদি আসলেই প্রবৃদ্ধিশীল মূলধন যা মুনাফা ও উপার্জন টেনে আনে। যা উপার্জনের লক্ষ্যে নিয়োজিত নয়, কেবল তা-ই যাকাত মুক্ত গণ্য হতে পারে। যেমন জমি এবং সে সব স্থান, যেখানে কারখানা ও শিল্পোৎপাদনের প্রতিষ্ঠান দাঁড় করা হয়। কেননা এগুলো সেই লক্ষ্যেই নির্মিত। কিন্তু জমি, দালান-কোঠা, হোটেল, সিনেমা ঘর প্রভৃতি নির্মিতই হয় আয়-আমদানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

আমদানী বৃদ্ধির জন্যে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে 'হাদুইয়ার' মত

যায়দীয়া শিয়া মতের হাদুইয়া প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, অর্থাগম ও প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্মিত সমস্ত জিনিসের উপর যাকাত ধার্য হবে। কেননা এগুলো মালিককে বিপুল আয়ের সুযোগ করে দেয়। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ 'ওদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর' খুবই নির্বিশেষ। আরও এজন্যে যে, তা প্রবৃদ্ধি লাভে ব্যবহৃত হওয়ার উদ্দেশ্যেই নির্মিত। ফলে তা ব্যবসা সম্পদের মত হয়ে গেল। অতএব তার যাকাত দিতে হবে যদি তার মূল্য নিসাব পরিমাণ পর্যন্ত পৌছে যায়।

অতএব যে অলংকার, ঘর, জন্তু-যান ইত্যাদি ভাড়ায় দেয়া হবে, তার নগদ মূল্য যদি

নিসাব পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে যায় ও বছরের শুরু ও শেষের দিকে তাই থাকে, তাহলে তার উপর ব্যবসায়-যাকাতের ন্যায় যাকাত ফরয হবে।

কেউ যদি একটা ঘোড়া ক্রয় করে এ উদ্দেশ্য নিয়ে যে, তার ফল বা উৎপাদন (বাচ্চা) যখন পাওয়া যাবে, তখন তা বিক্রয় করা হবে, তাহলে তার মূল্য ও তার বাচ্চার মূল্যের উপর যাকাত ধার্য হবে। কেননা তা ঠিক ব্যবসায়ের জন্যে খরিদ করা হয়েছে ও বাচ্চা তারই লাভ হয়েছে।

মুয়াইয়্যিদ বিল্লাহ্ বলেন ঃ 'রেশম পোকা যদি এ উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় যে, তার উৎপাদন বিক্রয় করা হবে, তাহলেও অনুরূপভাবে তার যাকাত দিতে হবে।

হুকাইনী বলেছেন, যদি কেউ কোন বৃক্ষ ক্রয় করে তার ফল বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে কিংবা কেউ গাভী বা ছাগল ক্রয় করে তা থেকে পাওয়া পশম, দুগ্ধ ও মাখন বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে, তাহলে তারও যাকাত দিতে হবে।

এ মতের দলীল হিসেবে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

১—সাধারণভাবে সব মালের উপর যাকাত ধার্যকরণই হল যাকাত ফরযের আয়াতের আসল দৃষ্টিকোণ। তাতে মালের বিভিন্নতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নির্দেশ করা হয়নি।

২. অর্থাগমের মাল সম্পর্কে কিয়াস করা হয়েছে ব্যবসায়ের মালের উপর। এই দুই প্রকারের মাল দ্বারা প্রবৃদ্ধি অর্জনই আসল লক্ষ্য।

ভিন্ন মতের উত্থাপিত আপত্তি

বিভিন্ন ফিকাহ্‌বিদ্ উপরিউক্ত মতের উপর আপত্তি তুলেছেন। তাঁরা যাকাত ধার্য হওয়ার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ রাখার পক্ষপাতী। ইমাম শাওকানী ও তাঁর ব্যাখ্যাতা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান এ পর্যায়ে উল্লেখ্য।

যাঁরা বলেন, শাক-সব্জি ও ব্যবসায়ের পণ্যে যাকাত নেই, শাওকানী ও সিদ্দীক হাসান এ মত পোষণ করেন—তাঁরা বলতে পারেন যে, ঘর-বাড়ি ও জন্তু-যান—যা তার মালিক ভাড়ায় দেয়—তাতেও যাকাত নেই।

এই পর্যায়ে যে দলীল উল্লেখ করা হয়েছে, তার উপর দুটি সংশয় আরোপিত হয়; একটির সম্পর্ক বর্ণিত হাদীসের সাথে। আর দ্বিতীয়টির সম্পর্ক যুক্তি ও বিবেচনার সাথে।

১. হাদীস হচ্ছে, 'মুসলিমের গোলাম ও তার ঘোড়ার উপর যাকাত নেই।' এখানে যাকাত না হওয়ার কথাটি সাধারণভাবে বলা হয়েছে। ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জন বা কেরায়ায় লাগানো ঘোড়া বা গোলামও তার অন্তর্ভুক্ত মনে হয়।

২. দ্বিতীয় সংশয়টি হচ্ছে, এসব মাল তো সর্বসম্মতভাবে সেই পর্যায়ের, যার উপর যাকাত ধার্য হয় না। তার উপর কি করে যাকাত ফরয করা যেতে পারে? যেমন ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা, যানবাহনরূপে ব্যবহৃত জন্তু ইত্যাদি। তার মূলটা ব্যবসায়ে বিক্রয় করা হয় না, শুধু ভাড়ায় লাগানো হয়। আর শুধু এ কারণে যাকাত ধার্য করার

কথা ইসলামের প্রাথমিক যুগে কখনই শোনা যায়নি। সে পর্যায়ে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কোন দলীলের উল্লেখ তো সুদূরপরাহত।

তখনকার লোকেরা ভাড়ায় গ্রহণ করত, ভাড়ায় লাগাতোও এবং তাদের ঘর-বাড়ির স্থানের ও যানবাহনরূপে ব্যবহৃত জন্তুর ভাড়াও তারা আদায় করত। কিন্তু তাদের কারোর মনেই বছরান্তে তার ঘরের-জমির ও জন্তুর এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ, যাকাত বাবদ দেয়ার কথা জাগেনি। তারা এ পীড়াদায়ক কষ্ট থেকে মুক্ত থাকা অবস্থা নিয়েই জীবন কাটিয়ে গেছে। তৃতীয় হিজরী শতকের শেষকালে কিছু লোক এ যাকাতের কথা কোনরূপ দলীল ছাড়াই বলতে শুরু করেছেন। তাঁদের একমাত্র দলীল ব্যবসায় পণ্যের উপর কিয়াস।

তা সত্ত্বেও এ 'কিয়াস'টাই কয়েকটি কারণে বিপর্যস্ত; একটি কারণ, আসল ও তার ফল বা শাখার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। আর মুনাফার ফায়দা নিশ্চয়ই আসলের ফায়দার সমান নয়।

এ সংশয়ের সারকথা হচ্ছে, মানুষ সর্বপ্রকারের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত, মানুষের আসল 'পজিশন' তাই। আর এসব আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের উপর যাকাত ফরয হওয়ার কোন প্রত্যক্ষ দলীলও পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক কালের কোন একজন লোকও এসবের উপর যাকাত ফরয হওয়ার কথা বলেন নি; কোন আয়াত বা হাদীসের অকাট্য দলীল পাওয়া তো দূরের কথা।

ব্যবসায়ের মালের উপর কিয়াস করে তার যাকাত দেয়া যদি যুক্তিসংগত ধরেও নেয়া যায়, তবু এ 'কিয়াস' বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পার্থক্যকারী থাকার কারণে। আর তা হচ্ছে, ব্যবসায়ের মাল এবং তার পণ্যদ্রব্যের 'আসল' দ্বারাই ফায়দা পাওয়া যায়। আর ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সে আসল ও মূলটাই হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু এ জিনিসগুলো সেরূপ নয়। এগুলো মালিকের কাছেই থেকে যায়, তার ফায়দাটুকুই শুধু কাজে নেয়া হয়, তার বেশী নয়।

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার দান

'মুসলিমের গোলাম বা তার অশ্বের উপর যাকাত নেই'—এ হাদীসটির তাৎপর্য হচ্ছে, এ দুটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে বলে তার উপর যাকাত ধার্য না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। গোলাম মনিবের খিদমত করে, আর অশ্বের পৃষ্ঠে সে নিজে সওয়ার হয়, যুদ্ধে গমন করে। এ কারণে ফিকাহ্‌বিদগণ ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই এ গোলাম ও অশ্বের উপর যাকাত ধার্য না করার পক্ষে মত দিয়ে এসেছেন। তবে তা ব্যবসায়ের জন্যে হলে তা থেকে যাকাত নেয়ার ব্যবস্থা কার্যকর করা হত। ইবনুল মুন্‌যির এর উপর ইজমা হওয়ার দাবি করেছেন। এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থও তা-ই; যা তাঁরা বুঝেছেন ও তার উপর ফতোয়াও দিয়েছেন।

এসব জিনিসের যাকাত ধার্য করণ সংক্রান্ত কোন কথা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের থেকে বর্ণিত না হওয়ার কারণ হচ্ছে, তখন এগুলো ভাড়ায় লাগানো ও তা থেকে অর্থাগম করার কোন রেওয়াজ ছিল না। আর প্রত্যেক যুগের সমস্যা সে যুগের অবস্থার প্রেক্ষিতেই অনুধাবনীয় হয়ে থাকে এবং সে অনুপাতেই তার সমাধান বের করতে হবে।

বর্ণনাকারিগণও ঠিক তা-ই বর্ণনা করেন পরবর্তী লোকদের কাছে। এসব অর্থাগমকারী দ্রব্যাদি নিয়ে সেকালে কোন সমস্যাই দেখা দেয়নি। কথা হচ্ছে, হাদী'র মত ইজমা'র পরিপন্থী নয়। কেননা সাহাবী ও তাবেঈনগণ হয় এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং তাতে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাহলে তা একটা বিরোধীয় বিষয়। অথবা তাঁরা এ বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু কেউ তা পরবর্তী লোকদের কাছে বর্ণনা করেন নি। কিংবা তাঁরা এ বিষয়ে আদৌ চিন্তা-বিবেচনাও করেন নি। অবস্থা যা-ই হোক, নির্ভুল চিন্তা-বিবেচনার ভিত্তিতে এ বিষয়ে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানতে চেষ্টা (ইস্তেম্বাত) করা নিশ্চয়ই কোন দূষণীয় কাজ নয়।

এসব অর্থাগমকারী প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়ের পণ্যের উপর 'কিয়াস' করার একটা যৌক্তিকতা বিবেচিত হতে পারে প্রথম দৃষ্টিকোণ থেকে। কেননা সব পণ্যদ্রব্য ও অর্থাগমের জিনিসপত্র মূলধন বিশেষ, প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন এবং ফল উৎপদানকারী। আর উভয়ের মালিক ব্যবসায়ী; সে তার মূলধনের ফল পায়, মুনাফা অর্জন করে। আর ব্যবসা পণ্যের মালিক সে আসল জিনিসটি তার মালিকানা থেকে বের করে হস্তান্তরিত করেই উপকার লাভ করে। পক্ষান্তরে দালান-ইমারত ও কারখানা শুধু মুনাফা দিয়েই মালিককে ধন্য করে, মূল জিনিসটা তার হাতেই থেকে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা এমন পার্থক্য নয়, যার দরুন এর একটির উপর যাকাত ফরয মনে করা হবে ও অপরটিকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে।

বরঞ্চ বলতে হবে, আসল জিনিস মালিকানায় অবশিষ্ট রেখে তার আয়-অর্থাগম থেকে উপকৃত হওয়া অধিক পরিমাণ মুনাফা লাভের কারণ হয়। ক্ষয়-ক্ষতি থেকেও মুক্ত থাকে অন্য ব্যবসায়ীর তুলনায় অনেক বেশী।

এ হল প্রথমবারের কথা। কিন্তু গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হলে দুই ধরনের জিনিসের ও তাদের মালিকদের মধ্যে আরও পার্থক্য স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে উঠবে। এখানে কয়েকটি দিক তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

প্রথম ঃ ব্যবসা পণ্যের অধিক সত্য ও যথার্থ সংজ্ঞা হচ্ছে, সে সব জিনিস যা মুনাফা লাভের আশায় প্রস্তুত করা হবে, তা-ই পণ্য বলে বিবেচিত হবে। সামুরাতা বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, 'নবী করীম (স) সে সব জিনিস থেকে যাকাত বের করার নির্দেশ দিতেন, যা লোকেরা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত করতেন।

ব্যবসায়ের যাকাত পর্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আর এসব ইমারত ও কারখানা এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কিন্তু বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয় না। বরং মালিকরা তা প্রস্তুত করে অর্ধাগমের উদ্দেশ্যে। এই কথাটির প্রয়োগ হয় ব্যবসায়ের উপর; সেসব শরীকদারের উপরও, যারা বড় বড় ইমারত ক্রয় করে বা নির্মাণ করে সেটি বিক্রয় করে মুনাফা পাওয়ার উদ্দেশ্যে। অতএব এই কাজ যে ঠিক ব্যবসা এবং এই ইমারতও ব্যবসায়ের পণ্য, তাতে কোন মতবিরোধ থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় ঃ যেসব মালিক তাদের মূলধন অর্থাগমের কাজে নিয়োজিত করে, তার প্রবৃদ্ধি কামনা করে, তাদের যদি ব্যবসায়ী মনে করা হয়—যদিও তাদের মূলধন আবর্তিত হয়

না এবং তা বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করাও হয় না—তাহলে যেসব জমি ফসল দেয় এবং যেসব গাছ ফল দেয়, সেসবের মালিকও ব্যবসায়ী গণ্য হবে এবং প্রতিবছর তাদের এই জমি ও গাছের বা বাগানের মূল্যায়ন করে তার ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। কিন্তু এই কথা যেমন কেউই বলেন নি, তেমনি তা আদৌ গ্রহণযোগ্যও হতে পারে না

তৃতীয় ঃ এ সব অর্থাগমের প্রতিষ্ঠান অনেক সময় কোন-না-কোন কারণে অকেজো হয়ে যায়, তার অর্থাগম স্তব্ধ হয়ে যায়। দালানের মালিক ভাড়াটে পায় না, কারখানার মালিক জরুরী সামগ্রী পায় না বা কাজের লোক পায় না, কিংবা মুনাফাদানকারী বাজার পায় না। তখন ওসবের যাকাত কে দেবে? আর কেমন করেই বা তা দেয়া হবে?

কিন্তু চলমান ব্যবসায়ী পণ্যের মালিক তো তা বিক্রয় করে তার মূল্য থেকে যাকাত আদায় করতে পারে। প্রয়োজন হলে তার মূল্যের উপর থেকে যাকাত প্রত্যাহার করাও সম্ভব। বাড়ির বা কারখানার মালিকের যদি অন্য কোন মাল বা নগদ সম্পদ না থাকে, তাহলে তা বা তার কোন অংশ বিক্রয় না করে দিলে সে যাকাত দিতে সক্ষমই হতে পারে না। কিন্তু তা যে কত কঠিন ব্যাপার, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্যে কঠিন নয়—সহজতর ব্যবস্থাই চান।

এ থেকে যে জিনিসের মূল ফায়দা দেয় এবং যে জিনিসের ফল বা ফসল থেকে ফায়দা পাওয়া যায়—প্রথমটির দৃষ্টান্ত ব্যবসা পণ্যদ্রব্য আর দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত জমি জায়গা—এ দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্যের মূল্য স্পষ্ট হয়ে উঠে।

চতুর্থ ঃ বাস্তব পরিণতির দিক দিয়ে উক্ত মতের অবস্থা আরও মর্মান্তিক হয়। কেননা ইমারত বা কারখানা ইত্যাদি প্রতি বছরই মূল্যায়ন ও যাকাত পরিমাণ নির্ধারণের মুখাপেক্ষী হবে। বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার মূল্য কি দাঁড়ালো, তা জানবার জন্যে এটা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। কেননা কালের পরিক্রমায় তার যোগ্যতার ঘাটতি অনিবার্য আর তার মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হবে। যেমন অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক বহু কারণেই দ্রব্যমূল্য পরিবর্তিত হয়ে থাকে। মূল্যায়নে তার প্রভাবও হয় অত্যন্ত প্রকট। আর প্রতি বছর অন্তর এই জিনিসগুলোর সঠিক মূল্য নির্ধারণ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

এ কারণে আমরা মনে করি, ইমারত ও কারখানার আমদানীর উপর যাকাত ধার্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্য দুটি মত এই দৃষ্টিকোণে গড়ে উঠেছে যদিও আমদানী থেকে কি হারে যাকাত নেয়া হবে তার নির্ধারণে সে মত দুটি পরস্পর বিপরীত। 'ওশর' হবে, না অর্ধ-ওশর, এ নিয়ে এ পার্থক্য—যেমন জমির ফসল ও ফলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে; অথবা নেয়া হবে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ—যেমন ব্যবসায়ের যাকাত নেয়া হয়?

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ ঃ আমদানী হাতে আসার পর নগদ সম্পদের মতই তার যাকাত দিতে হবে

ফিকাহ্র গ্রন্থাদিতে দ্বিতীয় যে মতটি পাওয়া যায়, তা এসব আমদানীকারী প্রতিষ্ঠানের উপর ভিন্নতর দৃষ্টি দেয়। তা হচ্ছে, প্রতি বছর তার মূল্য থেকে যাকাত নেয়া হবে না, বরং তার আয় ও আমদানী থেকেই যাকাত নেয়া হবে।

ইমাম আহ্‌মদের মত

ইমাম আহ্‌মদের এ মত বর্ণিত হয়েছে; যে ব্যক্তি তার ঘর ভাড়ায় দিল ও তার ভাড়া নিয়ে নিল, সে তার যাকাত দেবে যখন তা থেকে সে ফায়দা পাবে।

মালিকী মতের কথা

মালিকী মাযহাবের কিতাবে বলা হয়েছে, যে সব জিনিসের ফল বা আমদানী পাওয়ার জন্যে নির্মিত হবে—যেমন ঘর-বাড়ি ভাড়ায় দেয়ার জন্যে নির্মাণ করা হল, ছাগল রাখা হল পশম পাওয়ার উদ্দেশ্যে, বাগান বানানো হল ফল পাওয়ার জন্যে, এ সবের যাকাতের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। এ মতপার্থক্য দুটির ক্ষেত্রে ঃ

প্রথম ঃ সে আসল জিনিসটি বিক্রয় হলে তার মূল্যে—

দ্বিতীয় ঃ তার ফলে, যখন তা ব্যবহার করা হবে।

প্রথম ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে, তার এক বছর পূর্বেকার মূল্য ধরবে, যেমন ব্যক্তিগত মালামাল বিক্রয় করা হলে তাই করা হয়।

আর দ্বিতীয় কথা, তাকে মজুদকারী ব্যবসায়ীর পণ্য মনে করতে হবে। মালিকী মাযহাবে সে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত সর্বজনবিদিত। অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে যা বিক্রয় করা হবে, তার যাকাত দিতে হবে যদি সে পণ্য তার হাতে এক বছর বা ততোধিক কাল আটক হয়ে থেকে থাকে।

আলোচ্য সব জিনিসে আমদানী ও ফায়দার ক্ষেত্রে এ দুটো কথা কার্যকর হয়।

আমার মতে দ্বিতীয় কথাটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এসব আমদানী দানকারী জিনিসের আমদানীর মত যখনই হস্তগত হবে, তখনই তার যাকাত দিতে হবে।

সাহাবী, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তী লোকদের মত

যারাই ফায়দা দানকারী মালের মালিকানা লাভের সময় যাকাত দিয়ে দেয়ার কথা বলেন এবং একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত আরোপ করেন না, তাঁরাই বলেন যে, আমদানী দানকারী ইমারত, দালান-কোঠার আয়, কারখানার উৎপাদন এবং গাড়ি, উড়োজাহাজ, সাজ-সরঞ্জাম ও বিছানা-পত্রাদির ভাড়া পাওয়া মাত্র যাকাত দিয়ে দিতে হবে।

ফায়দা দানকারী মাল সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, মুআবিয়া, নাসের, বাকের ও দাউদের এই মত। উমর ইবনে আবদুল আযীয, হাসান বসরী, জুহ্‌রী, মক্‌হুল ও আওযায়ীও এ মতই প্রকাশ করেছেন। এঁদের সকলেরই দলীল হচ্ছে, যাকাত আদায় সংক্রান্ত হাদীসের সাধারণ ও নির্বিশেষ ঘোষণা ঃ নগদ সম্পদের যাকাত এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ।

কেউ কেউ ভাড়ায় দেয়ার জন্যে প্রস্তুত মাল আমদানীর জন্যে বানানো মালকে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত মালের উপর 'কিয়াস' করেছেন। তাঁরা বলেছেন, 'এ এক শক্তিশালী কিয়াস'। কেননা মুনাফা বিক্রি করা মূল জিনিস বিক্রয় করার সমান। কেউ যখন কোন জিনিস ভাড়া দেয়, তখন সে যেন তা বিক্রয় করে দেয়। তবে কিয়াসের দাবি হচ্ছে, ভাড়ার আমদানীকেই নিসাব ধরতে হবে। যদি তার বার্ষিক আয় দু'শ' দিরহাম হয়,

তাহলে তার এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ দিতে হবে। আর এর কম হলে কিছুই দিতে হবে না।

প্রথম মতটি কার্যকর হলে আসল মূলধন থেকেই যাকাত গ্রহণ করা হবে। কেননা এ মত অনুযায়ী যাকাত তো আয় ও আমদানী থেকে নেয়ার কথা ২.৫% হারে। তার জন্যে একটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার কোন শর্তই নেই।

এ কালের আলিমদের মতঃ আয়ের যাকাত শস্য ও ফলের যাকাতের মত

আধুনিককালে এ বিষয়ে অপর একটি মত উপস্থাপিত হয়েছে। এসব জিনিসের আয়ের যাকাত গ্রহণে তা উপরিউক্ত দ্বিতীয় মতের সাথে সংগতিসম্পন্ন। কিন্তু গ্রহণীয় পরিমাণের ব্যাপারে তা বিপরীত। কেননা এ মতে ফরয পরিমাণ হচ্ছে ওশর কিংবা অর্ধ-ওশর। কৃষি জমির ফসলে ধার্যকৃত ফরয পরিমাণকে সম্মুখে রেখে তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রথমোক্ত মতে এসব জিনিসকে ব্যবসা পণ্যের উপর কিয়াস করা হয়েছে, এ মতটি একে কিয়াস করেছে কৃষি জমির উপর। আর আয়-আমদানীকে কৃষি ফসল ও ফল সমতুল্য মনে করা হয়েছে। কেননা যে মালিক তার চাষকৃত জমির ফসল পায়, আর অপর যে মালিক তার কারখানা, দালান-কোঠা ইত্যাদির আয় লাভ করে—এ দুই মালিকের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

ইমারত, দালান-কোঠা ও শিল্প-কারখানাকে কৃষি জমি মনে করার এ মতটি একালের ফিকাহ্‌বিদগণ উপস্থাপিত করেছেন। আবূ জুহ্‌রা, আবদুল ওহাব খাল্লাফ ও আবদুর রহমান হাসান প্রমুখ অর্থনীতিবিদ ১৯৫২ সালে দামেশ্‌কে অনুষ্ঠিত যাকাত সংক্রান্ত এক সেমিনারে এ মত প্রকাশ করেছেন।

তাঁরা ফিকাহ্‌বিদদের উদ্ধৃতি দিয়ে ধন-মালকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন ঃ

১. যে সব মাল ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে সংগ্রহ করা হয়, যেমন বসবাসের ঘর, মালিকের খাদ্য ও প্রয়োজন পূরণের জন্যে সংগৃহীত ও সঞ্চিত খাদ্য ইত্যাদি। এসব সম্পদ বা দ্রব্যসামগ্রীর উপর যাকাত ধার্য হয় না।

২. মুনাফা অর্জনের আশায় ব্যবহারের জন্যে যেসব মালমাত্তা সংগ্রহ করা হয়, অথবা যেসব মালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা দিয়ে অর্থাগম করা যায় কিন্তু ভাণ্ডারে বা গুদামে তা বন্ধ করে রাখা হয়। সব ফিকাহ্‌বিদের সর্বসম্মত মতে এসবের উপর যাকাত ফরয হবে। রাসূলে করীম (স) এ ধরনের মালের উপর যাকাত ধার্য ও গ্রহণ করেছেন। তা হচ্ছে সেই আসল মাল, যার উপর অন্য মাল কিয়াস করা চলে।

৩. যে সব মাল প্রবৃদ্ধি লাভ ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের মধ্যে আবর্তিত হয়, যেমন অলংকার, জন্তু-জানোয়ার—যা নিজের কাজের জন্যে এবং সময় সময় প্রবৃদ্ধি লাভের জন্যে রাখা হয়—এ সবের উপর যাকাত ফরয হওয়া-না হওয়া নিয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

পরে তাঁরা বলেছেন, এ বিভক্তিকে এ কালে প্রয়োগ করা হলে আমরা নিশ্চিতরূপে এমন সব মালকে—যা একালে কার্যত প্রবৃদ্ধিপ্রবণ—যাকাতের মালের মধ্যে গণ্য করে

বসব, যা ফিকাহ্ রচনাকালে প্রবৃদ্ধি ও আয়-আমদানীর কাজে ব্যবহৃত হওয়ার ব্যাপারটি প্রচলিত ছিল না। তাঁরা এ পর্যায়ের দুধরনের মালের উল্লেখ করেছেন ঃ

প্রথম, শিল্পের পাত্র-ভাণ্ডার-হাতিয়ার, কল-কবজা ইত্যাদি, যা আয় বা লাভের জন্যে মূলধনরূপে গণ্য হয়। আসলে তা আয় লাভের মাধ্যম। যেমন বড় কারখানার মালিক কারখানা পরিচালনার জন্যে কর্মচারী নিয়োগ করে। আয় বৃদ্ধির জন্যে নিয়োজিত তার মূলধন হিসেবে যেসব শৈল্পিক পাত্রাদি ব্যবহৃত হয়; এ হিসেবে তা প্রবৃদ্ধিশীল বলে গণ্য হবে। কেননা তার আয় এসব যন্ত্রপাতি ও পাত্রাদি থেকেই আসে। তাই লৌহকার নিজ হাতে যেসব হাতিয়ার দিয়ে কাজ করে তা গণ্য হবে না, কাঠমিস্ত্রী যেসব হাতিয়ার দিয়ে নিজ হাতে কাজ করে, তাও গণ্য হবে না। এজন্যে তাঁরা বলেছেন, প্রবৃদ্ধি সম্পন্ন মাল গণ্য করা হলে এ সব হাতিয়ারের উপর যাকাত ধার্য হতে পারে। ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ পর্যায়ে তা গণ্য নয়।

ফিকাহ্বিদগণ তাঁদের সময়ে এসব শৈল্পিক যন্ত্র ও পাত্রাদির উপর যাকাত ফরয হয় বলে মনে করেন নি এ জন্যে যে, সেগুলো ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের হাতিয়ার, তা তার শৈল্পিকতার জন্যে মৌল প্রয়োজনে সীমালংঘন করে না। কাজেই তা উৎপাদন দানকারী ও প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন মালরূপে গণ্য হবে না। তাতে উৎপাদন হয় কর্মীর নিজের পরিশ্রমের জন্যে।

কিন্তু এক্ষণে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। কেননা এক্ষণে শিল্প-কারখানা তার শৈল্পিক পাত্র-হাতিয়ার আদি তারই প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন মূলধনরূপে গণ্য। এ কারণে আমরা বলব, যেসব শৈল্পিক হাতিয়ার-পাত্রের মালিক বা শিল্পপতি নিজে তা দিয়ে কাজ করে—যেমন নাপিতের নিজের হাতে কাজ করার অস্ত্র বা যন্ত্রপাতি, সেগুলোর উপর যাকাত ধার্য হবে না। কেননা সেগুলো মৌল প্রয়োজন পূরণকারী জিনিসরূপে গণ্য। কিন্তু শিল্প-কারখানার উপর যাকাত ধার্য হবে। তাতে ফিকাহ্বিদদের কথার বৈপরীত্য হবে এমন কথা বলা যাবে না। কেননা তাঁরা এ বিষয়ে কোন মতই দেন নি, তার কারণ, তাঁরা এগুলো আদৌ দেখেন নি। যদি তাঁরা এগুলো দেখতে পেতেন, তাহলে তাঁরাও এসব ব্যাপারে ঠিক সে সিদ্ধান্তেই পৌঁছতেন, যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হয়েছি। কেননা আমরা তো আসলে তাদের কাছ থেকে পাওয়া কথার উপর ভিত্তি করেই কথা বলছি।

দ্বিতীয় ঃ আয়-লাভের উদ্দেশ্যে নির্মিত দালান-কোঠা—যা ব্যক্তিগত বসবাসের জন্যে নির্মিত নয়। আমরা তাকে প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন মাল মনে করি। সেগুলোকে মৌল প্রয়োজন পূরণকারী মাল মনে করি না। এ কারণে ঘর-বাড়ি আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করি ঃ

এক—যা মালিকের বসবাসের জন্যে নির্মিত ও নিয়োজিত। এ পর্যায়ের ঘর-বাড়ির কোন যাকাত দিতে হবে না।

দুই—যা অর্থাগমের কাজে লাগানোর জন্যে নির্মিত। তার উপর যাকাত ফরয হবে বলে আমরা মনে করি। এ মত গ্রহণে আমরা ফিকাহ্বিদদের বিরোধিতা করছি না; যদিও তাঁরা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, ঘর-বাড়ির উপর যাকাত হয় না। কেননা তাঁদের কালের ঘর-বাড়ি কখনও অর্থাগমের উদ্দেশ্যে নির্মিত ও নিয়োজিত হত না .. হলেও তা ছিল খুবই সামান্য নগণ্য। তখন ঘর-বাড়ি নির্মিত হত ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণার্থে। আর

মীমাংসাকারী কমিটি

সমাজকে কেবলমাত্র পুরুষ লোকদেরকে বিবাদাগ্নি নির্বাপনের কাজে নিযুক্ত করতে বলা হয়েছে। সেই সাথে গাড়ি ও পানি 'শোষ পাইপ' ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও সঙ্গে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা কার্য সম্পাদনের জন্যে বিশেষভাবে পুরুষদেরকে নিযুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়। সেই সাথে এ মীমাংসা কার্যে অংশ গ্রহণের জন্যে নানা কমিটি গঠন করতে হবে প্রতিটি দিকে ও গ্রামে। যে কোন বিবাদের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা সেসব কমিটিকে দিতে হবে। সেই কমিটিগুলোর জন্যে সকল উপায় প্রয়োগে কাজ করার সুযোগও থাকতে হবে।

অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব

অস্বীকার করার উপায় নেই, লোকদের পারস্পরিক বিবাদ নিরসন ও মীমাংসা বাস্তবায়নে একটা দায়দায়িত্ব থাকে এবং বিশেষভাবে তা হচ্ছে অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব। কেননা এ বিবাদের কারণ 'দিয়েত' বা 'রক্তমূল্য' হতে পারে অথবা দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের বা উভয় পক্ষের ওপর ধার্য জরিমানাও হতে পারে এবং হতে পারে, সে জরিমানা দিতে এক পক্ষ সক্ষম হচ্ছে না কিংবা তা দেয়ার যৌক্তিকতা সে স্বীকার করে না; কিন্তু অপর পক্ষ তা ছেড়ে দিতে মোটেই রাজী নয়। আর শক্তি প্রয়োগ করা হলে মীমাংসার পথই বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়। আর আঘাত ভুলানো ও জখম শুকানোর লক্ষ্যে তা করা সমীচীনও মনে হয় না। তা হলে তখন কি করা যাবে ? পারস্পরিক মীমাংসা সৃষ্টির কি উপায় হতে পারে তখন ? এ অর্থনৈতিক দায়দায়িত্বটা কার মাথায় চাপানো চায় ?

সমাধান অতীব সহজ এবং এ সহজলভ্য সমাধান আমাদেরকে যাকাতই দিচ্ছে। যাকাতের অন্যতম ব্যয়খাত হচ্ছে 'আল-গারেমীন'—ঋণগ্রস্ত লোকগণ। 'যাকাত ব্যয়ের খাত' আলোচনায় আমরা বলে এসেছি এ ঋণগ্রস্ত লোকদের মধ্যে সে সব বড় বড় হৃদয়ওয়ালা লোকও গণ্য—ইসলামী সমাজ যাদের পরিচিতি উপস্থাপিত করেছে। তাদের এক-একজন দুটো পরিবার বা দুটো গোত্রের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার জন্যে অগ্রসর হত এবং মীমাংসা বাস্তবায়িত করার জন্যে 'দিয়েত' বা জরিমানাটা নিজের মাল থেকে দিয়ে দিতে বাধ্য হত—বিবাদের আগুন নিভানোর এবং শান্তি ও স্বস্তি কায়েমের উদ্দেশ্যে। এসব লোককে সাহায্য দেয়ার জন্যে যাকাতের এ খাতটি নির্ধারিত হয়েছে। এটা ইসলামের এক অনন্য অবদান।

কুবাইচাতা ইবনুল মাখারিক আল-হিলালী (রা) যিনি এমনি এক মীমাংসার কাজে গিয়ে একটা বড় বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছিলেন—পরে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে সাহায্যের প্রার্থনা করেছিলেন। এ সংক্রান্ত হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করতে কোন দ্বিধাবোধ করেন নি। নবী করীম (স) তখন তাঁকে বলেছিলেন ঃ অপেক্ষা কর, যাকাতের মাল আসুক, তখন তা থেকে আমরা তোমাকে দিতে বলব। পরে তিনি তাকে বললেন ঃ যে ব্যক্তিই এরূপ কোন ঋণের বোঝা নিজের মাথায় গ্রহণ করবে, তার পক্ষে 'চাওয়া' হালাল। যেন সে তা পায় এবং পরে সে সতর্ক হয়। (আহমাদ ও মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন)।

ইসলামের অবদানের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে—ফিকাহ্‌বিদগণ দৃঢ়তার সাথে বলেছেন—পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করতে গিয়ে যে লোক ঋণগ্রস্ত হবে, যাকাত থেকে তাকে দিতে হবে—যদিও সেই মীমাংসার ব্যাপারটি ইহুয়াদী-খৃস্টান যিম্মীদের মধ্যকারই হোক-না-কেন।[১]

কেননা ইসলামী সমাজ-পরিধির মধ্যে যারা বাস করে, তাদের সকলের মধ্যে শান্তি ও চুক্তি-সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত করাই ইসলামের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অতীব মৌলিক লক্ষ্য।

একটি ফিকহী প্রশ্ন

কিন্তু সেজন্যে কি এক ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম নিজের মাল থেকে সন্ধি-সমঝোতার জরিমানা দিয়ে দিতে হবে, পরে সে যা দিয়েছে তা যাকাতের মাল থেকে তাকে দিয়ে দিতে হবে, যেন প্রকৃতপক্ষে ঋণগ্রস্ত হওয়া ব্যক্তিকে যাকাত থেকে দেয়ার কাজটি হয়? জবাবে বলা যায়—সাধারণভাবে ফিকাহ্‌বিদদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, হ্যাঁ, এ শর্তটি রক্ষা করা আবশ্যক। তাহলেই যাকাত সংক্রান্ত আয়াতের আক্ষরিক মর্যাদা রক্ষিত হতে পারে।[২]

কিন্তু আয়াতটির ভাবধারা এবং যাকাতের এ অংশটি রেখে বিধানদাতা যে লক্ষ্য পেতে চান, তা হচ্ছে, সালিশী কমিটিকে তা দিয়ে দিতে নিষেধ করা যাবে না, যেন সে তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পাওনাদারকে তার প্রাপ্য দিয়ে দিতে পারে। অবশ্য যখন কোন কমিটির দায়িত্বে এ কাজটি হবে, সমাজ তার রায়কে গুরুত্ব দেবে। কেননা সমাজই এ কমিটি গঠন করেছে এবং তাতে রাজী হয়েছে। আর যদি কুরআনে প্রস্তাবিত রূপটা সংরক্ষণ করাই অপরিহার্য হয়, তাহলে কমিটির একজন সদস্যকে তা কোন লোকের বা কোন সংস্থার কাছ থেকে করজ নিয়ে দিয়ে দেবার জন্যে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। পরে যাকাতের এ ঋণগ্রস্তের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ থেকে তাকে তা দিয়ে দেয়া যাবে। ঋণগ্রস্তদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশই হচ্ছে 'সন্ধি-সমঝোতার ফাণ্ড'।

তবে এ ব্যাপারের গুরুত্ব অস্বীকার করা উচিত নয় যে, প্রথম প্রকার—সমাজের হৃদয়-কন্দর থেকে যা ফুটে ওঠেছে—যে দয়াপরবশ হয়ে মীমাংসার উদ্দেশ্যে নিজের কাছ থেকে ব্যয় করেছে, তা ফেরত পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা ছাড়াই, নৈতিকতার মানদণ্ডে এ প্রথম পন্থাটি মূলত লক্ষ্যভূত। ইসলামের নির্ধারণে তা খুব বেশী গুরুত্ব পাবে। 'জাতীয় আধ্যাত্মিক মূল্যমানের সাথে যাকাতের সম্পর্ক' পর্যায়ে আমরা এ বিষয়ে স্পষ্ট ও বিস্তারিত কথা বলেছি।

---

১. مطالب اولى النهى ج ٢ ص ١٤٣

২. غاية المنتهى গ্রন্থ এবং তার শরাহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ ষষ্ঠ হচ্ছে সেই ঋণী যে পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়েছে, সে ধনী হলেও, সে যদি নিজের মাল থেকে তা না দিয়ে থাকে। কেননা নিজের মাল থেকে দিয়ে থাকলে তো সে ঋণগ্রস্ত হ'ল না। যদি সে ঋণ নিয়ে তা দিয়ে থাকে, তাহলে তা পূরণের জন্যে সে যাকাত থেকে নিতে পারে। কেননা ঋণ তো রয়ে গেছে। المصدر السبق ج ص ١٤٤

অতএব এ সিদ্ধান্তের পূর্বে এমন একটা মৌলের প্রয়োজন যার উপর কিয়াস করা যেতে পারে। আর তা হচ্ছে কৃষি জমির ভাড়ার যাকাত যখন মালিক তা হস্তগত করে ও তার মালিক হয়। পূর্বে আমরা এ বিষয়ে বলেছি এবং দলীলের ভিত্তিতে এ মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। এ মৌল ব্যতীত উপরিউক্ত 'কিয়াস' সহীহ্ বলে মেনে নেয়া যায় না।

তৃতীয় কৃষি জমির উপর দালান-কোঠার 'কিয়াস' করা—এ দুটির মধ্যে পার্থক্যকারীর উপস্থিতির দরুন ক্ষুণ্ন হতে পারে। তা এভাবে যে, কৃষি জমি স্থায়ী আমদানীর উৎস। তাতে কোন স্থবিরতা দেখা দেবে না। পুরাতন হয়ে যাওয়ারও কোন আশংকা নেই এবং কালের অগ্রগতিতে তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকেনা। কিন্তু দালান-কোঠার অবস্থা ভিন্নতর। তা কয়েক বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদের অর্থাগমের উৎস হতে পারে। তা কমও হয়, বেশীও হয়, শেষে চূড়ান্ত সমাপ্তিও ঘটে। তাহলে আসল ও শাখার মধ্যকার এ পার্থক্যের দরুন তার উপর কিয়াস করা হবে। مقيس ومقيس عليه—এ দুইয়ের মাঝে পূর্ণ-মাত্রায় সাদৃশ্য থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়, অন্যথায় তা হবে সাদৃশ্যহীনের উপর কিয়াস। আর তা গ্রহণযোগ্য নয়।

এই আপত্তি থেকে কথাটি জানা যায়, যা উপরিউক্ত কিয়াসকে সহীহ্ করে, তা হচ্ছে ভোগ-ব্যবহারের উপর কর ধার্য না করা সংক্রান্ত মত গ্রহণ। তারা আমদানী থেকে একটা বার্ষিক পরিমাণ কর্তন করার দাবি তুলেছে এভাবে যে, বছরের অগ্রগতিতে তার পুঞ্জীভূত হওয়া মূলধন থেকে বিনিময় নিয়ে নিতে বাধ্য করে। এই মূলধনই হচ্ছে তার আমদানীর উৎস। তাহলে যন্ত্রপাতি বা জমি—আমদানির উৎস—যদি ক্রমাগতভাবে ত্রিশ বছর পর্যন্ত উৎপাদন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তাহলে তার মূল্য থেকে প্রতি বছর একটি অংশ জমা করে আরও যন্ত্র ও জমি ক্রয় করে আরও আমদানীর উৎস ক্রয় করা সম্ভবপর হয়। এতে করে আমদানী স্থিতিশীল ও অব্যাহত থাকতে পারে। এ কর্তিত অংশের করমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহলে এক ব্যক্তি যখন একটা ইমারতের মালিক হয়, তখন সে মনে করা যাক—তার মূল্য ধরা হল ত্রিশ হাজার দীনার এবং আরও ধরলাম যে, প্রতি বছর তার মূল্য ৩০ ভাগের এক ভাগ হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বছরের এক সহস্র দীনার। এক্ষণে তার বাৎসরিক আয় থেকে এ সহস্র দীনার বাদ দিয়ে ধরতে হবে। তাহলে বছরে যদি তার ভাড়া হয় তিন হাজার দীনার, মনে করা হবে যে, তার মাত্র দু'হাজার দীনারে ভাড়া দেয়া হয়েছে। কেবলমাত্র এ দিক দিয়েই কৃষি জমির উপর ইমারত ও কারখানার কিয়াস করা চলে । কেননা তা কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন অব্যহত রাখতে সক্ষম একটা উৎস। আর তা প্রতিষ্ঠান ও যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের ব্যয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় এবং তা আমরা যে ব্যয়-ভোগের উল্লেখ করেছি, তার বিপরীত নয়।

তৃতীয় আলোচনা

ইমারত ইত্যাদির যাকাতের নিসাব

দালান-কোঠা ও শিল্প-কারখানার আমদানী বিপুলতার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তার যাকাতের নিসাব কি হবে, তা নির্ধারণ পর্যায়ে আমাদের উপরিউক্ত মত প্রকাশকারী মনীষিগণ কোন কথা বলেন নি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, সে নিসাব কত ধরতে হবে? তার পরিমাণ কিভাবে নির্ধারিত হবে, তার নিসাব কি কৃষি ফসলের নিসাব পরিমাণে নির্ধারণ করা হবে .... যা কিনা পাঁচ 'অসাক'। আর সে নির্ধারণে কি নগণ্য ফসল ও ফল ধরা হবে, না মধ্যম মানের, না উচ্চ-উন্নত—মানের? এই বিতর্কের সহায়ক হয়, যদি আমরা কারখানার আয়কে জমির আয়ের উপর কিয়াস করি। কিংবা তার নিসাব নির্ধারণ করা হবে নগদ মূল্য হিসেবে? যার মুল্য ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ? এ হিসেবে যে, স্বর্ণ সর্বকালের নিসাব নির্ধারণে স্থায়ী ইউনিট। সম্ভবত এ কথাই অধিক সত্য এবং সহজ। কেননা এই পরিমাণ সম্পদ যে লোকই লাভ করে শরীয়াত তাকেই একজন ধনী লোক গণ্য করে এবং তার উপর যাকাত ধার্য করে। তার কম পরিমাণ সম্পদের মালিককে যাকাত দিতে বাধ্য করেন না। পক্ষান্তরে ইমারত বা শিল্প-কারখানার মালিক সব সময়ই তার মালিকানার আয় পেতে থাকবে নগদ হিসেবে। তাই তার যাকাতের নিসাব নগদ হিসেবে নির্ধারণ করাই উত্তম।

যে মেয়াদের মধ্যে নিসাব গণ্য হবে

নিসাব গণ্য করা যখন অপরিহার্য—কেননা শরীয়াতের দৃষ্টিতে তা-ই ধনী হওয়ার নিম্নতম পরিমাণ সম্পদ—তখন জানতে হবে কোন্ মেয়াদের মধ্যে নিসাব গণ্য করা হবে? তা কি মাসিক গণ্য হবে—বারো মাসের আয় নিসাব-পরিমাণ হওয়া শর্ত হবে? না বার্ষিক হিসাবে ধরা হবে—বারো মাসের আয় একত্রিত করে নিসাবের হিসাব করা হবে? এবং বছরের শেষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলে তার যাকাত গ্রহণ করা যাবে? মাসিক হিসাব ধরা হলে মালিকের পক্ষে তা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থা হয়। এতে নিম্নমানের ঘর-বাড়ির কম আয়ের লোকেরা যাকাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। কেননা তাদের মাসিক আয় কখনই নিসাব পরিমাণ হবে না, এর ফলে মালিকদের কিছুটা সুবিধা হবে।

তবে বার্ষিক হিসাব ধরলে গরীব মিসকীন ও যাকাত পাওয়ার অধিকারী লোকদের পক্ষে সুবিধা। কেননা তাতে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে অনেক প্রশস্ত হবে, যাকাত ফরয হওয়া মালের পরিমাণও বিপুল ও ব্যাপক। বিরাট সংখ্যক লোকের উপরই তখন যাকাত ধার্য হতে পারবে, যাকাত ফাণ্ডের আয়ের পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পেয়ে যাবে।

সম্ভবত এ হিসাবটাই অধিক যথার্থ ও বাঞ্ছনীয়। কেননা ব্যক্তির আয়-আমদানী রাষ্ট্রের আয়ের মতই। তার বার্ষিক হিসাব গ্রহণই প্রচলিত, মাসিক হিসাব নয়। প্রাচীনকালে ঘর-বাড়ির ভাড়াও বার্ষিক হিসাবে ধার্য হত, মাসিক নয় (মক্কা শরীফে এখনও বার্ষিক হিসাবে ধরা হয়)। এ কারণে ফিকাহ্‌বিদ্‌গণ বলেছেন যে, আয় করা মালের যাকাত তা হস্তগত হওয়ার সাথে সাথে দেয়া বাঞ্ছনীয়। বাড়ির ভাড়ার টাকা বছরে নিসাব পরিমাণ হলে সঙ্গে সঙ্গেই যাকাত দিয়ে দিতে হবে।

এরূপ অবস্থায় মাসিক আয়ের হিসাব গণ্য করা হবে, যেমন করে খেজুর ও কৃষি ফসলের হয়ে থাকে। যদিও তা কয়েকবারে কাটা বা তোলা হয় এবং পরে সব একসঙ্গে মিলিয়ে হিসাব করতে হয়। ইমাম আহমদ এই মত দিয়েছেন। 'আল-মুগনী' গ্রন্থে লিখিত হয়েছে ঃ 'এক বছরের সব ফল বা ফসল পরস্পর একত্রিত করে হিসাব করা হবে। তার পাওয়ার সময় যতই বিভিন্ন হোক-না কেন। তাতে অবশ্য আগে-পরে হবে। এক ফল শেষ হয়ে যদি পরবর্তী ফল প্রকাশ পায় ও শেষ হয়, তাহলে প্রতিবারের ফল একসঙ্গে মিলিয়ে গুণতে হবে। যেমন খেজুর যদি বছরে দুইবার ধরে—তাহলে তা একত্রিত করে গুণতে হবে।

দালান-কোঠার আয়ের হিসাবও এমনি করেই হবে, যেমন কারখানার হিসাব। সাদৃশ্যপূর্ণ হিসাবসমূহ একত্রিত করে করতে হবে। কেননা কারখানার হিসাব খুবই স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। প্রতি বছর তার আয়ের পরিমাণ সন্দেহমুক্তভাবে জানা যায়। কিন্তু প্রতি মাসের নির্ভেজাল এবং কাঁটায় কাঁটায় হিসাব করা সম্ভব হয় না।

আমদানী থেকে ঋণ ও ব্যয়াদি বাদ দেয়া

এ পর্যায়ে আমি মনে করি, যাকাত ধার্য হবে নির্ভেজাল আমদানীর উপর। অর্থাৎ মজুরী, কর ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়ার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে, তার উপর যাকাত ধার্য হবে। অনুরূপভাবে যে সব ঋণ সত্য প্রমাণিত হবে, তাও বাদ যাবে। ব্যয় পরিমাণ বাদ দেয়া হবে কৃষি ফসল ও ফলের ক্ষেত্রে। এটা ফিকাহ্‌বিদ আতার মত। তিনি বলেছেনঃ 'তোমরা ব্যয় পরিমাণ বাদ দাও এবং অবশিষ্টের যাকাত দাও।' ইবনুল আরাবীও এ মতের সমর্থন ও তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

জীবিকার জন্যে নিম্নতম পরিমাণ বাদ দেয়া

এ পর্যায়ে একটি আলোচনা থেকে যায়, যা করা হলে ইমারত ইত্যাদির যাকাত সংক্রান্ত কথাবার্তা পূর্ণত্ব পেতে পারে। তা হচ্ছে, মালিকের নিজের ও তার পরিবারবর্গের জীবন-জীবিকা পর্যায়ের যাবতীয় ব্যয়ের নিম্নতম পরিমাণও বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত। কেননা তার এ ছাড়া আর কোন আয়ের উৎস নেই, যা দ্বারা সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

তাহলে কি যাকাত ফরয হবে নির্ভেজাল বাৎসরিক আয়ের উপর এবং তার পরিবারবর্গের জীবিকা প্রয়োজনীয় পরিমাণ বাদ না দিয়ে?—ফিকাহ্‌বিদদের

পরিভাষানুযায়ী—তার মৌল প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা না করে? ... না কি কোন কিছু বাদ না দিয়ে সমস্ত আয়ের উপর যাকাত ধার্য হবে?

সন্দেহ নেই, এমন লোক অবশ্যই থাকতে পারে যাদের ভাড়ায় দেয়া একখানি ঘর ছাড়া জীবিকা নির্বাহের আর কোন উপায় নেই। ছোট-খাটো একটা কারখানাও হতে পারে, যা সে নিজেই পরিচালনা করে কিংবা তার প্রতিনিধি হিসেবে কেউ চালায়। এ ধরনের একটা ঘর বা একটা কারখানা একজন ক্ষমতাহীন বৃদ্ধ, বিধবা বা ইয়াতীম শিশুরও থাকতে পারে। তাহলে কি এ সবের সমস্ত থেকে জীবিকা নির্বাহের জন্যে কোন অংশ বাদ দেয়া হবে? .. এতো তাদের জন্যে অপরিহার্য? ...... তা বাদ দিয়েই অবশিষ্টের উপর যাকাত ধার্য করা উচিত নয় কি? ... না সমস্ত আয় থেকেই যাকাত দিতে হবে?

ইসলামের সুবিচারপূর্ণ নীতি হল, জীবিকার জন্যে নিম্নতম প্রয়োজনীয় পরিমাণ বাদ দিয়ে অবশিষ্টের উপর যাকাত ধার্য করা। দ্বীনদার অভিজ্ঞ লোকদের দ্বারাই পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। আর বাৎসরিক হিসেবে অবশিষ্ট সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে তবেই তার উপর যাকাত ধার্য করতে হবে। এটা বিশেষভাবে তাদের জন্যে, যাদের এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা নেই।

এ পর্যায়ে আমাদের দুটো দলীল রয়েছে ঃ

প্রথম ঃ মৌল প্রয়োজন পূরণে জন্যে যতটা মাল আবশ্যক, ফিকাহ্‌বিদদের দৃষ্টিতে তা না থাকার সমতুল্য। তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক পানি না থাকলে তায়াম্মুম করা যাবে। কেননা যা আছে, তা না থাকার শামিল।

দ্বিতীয় ঃ সেসব হাদীস, যা খেজুর আঙুরের বাগানের মালিকদের উপর চাপ হালকা ও সহজ করার উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (স) এদের সম্পর্কে বলেছেন এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে হিসাব করার জন্যে। আর এক-তৃতীয়াংশ বাদ না দিলে অন্তত এক-চতুর্থাংশ অবশ্যই বাদ দিতে হবে। এই পরিমাণ বাদ দিয়ে অবশিষ্টের উপর যাকাত ধার্য করাই হাদীসের দৃষ্টিতে অত্যন্ত জরুরী এবং তা যেমন ফলের ক্ষেত্রে, তেমনি আলোচ্য ক্ষেত্রেও।

নবম অধ্যায়

স্বাধীন শ্রমের উপার্জনের যাকাত

শুরু কথা

এ কালের ব্যক্তিবর্গের নিজের কাজ ও পরিশ্রমলব্ধ সম্পদই সর্বাধিক কাম্য। মানুষ কাজ করে যা উপার্জন করে, তা-ও মাল। এ ধরনের উপার্জনকারী লোকদের আয় দু'ধরনের ঃ

প্রথম ধরণ হলো ঃ ব্যক্তি নিজস্বভাবে কাজ করে এবং অন্য কারোর কাছে কোনরূপ হীনতা স্বীকার না করেই কিছু-না-কিছু উপার্জন করে সে কাজ হয় হাত দিয়ে করা হয়, না হয় তাতে বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটে। এই উভয় ধরনের কাজে আয়কে 'শ্রমের উপার্জন' বলা হয়। যেমন চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিল্পী, কারিগর, দর্জী, কাঠ-মিস্ত্রী প্রভৃতি লোককে স্বাধীন শ্রমজীবী বলা চলে।

দ্বিতীয় ধরন ঃ কাজে মানুষ অপর ব্যক্তির সাথে জড়িত হয়, সে অপর ব্যক্তি কিংবা সরকার হতে পারে, একটা কোম্পানী হতে পারে, হতে পারে একাধিক ব্যক্তি। এবং সে সংযুক্তি কতিপয় ব্যক্তির সাথে কৃত চুক্তির ভিত্তিতে হতে পারে এই মর্মে যে, সে কোন একটা কাজ সম্পন্ন করবে, সে কাজ দৈহিক শ্রমের হতে পারে, বিবেক-বুদ্ধির হতে পারে কিংবা এই উভয়ের সমন্বয়ে কোন কাজের জন্যে। এরূপ অবস্থায় তার আমদানীটা মাসিক বেতন, মজুরী বা প্রতিদানমূলক।

তাহলে এই আমদানী থেকে কি যাকাত গ্রহণ করা হবে—যা নিত্য-নতুনরূপে আসে কিংবা নেয়া হবে না? আর যাকাত নেয়া হলে তার নিসাব কি ধরা হবে? ইসলামী ফিকাহ্ এই পর্যায়ে কি বলে?

এমন কতগুলো প্রশ্ন, যার জবাব পাওয়া এ যুগের প্রেক্ষিতে খুবই জরুরী। তাহলেই প্রতিটি মুসলিম তার দেয় কর্তব্য বা হক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারবে। কেননা নবরূপের এই আমদানীর পরিমাণও একালে নেহায়েত কম হয় না। বরং তার পরিমাণ খুব বড়ই হয়। অতীতকালের ফিকাহ্‌বিদগণ এ ধরনের আমদানী সম্পর্কে তেমন কিছু জানতেন না।

আমরা তিনটি পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে এ প্রশ্নগুলোর জবাব উপস্থাপিত করতে চাই ঃ

১. কাজের, উপার্জনের বা শ্রমের ফিক্হী রূপায়ণ এবং তার যাকাত সম্পর্কে প্রাচীন ও নতুন ফিকাহবিদদের মত। সেই সঙ্গে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য মতের উল্লেখ।

২. নিসাব, তার পরিমাণ এবং হিসাবটা কিভাবে করা হবে?

৩. ফরযের পরিমাণ কত?

প্রথম আলোচনা

স্বাধীন ও পেশাভিত্তিক উপার্জনের স্বরূপ নির্ধারণ

সমসাময়িক অভিমত

আবদুর রহমান হাসান, মুহাম্মাদ আবূ জুহ্রা ও আবদুল ওহাব খাল্লাফ প্রমুখ একালের প্রখ্যাত ইসলামী ফিকাহ্‌বিদ ১৯৫২ সনে দামেশ্‌কে যাকাত সম্পর্কে অনুষ্ঠিত সেমিনারে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। সে সিদ্ধান্তটির মূল কথাগুলো এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

কাজ ও পেশাগত উপার্জন থেকেও যাকাত গ্রহণ করা হবে যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়ে একটি বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মত হচ্ছে, নিসাব পুরো বছর অক্ষত থাকতে হবে—কম-বেশী হতে পারবে না তা নয়; শুধু শুরু ও শেষে—দুদিকে নিসাব পরিমাণ বহাল থাকাই যথেষ্ট হবে—এ কথা লক্ষ্য রেখে আমরা বলতে পারি, কর্মের উপার্জনের উপর প্রতি বছরই যাকাত ধার্য করা সম্ভব। এখানে সেই 'ইল্লাত' বা কারণ পাওয়া গেছে—যা ফিকাহ্‌বিদগণ এজন্যে নির্দিষ্ট করেছেন। এবং যেহেতু ইসলাম চায়, কোন লোকের বারো জনীহ্ মিসরীয় স্বর্ণমুদ্রা পরিমাণ সম্পদ অর্জিত হলে তাকে ধনী মনে করা হবে এবং এই পরিমাণটা যাকাত ধার্য হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। এর ফলে ধনী যে যাকাত দেবে এবং দরিদ্র যে তা গ্রহণ করবে—উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যটা প্রকট হয়ে উঠবে।

হানাফীরা ভুলবশতই বছরের প্রথম ও শেষে নিসাব পরিমাণ প্রাপ্তিকে যথেষ্ট ধরে নিয়েছেন—সারা বছরকাল অনুরূপ পরিমাণের স্থিতিকে গুরুত্ব দেন নি। তাই স্বাধীন পেশা বৃত্তি ও কাজের উপার্জনের উপর যাকাত ধার্য করাকালে এ জিনিসটির দিকে লক্ষ্য দেয়া একান্ত আবশ্যক। তাহলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং স্বাধীন পেশাদার লোকদের মধ্যে এমন খুব কম লোকই দেখা যাবে, যাদের আমদানী প্রচুর নয়।

যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কে কথা বলার সময় তাঁরা আবার মূল বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে এসেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ

> স্বাধীন পেশা বৃত্তি ও কাজের উপার্জনের কোন দৃষ্টান্ত ফিকাহ্ শাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায় না, শুধু মজুর রাখার ব্যাপারটি ছাড়া—ইমাম আহমদের মত অনুযায়ী। তিনি বলেছেন, ' যে লোক তার ঘর ভাড়ায় দিল, তার কেরায়া হস্তগত করল—যা নিসাব পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁচেছে, তার উপর যাকাত ফরয হবে, যখন সে তা ব্যবহার করতে

শুরু করেছে। একটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার কোন শর্তই থাকবে না আর এটা প্রকৃতপক্ষে কর্মের উপার্জনের সাথে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব তার উপরও যাকাত ফরয হবে—যদি তার পরিমাণ নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে।

প্রথমে আমরা যা নির্ধারণ করেছি, এটা তার উপরের কথা। তা হচ্ছে, লক্ষণীয় যে, উপার্জনকারী সক্ষম ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকবে—তা খুব বিরল ঘটনা হবে। তার আমদানীর নিসাব পরিমাণ বছরের মাঝখানে হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও বছরের শেষে তা তার কাজ ও পেশাভিত্তিক উপার্জন পূর্ণত্ব পাবে। তা হলে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া নিসাব পরিমাণের উপরই যাকাত ফরয হবে।

মাসিক বেতন ও মজুরীলব্ধ মাল

পূর্বের এ সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি হিসাবে বলতে পারি, এক মাস থেকে বারো মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত মাসিক বেতন থেকেও যাকাত গ্রহণ করতে হবে। কেননা যাকাতের জন্যে সহজ পন্থা হচ্ছে স্থায়ী নিসাব যা বছরের প্রথমে ও শেষে থাকে।

এই মনীষিগণ কাজ ও পেশাবৃত্তির উপার্জন এবং মাসিক বেতন হিসেবে পাওয়া আয় সম্পর্কে কথা বলেছেন, এটা খুবই বিস্ময়কর। কেননা, ফিকাহ্ শাস্ত্রে তার কোন দৃষ্টান্ত তাঁরা পান নি। শুধু ইমাম আহ্মদ থেকে ঘরের ভাড়া সম্পর্কে একটি মত বর্ণিত পাওয়া গেছে। এখানে আমরা তাকে 'অর্জিত সম্পদ' বলব, যা মুসলিম ব্যক্তি অর্জন ও সংগ্রহ করে নতুন করে মালিকানা লাভের শরীয়াতসম্মত যে কোন উপায়ে তার মালিক হয়ে বসে। এ উপার্জনকে যথার্থ ফিক্হী রূপায়ণে বলা যায় 'অর্জিত মাল'।

সাহাবী ও তৎপরবর্তীকালের লোকদের একটি জামায়াত তার যাকাত নেয়া ফরয বলে মত প্রকাশ করেছেন, সেজন্যে একটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার কোন শর্ত আরোপ করেন নি। হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, মুআবিয়া, সাদেক, বাকের, নাসের ও দাউদ প্রমুখ এ মত গ্রহণ করেছেন। উমর ইবনে আবদুল আযীয, হাসান, জুহরী ও আওযায়ীরও এই মত।

অর্জিত সম্পদ সম্পর্কে সুচিন্তিত মত

একালে এভাবে উপার্জিত সম্পদ সম্পর্কে শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ জানতে পারা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একটা সুষ্ঠু মত সম্মুখে আসা দরকার, কেননা এর উপর বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ভরশীল। বহু প্রকারের আমদানী এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। স্বাধীন কাজ, পেশাবৃত্তি এবং ব্যবসা ছাড়া অন্যভাবে মূলধন ইত্যাদির আমদানী এই পর্যায়ে গণ্য।

অর্জিত মাল যদি পূর্বে যাকাত দেয়া কোন মালের প্রবৃদ্ধির ফলশ্রুতি হয়—যেমন ব্যবসায়ের মালের মুনাফা বা ছেড়ে-দিয়ে রাখা জন্তুর উৎপাদন—তাহলে তা তার মূল্যের সাথে গণ্য হবে। তার বছরও সেই অনুযায়ী গণনা করা হবে। এর ফলে আসল ও প্রবৃদ্ধি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যাবে।

তাই যে লোক উন্মুক্তভাবে বিচরণশীল জন্তু বা ব্যবসায়ের মালের নিসাব পরিমাণের মালিক হবে, বছরের শেষে সে আসলের ও তৎলব্ধ ফায়দার যাকাত একসঙ্গে দিয়ে দেবে। এ বিষয়ে আমাদের নতুন কিছু বলবার নেই।

এই অর্জিত মালের মুকাবিলায় আসে যদি তা যাকাত দেয়া মালের মূল্য হয়—যার উপর এক বছর সময় অতিবাহিত হয়নি। যেমন সে যদি তার জমির ফসল বিক্রয় করে দেয় এবং তার যাকাতও সে দিয়েছে ওশর বা অর্ধ-ওশর হিসাবে, তেমনি যদি সে তার জন্তু বিক্রয় করে দেয় অথচ তার যাকাত সে পূর্বেই দিয়ে দিয়েছে, তখন সে মূল্য বাবদ যে মালটা অর্জন করল, সে তার যাকাত তখন দেবে না। কেননা দিলে এই মালের দুইবার যাকাত দেয়া হয়, আর তা অচল।

কারো কাছে রক্ষিত মালের প্রবৃদ্ধি হিসাবে যা অর্জিত নয়, সে বিষয়েই কথা বলা হচ্ছে। তা এক স্বতন্ত্র উপায়ে অর্জিত, যেমন কোন বিশেষ কাজের মজুরী বা মূলধনের আয়, দান-উপঢৌকন ইত্যাদি, তা তার কাছে থাকা মালের সমজাতীয় হোক, কি ভিন্ন জাতীয়।

এ মালের যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে অর্জিত হওয়ার পর থেকে কি পূর্ণ একটি বছর মালিকের মালিকানার অধীন থাকা শর্ত? কিংবা তার কাছে যে জাতীয় মাল রয়েছে সে জাতীয় মাল অর্জিত হলে সব একত্রিত করে হিসাব করা হবে? এবং সেই পূর্বের মালের বছর শেষে অর্জিত মালেরও বছর পূর্তি ধরা হবে? অথবা তা যখনই অর্জিত হবে ও নিসাব পরিমাণ হওয়ার শর্ত পূর্তির এবং তার ঋণমুক্তি ও মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ার কথা জানা যাবে, তখনই তার যাকাত দিয়ে দিতে হবে?

এখানে যে তিনটি সম্ভাব্যতার কথা বলা হয়েছে, তার প্রতিটির পক্ষে ফিকাহ্‌বিদগণ রয়েছেন। যদিও ফিকাহ্‌ শাস্ত্র নিয়ে মশগুল থাকা লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, প্রত্যেক মালের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য একটি বছর পূর্ণ হওয়া জরুরী শর্ত—সে মাল নতুন অর্জিত হোক, কি পূর্ব থেকে বর্তমান থাকুক। এ পর্যায়ের কতিপয় হাদীসের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যা এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার উল্লেখসহ বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে অর্জিত মাল সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে।

এ কারণে এক বছর মালিকানা পূর্তির শর্ত যেসব হাদীসে এসেছে সেসব হাদীস কি মর্যাদার এবং হাদীসের ইমামগণের কাছে তার সত্যতা যথার্থতার প্রমাণ কতটা অকাট্য, সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

এক বছর পূর্তি সংক্রান্ত হাদীস যয়ীফ

চারজন সাহাবী কর্তৃক রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণনা করা হাদীসে মালিকানার এক বছর পূর্তির শর্ত উল্লিখিত হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন হযরত আলী, ইবনে উমর, আনাস এবং আয়েশা (রা)। কিন্তু এ কয়টি হাদীসই যয়ীফ। দলীল হিসাবে তা মেনে নেয়া যায় না।

হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীস

হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীসটি আবূ দাউদের গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটিতে বলা হয়েছে ঃ 'তোমার যখন দুইশ' দিরহাম হবে এবং তার উপর এক বছরকাল অতিবাহিত হবে, তখন তার উপর পাঁচ দিরহাম যাকাত ফরয হবে। আর স্বর্ণে তোমার উপর কিছুই দেয় হবে না, যতক্ষণ না তোমার বিশ দীনার সম্পদ হবে। যদি তোমার বিশ দীনার সম্পদ হয় এবং তার উপর এক বছর পূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়, তাহলে তার অর্ধ-দীনার দেয় হবে। এর বেশী হলে এভাবেই হিসাব চলবে।

বর্ণনাকারী বলেছেন, 'এভাবেই হিসাব চলবে' কথাটি হযরত আলীর নিজের না তিনি তা রাসূলে করীম (স) থেকেই বর্ণনা করেছেন, তা আমি জানি না। আর যাকাতের মালে 'এক বছর অতিবাহিত হলে' কথাটি নেই। কেবলমাত্র জরীর বলেছেন, ইবনে ওহাব রাসূলের হাদীসে বাড়িয়ে বলেছেন ঃ 'যাকাতের মালে কিছুই ধার্য হবে না, যতক্ষণ না তার উপর একটি বছর অতিবাহিত হবে।' আবূ দাউদের উদ্ধৃতি অনুযায়ী হযরত আলী বর্ণিত হাদীসটি এই। এক্ষণে হাদীস সমালোচকদের দৃষ্টিতে এ হাদীসটির মূল্য ও মর্যাদা কি, তা-ই আলোচ্য।

ক. ইবনে হাজম ও আবদুল হক বলেছেন, এ হাদীসটি ইবনে ওহাব জরীর, ইবনে হাজম—আবূ ইসহাক, আসেম, হারিস আলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আসেম ও হারিসের পরে রয়েছেন আবূ ইসহাক। হারিস মিথ্যাবাদী। আর বেশ কয়জন বর্ণনাকারী সম্পর্কেই এ উক্তি বৈধ। হারিস সনদ দিয়েছেন, আসেম দেন নি। জরীর এ দুজনকে একত্রিত করেছেন এবং একজনের বর্ণিত হাদীসকে অন্যজনের বর্ণনার মধ্যে দাখিল করে দিয়েছেন। শু'বা, সুফিয়ান ও মুয়াম্মারও এ হাদীসটি আবূ ইসহাক, আসেম আলী থেকে আলীর উক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এমনি প্রত্যেক 'ফিকাহ' বর্ণনাকারী থেকে আসেম বর্ণনা করেছেন এবং আলীর উক্তি বলে ধরেছেন। এক্ষণে জরীর যদি তা আসেমের সনদে বর্ণনা করে থাকেন এবং তা-ই বলে থাকেন তাহলে তা আমরা গ্রহণ করব।

খ. হাফেয ইবনে হাজার ইবনে হাজমের উপরিউক্ত কথার উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন, তিরমিযী এ হাদীসটিকে আবূ আওয়ানা, আবূ ইসহাক, আসেম আলী থেকে রাসূলের কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি বলব, আবূ আওয়ানা বর্ণিত হাদীসটিতে এক বছরের শর্তের উল্লেখ নেই। কাজেই তা দলীল হতে পারে না। তিরমিযীর বর্ণনা অনুযায়ী হাদীসটির ভাষা এরূপ—রাসূলে করীম (স) বলেছেন, 'আমি ক্ষমা করে দিয়েছি ঘোড়া ও ক্রীতদাসের যাকাত। অতএব তোমরা নগদ সম্পদের যাকাত নিয়ে এস প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম হিসাবে। আর একশ' নব্বই দিরহামে কিছুই ফরয নয়। তার পরিমাণ দু'শ' পূর্ণ হলে তা থেকে পাঁচ দিরহাম দিতে হবে।

গ. এ সব কথাই গ্রহণীয় যদি আসেমকে 'সিকাহ্' ধরা হয়। কিন্তু সে তো অক্ষত থাকেনি। মুন্যেরী বলেছেন, হারিস ও আসেমের বর্ণনা দলীল হতে পারে না। যাহাবী বলেছেন, তার কাছ থেকে চারজন বর্ণনা করেছেন। ইবনে মুয়ীন ও ইবনুল মদীনী তাঁকে সিকাহ বলেছে। ইমাম আহমদ বলেছেন, 'তিনি হারিসের উপরে অবস্থিত। আর তিনি

আমার কাছে গ্রহণীয়।' নাসায়ী বলেছেন, তাঁর বর্ণনা গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই। তবে ইবনে আদী বলেছেন, 'তিনি একাকী হযরত আলী থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন; আর 'তাঁর থেকেই অসুবিধাটির সূচনা হয়েছে।' ইবনে হাব্বান বলেছেন, 'তিনি স্মরণশক্তির দিক দিয়ে খারাপ ছিলেন; বড় বেশী ভুল করতেন। তিনি তাঁর বহু কথাই হযরত আলী থেকে রাসূলের কথা হিসেবে বর্ণনা করতেন। তাই তা পরিহারযোগ্য। তবে তাঁর অবস্থা হারিস থেকে ভাল।' এতে মুনযেরীর কথার সমর্থন হয়ে গেছে যে, তিনি দলীল হতে পারেন না।

ঘ. এতদসত্ত্বেও আলোচ্য হাদীসটি দোষমুক্ত। হাফিয ইবনে হাজার যেমন বলেছেন, তার কথা—'যে হাদীসটি আমরা আবূ দাউদ থেকে উদ্ধৃত করলাম, তা দোষমুক্ত।' পরে তার সনদের উল্লেখ করে বলেছেন, 'ইবনুল মুয়াফিক এর মধ্যকার প্রচ্ছন্ন দোস সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। আর তা হচ্ছে, জরীর ইবনে হাজাম আবূ ইসহাক থেকে এ হাদীসটি শুনেন নি। এটি ইবনে ওহাবের সঙ্গী হাফেযগণ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন, সাহনুন, হারমালা, ইউনুস, বহর ইবনে নসর প্রমুখ ইবনে ওহাব থেকে জরীর ইবনে হাজম, হারিস ইবনে উমারাতা, আবূ ইসহাক থেকে।' ইবনুল মুয়াক বলেছেন, 'এত আবূ দাউদের উস্তাদ সুলায়মানের উপরই চাপ পড়েছে। কেননা তিনি ভুল করে একটি লোককে প্রত্যাহার করেছেন। আর হাসান ইবনে উমারাতা—যিনি সনদ থেকে বাদ পড়েছেন—সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাহৃত।'

এ থেকে জানা গেল যে, উপরিউক্ত হাদীসটিতে কয়েকটি দোষ রয়েছে। হারিসের দিক থেকে—কেননা সে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত। কেবল সে একাই হাদীসটিকে রাসূলের কথারূপে বর্ণনা করেছেন। আসেমের দিক থেকেও দোষ দেখা দিয়েছে কেননা তাঁর সিকাহ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইবনুল মুয়াক যে 'ইল্লাতের' উল্লেখ করেছেন সে দিক থেকেও, ইবনে হাজারও সে 'ইল্লাতের' কথা বলেছেন। আমি মনে করি, যাঁরা হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন, তাঁরা যদি সেই 'ইল্লাতের' কথা জানতে পারতেন তাহলে তাঁরা তাঁদের একথা প্রত্যাহার করতেন। কেননা সে ইল্লাতটি খুবই মারাত্মক।

ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস

হযরত ইবনে উমর বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে ইবনে হাজার বলেছেন, 'হাদীসটিকে দারে কুত্নী ও বায়হাকী উদ্ধৃত করেছেন। তার সনদে রয়েছে ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ। তাঁর বর্ণিত হাদীস যয়ীফ।' ইবনে নুমাইর, মু'তামার প্রমুখও তাদের উস্তাদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, উস্তাদ হচ্ছেন উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমর—রাফে থেকে বর্ণনাকারী।

আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস

হযরত আনাস বর্ণিত হাদীসটি দারে কতুনী গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে হাসান ইবনে সিয়াহ একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যয়ীফ। তিনি এককভাবে সাবিত থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাব্বান বলেছেন, 'এ লোকটি খুব বেশী 'মুনকারে

হাদীস,' তার বর্ণিত হাদীসকে দলীলরূপে গ্রহণ করা যায় না—বিশেষ করে যখন সে একক বর্ণনাকারী হয়।'

আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি 'ইবনে মাজা' গ্রন্থে দারেকুতনী ও বায়হাকী উদ্ধৃত করেছেন। বর্ণনাকারী উকাইলী যয়ীফ। হারিসা ইবনে আবূ রিজালও যয়ীফ।

ইবনুল কাইয়্যেম 'তাহ্যীবে সুনানে আবূ দাউদ' গ্রন্থে বলেছে ঃ 'একটি পূর্ণ বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মালেই যাকাত নেই' হাদীসটি হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত এবং সহীহ্ সনদে উদ্ধৃত। মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনুল মুনাদী বলেন, .. হযরত আয়েশা বলেছেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ; 'এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মালে যাকাত ধার্য হয় না।'—আবুল হুসাইন ইবনে বিশরান, উসমান ইবনে সামাক—ইবনুল মুনাদী থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি বলব, ইবনুল কাইয়্যেম এই সনদে বর্ণিত এই হাদীসটিকে কি করে সহীহ্ বললেন, তা একটি বিস্ময়। বর্ণনাকারী শুজা' ইবনে ওলীদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করলেও চলে। কেননা আবূ হাতিম তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'সে খুব নরম—শক্ত নয় এবং তার বর্ণনাকে দলীলরূপে গ্রহণ করা যায় না।' তবে তার কিছু সহীহ্ হাদীস রয়েছে মুহাম্মাদ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। তাহলে তার শায়খ হারিসা ইবনে মুহাম্মাদকে কি করে উপেক্ষা করা যায়? সে-ই—হচ্ছে হারিসা ইবনে আবূ রিজাল—উমরা থেকে বর্ণনাকারী। দারে কুতনী ও উকাইলী তার হাদীসকে পূর্বেই 'যয়ীফ' বলে অভিহিত করেছেন। যাহাবী তার সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছেন, আহ্মদ ও ইবনে মুয়ীন তাকে যয়ীফ বলেছেন। নাসায়ী বলেছেন. 'পরিত্যক্ত'। বুখারী বলেছেন, 'মুনকারুল হাদীস, তাকে কেউ গণ্য করে না'। ইবনুল মাদীনী বলেছে, আমাদের সঙ্গীরা তাকে সব সময়ই যয়ীফ বলে অভিহিত করেছেন।' ইবনে আদী বলেছেন, 'সাধারণভাবেই তার বর্ণনা মুনকার—অ-গ্রহণযোগ্য।' অর্থাৎ তার যয়ীফ হওয়া ও প্রত্যাহৃত হওয়া সম্পর্কে সকলেই একমত। তাহলে তাঁর বর্ণিত হাদীসকে—বিশেষ করে তার একক বর্ণনাকে সহীহ্ বলা হতে পারে কিভাবে?

মালের মালিকানার একটি পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সম্পর্কিত হাদীসগুলোর মোটামুটি এ-ই হল অবস্থা। সে মাল সদ্য অর্জিত হোক কি অন্য কিছু, সেদিক থেকে নজর ফেরালেও তা গ্রহণযোগ্য নয়।

অর্জিত মাল সম্পর্কিত হাদীস

বিশেষ করে অর্জিত মাল পর্যায়ে তিরমিযী একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম—যায়দ ইবনে উমর সূত্রে। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ 'যে লোক কোন মাল অর্জন করল, তার উপর যাকাত ধার্য হবে না যতক্ষণ

মালিকের কাছে তার পূর্ণ একটি বছর অতিবাহিত না হবে।' আইয়ূব—নাফে-ইবনে উমর সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তা রাসূলে করীমের কথা হিসেবে বর্ণিত হয়নি।

তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিক সহীহ। আইয়ূব ও উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর ইত্যাদি নাফে ইবনে উমর থেকে তাঁর কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম হাদীসে যয়ীফ ব্যক্তি। আহমদ ইবনে হাম্বল ও আলী ইবনে মদীনী প্রমুখও তাকে যয়ীফ বলেছেন। বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি খুব বেশী ভুল করেছেন।

আবদুর রহমান ইবনে যায়দ বর্ণিত হাদীসটি দারে কুত্নী ও বায়হাকীও বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ও ইবনুল জাওযী প্রমুখ তাকে 'মওকুফ' বলেছেন। দারে কুত্নী বলেছেন, হাদীসটি যয়ীফ। মালিক তাকে 'মওকুফ' হিসেবে সহীহ্ বলেছেন। বায়হাকী তা আবূ বকর, আলী ও আয়েশা থেকে 'মওকুফ'—সাহাবীর উক্তিরূপে—সহীহ বলেছেন।

এই বিশ্লেষণ থেকে স্পস্ট হয় যে, মালের একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নবী করীম (স)-এর কথা হিসেবে সত্য হওয়ার প্রমাণ কোন হাদীসের অংশ নয়। বিশেষ করে অর্জিত মাল সম্পর্কে। হাফেয বায়হাকীও তাই বলেছেন।

এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে কোন কিছু সহীহ্রূপে প্রমাণিত হয়ে থাকলে তা সদ্য অর্জিত মাল সম্পর্কে প্রযোজ্য। তাহলে দলীলসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এখানে এক বছর অতীত হওয়ার ব্যাপারে একটা সর্বসম্মত কথা রয়েছে। তা হচ্ছে, যে মালের যাকাত একবার দেয়া হয়েছে, তার উপর অতঃপর এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত আর কোন যাকাত ধার্য হবে না। কেননা যাকাত বার্ষিক হিসাবে ধার্য হয়, এতে কোনই সংশয় নেই। 'যে মালে এক বছর অতিবাহিত হয়নি তাতে যাকাত নেই, এ হাদীসটির অর্থ হবে, 'তার যাকাত দেয়ার পর একটি পূর্ণ বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় কোন যাকাত তার উপর ধার্য হবে না'—এই কথা এ অধ্যায়ের এক বছরের শর্ত পর্যায়ে আমরা বিস্তারিত বলে এসেছি। অর্জিত মালের এক বছর অতিবাহিত হওয়া বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের যয়ীফ হওয়া বিষয়ে সাহাবিগণের মতপার্থক্য বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

অর্জিত মাল সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ীন ও পরবর্তী লোকদের মতপার্থক্য

মালের এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত পর্যায়ে কোন সহীহ্ হাদীস বা অকাট্য দলীল যখন পাওয়া গেল না, তখন এর উপর ইজমা অনুষ্ঠিত হওয়ারও কোন প্রশ্ন উঠে না। না কথার ইজমা, না চুপ থাকার ইজমা'। কেননা সাহাবী ও তাবেয়ীন অর্জিত মালের ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত করেছেন, কেউ কেউ তা করেন নি। যখনই কোন মাল অর্জিত হবে, তখনই তার যাকাত ফরয হওয়ার কথা বলেছেন অনেকেই।

আর এঁদের মধ্যেই যখন কোন বিষয়ে মতবিরোধ সংঘটিত হয়, তখন কোন একটা মতকে অপর মতের তুলনায় উত্তম বলা চলে না। তখন অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়—ইসলামের সাধারণ নিয়ম এটাই। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِیْ شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَی اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ-

তোমরা যখন কোন বিষয়ে মতপার্থক্যের মধ্যে পড়ে যাবে, তখন সেই বিষয়টি আল্লাহ্ এবং রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর কোন মালের এক বছরকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তার যাকাত গ্রহণ করতেন না।

উমারাতা বিনতে আবদুর রহমান কর্তৃক উম্মুল মু'মিনীর হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার যাকাত দেয়া যাবে না।—অর্থাৎ অর্জিত মালের যাকাত।

আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বলেছেন ঃ 'যে কোন মাল অর্জন করল, সে তার যাকাত দেবে না, যতক্ষণ না তার একটি বছর অতিবাহিত হয়।' ইবনে উমর থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

সাহাবিগণের এসব উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, মালিকদের মালিকানাধীন এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মালেরই যাকাত দেয়া ফরয হবে না। 'সদ্য অর্জিত মাল' হলেও নয়। কিন্তু অপর কয়েকজন সাহাবী এই মতের বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা অর্জিত মালের মালিকানার এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত করেন নি।

ইবনে হাজম বলেছেন, ইবনে আবূ শায়বা ও মালিক 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, 'সর্ব প্রকার মালের যাকাত তখনই ফরয হয় যখন মুসলিম ব্যক্তি তার মালিক হয়।'

এই বর্ণনা এক বছর কাল অতীত হওয়ার অপেক্ষা না করে অর্জিত মালের যাকাত সাথে সাথেই দিয়ে দেয়ার কথা বলছে। ইবনে মাসউদ ও মু'আবিয়া প্রমুখ সাহাবী এবং উমর ইবনে আবদুল আযীয, হাসান বসরী ও জুহরী প্রমুখ তাবেয়ী থেকেও এ কথাই প্রচারিত হয়েছে।

অর্জিত মাল পর্যায়ে সাহাবী ও তাবেয়ীর মত

অর্জিত মালের মালিক সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে আবূ উবাইদ বর্ণনা করেছেন ঃ 'সে যেদিন তা অর্জন করল, সেদিনই তার যাকাত দিয়ে দেবে। ইবনে আবূ

শায়বাও তাই বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস থেকে এ বর্ণনা সহীহ্। ইবনে হাজমেরও তাই মত। তার অর্থ, নগদ অর্জিত মালের যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই—ইবনে আব্বাসের উক্তি থেকে লোকেরা তাই বুঝেছেন। যদিও আবূ উবাইদ নিজেই এর বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন, লোকেরা ইবনে আব্বাসের উপরিউক্ত উক্তির ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের কথা বলতে চেয়েছেন। আবূ উবাইদ বলেন, সম্ভবত তিনি জমি থেকে পাওয়া ফসলের যাকাত দেয়া সম্পর্কে এ কথা বলেছেন। কেননা মদীনাবাসীরা জমিকে 'মাল' বলত। ইবনে আব্বাস তা মনে করে থাকলে তাঁর এই হাদীসের কি অর্থ হতে পারে তা আমি বুঝি না।

সন্দেহ নেই, আবূ উবাইদ অর্থনীতির বিষয়ে একজন সুদক্ষ ইমাম। যাকাতের বিষয়ে তিনি খুব বেশী ইজতিহাদ করেছেন ও উত্তম মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর অনেক কথা আমরাও গ্রহণ করেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর মত দুর্বল বলে মনে হয়। কেননা জাতির মনীষীবৃন্দের কথা থেকে যা সহজে বোঝা যায়, তিনি তার বিপরীত মত দিয়েছেন। আবূ উবাইদের পূর্বের মনীষিগণ যা বুঝেছেন সেই মতেরও বিরোধিতা তিনি করেছেন। কেননা তিনি যা বুঝেছেন তা সত্য হলে বলতে হবে, ইবনে আব্বাসের কথায় এমন কিছু নতুনত্ব নেই, যার দরুন তিনি বিশেষত্বের দাবি করতে পারেন এবং তা বর্ণনার যোগ্য হতে পারে।

সর্বোপরি, কথার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়, তার কোন রকম ব্যাখ্যায় যাওয়া উচিত নয়। তবে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণে কোন প্রতিবন্ধক থাকলে ভিন্ন কথা। কিন্তু এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণে তেমন কোন প্রতিবন্ধক আছে কি? .... না, তা নেই।

প্রথমতঃ ইবনে আব্বাস উম্মতের সার্বিক মতের বিপরীত কিছু বলেন নি। ইবনে মাসউদ এবং মু'আবিয়া প্রমুখ সাহাবীও সেই কথাই বলেছেন। পরবর্তীকালে উমর ইবনে আবদুল আযীয, হাসান ও জুহরী প্রমুখ সেই মতই দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ যে সব ব্যাপারে অকাট্য কোন দলীল নেই, সে বিষয়ে মত প্রকাশ করতে মুজতাহিদ সাহাবীর পক্ষে (কোন মত না দিয়ে) অন্য আলিমের অপেক্ষায় বসে থাকা জরুরী নয়। এমন নয় যে, অন্যরা কি বলেন তা জেনে নেয়ার পরই তিনি তাঁর রায় ও ইজতিহাদের কথা প্রকাশ করবেন। মতের সমর্থন পাওয়া গেলে বলবেন, নতুবা চুপ থাকবেন, এমন কথাও হতে পারে না। কেননা প্রত্যেক মুজতাহিদই ইজতিহাদী বিষয়ে স্বীয় মত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার অধিকারী। অন্যদের মত তাঁর অনুকূল কি প্রতিকূল, তা চিন্তা করার কোন দায়িত্ব তাঁর নেই।

তৃতীয়ত. কোন সাহাবী এককভাবে কোন মত প্রকাশ করলে তা কিছুমাত্র দূষণীয় নয়, আর আমাদের ফিক্হী ঐতিহ্যে তা অভিনবও কিছু নয়। হযরত ইবনে আব্বাস 'মুত্য়া' সম্পর্কে একক মত পোষণ করেন, যা কোন সাহাবীই সমর্থন করেন নি। পালিত গাধার গোশ্ত খাওয়া সম্পর্কেও তিনি একক মত রাখেন। তাঁর এই মত অন্য সাহাবীর মতের অনুকূল নয় বলে তা প্রত্যাহারযোগ্য নয়।

আবূ উবাইদ তাঁর ব্যাখ্যার উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নন। তিনি বলেছেন, এই ব্যাখ্যা যদি যথার্থ না হয়, তা হলে আমি জানি না তাঁর কথার অর্থ কি?

ইবনে মাসউদ

আবূ উবাইদ হুরায়রা ইবনে ইয়ারিম থেকে বর্ণনা করেছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) আমাদের ছোট জন্তুর মলত্যাগের স্থানে জায়গা দান করতেন, পরে তা থেকে যাকাত গ্রহণ করতেন।

আবূ উবাইদ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'দানের পূর্বে যে যাকাত ফরয হয়েছিল, তিনি তা নিয়েছেন, দানের পর ভবিষ্যতে যে যাকাত ধার্য হতে পারে না তা নয়।'

আবূ উবাইদের এই ব্যাখ্যাও যথার্থ ও মনঃপূত নয়। বাহ্যত যা মনে হয়, এই ব্যাখ্যায় তার বিপরীত কথা বলা হয়েছে। ইবনে মাসউদ থেকে অপর সূত্রে প্রাপ্ত সহীহ্ বর্ণনারও বিরোধিতা হয়েছে। দান থেকে যাকাত গ্রহণ বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর বক্তব্যকে সঠিকরূপে প্রকাশ করেছে। হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, ইবনে মাস্উদ তাঁর দানসমূহের যাকাত দিতেন—প্রতি হাজারে পঁচিশ। ইবনে আবূ শায়বা ও তাবরানীও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এই হুরায়রাই প্রথমোক্ত বর্ণনার বর্ণনাকারী। এই চূড়ান্ত কথা এ কালের কর-পারদর্শীদের কথা 'উৎসের উপর প্রতিবন্ধক'-এর সাথে তুলনীয়। দানের পূর্বে অন্যান্য মালের উপর যে যাকাত ফরয় হয়েছিল তা গ্রহণ করার কথা এখানে নয়। ইবনে মাসউদ যদি অন্য মালের উপরং ধার্য যাকাত দান থেকে রেখে দিতেন, তাহলে প্রতি হাজারে পঁচিশ নিশ্চয়ই ফরয ধার্য হত না, তার কমও হতে পারত, বেশীও হতে পারত। সম্ভবত আবূ উবাইদ এই শেষোক্ত বর্ণনাটি জানতে পারেন নি। সেই কারণেই তিনি এরূপ ব্যাখ্যাদানের কষ্ট স্বীকার করেছেন।

মু'আবিয়া

ইমাম মালিক তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। বলেছেন, মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ানই প্রথম ব্যক্তি, যিনি দান থেকে যাকাত গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত তার অর্থ, খলীফাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই কাজ করেছেন। তাঁর পূর্বে ইবনে মাসউদ তা গ্রহণ করেছেন; অথচ এই বর্ণনাকারী ইবনে মাসউদের কথা জানতেন না। কেননা তিনি ছিলেন কূফায়, আর ইবনে শিহাব অবস্থান করতেন মদীনায়।

সন্দেহ নেই, মুআবিয়া রাষ্ট্রের কর্তা হিসেবে দানসমূহ থেকে যাকাত রেখে দিতেন। তিনি তো খলীফা ও রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। আর মুআবিয়ার শাসনামলে বিপুল সংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন। মু'আবিয়া যদি শরীয়াতের বিপরীত কোন কাজ করতেন কিংবা গণনাযোগ্য ইজমা লংঘন করতেন তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই চুপ থাকতেন না। এছাড়া অনেক ব্যাপারেই তাঁরা প্রতিবাদের আওয়াজ তুলেছেন। যখন তিনি ফিতরার যাকাত বাবদ এক ছা' অন্য জিনিসের বদলে অর্ধ ছা' গম গ্রহণ করেছিলেন, তখন তার তীব্র প্রতিবাদ উঠেছিল। যেমন আবূ সায়ীদ খুদরী বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়। কেননা রাসূলে করীম (স) থেকে প্রমাণিত কোন সুন্নাতের বিরোধিতা করার সাধ্য কারোরই ছিল না।

উমর ইবনে আবদুল আযীয

মুআবিয়ার পর প্রথম হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ উমর ইবনে আবদুল আযীযের খিলাফত আমলে তিনি দানসমূহ, উপঢৌকন, পুরস্কার ও জুলুমের প্রতিকার বাবদ দেয় ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি থেকে যাকাত গ্রহণ করতেন।

আবূ উবাইদ উল্লেখ করেছেন, তিনি যখন কোন লোককে তার কাজের মজুরী দিতেন, তখন তিনি তার যাকাত রেখে দিতেন। কোন জুলুমের প্রতিকার বাবদ অর্থ দিলে, তা থেকেও তার যাকাত নিয়ে নিতেন। তাঁর সঙ্গীদের কোন পুরস্কার দিলেও তা থেকে তার যাকাত উসুল করে রাখতেন। কেননা যে লোক এগুলো পেত, তা তার একটি নতুন উপার্জন হত।

ইবনে আবূ শায়বা বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয দান ও পুরস্কারের যাকাত দিতেন। হযরত উমরের নীতিও ছিল তাই। একালের সরকারগুলোও এই পর্যায়ের অর্জনের উপর কর ধার্য করে থাকে।

অন্যান্য তাবেয়ী ফিকাহ্‌বিদ

জুহ্‌রী থেকে বর্ণিত, অর্জিত মাল হস্তগত হওয়ার সময়ই তার যাকাত দিতে হবে। হাসান ও মক্‌হুলও তাই বলেছেন বলে ইবনে হাজম উল্লেখ করেছেন। আওযায়ীও তা সমর্থন করেছেন। শুধু তাই নয়, আহমদ ইবনে হাম্বল থেকেও এই মত বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি ঃ 'যে লোক তার ঘর ভাড়ায় দিয়েছে এবং তার কেরায়া হাতে পেয়েছে সে যেন তার যাকাত তখনই দিয়ে দেয়।'

ইমাম বাকের, সাদেক, নাসের ও দাউদের মত

নাসের, সাদেক, বাকের প্রমুখ নবী বংশের ফিকাহ্‌বিদগণও এই মত প্রকাশ করেছেন। দাউদও বলেছেন ঃ ' যে লোক নিসাব পরিমাণ মাল অর্জন করল, তার কর্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে তার যাকাত আদায় করে দেয়া।'

এই সকল দলীল হচ্ছে, যাকাত ফরযকারী দলীলসমূহের সাধারণ তাৎপর্য। যেমন নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'নগদ (রৌপ্য) সম্পদে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ দেয়।'

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, অর্জিত সম্পদে একটি বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। তা হচ্ছে দুইবার যাকাত দেয়ার মধ্যবর্তী অবকাশ কাল মাত্র। নিসাব পরিমাণ সম্পদ হওয়া শর্ত শুধু যাকাত দেয়ার সময়ের। আর তা একবছর পূর্তির পর। নবী করীম (স) এবং তাঁর নিয়োজিত যাকাত আদায়কারীরা বছর শেষ হওয়ার পর তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু উপার্জিত মাল সম্পর্কে তাতে কিছু বলা হয়নি, যা বছরের প্রথমেই পাওয়া যাচ্ছে।

অর্জিত মাল সম্পর্কে চার মাযহাবের মতপার্থক্য

অর্জিত মাল পর্যায়ে চার মাযহাবের মত এক নয়। পারস্পরিক পার্থক্যটা গভীর। ইবনে হাজম তাঁর 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন,

অর্জিত মালের মালিকের হাতে একটি বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তার যাকাত দেবে না। তবে তার কাছে অনুরূপ জাতীয় মাল থাকলে বছর শুরু হতেই যাকাত দেয়া কর্তব্য হবে—আবশ্য যদি নিসাব পূর্ণ হয়। কেননা সে যদি তার পরের বছর পূর্ণ হওয়ার এক ঘণ্টা পূর্বেও অর্জন করে তার নিজস্ব মালের অনুরূপ জাতীয় মাল,—তার পরিমাণ কম হোক, কি বেশী—তাহলে সেই আসল মালের সঙ্গে তা একত্রিত করে যাকাত দেবে। তার কাছে স্বর্ণ-রৌপ্য, গবাদিপশু ও ওদের বাচ্চা—যাই হোক।

ইমাম মালিক বলেছেন, অর্জিত মাল এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার যাকাত দেবে না। তার কাছে যাকাত ফরয হওয়া জাতীয় মাল থাক আর না-ই থাক। তবে গবাদিপশুর কথা আলাদা। কেননা কেউ যদি এই জাতীয় কিছু পায়—এগুলোর বাচ্চা ছাড়া, তাহলে তার কাছে অবস্থিত গবাদিপশুর যদি নিসাব থাকে, তাবে বছরান্তে সমস্ত মালের যাকাত একসাথে দেবে। আর নিসাব পরিমাণের কম হলে তাতে যাকাত হবে না। গবাদিপশুর বাচ্চা পাওয়া গেলে মার বছর পূর্তির সময় সবগুলোর যাকাত এক সাথে দেবে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অর্জিত মালের যাকাত দেবে একটি বছর পূর্ণ হওয়ার পর। যদি এই মালের অর্জনকারীর কাছে সেই জাতীয় মালের নিসাব বর্তমান থাকে। গবাদিপশুর বাচ্চাদের তাদের মায়েদের সঙ্গে ধরা হবে না, যদি মায়েদের সংখ্যা নিসাব পরিমাণ হয়। অন্যথায় ধরা হবে।

ইবনে হাজম খুব তীব্র ও অপছন্দনীয় ভাষায় এই কথার সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, 'এসব কথাই বাতিল। বড় কথা, এগুলো অভিন্ন নয়, নিছক দাবি ও পরস্পর বিরোধী উক্তি মাত্র। এর কোন একটি কথার সত্যতার পক্ষে কোন দলীলই নেই—না কুরআন থেকে; না হাদীস থেকে কিছু পেশ করা সম্ভব হয়েছে—কোন দোষযুক্ত বর্ণনাও তুলে ধরা যায়নি। কোন ইজমা বা কিয়াসেরও উল্লেখ করা হয় নি।

ইবনে হাজম এসব গ্রহণযোগ্য বন্টনের বিকল্প হিসাবে বলেছেন ঃ সর্বপ্রকার মালেরই এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত—তা অর্জিত হোক বা অনর্জিত। এমনকি গবাদিপশুর বাচ্চা পর্যন্ত।' কিন্তু এ বলায় তিনি তাঁর সাথী দাউদ জাহিরীরও বিরোধিতা করেছেন। কেননা তিনি তো এসব বণ্টন নীতি থেকে বের হয়ে সর্বপ্রকার অর্জিত মালে যাকাত ধরেছেন বছর অতীত হওয়ার শর্ত ছাড়াই।

অর্জিত মাল হস্তগত করার সাথে সাথে যাকাত দিতে হবে

পূর্বোক্ত মতসমূহের ও এসবের পক্ষের দলীলাদির তুলনামূলক আলোচনার পর—বিভিন্ন প্রকারের মালের যাকাত সম্পর্কিত বিধি-বিধান পর্যায়ে পাওয়া দলীলসমূহ সামনে রেখে—যাকাতের বিধান নির্দিষ্ট করার যৌক্তিকতা ও লক্ষ্যকে বিবেচনা করে বলতে হচ্ছে, মাসিক নিয়মিত বেতন কর্মচারীর মজুরী, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার ও উকিল প্রভৃতি স্বাধীন শ্রমজীবীদের অর্জিত সম্পদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে একটি বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়; বরং মাল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাকাত দিয়ে দিতে হবে। গাড়ি, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ, প্রেস, হোটেল ও খেলা-তামাশার (Amusments

house) ঘর-বাড়ি ইত্যাদি অ-ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে নিয়োজিত মূলধনের যাকাতও এমনিভাবে আদায় করতে হবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের মত সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নলিখিত কথাগুলো পেশ করছি। আমরা আশা করছি, তা থেকে আমাদের মতের সমর্থক দলীলসমূহের প্রেক্ষিতে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১. সর্ব প্রকারের মালে, এমনকি অর্জিত মালেও, যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত কোন সহীহ্ দ্বারা প্রমাণিত নয়। উম্মতের জন্যে গ্রহণীয় শরীয়াত হুকুম প্রমাণের কোন 'হাসান' মর্যাদার দলীলও নেই। সাধারণ তাৎপর্য সম্বলিত দলীলসমূহ এ মতকে বলিষ্ঠ করেছে। হাদীসবিদগণ এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন এবং কোন কোন সাহাবীর কথায়ও তা সহীহ্ প্রমাণিত হয়েছে।

২. সাহাবী ও তাবেয়ীন অর্জিত মাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। কেউ কেউ এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত করেছেন, কেউবা করেন নি। তাঁরা পাওয়ার সাথে সাথেই তার যাকাত দিয়ে দেয়ার কথা বলেছেন। তাঁদের এই মতপার্থক্যের কারণে কারোর মত অন্যদের মত থেকে উত্তম বলা যায় না। তাই ইসলামের সাধারণ মৌলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে-অন্য দলীলের ভিত্তিতে বিষয়টি সম্পর্কে মীমাংসা গ্রহণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা কোন বিষয়ে মতদ্বৈততায় পড়ে গেলে বিষয়টিকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।'

৩. অর্জিত মাল পর্যায়ে কোন 'নস্ বা অকাট্য দলীল কিংবা কোন ইজমা বর্তমান না থাকার কারণেই চারটি মাযহাবের মধ্যে চরম মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে; যার দরুন ইমাম ইবনে হাজম এ কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন যে, 'তাদের ওসব কথা ভিত্তিহীন, মৌখিক দাবি এবং পরস্পর বিরোধী বিপর্যস্ত বন্টন মাত্র। তার কোন একটি মতের সমর্থনে কোন দলীল নেই—না কুরআন থেকে, না হাদীস বা সুন্নাত থেকে, এমনকি একটা দুর্বল দোষযুক্ত বর্ণনাও নেই, কোন ইজমা নেই, কিয়াসও নেই, উল্লেখযোগ্য কোন রায়ও তার পক্ষে পাওয়া যায় না।

এ ক্ষেত্রে মাযহাবগুলোর মধ্যে যে মতপার্থক্য হয়েছে, বিভিন্ন উক্তি করা হয়েছে, তা প্রতিটি মাযহাবের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। প্রতিটিরই সহীহ হওয়ার ও অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে—আমি নিজে চিন্তা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এর উপর ভিত্তিশীল বহু মাসয়ালা ও শাখা-প্রশাখা পর্যায়ের মতও পাওয়া গেছে, যা অর্জিত মালের সাথে সম্পর্ক যুক্ত; তারই বিভিন্ন প্রকার, বিভিন্ন রকম। তার কাছে যা আছে তা অর্জিত মালের সাথে একত্রিত করে হিসাব করা হবে, তা একত্রিত না করে কিংবা কতক একত্রিত করা হবে, কতক নয়,—নিসাব গণনায় মিলানো হবে, না বছর গণনায়, না এ দুটোতেই—এ পর্যায়ের সব মাসয়ালা। গবাদিপশুর যাকাতে এসব বিষয়ের আলোচনা তোলা হবে, তোলা হবে নগদ সম্পদের যাকাতেও, ব্যবসায় পণ্যের যাকাতে ও এর অন্যান্য শাখা-প্রশাখায়। আমি মনে করি, যে মহান সহজ শরীয়াত জনগণের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে, তা এসব কঠিন ও দুরূহ খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করবে একটি সর্বসাধারণের উপর ধার্য ফরযের ব্যাপারে, তা কল্পনাও করা যায় না।

৪. অর্জিত মালে যাঁরা এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত আরোপ করেন নি, সাধারণ দলীলের দৃষ্টিতে তাঁদের মত অধিক গ্রহণীয়—তাঁদের তুলনায়, যাঁরা এক বছরের শর্ত আরোপ করেছেন। কেননা কুরআন ও সুন্নাতে এ পর্যায়ের সব দলীলই সর্বপ্রকার শর্তমুক্ত। যেমন, 'তোমাদের মালের এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ দাও।' নগদ সম্পদে 'এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ দিতে হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণভাবে ও কোনরূপ শর্ত ছাড়াই বলেছেন ঃ 'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে ব্যয় কর (যাকাত দাও)।'

'তোমাদের উপার্জন' একটি সাধারণ কথা, সর্বপ্রকার উপার্জনই তার মধ্যে পড়ে, তা ব্যবসায়ে পাওয়া হোক, মাসিক বেতন হিসেবে পাওয়া হোক কিংবা হোক মজুরী হিসেবে। ফিকাহ্‌বিদগণ এ কথাকে দলীল বানিয়েছেন ব্যবসায়ের যাকাতের উপর। তা হলো শ্রম, পেশা ও কাজের ফলে উপার্জিত সম্পদের উপর তা প্রয়োগ করা হলে কেন তা গ্রহণীয় হবে না? আর ব্যবসায়ের যাকাতে ফিকাহ্‌বিদগণ যখন এক বছরের শর্ত আরোপ করেছেন, তখন তাই বর্তমানের আসল ও তা থেকে অর্জিত মুনাফার মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করে। কেননা মুনাফা প্রতিদিন পাওয়া যায়, কখনো ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কিন্তু মাসিক নির্দিষ্ট বেতন তা নয়। তা আসে পরিমিত ও স্বতন্ত্রভাবে।

৫. অর্জিত মালের যাকাতে এক বছরের শর্ত না করা যখন সাধারণ দলীল-ভিত্তিক কথা, তখন সহীহ্ কিয়াস এ সত্যও উদ্‌ঘাটিত করে যে, নগদ সম্পদ যখনই পাওয়া যাবে, তখনই তার যাকাত দিতে হবে। যেমন ফসল ও ফলে ঠিক কাটার সময়ই যাকাত ফরয হয়ে যায়। আমরা যখন ফল ও ফসলের ওশর বা অর্ধ-ওশর—ভাড়ায় লওয়া জমির হলেও—গ্রহণ করি তা কাটার সাথে সাথে, তখন মাসিক বেতন বা ডাক্তার উকিলের আয় থেকে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ সাথে সাথে গ্রহণ করব না কেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা মুসলিম ব্যক্তির উপার্জন ও জমি থেকে পাওয়া ফসল থেকে ব্যয় করার কথা একই সাথে—দুটিকে পাশাপাশি রেখে বলেছেন। এ দুটির মধ্যে আমরা পার্থক্য করতে পারি কোন্ অধিকারে, যখন আল্লাহ্ নিজেই এ দুটিকে একসাথে উল্লেখ করেছেন?—এ দুটিই তো আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক?

এ কথা সত্য যে, ফসল উৎপাদনে ও ফল বের করণে আল্লাহ্‌র নিয়ামত অধিকতর স্পষ্ট ও প্রকট। তার শোকরও অধিক কর্তব্য। কিন্তু তার দরুন এই প্রকারের আয়ের মালের মধ্যে একটি থেকে সাথে সাথে যাকাত গ্রহণ ও অপরটিকে এক বছরের জন্যে মাফ করে দেয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? শরীয়াত নিজেই যতটুকু পার্থক্য করেছে—জমির উৎপাদনে ওশর বা অর্ধ-ওশর ধার্য করেছে, আর উপার্জিত নগদ সম্পদে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ ধার্য করেছে—এতটুকু পার্থক্যই কি যথেষ্ট নয়?

৬. অর্জিত মালের যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে একটি বছর অতিবাহত হওয়ার শর্ত করার অর্থ, বড় বড় বেতনভুক ও স্বাধীন শ্রমজীবীদের তাদের আয়ের উপর যাকাত ধার্যকরণ থেকে নিষ্কৃতি দান। কেননা তারা হয় এমন ব্যক্তি হবে, যে যা কিছু আয় করে তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুনঃ বিনিয়োগ করবে, না হয় এমন ব্যক্তি হবে, যে যা কিছু অর্জন করে তা বিপুল ও বেহুদাভাবে ব্যয় করে নিজেদের আরাম-আয়েশের মাত্রা অনেক গুণ বৃদ্ধি করবে—ডানে ও বাঁয়ে যদৃচ্ছভাবে টাকা ওড়াবে। তার উপর একটি বছর

অতিবাহিত হতে দেবে না। আর তার অর্থ যাকাতের চাপ কেবলমাত্র মধ্যম নীতির ও বুঝে-শুনে ব্যয়-বিনিয়োগকারীদের উপর বর্তাবে। তারাই তাদের উপার্জন থেকে সঞ্চয় করবে ও একটি বছর পর্যন্ত তা ধারণ করে থাকবে। ইসলামী শরীয়াত সুবিচারক তা বেহুদা ব্যয়কারীদের অবাধ সুযোগ দেবে ও মধ্যম নীতি অনুসারীদের উপরই কেবল যাকাত দেয়ার দায়িত্ব চাপাবে, তা কিছুতেই কল্পনা করা যায় না।

৭. অর্জিত মাল-সম্পদে একটি বছর অতীত হওয়ার শর্ত নির্ধারণ করা একটি সুস্পষ্ট স্ববিরোধের সৃষ্টি করে, যাতে যাকাত ফরযকরণে ইসলামের সুবিচার নীতি ও যৌক্তিকতা অস্বীকৃত হয়ে পড়ে। কেননা যে কৃষক চাষ করে, ভাড়ায় জমি নিয়ে ফসল ফলায়, তার কাছ থেকে তো যাকাত—ওশর বা অর্ধ-ওশর—নেয়া হবে নিসাব পরিমাণ হলেই, শুধু ফসল কাটারই অপেক্ষা থাকবে, কিন্তু জমির মালিক, যে জমি ভাড়ায় দিয়ে একঘণ্টা সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ নগদ সম্পদ হস্তগত করে, তার কাছ থেকে কিছুই নেয়া হবে না—কেননা তার উপর একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত করা হয়েছে, যা খুব কমই ঘটে থাকে। চিকিৎসক , ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও যানবাহনের মালিক, হোটেল পরিচালক—এরা যাকাত দেয়া থেকে একটি বছর পর্যন্ত রেহাই পেয়ে যাবে, তা হতে পারে না। এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় শুধু কিছু সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদের মত রক্ষা করার জন্যে, কিছু সংখ্যক আলিমের ইজতিহাদের মর্যাদা রক্ষার জন্যে। অথচ তাঁদের কথা গ্রহণ করা যেমন, তেমনি অগ্রাহ্যও করা হতে পারে। তাঁরা যদি আধুনিক যুগকে দেখতে পেতেন, তাহলে নিজেরাই তাঁদের এই অসঙ্গতিপূর্ণ ইজতিহাদ বদলে দিতেন, ইমামগণের ন্যায়ানুগত্য থেকে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

৮. অর্জিত মাল-সম্পদের যাকাত অর্জিত হওয়ার সাথে সাথেই তা দিয়ে দিতে হবে। মাসিক নিয়মের বেতন, মজুরী এবং ব্যবসায় ছাড়া অন্যান্য মূলধন থেকে প্রাপ্ত সম্পদও এর মধ্যে পড়বে। আর স্বাধীন পেশাধারীদের আয়টা গরীব-মিসকীন—যারা যাকাত পায়—তাদের জন্যে অধিক কল্যাণকর। এর ফলে বায়তুলমালে খুব বেশী পরিমাণ আয় জমা হতে পারে। অথচ সরকারের পক্ষে তা লাভ করতে কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয়না। প্রাপক ব্যক্তিরও কোন কষ্ট হয় না সাথে সাথে যাকাত দিয়ে দিতে। মাসিক বেতনধারী সরকারী ও ফাউণ্ডেশনসমূহের কর্মচারীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। এ কালের কর-পারদর্শীরা তার নাম দিয়েছে 'উৎসের উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি।' যেমন ইবনে মাসউদ, মু'আবিয়া ও উমর ইবনে আবদুল আযীয প্রমুখ দান করার সময়ই সেই দান থেকে প্রাপ্য যাকাতটা নিয়ে নিতেন, এও ঠিক তেমনি।

ইবনে আবূ শায়বা হুরায়রা থেকে ঘোষণা করেছেন ঃ 'ইবনে মাসউদ তাঁর দানসমূহের যাকাত নিতেন প্রতি হাজারে পঁচিশ হিসাবে। আউন ও মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন ঃ আমি দেখেছি, শাসক—রাষ্ট্রপ্রধানগণ যখন কোন দান করতেন, তখন তা থেকেই তার যাকাত নিয়ে নিতেন।'

উমর ইবনে আবদুল আযীয প্রদত্ত দান ও পুরস্কারের যাকাত সাথে সাথে নিয়ে নিতেন।

ইমাম মালিক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, দানসমূহ থেকে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি যাকাত দিয়েছিলেন, তিনি হলেন, মু'আবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান। একথা বলার

উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, খলীফাগণের মধ্যে এই ব্যাপারে তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি। কেননা তাঁর পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ কাজ করেছেন; কিন্তু তিনি খলীফা ছিলেন না।

৯. অর্জিত সম্পদে যাকাত ফরযকরণে ইসলামের গভীর পরোপকার ইচ্ছা, সহানুভূতি ও দানশীলতার ভাবধারার প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, মুসলিমের মন-মানসে এ ভাবধারা ব্যাপকভাবে জেগে ওঠে। প্রত্যেক সামষ্টিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়, ব্যক্তি হয় সমষ্টির জন্যে ত্যাগ স্বীকারকারী, সমাজের বোঝা বহনে হয় অংশীদার। এ একটা স্থায়ী গুণ-মর্যাদা বিশেষ। ব্যক্তিত্বের মৌল উপাদানসমূহের মধ্যে এ একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকী লোকদের গুণ-পরিচিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُوْنَ-

আমরা তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।

বলেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ-

হে ঈমানদার লোকেরা! আমরা তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে তোমরা ব্যয় কর—(যাকাত দাও)।

এই কারণে নবী করীম (স) প্রত্যেক মুসলিমের তার মাল-উপার্জন, কাজ-শ্রম ও অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে যাকাত দেয়া কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন।

বুখারী আবূ মুসা আল-আশ্'আরীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ على كل مسلم صدقة— 'প্রত্যেক মুসলিমকেই যাকাত দিতে হবে।' লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন; 'হে আল্লাহ্‌র নবী! যার কিছুই নেই সে কোত্থেকে যাকাত দেবে?' বললেন ঃ

لِيَحْمَلُ بِيَدِهٖ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ-

সে নিজ হাতে কাজ করবে, শ্রম করবে, তার আয়ে নিজেকে উপকৃত করবে এবং অন্যদের দান করবে।

সাহাবীরা বললেন, শ্রম ও কাজ করেও যদি কিছু না পায়? বললেন ঃ

يُعِيْنُ ذَالْحَاجَةِ الْمَلْهُوْف— সে ঠেকায় পড়া কষ্ট ও দুঃখ পাওয়া মানুষের সাহায্য করবে। সাহাবীরা আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তাও যদি না পারে—সে সামর্থও যদি না থাকে? রাসূল বললেন ঃ

فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلْيَمْسُكْ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ-

তাহলে সে নিজে নেক আমল করবে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে। আর এটাই হবে তার বড় দান।

ওসব নিত্য নব আমদানীকে ফরয যাকাত থেকে নিষ্কৃতি দেয়া ও একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা এমন অবস্থার সৃষ্টি করবে যে, বহু লোক বিপুল উপার্জন করবে, ব্যয় করবে ও সুখ-ভোগ করবে। নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করবে: কিন্তু আল্লাহ্র দেয়া এ নিয়ামত থেকে তাঁর পথে—একান্তভাবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে তারা কিছুই ব্যয় করবে না, তাদের প্রতি সহানুভূতিও জানাবে না—যারা আল্লাহ্র এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে এবং অনুরূপ উপার্জনে সক্ষম নয়।

১০. অর্জিত মাল-সম্পদের যাকাত দিতে একটি বছর অপেক্ষা করার শর্ত না থাকলে যাকাতের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃঙ্খল বণ্টন খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হতে পারে। যাদের যাকাত দিতে হবে, এটা তাদের পক্ষেও খুব ভাল ব্যবস্থা। আর যাকাত সংগ্রহের দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও এটা খুব সহজসাধ্য কাজ হয়। কেননা যে-ই মাল অর্জন করবে তার যাকাত দান একটি বছর স্থগিত থাকলে—যে-ই তা পাবে, কম বা বেশী, মাসিক বেতন হিসেবে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে বা জমির আয় হিসেবে—যে প্রকারেই হোক-না-কেন—তাকে প্রতি বছর একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। যখনই বছরান্তে সেই নির্দিষ্ট তারিখটি উপস্থিত হবে, তখনই তাকে যাকাত দিয়ে দিতে হবে। তার অর্থ এই হবে যে, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে এক বছরে দশ-পনেরোটি তারিখ নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে যখন অর্জিত মালের বছর পূর্তির পর যাকাত দিতে হবে। বস্তুত এ একটা কঠিন কাজ। যাকাত আদায়কারী সরকারের পক্ষেও তা খুবই কষ্টকর ও দুঃসাধ্য হবে। কেননা প্রতিটি ব্যক্তির এরূপ অসংখ্য নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক রাখা সম্ভব হবে না, ফলে যাকাত সংগ্রহ করাটাই স্থগিত রাখা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

এ কালের বিশেষজ্ঞদের অভিমত

এ পর্যায়ে খুবই ইনসাফের কথা হবে যদি আমরা এখানে একালের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ শায়খ মুহাম্মদ আল-গাযালী তাঁর الاسلام والاوضاع الاقتصاديه নামের গ্রন্থে যা লিখেছেন তার উল্লেখ করি। তিনি লিখেছেন, ইসলামে যাকাত ফরয করার মৌল নীতি হচ্ছে, হয় শুধু মূলধন গণ্য করা হবে—কম হোক বেশী হোক; কিংবা নিজ অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে থাকা। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি বছর তার উপর দিয়ে অতিবাহিত না হচ্ছে, ততক্ষণে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। এ হচ্ছে ব্যবসা পণ্যের ও নগদ সম্পদের যাকাত দেয়ার নিয়ম। তাতে এক দশমাংশের এক-চতর্থাংশ দেয়া ফরয। অথবা আয়ের পরিমাণটা গণ্য করা হবে মূলধনের প্রতি নজর না দিয়ে। যেমন কৃষি ফসল ও ফল। তাতে ওশর বা অর্ধ-ওশর ধার্য হয়। অতঃপর বলেছেন ঃ এ থেকে আমরা এই নির্যাস লাভ করতে পারি যে, যার কোন আমদানী আছে; যা যাকাত ফরয হয় এমন কৃষকের আমদানীর চেয়ে কম হয় না, সে সমমানের যাকাত দেবে। মুলধনের পরিমাণের কোন গুরুত্ব নেই, তার শর্তও কিছু নেই।

অতএব চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, শিল্পী, কারিগর ও বিভিন্ন ধরনের পেশাদার, বেতনভুক ও তাদের মত আর যাদের উপর যাকাত ফরয হয়, তাদের যাকাত দিতে হবে তাদের বড় বড় আমদানী থেকে! এ কথার দুটি দলীল আমার কাছে রয়েছে।

প্রথম ঃ কুরআন মজীদের যাকাত সংক্রান্ত সমস্ত নির্দেশের সাধারণ প্রযোজ্য আয়াতঃ 'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যে পবিত্র উপার্জন কর, তা থেকে ব্যয় কর (যাকাত

দাও)।' উল্লিখিত গোষ্ঠীসমূহের উপার্জন নিশ্চয়ই পবিত্র। অতএব তা থেকে ব্যয় করা, যাকাত দেয়া অবশ্য কর্তব্য। এরূপ ব্যয় করেই এসব লোক তাদের মধ্যে গণ্য হতে পারে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّ رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُوْنَ-

যারা গায়বের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদের যা রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।

দ্বিতীয় দলীল ঃ যে কৃষক পাঁচ কাঠা পরিমাণ জমিরও মালিক নয়, সে যদি ইজারা নিয়ে জমি চাষ করে, তাহলে তার উপরও যাকাত (ওশর) ধার্য হবে; কিন্তু বড় বড় ইমারতের মালিকদের ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয়ের উপর যাকাত ধার্য হবে না, যে ডাক্তার রোগী দেখে একদিনে একজন কৃষকের সারা বছরের খাটুনীর বিনিময়ে পাওয়া সম্পদেরও অনেক বেশী আয় করে, তার উপর যাকাত ধার্য হবে না, ইসলামের ন্যায়বাদী বিধান সম্পর্কে তা কল্পনাও করা যায় না।

কাজেই এ সবের উপরও যাকাত ধার্য হওয়া একান্তই আবশ্যক। সমান ও সাধারণ কারণ যতক্ষণ থাকবে—যার ভিত্তিতে শরীয়াতের হুকুম সাব্যস্ত হয়, ততক্ষণ এই ধারণাকে অগ্রাহ্য করা এবং এর ফলশ্রুতিকে স্বীকার না করা খুবই মারাত্মক ভুল।

যদি বলা হয়, কি করে অর্জিত সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করা হবে এবং কোন হারে ধার্য করা হবে, তাহলে তার সহজ জবাব হচ্ছে, শরীয়াত ফল-ফসলের যাকাত ওশর বা অর্ধ-ওশর ধার্য করেছে। জমির ফসলের কৃষকের উৎপাদনের পরিমাণের ভিত্তিতে যাকাত ধার্য হবে। অতএব প্রত্যেক কর্মীর উৎপাদন হিসাবে সর্বপ্রকারের আমদানীর উপর যাকাত ধার্য হবে।

এ কথার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটিনাটি মাস্য়ালার সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে এবং মূল্য নির্ধারণ করাও সম্ভব। কিন্তু তা উপরিউক্ত মৌলনীতি স্বীকার করে নেয়ার পর। অবশ্য তা এক ব্যক্তির একক চিন্তার উপর ভিত্তি করলে হবে না; সে জন্যে আলিমগণের সহ্যোগিতাপূর্ণ সমবেত প্রচেষ্টা (ইজতিহাদ) একান্ত আবশ্যক।

বস্তুত এ এক উত্তম কথা, ইসলামের মৌল ও ভিত্তিগত নীতি-আদর্শের গভীর উপলব্ধি নিঃসৃত। আর যে যুক্তি দুটির উল্লেখ হয়েছে, তা-ও নিখুঁত।

তবে এখানে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, তা চিন্তাবিদ আল-গাযালীর প্রদর্শিত। তাতে ইজমার বিরোধিতা করা হয়নি। এ মত সাহাবী, তাবেয়ী ও পরবর্তী ফিকাহ্‌বিদদেরও অবলম্বিত।

এই মতে চারটি প্রখ্যাত মাযহাবেরই রায়ের পরিপন্থী পথ অবলম্বিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ মত আল্লাহ্ ও রাসূলের কাছ থেকে পাওয়া এবং মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ফিকাহ্‌বিদদের উপস্থাপিত কোন দলীলের পরিপন্থী নয়। তাঁরা তো অন্ধভাবে তাঁদের অনুসরণ করতে বলেন নি, তাঁদের ইজতিহাদের বিপরীত মত পোষণ করা যে হারাম, তাও তাঁরা বলেন নি। বরঞ্চ তাঁরা অন্ধভাবে নির্বিচারে তাঁদের কথা মেনে নিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। এ কথা কারোরই অজানা নেই।

দ্বিতীয় আলোচনা

কাজ ও স্বাধীন পেশার বিনিময়ে পাওয়া সম্পদের নিসাব

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলাম সকল মালের উপর যাকাত ধার্য করেনি; পরিমাণ তার কম হোক কি বেশী। যে মালের পরিমাণ সর্বপ্রকার ঋণ ও মৌল প্রয়োজন বাদ দিয়ে নিসাব মাত্রা পর্যন্ত পৌছবে কেবল তারই উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে। নিসাবের এই শর্ত করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে, তার ধনাঢ্যতা যেন প্রকট হয় যার উপর যাকাত ফরয হয়ে থাকে। কেননা যাকাত তো কেবল ধনীদের কাছে থেকেই গ্রহণ করা হয়, আর 'প্রয়োজনাতিরিক্ততা'ও যেন স্পষ্ট হয়। কেননা তা-ই হচ্ছে যাকাত ধার্য হওয়ার ক্ষেত্র। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَيَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ- قُلِ الْعَفْوَ-

হে নবী! লোকেরা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কি পরিমাণ ব্যয় করবে। তুমি বলে দাও, যা মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا صَدَقَةَ اِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى-

যাকাত শুধু ধনাঢ্যতার উপরই ধার্য হয়।

যে সব মালের উপর যাকাত ধার্য হয় সেই প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা এ পর্যায়ে বিস্তারিত কথা বলে এসেছি। আর যাকাত যখন নিসাব ছাড়া ফরয হয় না, তখন নিসাবের পরিমাণ কি, তা নির্ধারিতব্য।

চিন্তাবিদ আল-গাযালী তাঁর পূর্বোদ্ধৃত কথায় কৃষি ফসল ও ফলের নিসাব অনুযায়ী এই জিনিসেরও নিসাব নির্ধারণের প্রতি ঝোঁক প্রকাশ করেছেন। কৃষকের যতটা আমদানীতে যাকাত দিতে হয়, তার চাইতে কম আমদানী না হলে এ পেশাদারদের থেকে যাকাত নেয়া হবে। ফিকাহ্‌র ভাষায় তার অর্থ দাঁড়ায়, যার আমদানী পরিমাণ পাঁচ অসাকের মূল্যের সমান (মিসরীয় ৫০ কিলো) অথবা ৬৫৩ কিলোগ্রাম ওজন সমান জমির ফসল—গম ইত্যাদি হলে তার কাছ থেকে যাকাত নেয়া হবে। এই মতের একটি গুরুত্ব এবং ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় কৃষি ফসলের নিসাবের পরিমাণ কম করার দিকে শরীয়াতের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়। কেননা মানুষের জীবন-জীবিকার মৌল উপাদান হচ্ছে এই কৃষি ফসল।

তার চাইতেও উত্তম কথা, এখানে নগদ সম্পদের নিসাবকে মান হিসেব গণ্য করতে হবে। আর তার মূল্যমান হচ্ছে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ। এ পরিমাণটা বিশ মিশকাল সমান, যা হাদীসে—সাহাবীদের উক্তিতে—উদ্ধৃত হয়েছে।

যেমন লোকেরা তাদের মাসিক বেতন ও অন্যান্য আমদানী নগদ টাকায় গ্রহণ করে থাকে, এ-ও ঠিক তেমনি। কাজেই এই নগদ সম্পদের নিসাব ঠিক করাই উত্তম।

এই প্রসঙ্গের অবশিষ্ট কথা

স্বাধীন পেশাদার লোকদের আমদানী সুনিয়মিত ও সুসংগঠিতভাবে হয় না। প্রতিদিনও হতে পারে—যেমন ডাক্তার চিকিৎসকের আয় কখনও সখনও হতে পারে—যেমন আইন ব্যবসায়ী, উকিল, দর্জী ইত্যাদি। কোন কর্মী তাদের মজুরী সাপ্তাহিক নিয়মে পায় বা দুই সপ্তাহের এক সাথে পায়। অধিকাংশ বেতনভুক কর্মচারী মাসিক বেতন পেয়ে থাকে। ... এ সব অবস্থায় তাদের নিসাব ধরা হবে কোন হিসেবে?

আমাদের সম্মুখে দুটি সম্ভাব্য পন্থা বা দিক রয়েছে ঃ প্রথম, প্রত্যেক সম্পূর্ণ পাওনা আমদানী বা অর্জিত সম্পদের নিসাব আলাদা-আলাদাভাবে নিসাব করতে হবে। যার যার আমদানী নিসাব পরিমাণ হবে—উচ্চমানের চাকরীজীবীদের উচ্চতর বেতন, বড় বড় ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি, তা কর্মচারীদের জন্যেও হতে পারে—স্বাধীন পেশাদারদের এক-এক দফার আমদানীর পরিমাণ খুব বিপুল হয়, তা থেকে যাকাত নিতে হবে। যা নিসাব পরিমাণ নয়, তা থেকে যাকাত নেয়া হবে না।

এই পন্থার একটা যৌক্তিকতা আছে। এর ফলে ছোট ছোট বেতনভুকের যাকাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। কেবল বড় বড় চাকুরেদের উপর যাকাত ধার্য হবে। সামাজিক সুবিচারপূর্ণ ধন-বন্টনের দৃষ্টিতে এই পন্থা উত্তম।

সাহাবী ও ফিকাহ্‌বিদদের উক্তি এই পন্থার সমর্থনে রয়েছে। তাঁরা বলেছেন, অর্জিত সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে সাথে সাথে যাকাত দিয়ে দিতে হবে। এই পন্থা এ সম্ভাবনার দ্বারও খুলে দেয় যে, বছর শেষ হলে নিসাব পরিমাণ থাকলে তার উপর যাকাত ফরয থাকবে।

কিন্তু প্রতিবারের আমদানীকে যদি নিসাব পরিমাণ ধরতে চাই, তাহলে অধিকাংশ স্বাধীন পেশাদারই যাকাত দেয়া থেকে মাফ পেয়ে যাবে। কেননা তাদের অল্প পরিমাণ আমদানী খুব কাছাকাছি দফায় হয় বটে; কিন্তু তার খুব কমই নিসাব পরিমাণ হয়ে থাকে। নিকটবর্তী সময়ে এই সমস্ত দফায় পাওয়া সম্পদ একত্র করে গণনা করা হলে তার সমষ্টি হয়ত নিসাব পরিমাণ হতে পারে। অধিকাংশ বেতনভুক কর্মচারীর অবস্থাও তাই।

এখানেই দ্বিতীয় সম্ভাব্যতা প্রকটিত হয়। তা হচ্ছে, নিকটবর্তী সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে অর্জিত বা আয় করা সম্পদ একত্র করে গণনা করা।

খনি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে পাওয়া সম্পদের নিসাব নির্ধারণে ফিকাহ্‌বিদগণ এই নীতি অবলম্বনের কথাই বলেছেন। কেননা তাতে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় বারে বারে উত্তোলিত সম্পদকে একত্রিত করে গণনা করা হলেই নিসাব পূর্ণত্ব পায়।

এক বছর সময়ের মধ্যে বারে বারে পাওয়া কৃষি ফসল ও ফলের নিসাব নির্ধারণে সব একত্রিত করে হিসাব করা পর্যায়ে ফিকাহ্‌বিদগণ একমত হতে পারেন নি। হাম্বলীদের বক্তব্য হল, এক বছরে পাওয়া কৃষি ফসল বা ফলের নিসাব মাত্রা পূর্তির জন্যে বিভিন্ন প্রজাতীয় ফল-ফসল একত্র করে গণনা করতে হবে, তা বিভিন্ন স্থান থেকে উৎপন্ন হলে ক্ষতি নেই। একই বছরে গাছে দুবার ফসল ধরলে তা একত্রিত করে নিসাব গণনা করতে হবে। কেননা তা এক বছরের ফল ও ফসল।

এই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, শরীয়াতের দৃষ্টিতে একটা বছর একটা সময়—ইউনিট। আধুনিক কর পদ্ধতিতেও তা-ই স্বীকৃত। যাকাতের বছর গণনায়ও এই নিয়ম চলবে।

অনেক ক্ষেত্রে সরকার কর্মচারীদের বেতন বার্ষিক হিসাব ধার্য করে, যদিও তা দেয় মাসিক হিসেবে। কেননা কর্মচারীদের প্রয়োজন এ হিসেবেই দেখা দেয়। তদনুযায়ী কর্মচারীদের নির্ভেজাল আয় এবং স্বাধীন পেশাদারদের আয় থেকে পূর্ণ বছরে একবার—যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়—যাকাত গ্রহণ করা হবে।

কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ অর্জিত সম্পদের যাকাত দেয়া ও তার পদ্ধতি পর্যায়ে যা বলেছেন, তার উল্লেখ উপরিউক্ত কথাকে বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট করে তুলবে।

অর্জিত সম্পদের যাকাত দেয়ার নিয়ম

আগের কালের যেসব মনীষী অর্জিত সম্পদের যাকাত দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন, যাকাত দানের নিয়ম ও পদ্ধতি পর্যায়ে তাঁদের কাছ থেকে দুটো কথা বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম নীতি ঃ জুহরী বলেছেন, একজন লোক যখন কোন সম্পদ অর্জন করল, তার নির্দিষ্ট যাকাত দেয়ার মাসের আগমনের পূর্বেই যদি সে তা ব্যয় করতে ইচ্ছা করে, তাহলে তাকে তার যাকাত প্রথমেই দিয়ে দিতে হবে। তারপর সে তা ব্যয় করতে পারবে। আর সে যদি তার এ সম্পদ ব্যয় করতে না চায়, তাহলে অন্যান্য মালের সাথে একত্র করে নির্দিষ্ট মাসেই সে যাকাত দেবে।

ইমাম আওযায়ী প্রায় এ রকমের কথাই বলেছেন। তাহলে, যে লোক তার দাস বা ঘর বিক্রয় করল, সে মূল্য হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার যাকাত দিয়ে দেবে। তবে তার যাকাত দেয়ার জন্যে কোন নির্দিষ্ট মাস থেকে থাকলে সে মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করে তার অন্যান্য মালের সাথে একসাথে যাকাত দেবে।

তার অর্থ, যার পূর্বে থেকেই যাকাত দেয়ার মাল রয়েছে ও তার একটি বছর প্রচলিত নিয়মে অতিবাহিত হয়ে গেছে, সে তার অর্জিত সম্পদের যাকাত দান সে মাস পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারবে। তদনুযায়ী সব মালের যাকাত একসঙ্গে দেবে। অন্যথায় বছর

পূর্তির পূর্বেই তা ব্যয় করে ফেলার আশঙ্কা থাকলে অনতিবিলম্বে তার যাকাত দিয়ে দেবে।

দ্বিতীয় নীতিঃ মক্‌হুল বলেছেন, কারোর, যাকাত দেয়ার নির্দিষ্ট মাস থাকলে—মাঝখানে যদি সে কোন মাল পেয়ে যায় ও তা ব্যয় করে ফেলে, তাহলে যা ব্যয় করে ফেলেছে, তার যাকাত তাকে দিতে হবে না। কিন্তু সেই মাস পর্যন্ত যা অবশিষ্ট থাকবে তার যাকাত তাকে দিতে হবে। যদি কোন নির্দিষ্ট মাস না থেকে থাকে, আর সে কোন সম্পদ পেয়ে যায়, তাহলে সে তখনই তার যাকাত দিয়ে দেবে।

কিন্তু এ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট মাসে যাকাত দেয়ার মত মাল যার আছে, সে এমন একটা সুযোগ পেয়ে যায়, যা যার সে রকম কোন মাল নেই সে পায় না। কেননা প্রথম ব্যক্তির পক্ষে অর্জিত সম্পদ যাকাত না দিয়েই ব্যয় করে ফেলা জায়েয হয়ে পড়ে। সে নির্দিষ্ট মাসে শুধু অবশিষ্ট পরিমাণেই যাকাত দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু যার অন্য মাল নেই, সে তো সাথে সাথেই যাকাত দিয়ে দেবে। ফল দাঁড়ালো এই যে, অন্য মাল যার আছে সে সুবিধা পেয়ে গেল, কিন্তু যার এই অর্জিত মাল ছাড়া আর কোন মাল নেই, তার উপরে অধিক চাপ পড়ল।

আমার চোখে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য মত হল, যে অর্জিত মাল নিসাব পরিমাণ হবে, তার যাকাত তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ে নেয়া হবে—যেমন জুহরী ও আওযায়ী বলেছেন। হস্তগত হওয়ার সাথে সাথেই যাকাত দিয়ে দেয়া হবে (যার অন্য কোন মাল নেই তার সম্পর্কে এই কথা), অথবা অন্যান্য মালের সাথে মিলিয়ে যাকাত দেয়ার জন্যে নির্দিষ্ট বছরপূর্তির জন্যে বিলম্ব করা হবে—যদি খরচ করে ফেলার আশংকা না থাকে তবে। অন্যথায় সঙ্গে সঙ্গেই যাকাত দিয়ে দিতে হবে। আর কার্যত তা ব্যয় করে ফেললেও তার যাকাত দেয়ার দায়িত্ব তার উপর অর্পিত থাকবেই। নিসাব পরিমাণের কম হলেও তা থেকে যাকাত নিতে হবে—যেমন মক্‌হুল বলেছেন। সেই নির্দিষ্ট মাস পর্যন্ত যা অবশিষ্ট থাকবে, একসঙ্গে তার যাকাতও দিয়ে দেবে। আর তার নিজের ও তার পরিবারবর্গের প্রয়োজনে যা ব্যয় হয়ে যাবে, তার যাকাত দেয়া ফরয হবে না। অর্জিত মাল ছাড়া তার অপর কোন মাল না থাকলে সেই নির্দিষ্ট সময়ে তার যাকাত দিয়ে দেব। আর অর্জিত মাল নিসাব পরিমাণের কম হলে তা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন যাকাত দিতে হবে না।

এই নীতির লক্ষ্য হচ্ছে, ছোটখাটো বেতনধারী লোকদের—যাদের প্রাপ্তি নিসাব পরিমাণ হয় না—তাদের যাকাতের দায়িত্ব হালকা করা। অনুরূপভাবে অল্প পরিমাণের কয়েক দফায় যে আমদানী স্বাধীন পেশাদারদের হয়, তারাও নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। কেননা তাদের কোন দফার আমদানীই নিসাব পরিমাণ হয় না।

নির্ভেজাল আমদানী ও মাসিক বেতনের যাকাত

মাসিক বেতন ও মজুরীর যাকাত দেয়ার মতটি যখন আমরা গ্রহণ করেছি, তখন আমরা এই মতকেই অগ্রাধিকার দেব যে, যাকাত কেবল নির্ভেজাল সম্পদ থেকে নিতে

হবে অর্থাৎ তা থেকে প্রমাণিত ঋণ বাদ দিতে হবে। আর তার ও তার পরিবারবর্গের নিম্নতম মাত্রার জীবন-জীবিকা মানুষের জন্যে একান্তই অপরিহার্য। তা হচ্ছে, মৌল প্রয়োজন। আর যাকাত ফরয হয় মৌল প্রয়োজন পূরণ করার পর অতিরিক্ত সম্পদের উপর।

এসব বাদ দিয়ে বছরের বেতন প্রাপ্তি ও আমদানী থেকে যাকাত নেয়া হবে, যদি তার পরিমাণ নগদ সম্পদের নিসাব সমান হয়। আর যে বেতন ও মজুরী বার্ষিক হিসাবেও নিসাব (সব বাদ সাদ দেয়ার পর) পরিমাণ হয় না, তা থেকে কোন যাকাত গ্রহণ করা হবে না।

মনে রাখা আবশ্যক, মুসলিম ব্যক্তি যখন তার কাজ বা পেশার মাধ্যমে উপার্জন করা সম্পদের যাকাত দেবে—সর্বপ্রকার অর্জিত সম্পদ থেকে, সে তার যাকাত দেবে অর্জিত হওয়ার সময়ে। পরে তা বছর সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পূর্বে তাকে আবার কোন যাকাত এ বাবদ দিতে হবে না। কেননা একই বছরে দুবার যাকাত ফরয হয় না। এ কারণে আমরা বলে এসেছি যে, সে তার অর্জিত সম্পদের যাকাত অন্যান্য মালের সাথে বছরপূর্তির পর দিতে পারে—যদি বছরপূর্তির পূর্বেই তা খরচ হয়ে যাওয়ার ভয় না থাকে।

একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। একজন লোক তার মালের যাকাত প্রতি বছর মুহাররম মাসে দিয়ে দেয়। সে যদি কোন অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করে—যেমন বেতন পেল সফর বা রবিউল আউয়াল কিংবা তার পরের কোন মাসে এবং প্রাপ্তির সাথে সাথেই তার যাকাতও দিয়ে দিল, বছরপূর্তির পর সে তার অন্যান্য মালের যাকাত দেয়ার সময় এ মালের যাকাত আবার দেবে না। এ মালের বা তার অবশিষ্টের যাকাত সে দেবে পরবর্তী বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পর। তাহলে একই বছরে দুবার যাকাত দেয়ার বোঝা তার উপর চাপবে না। কেননা আল্লাহর শরীয়াত মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্য দেয়, কষ্ট নয়।

তৃতীয় আলোচনা

কর্মে উপার্জিত সম্পদের যাকাত পরিমাণ

বিভিন্ন ধরনের আয়-আমদানী থেকে যে যাকাত নেয়া হবে, তার হার কি হবে? চিন্তাবিদ আল-গাযালী তা নির্ধারণের জন্য ইসলামী চিন্তাবিদদের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন বোধ করে তাঁদের আহবান জানিয়েছেন। আমরা এ পর্যায়ের কথাবার্তার তুলনামূলক আলোচনা-পর্যালোচনা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, এখানে তা সুবিন্যস্তভাবে পেশ করছি।

কেবলমাত্র মূলধনের ফলশ্রুতিতে পাওয়া আমদানী হবে অথবা মূলধন ও কর্ম—এই উভয়ের মিলিত আয় হবে। যেমন শিল্প-কারখানা, দালান-কোঠা, ছাপাখানা, হোটেল, গাড়ি, বিমান ইত্যাদির আমদানী-তার যাবতীয় খরচ, ঋণ ও মৌল প্রয়োজন বাদ দেয়ার পর নির্ভেজাল সম্পদ থেকে এক-দশমাংশ যাকাত বাবদ নেয়া হবে। কৃষি জমির আয়ের উপর কিয়াস করে এ মত দেয়া হয়েছে, যা কোনরূপ সেচ, পরিশ্রম বা ব্যয় ব্যতিরেকেই সিক্ত হয়।

দালান-কোঠা ও শিল্প-কারখানার আমদানীর যাকাত পর্যায়ে শায়খ আবূ জুহরা ও তাঁর সমমনাদের অভিমত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত খরচ ও কষ্ট, শ্রমমূল্য বাদ দিয়ে নির্ভেজাল আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হলে—যেমন শিল্প-কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে—তাহলে নির্ভেজাল আয় থেকে ওশর পরিমাণ যাকাত গ্রহণ করা হবে। আর তা সম্ভব না হলে আমদানী থেকে অর্ধ-ওশর পরিমাণ যাকাত নেয়া হবে—এই বন্টন নীতি গৃহীত হয়েছে।

মূলধন বলতে আমরা এখানে ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত নয় এমন মূলধন বুঝিয়েছি। আর ব্যবসায়ে আবর্তনশীল মূলধন ও তার মুনাফা থেকে এক সাথে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ নেয়া হবে।

কেবলমাত্র কাজের ফলে লব্ধ আয়—যেমন বেতনধারীদের বেতন ও স্বাধীন পেশাদারদের কাজের আমদানী—থেকে নেয়া হবে শুধু ওশরের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ। কেননা নগদ সম্পদে সাধারণভাবেই এই পরিমাণ ফরয করেছে কুরআন-হাদীসের দলীল। তা সদ্য অর্জিত সম্পদ হোক, কি তার উপর এক বছর অতিবাহিত হয়ে থাকে। তাতে চেষ্টা ও কষ্টের গুরুত্ব স্বীকারে ইসলামের যে মৌল নীতি রয়েছে, তার সাথে সংগতি রক্ষা করা হয়েছে। কেননা এই ক্ষেত্রে যাকাত পরিমাণ খুব হালকা হয়। ইবনে মাসউদ ও মুআবিয়া সৈন্যদের জন্যে দেয়া দান ইত্যাদির সাথে এই হার নির্ধারণে যে

নীতি অবলম্বন করেছেন, তার সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করা হয়েছে। এঁদের পরে উমর ইবনে আবদুল আযীযও এই নীতিই অনুসরণ করেছেন। কাজেই এসব দানের ক্ষেত্রে অবলম্বিত নীতির উপর কিয়াস করা কৃষি জমির আমদানীর উপর কিয়াস করা অপেক্ষা অনেক ভাল। তার উপর কিয়াস করা যেতে পারে দালান-কোঠা ও শিল্প-কারখানার আমদানী। এসব ক্ষেত্রে মূলধন অক্ষুণ্ন থেকেই আমদানী দিয়ে থাকে।

তার অর্থ কাজের আমদানীর ব্যাপার খালেস মূলধনের বা মূলধন ও কাজ মিশ্রিত আমদানীর ব্যাপার অপেক্ষা অনেক হালকা ও সহজ। একালেও তার উপর কর ধার্য করা হয়ে থাকে। আয়কর ধার্যকরণে উপার্জনশক্তির তারতম্যের প্রতি গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর মূলত আমদানীর উৎস তিনটি অবস্থার যে-কোন একটির মধ্যে পড়তে পারে। মূলধন, কাজ বা শ্রম এবং মূলধন ও শ্রম একত্রে। কেননা 'কর' জগতে এটা সুনির্দিষ্ট যে, অস্থাবর আমদানীর উপর বা জমির আমদানীর উপর কর পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে কাজে উপার্জনের উপর ধার্য করের চাইতে অধিক। কেননা মূলধন স্থায়ীভাবে আমদানী দিতে থাকে আর কর্মশক্তি খুব সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। তাঁরা আরও বলেছেন, আমদানীর উৎসের বিবেচনা এই হবে যে, শক্তিসম্পন্ন উৎসের আমদানী দুর্বল উৎসের আমদানী মালিকদের তুলনায় অধিক কর বোঝা বহনে সক্ষম। ধন-বণ্টনে সুবিচারনীতির কার্যকরতা এতেই নিহিত।

কমিউনিস্টরা তো দাবি তুলেছে যে, কর্মের আমদানীকে সর্ব প্রকারের কর থেকে মুক্ত রাখতে হবে। কিন্তু যাকাতের ইসলামী দৃষ্টিকোণ হচ্ছে তা আল্লাহর নিয়ামতের শোকরস্বরূপ দিতে হবে। তার মধ্যেই নফ্‌সের তায্‌কিয়া করতে হবে, ধন-মাল পবিত্র-পরিশুদ্ধিকরণ করতে হবে। আল্লাহ্‌র হক্‌ আদায় করারও পন্থা এটাই। সমাজ-সমষ্টির অধিকার এই পথেই আদায় করা সম্ভব। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোকদের সাহায্য করার এ এক কার্যকর ব্যবস্থা। এই মত ও দৃষ্টিকোণ কর্ম ও শ্রমের উপার্জনের উপরও যাকাত ধার্য করে; তার পরিমাণ যতই বিভিন্ন হোক-না-কেন।

দশম অধ্যায়

শেয়ার ও বণ্ডের যাকাত

আধুনিক অর্থনীতিতে এক নতুন ধরনের মূলধনের পরিচয় ঘটেছে। বিশ্বে শিল্প বিপ্লব ও ব্যবসায়ের নিত নতুন রূপ এই অভিনব মূলধনের উদ্গাতা। তা হচ্ছে শেয়ার ও বণ্ডের সার্টিফিকেট যা নগদ মূলধন সমতূল্য। বিশ্বের বাজারে ব্যবসায়ী লেন-দেনে তা বিশেষ গুরুত্ববহরূপে গণ্য। তা 'কাগজী মুদ্রার বিনিময়' নামে পরিচিত। এই সব কাগজ বা শেয়ার ও বণ্ডকে অর্থনীতিবিদগণ 'অস্থাবর সম্পত্তি' গণ্য করেন এবং তার নিত্য নতুন আমদানীর উপর কর ধার্য করা হয়। তার নাম করা হয় অস্থাবর সম্পত্তির আয়ের কর। অনেকে মূল শেয়ারের উপর কর ধার্য করে একে মূলধনের উপর ধার্য কর মনে করে।

শেয়ার ও বণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

'শেয়ার' হচ্ছে বড় বড় কোম্পানীর বিরাট মূলধনের অংশের উপর মালিকানা অধিকার। প্রতিটি শেয়ার মূলধনের অংশ হিসেবে সমমান ও মূল্যের হয়ে থাকে।

আর বণ্ড হচ্ছে ব্যাংক, কোম্পানী বা সরকার প্রদত্ত লিখিত প্রতিশ্রুতি বিশেষ, যার মালিক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ সম্পদ পাওয়ার অধিকারী হয়।

এই শেয়ার ও বণ্ড-এর মধ্যে পার্থক্যের আরও বহু দিক রয়েছে। 'শেয়ার ব্যাংক বা কোম্পানীর মূলধনের অংশের বিকল্প। আর বণ্ড কোম্পানী বা ব্যাংক কিংবা সরকারকে প্রদত্ত ঋণের একটি অংশের বিকল্প।

'শেয়ার' ব্যাংক বা কোম্পানীর মুনাফার একাংশ অর্জন করে। তার পরিমাণ কম হতে পারে, বেশীও হতে পারে। পরিমাণে এই বেশী-কম নির্ভর করে কোম্পানী বা ব্যাংকের লাভ অর্জনের পরিমাণের উপর। আর লোকসান হলে তারও অংশ তার ভাগে পড়ে। কিন্তু বণ্ড বা সার্টিফিকেট সেই ঋণ থেকে নির্দিষ্ট সীমিত পরিমাণ মুনাফা এনে দেয়, যা তার বিকল্প। এই মুনাফা কমও হতে পারে, বেশীও হতে পারে।

বণ্ডের ধারক ঋণদাতারূপে গণ্য। যে কোম্পানী বা ব্যাংক কিংবা সরকারকে লিখিত পরিমাণ ঋণ দিয়েছে বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু শেয়ার মালিক তার শেয়ার মূল্য অনুপাতে কোম্পানী বা ব্যাংকের অংশের মালিক হবে।

বণ্ডের একটা সীমীত সময় রয়েছে তার যথার্থতা স্বীকৃতির জন্যে। কিন্তু শেয়ার কোম্পানীর চূড়ান্ত অবসানের পূর্বে মূল্যহীন হয় না।

শেয়ার ও বণ্ডের একটা নামগত মূল্য রয়েছে। তা ইস্যু করার সময় যে মূল্য ধরে দেয়া হয়, তা-ই তার মূল্য। আর একটা আছে বাজার মুল্য—যা বাজার দর অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং উঠানামা করে। এর দুটিই পারস্পরিক লেনদেনে ব্যবহৃত ও গৃহীত হয় ঠিক পণ্যদ্রব্যের মতই। বহু লোক তার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করে থাকে

তার মাধ্যমে মুনাফা লাভের আশায়। চাহিদা ও যোগানের বাড়তি অনুসারে উপরিউক্ত বাজারে পণ্য মূল্য প্রভাবিত হয়, যেমন প্রভাবিত হয় দেশের রাজনৈতিক অবস্থার দ্বারা। তার অর্থ-কেন্দ্র ও কোম্পানীর সাফল্যও তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাতে শেয়ারের প্রকৃত মুনাফা পরিমাণ এবং বণ্ডের প্রকৃত মুনাফায় যথেষ্ট পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। বিশ্ব শান্তি বা যুদ্ধের প্রভাবও তার উপর যথেষ্ট প্রতিফলিত হয়।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, শেয়ার ইস্যু করা তার মালিকত্ব ও ক্রয়-বিক্রয় এবং তার ভিত্তিতে পারস্পরিক লেনদেন সম্পূর্ণ হালাল, তা করতে কোন দোষ নেই যতক্ষণ কোম্পানীর আসল কাজ কোন হারাম পেশার ভিত্তিতে না চলবে। যেমন মদ্যোৎপাদনের কারখানা, মদ্য বিক্রয়ের ব্যবসায় কিংবা সূদের ভিত্তিতে ঋণদান ও ঋণ গ্রহণ হতে না থাকবে।

কিন্তু বণ্ডের অবস্থা শেয়ার থেকে ভিন্নতর। যার গোটা কারবারই সূদ-ভিত্তিক। অনেক সময় অবশ্য বণ্ড মূলধন সমতল্য হয় তার মালিকের কাছে ঠিক শেয়ারের মতই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ দু'প্রকারের মূলধনের যাকাত কিভাবে দেয়া হবে?

বিভিন্ন কোম্পানী শেয়ারের যাকাত দেয়ার পদ্ধতি

এ পর্যায়ে খুব কম লেখা হয়েছে। সমকালীন মনীষিগণ শেয়ার ও বণ্ডের যাকাত দেয়া সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন, তাতে দুটি দিক স্পষ্ট ঃ

প্রথম দিক ঃ কোম্পানীর স্বরূপ অনুযায়ী শেয়ারের মূল্যায়ন

এ সব শেয়ার ও বণ্ডে প্রথম বিবেচনা করতে হবে তা ইস্যুকারী কোম্পানীর স্বরূপ অনুযায়ী। সে কোম্পানী কি শিল্প প্রতিষ্ঠান, না ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা উভয় দিকের সমন্বিত রূপ।

শেয়ারের স্বরূপ নির্ধারণ নির্ভর করে কোম্পানীর স্বরূপ নির্ধারণের উপর—যে কোম্পানীর মূলধনের একটা অংশের তা বিকল্প। আর তারই ভিত্তিতে তার যাকাত দেয়া-না-দেয়া সম্পর্কে মত ব্যক্ত করা চলে।

শায়খ আবদুর রহমান ঈসা তাঁর المعاملات الحديثة واحكام مها নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> কোম্পানীসমূহের বহু সংখ্যক শেয়ার মালিকই তাদের শেয়ারের যাকাত দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই জানে না। অনেকে মনে করে, তার যাকাত দেয়া ফরয নয়। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। অনেকের ধারণা কোম্পানীর সব শেয়ারেরই যাকাত ফরয। কিন্তু এ কথাও ঠিক নয়। শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানীর স্বরূপ নির্ধারণের মাধ্যমেই এ সব শেয়ার সম্পর্কে কথা বলা যাবে। কোম্পানী যদি নিছক শিল্প সংক্রান্ত হয়—যা কার্যত কোন ব্যবসা করে না;—যেমন রং-এর কোম্পানী, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কোম্পানী, হোটেল কোম্পানী, প্রচার কোম্পানী, অটোমোবাইল কোম্পানী, স্থল ও সামুদ্রিক পরিবহন কোম্পানী, ট্রাম কোম্পানী, বিমান কোম্পানী ইত্যাদি—এ সবের শেয়ারের কোন যাকাত দিতে হবে না। কেননা এসব শেয়ারের মূল যন্ত্রপাতি, প্রতিষ্ঠান পরিচালন ও আনুসংগিক কার্য পরিচালনায় নিয়োজিত এসব কোম্পানী যা

মুনাফা অর্জন করে তা শেয়ার হোল্ডারদের মূল সম্পদের সাথে যখন মিলিত হয় তখন সমগ্র সম্পদেরই যাকাত দেবে, একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয়।

আর কোম্পানী—যদি নিছক ব্যবসায়ী হয়—পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করে, এসব পণ্যের উৎপাদনে মূলধন বিনিয়োগ করে না,—যেমন বৈদেশিক বাণিজ্য কোম্পানী, আমদানীকারক কোম্পানী অথবা যদি শিল্প ও ব্যবসায়ী কোম্পানী হয়—যা কাঁচামাল উদ্ভাবন করে বা ক্রয় করে পরে তার উপর আবর্তনী কার্যক্রম পরিচালিত করে ও তাতে ব্যবসা করে—যেমন পেট্রোল কোম্পানী, পশম কোম্পানী, রেশম বা তুলা উৎপাদন কোম্পানী, লৌহ ও চর্বি কোম্পানী, রাসায়নিক কোম্পানী ইত্যাদি—এসব কোম্পানীর শেয়ারের যাকাত দিতে হবে। তাহলে কোম্পানীর শেয়ারসমূহের উপর যাকাত ফরয হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে, কোম্পানীর নিজেরই ব্যবসায়ী কার্যক্রমে জড়িত হওয়া—তার সাথে শিল্পোৎপাদন হোক কি না হোক। আর শেয়ারগুলোর মূল্যায়ন করা হবে তার সাম্প্রতিক মূল্যে। সেই সাথে প্রতিষ্ঠান, যন্ত্রপাতি ও কোম্পানীর মালিকানাধীন পাত্রসমূহেরও মূল্য ধরতে হবে। কেননা এগুলো মূলধনের এক-চতুর্থাংশ কিংবা তার কম অথবা বেশীরই প্রতীক। এগুলোর মূল্য তা থেকে বাদ যাবে। আর অবশিষ্টের যাকাত দিতে হবে। কোম্পানীর বাৎসরিক বাজেট থেকেই—যা প্রতি বছর তৈরী ও প্রকাশিত হয়। কেননা এই সবের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব।

শেয়ারের যাকাত পর্যায়ে উপরে যা লিখিত হয়েছে, তা এই প্রসিদ্ধ মতের উপর স্থাপিত যে, শিল্প-কারখানা, ব্যবসায়ী দালান-কোঠা ও তাতে বিনিয়োগকৃত মুলধনসমূহের' যা ব্যবসার কাজে নিয়োজিত নয়—সব কিছুতেই যাকাত হয় না। যেমন হোটেল, গাড়ি, ট্রাম, বিমান প্রভৃতি; মূলধন ও মুনাফাতেই ব্যবসায়ের পূর্ণত্ব নয়। না উৎপাদন ও আমদানীতে, যেমন কৃষি জমির উৎপাদান (তবে তা থেকে কিছু অবশিষ্ট থাকলে ও তার উপর একটি বছর অতিবাহিত হলে ভিন্ন কথা)। এই ভিত্তিতে শিল্প-কোম্পানী (যা কার্যত ব্যবসায়ের কাজে জড়িত নয়) ও অন্যান্য কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য করা হয় ও প্রথমটির শেয়ারের উপর যাকাত ধার্য করা হয় না, শেষোক্তটির শেয়ারের উপর ধার্য করা হয়। যদি দুজন লোক এমন হয় যে, তাদের প্রত্যেকেই এক হাজার দীনারের মালিক, তাদের একজন তার হাজার দীনার দিয়ে আমদানী-রফতানী কোম্পানীর দুইশ'টি শেয়ার খরিদ করল; আর অপরজন তার টাকা দিয়ে বই বা পত্র-পত্রিকা ছাপার কোম্পানীর দুইশ' শেয়ার ক্রয় করল। প্রথম ব্যক্তিকে তার দুইশ' শেয়ারের যাকাত দিতে হবে এবং প্রতি বছরের শেষে যে মুনাফা অর্জিত হবে তারও। অবশ্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সরঞ্জামাদির মূল্য বাদ দিয়ে যেমন ব্যবসায়ের মালে করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় জনের দুইশ' শেয়ারের যাকাত দিতে হবে না। কেননা তা কোম্পানীর প্রাতিষ্ঠানিক ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ে নিয়োজিত। তার মুনাফা ও যাকাত হবে না। তবে বছরের শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকলে ও সে মাল ও অন্য মাল মিলিয়ে নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিতে হবে। আর যদি বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তা ব্যয় হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেও তাতে যাকাত হবে না।

এভাবে এটা সম্ভব যে, এই ব্যক্তির সমস্ত বছরগুলোই এমনভাবে অতিবাহিত হয়ে যাবে যে, তার উপর যাকাত ফরয হবে না—না তার শেয়ারের উপর, না মুনাফার উপর। কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তির অবস্থা তা নয়। তার উপর প্রতি বছর বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত ফরয হতে থাকবে—তার শেয়ারেরও এবং তার মুনাফারও। কিন্তু এটা এমন একটা ব্যাপার যা ইসলামী শরীয়াতের সুবিচার নীতি কখনই সমর্থন করতে পারে না। কেননা দুটির সমান অবস্থার জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করা কোনক্রমেই ন্যায় বিচারের কাজ হতে পারে না।

অষ্টম অধ্যায় দালান-কোটা ও শিল্পকারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের যাকাত পর্যায়ের আলোচনায় আমরা বলে এসেছি যে, তাতে তিনটি প্রসিদ্ধ অন্ধ অনুসরণমূলক মতের বৈপরীত্য রয়েছে ঃ

১. একটি মত তা কি ব্যবসায়ের পূর্ণত্বের মাল গণ্য করে প্রতি বছর তার মূল্য নির্ধারণের কথা বলে এবং তার এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ যাকাত বাবদ দিতে বলে;

২. আর একটি মত তার উৎপাদন ও মুনাফাকে সদ্য অর্জিত মাল গণ্য করে তা থেকে নগদ সম্পদের সমান যাকাত গ্রহণ করতে বলে;

৩. তৃতীয় মত তাকে কৃষি জমির উপর কিয়াস করে এবং তাতে এক-দশমাংশ বা তার অর্ধেক যাকাত বাবদ ধার্য করে—তার নির্ভেজাল ফসল ও মুনাফা থেকে। সেখানে এই শেষোক্ত মতটিকেই আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি।

আর এখানে আমরা মনে করি, শৈল্পিক বা আধা-শৈল্পিক কোম্পানী এবং ব্যবসায়ী ও আধা-ব্যবসায়ী কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য করা—এমনভাবে যে, প্রথমটিকে যাকাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং দ্বিতীয়টিতে যাকাত ধার্য করা হয়—এমন একটা পার্থক্যমূলক নীতি যা কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, কিয়াস কোন কিছুই সমর্থন করতে পারে না।

ব্যবসায়ী কোম্পানীর শেয়ার হলে তার যাকাত নেয়া এবং শিল্প-কোম্পানীর শেয়ার হলে তা প্রত্যাহার করার মূলে কোন যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না। এই উভয় ক্ষেত্রেই শেয়ারগুলো তো মূলধন, যা প্রবৃদ্ধি পায়, মুনাফা আনে—বাৎসরিক এবং নিত্য নতুন। বরং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুনাফা প্রথমটির তুলনায় অনেক বেশীই হয়ে থাকে—হতে পারে।

আমরা যদি এই দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করতে চাই—ব্যবসায়ী কোম্পানীর স্বরূপ অনুযায়ী শেয়ারসমূহের প্রতি নজর দিয়ে, যা তার মূলধনের অংশ—তাহলে এখানে আমরা বলব যে, কোম্পানীসমূহের স্বরূপ যা-ই হোক—তা ব্যক্তিবর্গের কার্যক্রমের মতই। কেননা তারা তারই মালিক, যার মালিক হয় এই সব শিল্প বা কোম্পানী-সমূহ। অতএব শৈল্পিক কোম্পানী বা আধা-শৈল্পিক কোম্পানী—যা তার মূলধনের বেশীর ভাগ প্রাতিষ্ঠানিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ে বিনিয়োগ করে থাকে—যেমন ছাপাখানা, শিল্পকারখানা, হোটেল, পরিবহন গাড়ি ইত্যাদি—এ সব কোম্পানীর শেয়ার থেকে—বরং তার নির্ভেজাল আয় ও মুনাফা থেকে ওশর পরিমাণে যাকাত নেয়া হবে না। যেমন উৎপাদান মূলক প্রতিষ্ঠানের যাকাতের ক্ষেত্রে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি এবং শিল্প-কারখানা, হোটেল ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমরা করে থাকি—যদি তা ব্যক্তির মালিকানাধীন হয়।

পক্ষান্তরে ব্যবসায়ী কোম্পানীসমূহের মূলধনের বড় অংশ অস্থাবর জিনিসপত্রে নিয়োগ করে, যা দিয়ে তা ব্যবসা করে, তার মূল অবশিষ্ট থাকে না। এ সব কোম্পানীর শেয়ারগুলোর বাজার দর অনুযায়ী যাকাত নেয়া হবে। সেই সাথে মিলাতে হবে তার মুনাফা। তার যাকাতের পরিমাণ হবে শতকরা ২.৫% শেয়ারগুলোর স্থায়ী মূল্য ও সর ামাদির মূল্য বাবদ দিয়ে। ব্যবসা পণ্য সম্পর্কে যেমন পূর্বে বলে এসেছি—গতিশীল ও আবর্তনশীল মূলধনের যাকাত দিতে হবে। ব্যবসায়ী কোম্পানীসমূহের ব্যাপার এমনিই হয়ে থাকে, যা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে যখন তা ব্যক্তিদের মালিকানাভুক্ত হয়। এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

বণ্ডের যাকাত

বণ্ডের যাকাত পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ বণ্ড ব্যাংক বা কোম্পানী কিংবা সরকারের ঋণগ্রস্ততার চেক্। তার ধারক নির্দিষ্ট সীমিত মুনাফা পাওয়ার অধিকারী হয়। এই বণ্ডের মালিক একটা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের মালিক। কিন্তু মেয়াদ শেষে তা তাৎক্ষণিক হয়ে যায়। অতএব তার উপর যাকাত ফরয হবে সেই সময়—যদি তার মালিকত্বে এক বছর বা ততোধিক সময় অতিবাহিত হয়ে থাকে। ইমাম মালিক ও আবূ ইউসুফ এই মত দিয়েছেন।

আর তার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হলে তার যাকাত দেয়া ফরয হবে না। কেননা তা মেয়াদী ঋণ। তার মালিকত্বে এক বছরকাল অতিবাহিত না হলেও তাই। কেননা তাতে যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে একটি বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত।

পূর্বে বলেছি, ফেরত পাওয়ার আশায় ঋণ সম্পর্কে সহীহ্ কথা হচ্ছে, প্রতি বছরই তার যাকাত দেয়া ফরয হবে। জমহুর ফিকাহবিদগণেরও এই মত। কেননা এই ধরনের ঋণ হাতে মজুদ সম্পদের মত।

বিশেষভাবে বণ্ডের ক্ষেত্রে এই কথাই যথার্থভাবে গ্রহণীয়। কেননা এই ঋণের একটা বিশেষত্ব আছে, ফিকাহবিদগণ যে ঋণের সাথে পরিচিত এই ঋণ তা থেকে ভিন্নতর। কেননা তা প্রবৃদ্ধি সম্পন্ন সম্পদ, তা ঋণদাতার জন্য মুনাফা অর্জন করতে থাকে, যদিও তা নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষিদ্ধের জন্য বণ্ড যাকাত দেয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে না। হারাম কাজ করার দরুন কেউ অন্যের উপর বিশেষ মর্যাদা বা সুবিধা লাভ করতে পারে না। এ কারণে ফিকাহবিদগণ হারাম অলংকারের যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হয়েছে—যদিও তা মুবাহ্। অবশ্য অলংকারের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ ঃ শেয়ারগুলোকে ব্যবসা পণ্য হিসেবে গণ্য করা

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ প্রথমোল্লিখিত দৃষ্টিকোণের বিপরীত। তাতে শেয়ারগুলো সম্পর্কে কোম্পানীর স্বরূপের বিচার-বিবেচনা করা হয় না। ফলে এক ধরনের কোম্পানীর শেয়ার ও অন্য ধরনের কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। বরং এ সবগুলোর প্রতি এক অভিন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় এবং কোম্পানীর স্বরূপের প্রতি নজর না দিয়ে সকল পর্যায়ে একই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চিন্তাবিদ আবূ জুহরা, আব্দুর রহমান, হাসান ও খাল্লাফ মনে করেন শেয়ার ও বণ্ড মাল বিশেষ, যা ব্যবসা করার জন্যে গৃহীত হয়েছে। কেননা এগুলোর ধারক তো তা নিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা চালায় এবং তা থেকে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতই উপার্জন করে। তার প্রকৃত মূল্য বাজারে নির্ধারিত হয়, যা তার লিখিত মূল্যের তুলনায় ক্রয়-বিক্রয় বিভিন্ন মূল্যের হয়ে থাকে। এই দিক দিয়ে তা ব্যবসায়ের পণ্য বিশেষ। অতএব তা ব্যবসায় পণ্যের মতই বিবেচিত হওয়া উচিত।

তার অর্থ, প্রতি বছরের শেষে তা থেকে শতকরা ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। বাজার মূল্য নির্ধারণ অনুযায়ী শেয়ারসমূহের মূল্য থেকেই তা দেয়া হবে। সেই সাথে যুক্ত হবে তার মুনাফা। তবে শর্ত এই যে, মূল্য ও মুনাফা মিলিত হয়ে নিসাব পরিমাণ হতে হবে। অথবা নিসাব পরিমাণ পূর্ণ হবে তার কাছে রক্ষিত মাল মিলিয়ে। মৌল প্রয়োজন পূরণের ব্যয় তো বাদ যাবেই। অন্যথায়, নিম্নতম জীবিকা পরিমাণ, এই দৃষ্টিতে যে, শেয়ারের মালিকের তা ছাড়া জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন সূত্র নেই। যেমন বিধবা ইয়াতীম—যাদের কোন জীবিকা-উপায় নেই। অবশিষ্ট মুনাফা ও মূলধনের যাকাত একসাথে দেবে। সম্ভবত প্রথম দৃষ্টিকোণের তুলনায় এই দৃষ্টিকোণটি ব্যক্তিবর্গের বিবেচনায় অধিক গ্রহণীয়। তদনুযায়ীই ফতওয়া দেয়াও বাঞ্ছনীয়। তাতে প্রত্যেক শেয়ার মালিক তার শেয়ার পরিমাণ দ্বারাই বিবেচিত হবে। প্রতিবছরই তার মুনাফা পরিমাণও জানতে পারবে এবং তদ্দরুন সহজেই সে তার যাকাত দিতে সক্ষম হবে। প্রথম দৃষ্টিকোণে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারের মধ্য পার্থক্য করা হয় এবং এক ধরনের শেয়ারের যাকাত নেয়ার কথা বলা হয়, অন্য ধরনের নয়। কোন-কোনটিতে মূল শেয়ারের যাকাত নেয়ার কথা বলা হয়, অন্য ধরনের নয়। কোন-কোনটিতে মূল শেয়ারেই যাকাত নেয়া হয় তার মূল্য হিসাবে এবং সেই সাথে তার মুনাফা যুক্ত করে। এটা বড় দুরূহ ব্যাপার। এই কারণে আমরা বলব, এই দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করা দাতাদের পক্ষে উত্তম; হিসাব করাও সহজ। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র যদি কোম্পানীগুলোর যাকাত দিতে ইচ্ছা করে, তাহলে অবশ্য প্রথম দৃষ্টিকোণই অধিক ভাল ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

কোম্পানীর আয় ও শেয়ারের যাকাত কি একসাথে নেয়া হবে

এই শেয়ারগুলোকে যদি ব্যবসায়ী মূলধন গণ্য করা হয় এবং তা থেকে ব্যবসায়ী যাকাত গ্রহণ করা হয়, তাহলে এসব শেয়ারের ভিত্তিতে যেসব কোম্পানী গড়ে উঠে তার আয় থেকেও কি যাকাত গ্রহণ করা হবে?

আবূ জুহ্‌রা ও তাঁর সঙ্গিগণ এ মত দিয়েছেন যে, শেয়ার ও বণ্ড—যে তা নিয়ে ব্যবসা করে—তার থেকে যে যাকাত গ্রহণ করা হবে, তা হবে মূল কোম্পানী থেকে গৃহীত যাকাত থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। কেননা যেসব কোম্পানী থেকে যাকাত নেয়া হবে, তা হবে এই হিসাবে যে, কোম্পানীর-মাল প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন, শিল্পোৎপাদনশীল ইত্যাদির কারণে। কিন্তু যে লোক কেবল শেয়ার নিয়ে ব্যবসা করে তার কাছে তা ব্যবসায়ের পণ্য হিসেবে প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন মাল।

নিষিদ্ধ দ্বৈততা

উপরিউক্ত মতের ভিত্তিতে বলতে চাই, ধরুন—এক ব্যক্তির কোন শৈল্পিক কোম্পানীর শেয়ার রয়েছে, যার মূল্য এক হাজার দীনার। বছরের শেষে তা নির্ভেজাল মুনাফা অর্জন করল দুইশত দীনার। তার এই সমস্ত—১২০০ দীনারের—শতকরা ২.৫% হিসাবে মোট ৩০ দীনার যাকাত বাবদ দেয়া কর্তব্য হবে।

কোম্পানীর নির্ভেজাল মুনাফা থেকে যদি ওশর পরিমাণে যাকাত নেয়া হয়—এই মতের লোকেরা যেমন বলেন—তাহলে এই এক হাজার দীনার ও তার অর্জিত মুনাফার যাকাত দুইবারে নেয়া হবে। তাতে একবার শেয়ার মালিককে ব্যবসায়ী গণ্য করা হবে এবং তার শেয়ার ও মুনাফা সব কিছু থেকে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ নেয়া হবে। পরে আবার নেয়া হবে উৎপাদক হিসেবে। তাহলে শেয়ারের মুনাফা থেকে—অন্য কথায় কোম্পানীর আয় থেকে ওশর নেয়া হয়। বস্তুত এ-ই হচ্ছে দ্বৈততা, যা শরীয়াতে নিষিদ্ধ।

দুই যাকাতের পরিবর্তে কোন একটি যাকাত গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। হয় যাকাত নেয়া হবে শেয়ার মূল্য থেকে তার মুনাফা সহ—এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণে অথবা যাকাত নিতে হবে কোম্পানীর নির্ভেজাল আয় থেকে ওশর পরিমাণে।

সাদৃশ্যসম্পন্ন অবস্থাসমূহ—যা ফিকাহ্‌বিদগণ নিষেধ করেছেন

এখানে এমন কতগুলো অবস্থার উল্লেখ অবান্তর হবে না, যা পরস্পর সাদৃশ্য সম্পন্ন কিংবা আমাদের উপস্থাপিত এই অবস্থার নিকটবর্তী। ফিকাহ্‌বিদগণ যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তার ফলে আলোচ্য বিষয়ে আমাদের কথার যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

গবাদিপশুর ব্যবসা ও তার যাকাত দেয়ার নিয়ম

'গবাদিপশু সম্পদের যাকাত' অধ্যায়ে আমরা বলে এসেছি যে, গবাদিপশুর সংখ্যা নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দেয়া ফরয । এই কথা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু কেউ যদি গবাদিপশু ব্যবসার জন্যে ক্রয় করে তাহলে শরীয়াতের হুকুম কি হবে। যেসব পশু বছরের অধিকাংশ সময় মুফত ঘাস খাওয়ায়ে পালা হয় এবং তার একটি বছর পূর্ণ হয়ে যায়। তাতে ছেড়ে দিয়ে উন্মুক্তভাবে পালা ও ব্যবসা করা উভয় নিয়তই বর্তমান। তাহলে তখন কি পালিত পশুর যাকাত দিতে হবে, না ব্যবসা পণ্যের যাকাত দিতে হবে?

এ পর্যায়ে ইবনে কুদামাহ ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (নতুন মতে) বলেছেন, তার পশু পালনের যাকাত দিতে হবে। কেননা এই পশুগুলোর পালনের দিকটি অধিক বলিষ্ঠ—এই মতে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতএব তাই উত্তম।

ইমাম আবূ হানীফা, সওরী ও আহমদ বলেছে, তার যাকাত হবে ব্যবসা যাকাত। কেননা তা দিলে যাকাত প্রাপক গরীব-মিসকীনরা ভাগে বেশী পাবে। আর যাকাত ফরয হয় নিসাবের অতিরিক্ত সম্পদে, কিন্তু পশুর যাকাত তা নয়। শরীয়াতে নির্দিষ্ট নিসাবসমূহের মধ্যবর্তী পরিমাণ থেকে যাকাত প্রত্যাহার করা হয়েছে। ৪০ ও ১২০ টি

ছাগলের মাঝের যে কোন সংখ্যার যাকাত দিতে হয় না। ২৫—৩৬ টি উটের মাঝের কোন যাকাত হয় না। তাই যদি পশুর যাকাত দেয়া হয়, তাহলে গরীব লোকেরা সেই পশুগুলোর যাকাত থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয়, যা দুই নিসাব পরিমাণের মধ্যবর্তী। কেননা তার যাকাত মাফ করে দেয়া হয়েছে অথচ ব্যবসার বিচারে যাকাত দেয়া হলে—তা-ও করা যায়—ফরয সঠিকরূপে আদায় হয়ে যায়। পালিত পশুর সংখ্যা নিসাব মাত্রার না হলে ব্যবসার যাকাতের নিসাব পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছবে। ব্যবসার যাকাত পরিমাণে বেশী হবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

আর ব্যবসা যাকাতের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যদি পশু যাকাতের সময় এসে যায়—যেমন কেউ ৪০ টি ছাগলের মালিক হল, তার মূল্য ব্যবসা নিসাবের কম, পরে তা বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠল বা মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে গেল, তখন তার মূল্য অর্ধ বছরে ব্যবসা নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে গেল, এরূপ অবস্থায়—কোন কোন আলিমের মতে—ব্যবসা যাকাতের বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তার যাকাত ফরয হওয়া বিলম্বিত হবে। কেননা গরীবদের জন্যে তা-ই অধিক লাভজনক।

ইবনে কুদামাহ বলেছেন, পশুর যাকাত তার বছর শেষ হওয়াকালে ফরয হবার সম্ভাবনা আছে। কেননা কোনরূপ প্রতিবন্ধক ছাড়াই তার দাবি বর্তমান। তাই ব্যবসার বছর পূর্ণ হয়ে গেলে নিসাবের অধিক সম্পদের যাকাত দেয়া ফরয হবে। কেননা এটা ব্যবসার মাল এবং তার উপর একটি বছর অতিবাহিত হয়েছে এবং তা-ই নিসাব।

দুটি পূর্ণ হলেও দুই যাকাত ধার্য হওয়া সম্ভবপর নয়। কেননা তাতে একই বছরে ও একই কারণে দুবার যাকাত দেয়ার অবস্থা দেখা দেয়। নবী করীম (স)-এর উক্তির কারণে তা জায়েয হবে না।

আর যদি পশুর নিসাব পূর্ণ হয়; কিন্তু ব্যবসার নিসাব পূর্ণ না হয়—যেমন ৪০টি ছাগী, তার একটি বছর পূর্ণ হল; কিন্তু তার মূল্য ব্যবসার নিসাব মাত্রায় হল না—তা হলে তাতে কোন প্রতিবন্ধক নেই বলে তার উপর পশুর হিসাবের যাকাত ফরয হবে।

ইবনে কুদামাহ্ আরও বলেছেন, কেউ যদি একটি জমি বা বাগান ব্যবসার জন্যে ক্রয় করে, পরে জমি চাষ করালে, ফল বা ফসল পাওয়া যায়, আর উভয় বছরই একসঙ্গে সম্পূর্ণ হয়—বছর পূর্ণ হওয়াকালে ফল বা ফসল পাকে, আর জমির মূল্য ফসলের মূল্য ব্যবসার নিসাবের অনুরূপ হয়, তাহলে সে ফল ও ফসলের যাকাত বাবদ ওশর দেবে। আর মূল জমি বা বাগানের যাকাত দেবে ব্যবসার যাকাত হিসেবে। আবূ হানীফা ও আবূ সওর এই মত দিয়েছেন।

হাম্বলী মতের লোকদের কথা হল, জমি ও ফসল উভয়েরই যাকাত দেবে এর মূল্য হিসেবে। কেননা আসলে তা তো ব্যবসায়ের মাল। অতএব তাতে ব্যবসার যাকাত ধার্য হবে।

প্রথম কথার পক্ষের দলীল হচ্ছে, ওশর যাকাত গরীবদের জন্যে অধিক পরিমাণে পাওয়ার ব্যবস্থা করে—এক-দশমাংশ। এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশের তুলনায়

বেশী। তাই যা গরীবদের অধিক পরিমাণে দেয়, তাকেই অগ্রসর ধরতে হবে। আর এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশের অধিক পাওয়ার কারণ এখানে বর্তমান। অতএব তা-ই ফরয় হবে। তবে ব্যবসার জন্যে ক্রীত পশুর ব্যাপারটি ভিন্নতর। কেননা পশুর হিসাবে যে যাকাত তা ব্যবসার যাকাতের তুলনায় কম। ইবনে কুদামাহ্ প্রদত্ত এই যুক্তি খুব অকাট্য নয়। কেননা যাতে গরীবদের অংশ বেশী হবে তাকেই অগ্রবর্তি মনে করা অগ্রাহ্য হবে যদি তাতে মালিকদের উপর জুলুম হয়। শরীয়াত তো উভয় পক্ষের প্রতি সমান ইনসাফের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।

এই পদ্ধতি প্রবর্তিত ইনসাফের কথা হল, মূল থেকে নয়, আয় ও আমদানী থেকে যাকাত নেয়া হলে ওশর ধার্য হয়। যেমন ফল-ফসলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মূল ও তার প্রবৃদ্ধি থেকে যাকাত নেয়া হলে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ ধার্য করা হয়। ব্যবসায়ে যেমন মূলধন ও মুনাফা উভয় থেকে যাকাত নেয়া হয়। কিন্তু এ দুটি ব্যাপার একত্রিকরণের পক্ষে কোন হুকুম নেই। তাই দুটি যাকাতের একটিকে অন্যটির উপর বিজয়ী ধরতে হবে।

এক্ষেত্রে দুটি কারণ একত্রিত হয়েছে, ব্যবসা ও চাষাবাদ—এমন কথা বলাও অযৌক্তিক। কেননা দুটির একটি কারণ মূলত লক্ষ্যভুক্ত, আর দ্বিতীয়টি তার ফলশ্রুতি। অতএব তা পিছনে থাকবে। তাই যে লোক কৃষি জমির ব্যবসা করে—কেনে ও বেচে—সেখানে চাষাবাদ আসল লক্ষ্য নয়; তা আনুসংগিক মাত্র। সেখানে ব্যবসায়ের লক্ষ্যটা প্রবল ও বিজয়ী ধরতে হবে।

এ কারণে হাম্বলী মাযহাবের লোকেরা বলেছেন ঃ যে লোক ব্যবসার জন্যে নির্দিষ্ট ও ক্রীত পশুর নিসাব সংখ্যার মালিক হল, তার উপর শুধু ব্যবসার যাকাত ধার্য হবে। কেননা ব্যবসার লক্ষ্য পশুর যাকাত হিসাবকে দূরীভূত করেছে। আর যে লোক ব্যবসার জন্যে ক্রীত জমির মালিক হল, তাতে সে চাষাবাদ করে বীজ বপন করল, তাকে ব্যবসার যাকাত দিতে হবে অথবা কেউ ব্যবসার খেজুর বাগানের মালিক হল, তাতে ফল ধরল সে-ও শুধুই ব্যবসার যাকাত দেবে। যদি ব্যবসার বছর পূর্তির পূর্বেই ফসল ও ফলের যাকাতের হিসাব অগ্রবর্তী হয় তবুও। কেননা ফল ও ফসল তা থেকে পাওয়া সম্পদের অংশ-বিশেষ। তাই মূলের সাথেই তা গণ্য হবে। তবে যদি সেই পশু, জমিসহ ফসল ও ফলসহ বাগানের মূল্য নিসাব পরিমাণ না হয়—বিশ মিশকাল স্বর্ণ মূল্যের ও দুইশ' রৌপ্য মুদ্রার কর—তাহলে তার অ-ব্যবসায়ী যাকাত দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পশুর হিসাবে যাকাত দেবে। আর ফল ও ফসলে যা ফরয হবে তা-ও। কেননা যাকাত তো সম্পূর্ণভাবে নাকচ করা যায় না।

ইবনে হাজম হাসান ইবনে হাই থেকে উদ্ধৃত করেছেন, যা ব্যবসার জন্যে চাষাবাদ করা হয়েছে—তার যাকাতও হবে ব্যবসা-যাকাত, অন্য কিছু নয়।

কাসানী বলেছেন, যে লোক ব্যবসার লক্ষ্যে ওশরী জমি ক্রয় করবে কিংবা খারাজী জমি ক্রয় করবে ঐ ব্যবসার উদ্দেশ্যে, তাতে হয় ওশর ধার্য হবে, না হয় হবে খারাজ। কোন একটিতেও ব্যবসার যাকাত ধার্য হবে না—এ হচ্ছে হানাফীদের মত।

ইমাম মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, এরূপ ক্ষেত্রে ওশর ও যাকাত—ব্যবসা-যাকাত অথবা খারাজ ও যাকাত উভয়ই ধার্য হবে। এই বর্ণনাটির তাৎপর্য হল, জমির উপর ফরয হবে ব্যবসার যাকাত, আর ওশর হবে কৃষি ফসলের উপর। এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন মাল। কাজেই একটি মালের উপর দুটি হক্ ধার্য হয়েছে, এমন কথা বলা যাবে না।

হানাফী মতের প্রসিদ্ধ বর্ণনার তাৎপর্য হচ্ছে, প্রত্যেকটির উপর যাকাত ফরয হওয়ার কারণ এক, আর তা হল জমি। আর আল্লাহ্র হক্ ধার্য হয় প্রবৃদ্ধি সম্পন্ন মালে। একটি নামের কারণে দুটি হক তাতে ফরয হয়নি। যেমন গবাদিপশুর যাকাত হয় ব্যবসার যাকাতের সঙ্গে একসাথে।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, একটি যাকাত অপর যাকাতটির উপর প্রাধান্য পাবে। এভাবে যে, একটি যাকাত ধার্য হয়ে অপরটি ধার্য হওয়ার পর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। হানাফীদের এ হল প্রসিদ্ধ মত। কিন্তু কোন্ যাকাতটি প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার পাবে? ... আমার কথা, যাকাতদাতার ইচ্ছার উপর তা ছেড়ে দিতে হবে, অথবা রাষ্ট্রকর্তা তার ফয়সালা করবে। কেননা উভয় যাকাতের পেছনেই যুক্তি রয়েছে।

এখানে আমি যা বলতে চাই, তা হচ্ছে, মুসলিম ফিকাহ্‌বিদ্‌দের অধিকাংশই—বরং সকলেই একই মালে একই কারণে একাধিকবার যাকাত ধার্য হওয়া না-জায়েয মনে করেন। যদিও কোন কোন অবস্থায় কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ পরস্পরের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। আর তা করেছেন, তাঁদের দৃষ্টিতে দুই কারণে যাকাত ধার্য হয়েছে বলে। ইমাম মুহাম্মাদের বর্ণনায় যেমন বলা হয়েছে ঃ

ইসলামী শরীয়াতে বহু বর্ষ পূর্বেই এ পর্যায়ে বিধান রচিত হয়েছে; তা ইসলামী চিন্তা ও কর ধার্যকরণ জগতে 'দ্বৈত কর ধার্যকরণ নিষিদ্ধ' নামে পরিচিত হয়ে আছে।